জয়ন্তী-উৎসর্গ

রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১১ই পৌষ, ১৩৩৮

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীজগদানন্দ রায়

জয়ন্তী-উৎসর্গ

প্রথম সংস্করণ, পৌষ, ১৩৩৮

মূল্য ৩৸০ টাকা

মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুরী লেন, কলিকাতা
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসীগণ কবির কাব্যা-লোচনার উদ্দেশে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা গঠন করেন এবং কবির জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখকদের রচনা সংগ্রহ আরম্ভ করেন। সংগ্রহের কাজ কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর বিশ্বভারতীর উপর তাহা সম্পূর্ণ করা এবং প্রকাশের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শেষ কয়েক মাস যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিশ্বভারতী যে রচনাগুলি বঙ্গবাণীর অঙ্গনে চয়ন করিয়াছেন, জয়ন্তী-উৎসবের শুভদিবসে অদ্য তাহা কবির চরণে নিবেদন করিয়া সার্থক হইলাম।

মুদ্রিত রচনাগুলি ব্যতীত আরো অনেক রচনা সংগৃহীত হইয়াছিল; সময় ও স্থানাভাববশত আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক,
বিশ্বভারতী-গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ।

১১ই পৌষ,
১৩৩৮

সূচী

জয়ন্তী-উৎসর্গ

"জয়ন্তী"

—শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

রবীন্দ্রনাথ ও আমি যখন সর্ব্বপ্রথম সৌহার্দ্দ্যের সুনিবিড় বন্ধনে পরস্পর আকৃষ্ট হই তাহার পর প্রায় সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল কাটিয়া গেল। জীবনের বহুবিচিত্র বিকাশ ও ধারার পরিচয় লাভের পথে একদা আমি যখন তিলে-তিলে অগ্রসর হইতেছিলাম সেই ক্লান্তিহীন প্রয়াসে বৎসরের পর বৎসর তিনি আমাকে প্রতিদিন সখ্য ও সাহচর্য্য দান করিয়াছেন। সহস্র-সহস্র বৎসরের মৌনতা ভাঙিয়া বাণীহীন তরুলতা অবশেষে একদিন যেন কথা কহিয়া উঠিল, আপন অন্তরজীবন সুখ-দুঃখ পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী সে আপনি লিপিবদ্ধ করিয়া চলিল। এই স্বরচিত ইতিহাসের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, উদ্ভিদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম প্রাণী পর্য্যন্ত নিখিল জীবলোকে একই প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইতেছে, একই প্রাণধারা সর্ব্বত্রই বহমান। যে-বাধা একদিন আত্মীয় হইতে আত্মীয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা দূর হইল, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী একই জীবনধারার বহুমুখী বিকাশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এই মহাসত্যকে জানিতে পারিলে জগদ্ব্যাপারে পরমরহস্যের যবনিকা ঘুচিয়া যাইবে না, বরং গভীরতর নিবিড়-তর হইয়াই উঠিবে। মানুষ যে তাহার অসমাপ্ত জ্ঞান, অসম্পূর্ণ দৃষ্টি ও অক্ষম

শক্তি লইয়াও অবিনির্ণীত-দিক্ মহাসমুদ্রে দুঃসাহসিক জয়-যাত্রায় আপনার চিত্ততরণী ভাসাইয়া দিল একি কম আশ্চর্য্যের কথা? যে-অবর্ণনীয় রহস্য তাহার দৃষ্টির অগোচর ছিল, এই অভিযানপথে অকস্মাৎ এক-একদিন সে-রহস্য মুহূর্ত্তকালের জন্য তাহার গোচরীভূত হইতে থাকে এবং যে-আত্ম-সর্ব্বস্বতা এতকাল তাহাকে বিশ্বব্যাপী প্রাণস্পন্দনের প্রতি বিমুখচিত্ত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা তাহার মন হইতে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে নিঃশেষে মিলাইয়া যায়।

বিশ্বজগতের এই ঐক্যতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির নিকটে ধরা দিয়াছে এবং তাঁহার কাব্যে ও সাধনায় এই ঐক্যধারাই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। প্রতিদিন তাঁহার দৃষ্টি উদার হইতে উদারতর হোক্ এবং তাঁহার বাণী নিখিলের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হোক্, এই কামনা করি।

কবি-রবি

—শ্রীকামিনী রায়

স্নিগ্ধ রক্ত রাগ রথে পূরব অম্বরে
বালারুণ রূপে যবে রবীন্দ্র-উদয়,
উঠেছিল দিগ্‌বধূ গাহি' জয় জয়
হেরি' তারে। চিনি' তারে তার কণ্ঠস্বরে
মেলি' আঁখি কহে বঙ্গ, আনন্দের ভরে—
একি আলো! একি গান! গীতি-জ্যোতির্ম্ময়
এ যে গো আমার রবি—আর কারো নয়;
দিলা বিধি সর্ব্ব দৈন্য ভুলাবার তরে।
যত বেলা বাড়ে ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধতর
চলে তার আলো-রথ, ঝরে শতধারে
অমৃত-বরষা। বিশ্ব চাহি' নভঃ পানে,
হেরে মধ্যাকাশে রবি অপূর্ব্ব ভাস্বর!
বঙ্গের কি ভারতের কে কহিবে তারে?
রবি জগতের কবি আজ কে না জানে?

রবীন্দ্রায়ণ

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

হে সূর্য্য, প্রতিভা তব সপ্ত অশ্ব সপ্ত সিন্ধু পারে
যে-বিজয়মাল্য জিনি' ফিরিল এ পূর্ব্বাশার দ্বারে,
বিচিত্র আনন্দালোকে উদ্ভাসিয়া বিশ্বের ললাট,—
কোন্ কণ্ঠে, কহ কবি, তার যোগ্য মন্ত্র করি পাঠ ?

সপ্তদ্বীপে জয়ধ্বনি উঠে যার দিবসে নিশীথে,
দীপ্ত জাগরণসম অভ্যর্থনা যার ধরিত্রীতে,
সপ্ত আলোকের তারে সপ্তস্বরা যার অতন্দ্রিত,—
কোন্ ছন্দে, কহ কবি, তারে আজি করিব বন্দিত ?

শিবসরস্বতী যার একাধারে শুভ্র কণ্ঠভূষা,
কালের কালিন্দীতীরে জাগে যার অকুণ্ঠিতা ঊষা,
বাণী যার বার্ত্তা বহি' দিকে দিকে বর্ণবাণ হানে,—
কোন্ যন্ত্রে কোন্ সুর দিব তার প্রশস্তিকা-গানে ?

আনন্দ ও বেদনার নব নব রূপরশ্মিঘাতে,
ইন্দ্রধনু কুজ্ঝটিকা ছায়াচ্ছবি যার তুলিপাতে
নিত্য মূর্ত্ত হ'য়ে উঠে মানবের মানসদর্পণে,—
কোন্ যোগ্য অর্ঘ্য তার বিরচিব এ অভিনন্দনে ?

আজি শুধু স্তব্ধ হ'য়ে ভাবি মনে, কী যে তুমি ধন !
বিধাতার আশীর্ব্বাদ,—তব স্পর্শে ধন্য এ জীবন।
কবির প্রেরণা তুমি চিত্তমাঝে, ভক্তের বিনতি :
তব পদপ্রান্তে আজি জানাইনু প্রাণের প্রণতি।

রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন সাহিত্যিক ও অন্যবিধ নানা সাধনায় ও কর্ম্মে পরিপূর্ণ। ব্যক্তিত্বে ও প্রতিভায় জগতের শ্রেষ্ঠ মানবসমূহের মধ্যে তিনি গণনীয়। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন না, একটি প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে সম্যক্ ধারণা উৎপাদন সম্ভবপর নহে। এইজন্য কেবল কয়েকটি বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিব।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি মাসিক পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে কোন কোন সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজেও তিনি লিখিয়াছেন। আমি যতদূর অবগত আছি, প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার কোন ইংরেজী লেখা মুদ্রিত হয় নাই। ১৯১২ সালের গোড়ার দিকে আমি তাঁহাকে তাঁহার কোন কোন বাংলা কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে অনুরোধ করি। তাহার পূর্ব্বে কেহ তাঁহাকে এরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন কি না, জানি না। আমাকে তিনি অনিচ্ছা জানান, এবং এ-বিষয়ে তাঁহার শক্তিতে তখন তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, তাহা আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল। তিনি যদিও আমার অনুরোধের উত্তরে পরিহাস করিয়া লিখিয়াছিলেন,

> "বিদায় দিয়েছি যারে নয়ন-জলে,
> এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে ?"

ছাত্রাবস্থার সঙ্গে-সঙ্গে সেই অবস্থার আনুষঙ্গিক ইংরেজী রচনার অভ্যাসকে তিনি বিদায় দিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তাঁহার অন্তরের প্রেরণা তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিল না, তিনি কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা ১৯১২ সালের গোড়ার দিকে অনুবাদ করিয়া, আমি অনেক বৎসর ইস্কুল মাষ্টারি করিয়াছিলাম বলিয়া, আমাকে দেখিতে দেন। এইগুলি আমি মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত করি। আমি যতদুর জানি ইহার পূর্ব্বে তাঁহার কোন ইংরেজী কবিতা অন্য কোথাও ছাপা হয় নাই।

বাংলা মাসিক পত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা 'জ্ঞানপ্রকাশে' প্রকাশিত হয়। এই মাসিক বহুকাল লয় পাইয়াছে। "ভুবনমোহিনী প্রতিভা" সেকালের কোন নারীনামধারী পুরুষের একটি জাল রচনা। রবীন্দ্রনাথ 'জ্ঞানপ্রকাশে' ইহার সমালোচনা করেন। এই জাল তখনকার অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিককেও ঠকাইয়াছিল, কিন্তু যুবা রবীন্দ্রনাথকে ঠকাইতে পারে নাই।

পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সম্পাদকতায় যখন সাপ্তাহিক হিতবাদী বাহির হইত, রবীন্দ্রনাথ তখন তাহাতে লিখিয়াছিলেন। পরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যখন কলিকাতার গ্রে ষ্ট্রীট-স্থিত স্বীয় বাসভবন হইতে সুপ্রভাত নামক সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন, তখন তাহাতেও রবীন্দ্রনাথের লেখা বাহির হইয়াছিল। আমি তখন এলাহাবাদে চাকরী করিতাম এবং ঐ কাগজের তত্রত্য সৌখীন সংবাদদাতা ছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি মাসিকের সম্পাদকতা করিয়াছেন, কবিতা প্রবন্ধ গল্প উপন্যাস চিঠি দিয়াছেন তার চেয়ে অনেক বেশী মাসিক পত্রে।

তাঁহার সম্পাদিত "বালক" সেকালে দেখিয়া আমার মনে হইত, যে, তিনি তাহা যে-সব বালকদের জন্য সম্পাদন করিতেন, তাহাদের রুচি জ্ঞান বুদ্ধি সম্বন্ধে ধারণা নিজের বাল্যের জ্ঞান বুদ্ধি রুচির মতই মনে করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণে, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অভিপ্রেত "ভারতী"র সহিত তাহা পরে মিলিত হইয়া "ভারতী ও বালক" নামে বাহির হইতে পারিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বালক, ভারতী, ভাণ্ডার, বঙ্গদর্শন, ও সাধনার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। সবুজ পত্রের সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী; কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে লেখা জোগাইবার ভার বেশী পরিমাণে লইতে হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত সব কাগজের মধ্যে সাধনা শ্রেষ্ঠ, সেকালে আমার এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল। তাহা পরিবর্ত্তন করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। সাধনার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, তাঁহার লেখাতেই ইহার কলেবর অনেকখানি পূর্ণ হইত। তাছাড়া, অন্য যে-সব লেখা বাহির

হইত, তাহার উপরও তাঁহারই ব্যক্তিত্বের ও লিখিবার সম্বন্ধে তাঁহার স্বকীয় ছাঁদের ছাপ অনুভব করিতাম। ইহার কারণ বোধ হয় এই, যে, তিনি অন্য লেখকদের লেখা খুব সুধরাইয়া দিতেন, হয়ত সেগুলি অনেকটা তাঁহার দ্বারা পুনর্লিখিত হইত। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত লেখকের লেখাও তাঁহার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া তবে 'সাধনা'য় বাহির হইত। বলিতে গেলে, তিনি অনেক লেখককে গড়িয়া-পিটিয়া মানুষ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রচনার উৎকৃষ্ট পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

তিনি ইহা যে কেবল নিজের সম্পাদিত কাগজগুলির লেখকদের সম্বন্ধেই করিয়াছেন, তাহা নহে। প্রবাসীতে কিছুদিন "সংকলন" নাম দিয়া কতকগুলি লেখা বাহির হইত। এইগুলি বিলাতী ও আমেরিকান্ নানা মাসিক পত্রের নানা প্রবন্ধের আংশিক বা সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এইরূপ কতক মাসিক শান্তিনিকেতনে আসিত। অনেকগুলা আমি কিনিয়া এবং স্বর্গীয় বামনদাস বসু মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দিতাম। তিনি তাহা হইতে প্রবন্ধ বাছিয়া শান্তি-নিকেতনের কোন কোন অধ্যাপক ও ছাত্রকে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুবাদ করিতে দিতেন। অনুবাদগুলি তাঁহার হাতে পৌঁছিলে তিনি কোন কোন অংশ বাদসাদ দিতেন, সংশোধন করিতেন। তাহার পর সেগুলি আমার নিকট আসিত। আমি অনেক সময় দেখিতাম, তিনি পাতাকে পাতা লম্বা কষি টানিয়া কাটিয়া দিয়া পাশে আগাগোড়া সমস্তটা স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন। সংশোধন ও পরিবর্ত্তন ত' অনেক থাকিতই। তাঁহার মত অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখকের এই লোকহিতৈষণাপ্রসূত পরিশ্রম হইতে নবীন লেখকদের ইহা শিখিবার আছে, যে, এরূপ কাজকেও ড্রাজারি বা "গাধার খাটুনী" মনে করা উচিত নয়।

প্রবাসীর "সংকলন" কেন বন্ধ হইল, তাহা জানিবার যোগ্য। কিছুকাল এই কাজ করাইয়া ও করিয়া কবি দেখিলেন ও আমাকে জানাইলেন, বিলাতী ও আমেরিকান্ ম্যাগাজিনগুলাতে হিতকর ও মনোহারী প্রবন্ধের অভাব লক্ষিত হইতেছে, অতএব সংকলনযোগ্য জিনিষ আগেকার মত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না। বিলাতী ও আমেরিকান্ লোক-

প্রিয় ম্যাগাজিনগুলির এই অপকর্ষ হয়ত এখনও কায়েম আছে। হয় ত বলিতেছি এইজন্য, যে, সেগুলির সহিত বহুকাল আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় নাই।

কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎকৃষ্ট লেখাই ছাপিব অথচ মাসিক পত্রটা ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে বাহির করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা সেই সম্পাদকই করিতে পারেন, যিনি স্বয়ং মাসিক পত্রের জন্য আবশ্যক সব রকম গদ্য ও পদ্য রচনা প্রচুর পরিমাণে জোগাইতে পারেন। এই যোগ্যতা বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথের যেমন দেখিয়াছি, আর কাহারও সেরূপ দেখি নাই। সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধেও তিনি সেকালে যাহা লিখিতেন এবং এখন যাহা লেখেন, তাহাতেও সাহিত্যরস পাওয়া যায়। তাঁহার লেখা এক-একখানা পোষ্টকার্ডেও এই রস বিদ্যমান। এইজন্য তিনি ইচ্ছা করিলে একাই এক-একখানা কাগজ চালাইতে পারেন। তাহা যে তিনি করেন নাই, ভালই করিয়াছেন। কারণ, তাহা করিলে সাংবাদিক জগৎ লাভবান্ হইত বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠতর সাহিত্য তাঁহার প্রতিভার ফসল হইতে বঞ্চিত হইত।

সাংবাদিকদের একটা গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। তাহা ঠিক্ সময়ে নিয়মিতরূপে লেখা জোগান। রবীন্দ্রনাথের এই গুণ আছে। তাঁহার অনেক লেখা ক্রমশঃ পাইয়া মাসে মাসে ছাপিয়াছি। কখনও তাঁহার জন্য বিলম্ব বা অনিয়ম ঘটে নাই। মনে পড়িতেছে, গোরা উপন্যাসের একটি কিস্তি তিনি দারুণ শোক পাইবার পরদিনই লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

মাসিকপত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কি করিয়াছেন, এতক্ষণ তাহাই বলিলাম, কারণ মাসিক চালান আমার প্রধান কাজ বলিয়া এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কোন কোন কথা আমার জানা আছে। এখন অন্য কিছু বলিব।

স্কট্‌ল্যাণ্ডের স্যাল্টন-নিবাসী ফ্লেচারের উক্তি বলিয়া এই একটি কথা চলিত আছে যে, কেহ যদি কোন জাতির গান এবং কথা ও কাহিনী রচনা করিতে যান, তাহা হইলে তাহার বিধি-ব্যবস্থা কে প্রণয়ন করে, তাঁহার তাহা খোঁজ লইবার আবশ্যক নাই। সোজা কথায় ইহার মানে এই দাঁড়ায়,

যে,জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় ইতিহাস লোকপ্রিয় সাহিত্যের দ্বারা যে-ভাবে ও যে-পরিমাণে গঠিত হয়, বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা তাহা হয় না। এই মতটির দ্বারা কবিপ্রভাব সুন্দর ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত জাতীয় চরিত্রকে যে-ভাবে গড়িয়াছে, কোন্ শাসনকর্ত্তা নিজের প্রভাব সেই প্রকারে তেমন স্থায়ী ভাবে বিস্তার করিতে পারিয়াছেন? রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টসাহিত্যের প্রভাব বাঙালীজাতির উপর কতটা পড়িয়াছে, তাহা আমরা সম্যক্ বুঝিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে বুঝা যাইবে।

তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি ও গদ্য লেখক। জগতের শ্রেষ্ঠ লেখক-দিগের মধ্যেও তিনি স্থান পাইয়াছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই হাত দিয়াছেন, এবং যাহাতে হাত দিয়াছেন তাহাকেই অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং তাহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন— তাহাই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বিশ্বসঙ্গীত শুনিয়াছেন; তাঁহার কবিতায় ও গদ্য রচনায় আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। নয়নগোচর রূপের জগৎ, সৌন্দর্য্যের জগৎ তিনি দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। অধিকন্তু তিনি ধ্বনির জগতের রূপ অনুভব করিয়া অন্যকেও তাহা অনুভব করাইবার অসামান্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। জন্মলব্ধ প্রতিভা, শিক্ষা, সাধনা, শোক তাঁহাকে বিশ্বনাথের বাণী শুনিতে সমর্থ করিয়াছে। তিনি পরব্রহ্মের প্রেরণায় তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া আমাদিগকে বিশ্বনিয়মের ও বিশ্বনিয়ন্তার সহিত যোগ-স্থাপন করিতে আহ্বান করিয়া আসিতেছেন।

তাঁহার মত মানবপ্রাণের নিগূঢ় মর্ম্মস্থলে পৌঁছিতে অল্প লেখকই পারিয়া-ছেন। মানুষের বাহ্য আবরণের আভ্যন্তরীণ কারণ তিনি অসামান্য দক্ষতার সহিত বিশ্লেষণ ও প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্বে বাংলা-সাহিত্য জাতীয় সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বসাহিত্যের সমশ্রেণীস্থ হইয়াছে। যে-সকল আদর্শ ভাব ও চিন্তার স্পর্শ, প্রভাব ও শক্তি বিশ্বমানবকে প্রগতি ও উন্নতির জন্য, নূতন আলোকের জন্য, নবজীবনের জন্য চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, বাঙালীরা তাঁহার রচনার মধ্যে তাহা অনুভব করিয়াছে।

বাংলাভাষায় যদি কেবল তাঁহারই রচনা থাকিত, তাহা হইলেও ইহা বিদেশীদের শিখিবার যোগ্য হইত। কিন্তু তিনি কেবল সাহিত্যিক নহেন। চলিত কথায় যাহাকে গানের ওস্তাদ বলে, তিনি তাহা না হইলেও, সঙ্গীতে তিনি আশ্চর্য্য প্রতিভাশালী। তিনি যে কেবল ভগবদ্ভক্তি, স্বদেশপ্রীতি ও অন্য নানা বিষয়ক বহুসংখ্যক অতি উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছেন তাহা নহে; তিনি যে কেবল সুকণ্ঠে হৃদয়-বীণার সহিত মিলাইয়া ঐসকল নানাভাবের গান গাহিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বহু বৎসর ধরিয়া মুগ্ধ করিয়া আসিতেছেন তাহা নহে; তিনি অধিকন্তু নূতন নূতন গানে, নূতন নূতন সুর দিয়া নিজ সঙ্গীত সৃষ্টি-নৈপুণ্য দ্বারা অনেক ওস্তাদকেও চমৎকৃত করিয়াছেন। কবিতা ও নাটক পাঠে ও আবৃত্তিতে, নাটক-অভিনয়-দক্ষতায়, এবং লিখিত বক্তৃতা সভা-সমক্ষে পাঠে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা লক্ষিত হয়। নৃত্যকলার অনুশীলন দীর্ঘকাল ভদ্রসমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। তিনি বালিকা ও নারীদের সুরুচিসঙ্গত নৃত্যকে আবার ভদ্রসমাজে স্থান দিয়াছেন। নৃত্য-শিক্ষাদানে তিনি সুনিপুণ, চিত্রকলায় তাঁহার কৃতিত্ব মানুষকে ভাবাইতেছে এখন তাঁহার প্রতিভা প্রচার কোন্ নূতন পথে যাইবে। উপাসনান্তে তিনি যে-সকল উপদেশ দেন এবং না লিখিয়া মুখে মুখে যে-সব বক্তৃতা দেন, তাহাতে তাঁহার বাগ্মিতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার সরস কথোপকথন সাতিশয় উপভোগ্য। তিনি পরিচিত অপরিচিত কত লোককে কত যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহার কোন হিসাব নাই। এইসব চিঠি বাংলা সাহিত্যের রত্ন।

তাঁহার রচিত স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশভক্তি বিষয়ক গানগুলি অতীব প্রাণস্পর্শী। ভারতবর্ষের ইতিহাস এরূপ যে, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে বীররসের সঞ্চার করিতে হইলেই ভারতবাসী কোনো-না-কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে মনকে উত্তেজিত না করিয়া বীরত্বব্যঞ্জক গান রচনা করা কঠিন। কিন্তু এরূপ গান সমগ্র জাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রীতিকর ও উৎসাহবর্দ্ধক হইতে পারে না। তদ্দ্বারা সম্প্রদায়-বিশেষ ক্ষণিক উত্তেজনা, উৎসাহ ও তৃপ্তি লাভ করিলেও

তাহা জাতিগঠনের অনুকূল হইতে পারে না। এই প্রকারের বীররসাত্মক গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন নাই, ভালই করিয়াছেন। কিন্তু তা বলিয়া বীরত্বসঞ্চারী কোন গানই যে তিনি রচনা করেন নাই, এমন নয়। সাহস, নির্ভীকতা, অপরের জন্য আত্মোৎসর্গ, স্বদেশবাসীর ও অপর মানবের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের বিকাশে ও প্রকাশে অটল বিশ্বাস, সকলের পক্ষে স্বাধীনতার সম্ভাবনায় বিশ্বাস, সর্ব্বদেশে মানব-প্রকৃতির অদম্যতায় বিশ্বাস, সত্য-ন্যায়-করুণার জয়ে বিশ্বাস, বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস, বীরত্বের প্রধান উপাদান। এইসব উপাদান তাঁহার "স্বদেশী" গানগুলিতে, "কথা ও কাহিনী"তে, "নৈবেদ্যে" ও অন্য অনেক রচনায় প্রচুর পরিমাণে আছে। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে", এ শিক্ষা তাঁহার মত আর কে দিয়াছে? আমাদের শৃঙ্খল অন্যে যত দূর করিবার চেষ্টা করে, আমাদের আভ্যন্তরীণ বন্ধন তত টুটিয়া যায়, এ শিক্ষা তাঁহার মত আর কে দিয়াছে? "বিধির বিধান ভাঙবে তুমি এমনি শক্তিমান্?"—এ প্রশ্ন তাঁহার মত দৃঢ় স্বরে আর কে করিয়াছে? তাঁহার রচনাবলীর অসামান্য সংযম ও সুষমা, এবং তৎসমুদয়ে বাহ্য ডাক-হাঁক, স্পর্দ্ধা, বীরত্বোচ্ছ্বাস ও আস্ফালনের অভাব আমাদিগকে অনেক সময় ভুলাইয়া দেয় যে, তাহাদের মধ্যে কিরূপ শান্ত সংযত আত্মসংবৃত অটল বীরত্ব নিহিত আছে।

তাঁহার হৃদয় ভারতবর্ষের অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সকল বিভাগকে ভালবাসিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা তিনি ঠিক্ করিয়াছেন।

তাঁহার স্বদেশপ্রেমে সংকীর্ণতা, অতীত গৌরবের অতিপূজা এবং বিদেশ ও বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ-অবজ্ঞা নাই। ভারতবর্ষের বিশেষত্বে এবং বিধিনির্দ্দিষ্ট বিশেষ কার্য্যে ও ভবিষ্যতে তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু অন্যান্য দেশেরও যে এইরূপ বিশেষত্ব, বিশেষ কাজ ও ভবিষ্যৎ থাকিতে পারে, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে তিনি অবজ্ঞা করেন না, অনাবশ্যকও মনে করেন না; বরং বিজ্ঞান-চর্চ্চার দ্বারা জাগতিক সত্য ও নিয়ম আবিষ্কারে ও অন্য কোন কোন বিষয়ে পাশ্চাত্য

জাতিসমূহের কৃতিত্বকে তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। কিন্তু তিনি চান না, যে, ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য দেশ-সকলের একটা নিকৃষ্ট নকল মাত্র হয়—উৎকৃষ্ট নকল হয় তাহাও তিনি চান না। পশ্চিমের নিকট হইতে আমরা লইব, পশ্চিমও আমাদের নিকট হইতে লইবে। ভিক্ষুকের মত, পৈত্রিক-সম্পত্তিহীন অনাথ বালকের মত আমরা প্রতীচীর প্রাসাদের দ্বারস্থ হইব না। আমাদেরও প্রকৃতিতে সর্ব্ববিধ মহত্ত্ব, সর্ব্ববিধ সাফল্য, সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের বীজ নিহিত আছে। প্রতীচীর সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে যদি তাহা অঙ্কুরিত হয়, তাহাই প্রধান লাভ। আমরা আঁধার ঘরের বদ্ধ বাতাসে আবদ্ধ ছিলাম; যেমন ভাবেই হউক, প্রতীচীর দ্বারা আমরা বাহিরের আলো বাতাস, বাহিরের ঝঞ্চাবৃষ্টি, বাহিরের জনতার ঠেলাঠেলির মধ্যে আনীত হইয়াছি। এখন হাত পা ও মনটা স্বাভাবিক ও সতেজ হউক। প্রতীচী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে নাই। তাহার আবির্ভাব আমাদেরই আভ্যন্তরীণ ব্যাধির ফল ও বাহ্য লক্ষণ। জোর করিয়া তাহাকে গলাধাক্কা দিতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা; তাহা সম্ভবপরও নহে। আমরা মানুষ হইলে, সুস্থ-প্রকৃতি হইলে, স্বদেশকে বাস্তবিক স্ব-দেশ করিতে পারিলে, ভাবে চিন্তায় জ্ঞানে কার্য্যে জাতীয় জীবনের সকল বিভাগকে আপনাদের করিতে পারিলে, শৃঙ্খলা সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য্যে স্বদেশী চেষ্টায় স্বদেশকে বরেণ্য করিতে পারিলে পাশ্চাত্যের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব দূর হইবে। এই প্রকার চেষ্টায় যে বাহ্য বাধা আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহা দূর করা যে অনাবশ্যক মনে করেন, তাহা নহে। বাহিরের শৃঙ্খল ছিঁড়িতে তিনিও চান; কিন্তু ভিতরের শৃঙ্খল ছেঁড়াও অত্যাবশ্যক মনে করেন। এবং ভিতরের শৃঙ্খল ছিন্ন না হইলে বাস্তবিক বাহিরের অভাবও দূর হইবে না, মনে করেন। এইজন্য তাঁহার রাষ্ট্রনীতি স্বদেশবাসী প্রত্যেকের ও স্বদেশী সমাজের আভ্যন্তরীণ সুস্থতা সম্পাদনে ও শক্তিবর্দ্ধনে ব্যাপৃত। ভিতরে যে-লোক প্রবৃত্তির, স্বার্থের, ভয়ের, অজ্ঞানতার ও কুপ্রথার দাস, বাহিরে তাহার বন্ধনমুক্ত হওয়া সুকঠিন হইলেও তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে। অতএব জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের পথ ভিতরেও অন্বেষণ করা চাই। এই কারণে রাষ্ট্রনীতির রবীন্দ্রনাথ এবং ধর্ম্মাচার্য্য রবীন্দ্রনাথ অভিন্ন।

লঘু-চিত্ত ও অগভীর-দৃষ্টি লোকেরা মনে করে, বিশ্বহিতৈষী ও বিশ্বপ্রেমিক হইলে স্বদেশহিতৈষী ও স্বদেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। কিন্তু ইহা বুঝা তাহাদের পক্ষেও সোজা, যে, স্বদেশ বিশ্বের অন্তর্গত এবং সকলের হিত না হইলে স্বদেশের হিত হইতে পারে না। এইরূপ যে-সব লোক রবীন্দ্রনাথকে উপহাস-ব্যঙ্গ করিয়াছে, তাহারা কৃপার যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের স্বাজাতিকতা কখনও তাঁহার বিশ্বমানবিকতার বিরোধী ছিল না। বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বঙ্গে প্রথম স্বদেশী প্রচেষ্টার যুগে তাঁহার স্বাজাতিকতাই সুস্পষ্ট হইলেও তাঁহার বিশ্বমানবিকতা, "বসুধৈব কুটুম্বকম্" ভাব, তাহার আগে হইতেই ছিল। তিনি প্রায় একত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৩০৭ সালের ৩রা ফাল্গুন "প্রবাসী" শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন। তাহা "প্রবাসী"র ১ম সংখ্যায় ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। তাহার প্রথম কলিটিতেও তাঁহার বিশ্বমানবিকতা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরিবাসী আমি যে দুয়ারে চাই,
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।"

বিশ্বভারতী স্থাপন দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই বিশ্বপ্রীতিকে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে নানা ভাগে বিভক্ত অথচ নিগূঢ় ঐক্যসূত্রে বদ্ধ ভারতীয় নানা কৃষ্টির সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশের কৃষ্টির যোগ ও সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা আছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে বিরুদ্ধভাব দূর করিয়া সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা আছে। শান্তি-নিকেতনে যাহা প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমরূপে স্থাপিত হয়, তাহাই বিশ্বভারতীর আকার ধারণ করিয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসীতে' ভগিনী নিবেদিতার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহার মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার নিজের মতের সংক্ষিপ্ত আভাস আছে। কোন এক উপলক্ষ্যে ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাকে বলেন, "বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কি? জাতি-গত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিষটা আছে, তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মে বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভাল বোধ হয় না।"

নিবেদিতার এই মত সম্বন্ধে তাহার পর কবি লিখিতেছেন :—

"মোটের উপর তাঁহার এই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্ব্ব-ভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসঙ্গত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় ত' জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজ-বোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা ত' সাধারণ শিক্ষকের কর্ম্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটা রকমে কাজ চালাই। তাহাতে অন্ধকারে ঢেলা মারা হয়—তাহাতে অনেক ঢেলার অপব্যয় হয়, এবং অনেক ঢেলা ভুল জায়গায় লাগিয়া ছাত্র বেচারাকে আহত করে। মানুষের মত চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতর পাইকারীভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই, সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে সর্ব্বত্র তাহা প্রতিদিনই হইতেছে।"

জাতির অতীত ও বর্ত্তমান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিশুদের সুশিক্ষা হইতে পারে না, কবির এই মত উপরে উদ্ধৃত কথাগুলি হইতে বুঝা যায়। এইজন্য তিনি ভারতের প্রাচীন তপোবনসমূহের শিক্ষার আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে, প্রকৃতির এবং মানব-সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগকে, ইহার প্রাণ বলিয়া চিনিয়া লইয়াছেন। মানুষের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করা ও রূপ

দেওয়া তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর অন্যতম উদ্দেশ্য। যে-মানুষ রচনা করে, গড়ে এবং যে-মানুষ জানে—মানুষের প্রকৃতির এই দুটি দিকেরই তিনি বিকাশ চান।

তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে শিক্ষক হইবার যোগ্যতা দিয়াছে। তাঁহার নানা-বিষয়ক জ্ঞান তাঁহার এই যোগ্যতা বাড়াইয়াছে। অনেকে মনে করেন, মাকড়সা যেমন নিজের ভিতরের জিনিষ হইতে জাল বুনে, কবি রবীন্দ্রনাথ তেমনি কেবল কল্পনার বলে কাল্পনিক জিনিষ রচনা করিয়া কাল কাটান। কিন্তু বাস্তবিক তিনি যে কত রকমের বিজ্ঞান, ললিত-কলা, কারুকার্য্য, চাষবাস, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক বহি পড়িয়াছেন এবং এখনও পড়েন, তাহা অল্প লোকেই জানে। পৃথিবীর সকল মহাদেশ ভ্রমণ, অধ্যয়নের মতই, তাঁহার জ্ঞান বাড়াইয়াছে।

অনেকে বয়োবৃদ্ধি-সহকারে সামাজিক কুপ্রথাদি বিষয়ে রক্ষণশীল হন। মতে ও আচার-আচরণে যাহা কিছু ভাল রবীন্দ্রনাথ তদ্বিষয়ে রক্ষণশীল, কিন্তু যাহা অনিষ্টকর তদ্বিষয়ে সংস্কারপ্রয়াসী। তাঁহার এই ভাব বয়োবৃদ্ধি-সহকারে বাড়িয়া চলিয়াছে।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

কত লাখে লাখ পঁচিশে বৈশাখ
এল আর চ'লে গেল উড়ে,
সকল আকাশখানা জুড়ে
মহাকাল-বৈশাখীর কালো ডানা মেলে,
ছিঁড়ে দিয়ে ফুল-ফল, ছড়াইয়া ফেলে
ধরিত্রীর বক্ষ 'পরে, ঘূর্ণিত বাত্যায়
আকাশ মন্থিয়া ঘোর তমিস্রা-ব্যথায়।

তুমি শুভ দিনে জন্ম নিলে চিনে'
ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঘরে,
বাজিয়া উঠিল শঙ্খ-স্বরে,
তোমার মঙ্গল আগমনী বঙ্গভুমে,
মহাকাল স্নেহ-ভরে পড়িল কি নুমে,
সপ্ত রশ্মি তৃপ্তি পেল চুমিয়া ললাট,
হে কবীন্দ্র, হে রবীন্দ্র, আকাশ-সম্রাট !

তব জন্ম-কথা, অপূর্ব্ব বারতা
আমাদের জ্ঞান-অগোচর ;
জানি আজ বিশ্ব-চরাচর,
তব কীর্ত্তি-কথা ঘোষে স্বদেশে বিদেশে,
তোমারে বরণ করি' নিল ভালবেসে,
চরণে ঢালিল অর্ঘ্য, দিল জয়-টীকা,
পারিজাত কুসুমের অম্লান মালিকা !

শুধু বাংলার নহ তুমি আর,
সার্ব্বভৌম কবি তুমি আজ,
বিশ্বগুরু করিছ বিরাজ
প্রাচ্য-প্রতীচ্যের স্বর্ণ-হৃদয়-আসনে,
তব বাণী দীক্ষা-মন্ত্র, বীজ-মন্ত্র সনে,
যুক্ত করে, ভক্ত জন মুক্তি-কামনায়
জপ করে, শান্তি-জলে সিক্ত করুণায়।

আমার স্মরণে, জীবনে মরণে,
গুরু তুমি, আদর্শ মহান,
তব প্রীতি, তব কাব্য গান
নিঃসঙ্গের সঙ্গী মম, শূন্য নিরালায়
সাথী সে কৈশোর হ'তে, শান্তির কুলায়!

বৈজয়ন্তী তব, নিত্য অভিনব,
অসীমের বার্ত্তা বহি' চলে,
সিন্ধুতটে ভূধরে অচলে,
আলোক-প্লাবন আনে দূরতম দেশে,
মেরু আর মরু-বক্ষ জাগে ভালবেসে,
মর্ত্ত্য তবু তুমি আজ হয়েছ অমর,
শান্তির দিশারী নেয়ে, দূত অগ্রচর।

যে-কথা অন্তরে সুপ্ত চিরতরে,
জাগাইয়া, মোর মর্ম্ম-বাণী,
মৌন ভাঙি', কহিলাম আনি'।
চিরঞ্জীব, মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠ সম,
তুমি দীপ্ত, তুমি সত্য, তুমি নিরুপম!

রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত-সাহিত্য

—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

কালিদাসের কালে জন্ম নিলে তাঁর কাব্য-রচনার প্রকৃতি ও পরিমাণ কি রকম হ'তো রবীন্দ্রনাথ তা কৌতুকের সঙ্গে কল্পনা করেছেন। তাঁর লেখা একটি মাত্র শ্লোকের স্তুতিগানেই যে রাজা উজ্জয়িনীর প্রান্তে একখানা উপবন-ঘেরা বাড়ী কবিকে দান করতেন তা সহজেই বিশ্বাস হয়। কিন্তু কালিদাসের কালের রবীন্দ্রনাথ যে বিম্বাধরের স্তুতিগীতেই তাঁর কবি-প্রতিভাকে নিঃশেষ করতেন, আর তাঁর কাব্য-সৃষ্টি দু'একখানি মাত্র ছোট-খাটো পুঁথি ভ'রে দিতো এ একেবারে অবিশ্বাস্য। ত্বরাহীন জীবন মন্দাক্রান্তা তালে কাটিয়ে দেবার কোনও লোভ, কি রাজার চিত্র-শালার কোনও মালবিকার মোহ তাঁর কবি-মর্মের এ সংকোচ ঘটাতে পারতো না। তাঁর কাব্যগুলি খুব সম্ভব আকারে ছোটই হ'তো, যেমন 'মেঘদূত' ছোট; কিন্তু সংখ্যায় দু'একখানি নয়। নরনারীর চিত্তের সহজ ও সূক্ষ্ম বহু ভাব ও আকাঙ্ক্ষা, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় যোগের পরমাশ্চর্য্য লীলা অনেকগুলি খণ্ডকাব্যে বাণীর পরিপূর্ণ মূর্ত্তি নিয়ে ফুটে উঠতো, যার অম্লান দীপ্তি কাব্য-রসিকের মন আজও উদ্ভাসিত করতো। অনুষ্টুপ থেকে স্রগ্ধরা, এবং রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালে জন্মেন নি ব'লে সংস্কৃত ভাষার যে-সব ছন্দ অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে তাদের বিচিত্র ঝঙ্কার ও দোল, এ সব কাব্য থেকে দেড় হাজার বছর পার হ'য়ে আমাদের কান ও মনে এসে লাগতো।

সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, বিশেষ ক'রে কালিদাসের কাব্য, রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে নানা দিকে নাড়া দিয়েছে। এর কারণ, এ সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নিবিড় যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথ সুর ও ছন্দের রাজা। তাঁর সুর-রসিক মন ও আশ্চর্য্য ছন্দকুশলী কান সংস্কৃত কাব্যের ধ্বনি ও ছন্দের মধ্যে নিজের প্রতিভার একটা অংশের গভীর ঐক্য উপলব্ধি করেছে। বালক বয়সে যখন সংস্কৃত কাব্যের অর্থ বুঝে তার রস গ্রহণের সময় হয়নি, তখনও যে তাঁর মনকে ওর ছন্দের তান ও

লয়ে মুগ্ধ করতো 'জীবনস্মৃতিতে' রবীন্দ্রনাথ তার সাক্ষী দিয়েছেন। কালিদাসের কাব্যে ভাষায় ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা ও রসোদ্বোধনের শক্তি একটা চরম পরিণতি লাভ করেছে। এই পরম উৎকর্ষের মূল উপাদান দু'টি—কালিদাসের শব্দ-সম্পদের নিটোল পরিপূর্ণতা ও তার অপূর্ব্ব ধ্বনি-সামঞ্জস্য। এর মিশ্রণে যে কথা ও ভাব কালিদাস প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার দীপ্ত পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি তখনি তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে, যে রস তিনি জাগাতে চান 'শুষ্কেন্ধন ইবানলঃ' পাঠকের চিত্তকে তা ব্যাপ্ত করে। কালিদাসের ভাষা একসঙ্গে ছবি ও গান। 'রঘুবংশের' যে-প্রারম্ভটা প্রথম যৌবনে নিতান্ত সরল, বর্ণচ্ছটাহীন মনে হয়, ভাব-প্রকাশে তার কি অদ্ভুত ক্ষমতা!—

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

মনে হয় কি সহজ এ রচনা। শিল্পীর চরম কৌশল এই সহজের মায়া সৃষ্টি করেছে। এ হচ্ছে সেই শ্রেণীর সহজ, মানব-দেহের সামঞ্জস্য যেমন সহজ। ও এমনি সু-সম্পূর্ণ যে, তাকে নিতান্ত স্বাভাবিক ব'লে আমরা মেনে নিই। গড়নের যে আশ্চর্য্য কৌশলে এই সামঞ্জস্য এসেছে, তার কথা মনেই হয় না।

প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।

একটিমাত্র লাইনে অক্ষমের হাস্যকর নিষ্ফল চেষ্টার ছবি কালিদাস এঁকে তুলেছেন, আর তেমনি সে লাইনের ধ্বনির বৈচিত্র্য ও 'ব্যালান্স'! ভাষা-প্রয়োগের এই চরম নৈপুণ্য কেবল পৃথিবীর মহাকবিদের লেখাতেই পাওয়া যায়। যেমন সেক্সপিয়রে—

"And then it started like a guilty thing
upon a fearful summons."

"a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more;"

ভাষা যেন রেখা ও ধ্বনি দিয়ে ভাবের মূর্ত্তি গ'ড়ে চলেছে। এই পরিপূর্ণ বাণীর অভাবে অনেক শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা মহাকবিত্ব লাভে বঞ্চিত

হয়, যেমন ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং। রবীন্দ্রনাথের ভাষা এই মহাকবির ভাষা ; ধ্বনি, রেখা, রং-এর অমৃত রসায়ন।

"বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকিরে।"
"শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি' উঠে ধরার অঞ্চল।"
"পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।"
"অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।"

কিছুই আশ্চর্য্য নয় যে, পূর্ব্বভারতের অপভ্রংশের এই মহাকবি পোনর শতাব্দীর ব্যবধান ভেদ ক'রে উজ্জয়িনীর মহাকবির হাতে হাত মিলিয়েছেন।

কালিদাস বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যে মানুষের চিত্তকে ব্যাপ্ত ক'রেছেন। তাঁর কাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভাব ও রসের নিবিড় মিলন ঘটেছে। এইখানে কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকটতম আত্মীয়তা। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় যোগের যে-রসমূর্ত্তি রবীন্দ্র-নাথের কাব্যে ফুটে উঠেছে, পৃথিবীর সাহিত্যে তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ সম্পর্কে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নাম ইংরাজী কাব্য-রসিকদের মনে হয়। কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে-যোগ, তা প্রধানত' তত্ত্বের যোগ, রসের যোগ নয়—প্রকৃতির সঙ্গে ভাবের কারবারে কবির মন কত দিক থেকে কতখানি পুষ্ট হচ্ছে তার হিসাব। এঁর আস্বাদ বিভিন্ন। যুগল-মিলনের যে মধুর রস রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ব'য়ে যাচ্ছে এ রস সে অমৃত-রস নয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে ভাবৈকরসত্ব মানুষের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত ক'রে দেয়, বিশ্বপ্রকৃতির সুর মানুষের মনের বীণায় বাজাতে থাকে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বাহিরে কালিদাসের কাব্যেই তার সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অতীত ও বর্ত্তমানের এই দুই মহাকবি এইখানে পরস্পরের একমাত্র আত্মীয়।

কালিদাসের কাব্য ও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আর-একটি যোগ এমন প্রকট নয়, কিন্তু প্রচ্ছন্ন নাড়ীর যোগ। সে হচ্ছে, এই কাব্যের একটা আভিজাত্যের সংযম। মহাভারতে, রামায়ণে, কালিদাসে সমস্ত ভাব, রস ও বৈচিত্র্যকে একটা

গভীর শান্তরসে ঘিরে আছে, যা সমস্ত রকম আতিশয্য ও অসংযমকে লজ্জা দেয়। তার অর্থ নয় যে, এ সব কাব্যের ভাব. গতানুগতিক, কি রসবৈচিত্র্যহীন। কালিদাস কবি-প্রসিদ্ধির ধার-করা চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখেন নি, সংস্কারহীন কবির চোখেই দেখেছেন। বহু রসের বিচিত্র নবীন লীলায় তাঁর কাব্য ঝল্‌মল্‌ কর্‌ছে। কিন্তু তাঁর কাব্য কখনও সংযমের ছন্দ কেটে সৌন্দর্য্যের যতিভঙ্গ করে না। ইউরোপীয় অলঙ্কারের ভাষায় কালিদাসের কাব্যে 'ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্‌' ও 'রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌'-এর অপূর্ব্ব মিলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা এই মিলন-পন্থী। পৃথিবীর 'লিরিক' কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান সম্ভবত' সবার উপরে। মানুষের মনের এত অসংখ্য ভাবের রসের পরিপূর্ণ রূপ আর কোথাও দেখা যায় না। প্রাণের প্রাচুর্য্যে তাঁর কাব্য কানায় কানায় ভরা। কিন্তু সমস্ত লীলা ও গতিকে অন্তরের একটি গভীর অটলতা, নটরাজের মূর্ত্তির মত চির-সুন্দরের ছন্দে গ'ড়ে তুলেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সমধর্ম্মী। রবীন্দ্রনাথের যৌবনে যে কাব্য-সাহিত্যের সবচেয়ে প্রভাব ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর সেই ইংরেজী কাব্য বরং এর পরিপন্থী। এ কাব্যে ভাব ও প্রাণের বন্যা বহু স্থানেই রসের সীমাকে ভাসিয়ে অদৃশ্য ক'রেছে। দুই তটরেখার মধ্যে কূলে কূলে পূর্ণ নদীর যে রূপ তা এ কাব্যে ক্বচিৎ দেখা যায়। কারণ বন্যা যখন নেমে গেছে তখন জল শুকিয়ে চর দেখা দিয়েছে, যেমন 'টেনিসনের' কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের অনতিপূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যে এই ইংরেজী কাব্যের ভাবাতিশয্যের প্রভাব অতিমাত্রায় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে এ থেকে মুক্ত তার কারণ তাঁর প্রতিভার ধর্ম্মবৈশিষ্ট্যের পরেই সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, বিশেষ ক'রে কালিদাসের প্রভাব।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের উপর সংস্কৃত-কাব্যের প্রভাব কোথাও তাঁকে তার অনুকরণে রত করে নি। এ প্রভাব তাঁর প্রতিভার জারক রসে জীর্ণ হ'য়ে স্বতন্ত্র নব সৃষ্টির রস জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংস্কৃত-কাব্যের সুর, ধ্বনি, ভাব ছড়ান রয়েছে; কিন্তু তার আস্বাদ সংস্কৃত-কাব্যের স্বাদ নয়। নব প্রতিভার নবীন রসায়নে তা থেকে নূতন রসের সৃষ্টি হ'য়েছে।

(২)

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা সংস্কৃত কবি ও কাব্যের কবিতা; যেমন 'মেঘদূত', 'ভাষা ও ছন্দ', 'সেকাল', 'কালিদাসের প্রতি', 'কুমারসম্ভব গান'। এ কবিতাগুলি এক অভিনব কাব্য-সৃষ্টি। এগুলি কাব্য বা কবিকে শ্রদ্ধা, প্রীতি বা প্রশংসার অঞ্জলি নয়, যেমন কীট্‌স্-এর On Looking into Chapman's Homer, কি রবীন্দ্রনাথের নিজের, "যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধু-পারে।" বস্তুর জগৎ কবির চিত্তকে রস-সমাহিত ক'রে কাব্যের জন্ম দেয়; এখানে কবি ও কাব্যের জগৎ রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে ঠিক তেমনি রসাবিষ্ট ক'রে এই অভিনব শ্রেণীর কাব্যের জন্ম দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কালিদাসের 'মেঘদূত' প'ড়ে কবি-চিত্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাস নয়। মেঘদূত ও তার কবি রবীন্দ্রনাথের অনুকূল কবি-কল্পনাকে যে-দোল দিয়েছে এ তারি ফলে নতুন রস-সৃষ্টি। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাও ঠিক তাই। বাল্মীকির রাম-চরিত রচনার যে-কাব্যে রামায়ণের আরম্ভ, রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় গ'লে তা এক নতুন রস-মূর্ত্তি নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কাব্য যে কোথাও সংস্কৃত-কাব্যের প্রতিচ্ছবি, তা মনে হয় না; মনে হয়, সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি, তার কারণ, এসব কাব্যে কবির মন ও দৃষ্টি এখানেও রবীন্দ্রনাথের মন ও দৃষ্টির সীমারেখা নয়। তাঁদের কাব্যের পথেই রবীন্দ্রনাথের চোখ ও মন সেই বস্তু ও ভাবে গিয়ে পৌছেছে যা তাঁদের কাব্যের মূল উপাদান, এবং সেই উপাদানকে নিজের প্রতিভার ছন্দে ও রংএ নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলেছে। 'মেঘদূত' কবিতার যে-অংশটা বাহ্যত কালিদাসের মেঘের যাত্রা-পথের সংক্ষেপ মাত্র সেখানেও এর পরিচয় পাওয়া যায়।—

"   কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি; বেত্রবতী-কূলে
পরিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে

কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা।"

এ মেঘদূত, কিন্তু ঠিক মেঘদূত নয়। কালিদাস আঙ্গুল তুলে যে-দিকে দেখিয়েছেন, কবি সেই দিকেই চেয়েছেন, কিন্তু দেখেছেন নিজের চোখে। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার,—

"বীর্য্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহা দৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—"

রামায়ণের রামচরিত্রই বটে। কিন্তু আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি-নারদ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ঠিক এ জিনিষ পাওয়া যাবে না।

(৩)

মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণের প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্যের উপাদান। প্রাচীন ভারতবর্ষের এই বিশাল ও মহান সাহিত্য তাঁর কবি-চিত্তের অনেকখানি জুড়ে আছে। কিন্তু এখানেও তাঁর প্রতিভা যা সৃষ্টি করেছে তা নতুন সৃষ্টি। এইসব কাব্যে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক সুপরিচিত পাত্র ও পাত্রীর উপর যে কল্পনার আলো ফেলেছেন তাতে মনে হয় যেন 'নতুন লোকে' তাদের সঙ্গে 'নতুন ক'রে শুভদৃষ্টি হ'লো'। 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদে' রবীন্দ্রনাথ, ব্যাস যে-রসের সৃষ্টি করেছেন, তার ধারা ধ'রেই মহাভারতের এই চরিত্রগুলির একেবারে অন্তঃস্থলে পাঠককে নিয়ে গেছেন। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের মুখে রবীন্দ্রনাথ যে-সব কথা দিয়েছেন, কর্ণ ও কুন্তীকে দিয়ে যা বলিয়েছেন তার অনেক কথাই মহাভারতে নেই। কিন্তু সে-সবই যে মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী, কর্ণ ও কুন্তীর মুখের

কথা তাতেও সন্দেহ নেই। এসব চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ নিজের কল্পনায় একেবারে আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছেন। এবং তাঁর কাব্যে এদের নতুন কথা ও নতুন কাজ অত্যন্ত পরিচিত লোকের স্বাভাবিক কথা ও কাজ মনে হয়।

"হের দেবী পরপারে পাণ্ডব-শিবিরে
জ্বলিয়াছে দীপালোক,—এবারে অদূরে
কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
খর শব্দ উঠিছে বা.জয়া।"

মহাভারতে নেই। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধপর্ব্বগুলিতে আসন্ন যুদ্ধের যে ভীষণ-গম্ভীর রস পুনঃ পুনঃ ফুটে উঠেছে এ তারি রূপ।

'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায় অভিশাপ' মহাভারতের অতি সামান্য ভিত্তির উপর কবির সম্পূর্ণ কল্পনার সৃষ্টি। এ দুই কাব্যের যে-রস তার সঙ্গে মহাভারতের উপাখ্যান দুটির সম্পর্ক নেই। এখানে পৌরাণিক চরিত্র ও আখ্যান কবির কল্পনাকে জাগায় নি, কবির কল্পনাই এদের আশ্রয় করেছে। এ দুই জায়গায় তবুও গল্পের এক-একটা কাঠামো ছিল; কিন্তু রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান থেকে যে 'পতিতার' কল্পনা তা রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব।

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রসঙ্গ নিয়ে আধুনিক বাঙ্গলায় কাব্য-রচনার কথায় স্বভাবতই মাইকেলের কথা মনে হয়। 'মেঘনাদ-বধ' ও 'তিলোত্তমার' বাহ্যিক গড়ন, সংস্কৃত 'ক্ল্যাসিক' কবিরা পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়ে যে-সব কাব্য রচনা করেছেন, ঠিক সেই গড়ন। এবং এই দুই কাব্যের অন্তরের মিলও ঐ 'ক্লাসিক' কবিদের কাব্যের সঙ্গে। পুরাণ থেকে আখ্যানবস্তু নেওয়া হয়েছে মাত্র, কিন্তু তার ঘটনা কি চরিত্র কবির চিত্তের রসের তারে খুব জোরে ঘা দেয় নি। কাব্য-সৃষ্টিতে কবি যে-কল্পনা এনেছেন তা পুরাণ-প্রসঙ্গকে অতিক্রম ক'রে পাঠককে রসের একটা সম্পূর্ণ নতুন লোকে নিয়ে যায় না। এ কাব্য পৌরাণিক আখ্যানের ঘরেই থাকে, কিন্তু 'পেইং গেষ্ট'। রবীন্দ্রনাথ থাকেন বাহিরে, কিন্তু তিনি ঘরের লোক। বাড়ী যখন আসেন তখন একবারে অন্তঃপুরে যেয়ে

উপস্থিত হন। 'বীরাঙ্গনায়' বিদেশী কবির কল্পনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে মাইকেল অতি সূক্ষ্ম পৌরাণিক সূত্র ধ'রে অভিনব রস-সৃষ্টি ক'রেছেন। এ কাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায়-অভিশাপের' সমশ্রেণীর কাব্য। স্বাদের যে তফাৎ সে হচ্ছে দুই বিভিন্ন প্রতিভার সৃষ্টির প্রভেদ।

(৪)

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভারতবর্ষের কাব্য-সৃষ্টির ধারায় সংস্কৃত কাব্যের পরম গৌরবের যুগের সঙ্গেই একমাত্র নিজেকে মিলাতে পারে। তাঁর কাব্য সেইজন্য তাঁকেই স্মরণ করায় যিনি রবীন্দ্রনাথের অপরূপ কল্পনায় উজ্জয়িনীর রাজ-কবি ছিলেন না, কৈলাসের প্রাঙ্গণে মহেশ্বরের আপন কবি ছিলেন ; যাঁর কাব্য-পাঠের শেষে নিজের কান থেকে বর্হ খুলে গৌরী কবির চূড়ায় পরিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি, কিন্তু তিনি কালিদাসের কালেই জন্মেছেন।

উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ কবি, তিনি নাট্যকার, তিনি ঔপন্যাসিক। এসব দিক দিয়াই তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের শীর্ষে, বিশ্ব-সাহিত্যের কিরীটের মণিমালিকায় তাঁর স্থান।

কিন্তু তিনি আগে কবি, পরে নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর জীবনের প্রধান রস কাব্যরস—যাহা lyric কবিতার জীবন। নাটক ও উপন্যাস তাঁর জীবনের এই প্রধান রসকে বেষ্টন করিয়া তারই আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্য যেন তাঁর জীবনের এই রস-সাগরের প্রবাল-দ্বীপপুঞ্জ। সাগরের প্রবালের মত তাঁর উপন্যাসের কাহিনীগুলি, এই রস-সাগরেই জন্মলাভ করিয়া যেন ক্রমে একটা সূক্ষ্ম প্রবাল-বেষ্টনীর মত তাহার একটি ক্ষুদ্র খণ্ডকে স্থধু ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

উপন্যাসও কাব্যের মত রস-রচনা। সেই উপন্যাসই সার্থক যাতে রস একটা পরিপূর্ণ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু গানের রসের যেমন দুটি উৎস—তার কথা ও তার সুর, তেমনি কথা-সাহিত্যের রসের দুটি উপকরণ, উপাখ্যান ও ভাব।

কাহিনীটির গঠন-চাতুরী ও তাহার রচনাসৌষ্ঠব হইতেই এক-প্রকার রস জন্মায়, তাহাতে আমাদের রসতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি সম্পাদন করে। একটি সুগঠিত আদ্যোপান্ত অনবদ্য কাহিনী নিরলঙ্কারভাবে বলিয়া গেলেও, তাতে রসের প্রচুর উপকরণ থাকে, সে-রসকে কথারস বলা যাইতে পারে। কিন্তু তা ছাড়া, উপাখ্যানে যে-জীবন চিত্রিত করা হয় তার পর্ব্বে পর্ব্বে ভাবরসের প্রচুর অবসর থাকে—সেই রসও lyric কাব্যের মত উপন্যাসেরও উপজীব্য। কথারস ও ভাবরসের সুনিপুণ বিন্যাসে ও পরিবেষণ-নৈপুণ্যে উপন্যাস রমণীয় হইয়া উঠে।

ঔপন্যাসিকের মধ্যে কেহ বা কথারস, কেহ বা ভাবরসকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রধান রস ভাবরস। তিনি যে কয়খানি উপন্যাস লিখিয়াছেন, প্রত্যেকটিই কেবলমাত্র কাহিনী হিসাবে সুন্দর—কিন্তু তার উপাখ্যানভাগ যাহা তাহা অতি সংক্ষেপে বলা যায়। তার ভিতর ঘটনার বৈচিত্র্য বা বিবিধ চিত্তচমকপ্রদ ঘটনার সংঘাতের বাহুল্য নাই। যে সংক্ষিপ্ত ঘটনাবিরল কাহিনীটি লইয়া তাঁর উপন্যাস, তার পরতে পরতে ভাবরসের যে-সব সূক্ষ্ম অবসর আছে সেইগুলি আশ্রয় করিয়া তিনি তাঁর কাহিনী অপরূপ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসই তাঁর এইসব সূক্ষ্মভাবের অভিব্যক্তি ও পরিণতির ইতিহাস—কোমল তূলিকায় সূক্ষ্মতম রেখা ও বিন্দুপাতে আঁকা এক-এক বিচিত্র চিত্র

এইটাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন। সেগুলির ভিতর বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের অন্ত নাই, কিন্তু তাঁর প্রথম বয়সের উপন্যাস 'রাজর্ষি' হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ বয়সের 'শেষের কবিতা' পর্য্যন্ত, সবগুলির মধ্যেই এই একটি লক্ষণ খুব সুস্পষ্টভাবে তাঁর সৃষ্টিকে অপরের সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্রতা দান করিয়াছে। এ লক্ষণ তাঁর চিত্তের গঠনে ভাবরসের মুখ্যতার ফল।

জীবনের যে-ইতিহাস উপন্যাসে লেখা হয় তার ভিতর কোথায় কোন-খানে lyric রসের সূক্ষ্ম অবসর আছে তাহা তাঁর চক্ষু কখনও এড়াইয়া যায় না, আর সূক্ষ্মতম অবসরটুকুর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া তিনি তাহা অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত করিয়া তোলেন। তাঁর এই কবিদৃষ্টি ও এই বিশিষ্ট রস-প্রবণতার পরিচয় পাইয়াছিলাম একদিন তাঁর সঙ্গে আমার লিখিত একখানি উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে। অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত সে-কথাটা বলিতে সাহস করিতেছি, সুধু কথাটায় তাঁর উপন্যাসের এই দিকটা বুঝিবার সহায়তা হইবে বলিয়া। আমার সে-উপন্যাসে একটি বিবাহিতা পতিপ্রাণা নারী এবং তার সহচর একটি যুবক এক সঙ্গে জেলে যায়। তাদের দীর্ঘ কারাবাসের অবসরে পত্রবিনিময়ে তাদের ভিতর যে গুপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আমি যুবক-যুবতীর

এই ভাবের পরিণতি আমার শক্তি অনুসারে সংক্ষেপে মোটা তুলির দুই-চারিটি আঁচড়ে ইঙ্গিতমাত্র করিয়া গিয়াছিলাম। সেই বইখানার আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ আমাকে দুই-চার কথায় বুঝাইয়া বলিলেন যে, এইখানে ভাবের এই পরিণতিটি আরও অনেক বিস্তারিত করিয়া বলিবার অবসর ছিল। কারাগারের প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটা হীন-চরিত্রা নারীর সাহচর্য্যে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে গোপার চরিত্রের উপর সমাজের প্রচ্ছন্ন প্রভাব অপসৃত হইয়া অসংবিদ হইতে গুপ্ত কামনা ঠেলা মারিয়া উঠিল তাহার বিস্তীর্ণ ইতিহাসটা খুব চিত্তহারী করা যাইত। কাহিনীটির এইখানটায় এই lyric রসের প্রচুর অবসর ছিল; লিখিবার সময় আমার তাহা মনে পড়ে নাই, আর সে-রস অমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার শক্তিও আমার ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবরস-বহুল কবিচিত্ত ঠিক এই অবসরের দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁর নিজের হাতে এমনি একটি কাহিনী পড়িলে এই রসটিকে নিশ্চয় তিনি অশেষ দরদের সহিত ফুটাইয়া তুলিতেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁর উপন্যাসের যে-কথাভাগ তাহা পরিকল্পনার গঠননৈপুণ্যে এবং পরিণতির স্বাভাবিকতা ও রসবাহুল্যে অনিন্দ্য। কিন্তু তবু, তাঁর উপন্যাসের যে প্রধান মাধুর্য্য, তাহা এই কাহিনীর সৌষ্ঠব নয়, তার পর্ব্বে পর্ব্বে লক্ষিত যে-ভাবরস আছে তাহাতে।

তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের প্রথম পরিচয় দেখিতে পাই, তাঁর প্রথম উপন্যাসের উদ্ভবের ইতিহাসে। "রাজর্ষি"র উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্ এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সহিত তার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—বাবা এ কি! এ যে রক্ত! বালিকার এই কাতরতায় বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভাণ করিয়া কোনও মতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে। জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প।"

এই স্বপ্নে 'রাজর্ষি'র উদ্ভব। বলির রক্ত দেখিয়া শিশুর এই ভীতি

ও বিক্ষোভ হইতে গোবিন্দমাণিক্যের চিত্তে যে-ধাক্কা লাগিল তাহার পরিণতি-মুখে রাজর্ষির চরিত্র সৃষ্টি—ইহাই এ উপাখ্যানের বিষয়। সুধু এই ব্যাপার-টুকু লইয়া একটি অপূর্ব্ব lyric লেখা যাইত। গোবিন্দমাণিক্যের চিত্তের পরিণতির ইতিহাস লইয়া "কথা ও কাহিনী" বা "পলাতকা"র কবিতার মত অপেক্ষাকৃত বড় কবিতা লেখা যাইত। এই স্বপ্ন তাই রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তকে বিশেষভাবে আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের চিত্তের পরিণতির এ ইতিহাস তাঁর কল্পনায় বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিল, এবং ইহার ভিতর এত প্রচুর রসের অবসর ক্রমে তাঁর চক্ষে ফুটিয়া উঠিল যে, তাহা খণ্ডকাব্যের সঙ্কীর্ণ পরিসরে ধরিয়া রাখা যায় না। তাই এই কাহিনীটি হইল উপন্যাস। তাঁর সৃষ্ট রস তিনি ভরিয়া দিলেন গোবিন্দমাণিক্যের ঐতিহাসিক চরিত্রের ভিতরে। সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাল্পনিক বহু ঘটনার বেষ্টনী দিয়া তিনি সৃজন করিলেন এক উপন্যাস।

'রাজর্ষি' কবির প্রথম উপন্যাস। ইহাতে এবং "বৌঠাকুরাণীর হাটে" তরুণ কবি সেকালের উপন্যাসের প্রচলিত আদর্শের দ্বারা অনেকটা চালিত হইয়াছিলেন। তাই এই দুইখানি উপন্যাসে তাঁর প্রতিভার প্রকৃত স্বরূপ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। তবু, এটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই বইয়েরও উদ্ভব হইয়াছে একটা ভাবরসবহুল কল্পনায় এবং সেই ভাবটার পরিণতিই এ কাহিনীর প্রতিপাদ্য। ইহার পর কবি আর যে-সব উপন্যাস লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁর এই দিক দিয়া যে প্রকাণ্ড শক্তি আছে তার ক্রমপরিণতির একটা ইতিহাস আমরা দেখিতে পাই। 'নষ্টনীড়ে' তার আরম্ভ, 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'তে তার পুষ্টি—তার পরিপূর্ণ বিকাশ 'গোরা' ও 'ঘরে-বাইরে'তে। মানুষের অন্তরের গভীরতম তলদেশে প্রবেশ করিয়া তাহার চিত্তের সবগুলি কোমল পরদা একটি একটি করিয়া তুলিয়া তাহার সকল মাধুরী বিকশিত করিয়া তুলিবার যে অপরূপ শক্তি রবীন্দ্রনাথের আছে, যে-শক্তির দ্বারা তিনি তাঁর lyric কবিতায় অপূর্ব্ব সফলতার সহিত প্রতি মানবের চিত্তের অসম্বদ্ধ বা অর্দ্ধ-সম্বদ্ধ ভাবরাশি উন্মীলিত করিয়া পূর্ব্বেই দেশবাসীর চিত্ত-হরণ করিয়া-ছিলেন, সেই শক্তিই যে কথা-সাহিত্যেও তাঁর প্রধান শক্তি, সে-কথা

রবীন্দ্রনাথ ক্রমে আবিষ্কার করিয়াছেন। 'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' উপন্যাসগঠনের প্রচলিত পদ্ধতির চাপে ইহা অনেকটা আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। 'নষ্টনীড়', 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'তে কবি তাঁর শক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় লাভ করিয়া তাঁর প্রধান অধিকারক্ষেত্রে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছেন। 'গোরা'তে ও 'ঘরে-বাইরে'তে তাঁর এই শক্তিতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার হাতে যে ইন্দ্রজালের যন্ত্র আছে তাহার পূর্ণ শক্তি অনুভব করিয়া অপরিসীম পটুত্বের সহিত তিনি তাহার ব্যবহার করিয়াছেন তাঁর এই দুইখানি উপন্যাসে। দীর্ঘকাল পরে আবার যখন তিনি উপন্যাস লিখিলেন তখন তাঁর অধিকারক্ষেত্র দখল হইয়া গেছে, সেইখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কবি তাঁর ইন্দ্রজালের অপরূপ খেলা দেখাইয়া গিয়াছেন। 'যোগাযোগ' এবং 'শেষের কবিতা'য় কবির এই শক্তিরই অপরূপ বিকাশ। গল্পের ভিতর যে-কাব্যরস তাঁর প্রধান দান, তাই পরিপূর্ণ হইয়া জমজমাট হইয়া উঠিয়াছে এই দুইখানি উপন্যাসে। 'গোরা' বা 'ঘরে-বাইরে'তে সে-রসের নবীনতার যে ফেনিল উচ্ছলতা ছিল তাহা মিলাইয়া গিয়াছে, ফুটিয়া উঠিয়াছে আরও নিবিড় হইয়া তার মাধুর্য্য।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে উপাখ্যানভাগ সর্ব্বত্রই অতি-সংক্ষিপ্ত। তাঁর উপাখ্যান-চয়নের ক্ষেত্রও খুব প্রশস্ত নয়। 'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ছাড়িয়া দিলে, তাঁর আর সব কয়খানি উপন্যাসেরই বিষয়-বস্তু খুব সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। সম্পন্ন ভদ্রপরিবারের সুশিক্ষিত পুরুষ ও নারী লইয়া তাঁর উপন্যাস। প্রত্যেকটিতেই দু'টি চারটি পাত্র-পাত্রী লইয়া কথা। আর গল্পের প্রধান বিষয়—অবস্থাভেদে প্রেমের স্বরূপ ও পরিণতির বৈচিত্র্য। তাঁর চিত্রফলকের ভিতর রাশি রাশি লোক ভিড় করিয়া আসে না কোনও দিনই। তিন-চারটি লোক লইয়া তাঁর উপন্যাস। আর তাদের জীবন এমন কিছু ভয়ানক বিস্ময়াবহ নয়। যুদ্ধ বা ডাকাতি, বা খুন-খারাপীর মত উত্তেজক বিষয় তাঁর উপন্যাসে কোথাও নাই। কাজের তাড়াও নাই। Action-এর পরিমাণ তাঁর উপন্যাসে যৎসামান্য, এবং বিবর্ত্তন-মুখে সে-পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়া আসিয়া "শেষের কবিতায়" দুটি যুবক-যুবতীর নিরবচ্ছিন্ন প্রেমালাপে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

কিন্তু এই অপরিসর ক্ষেত্রে তিনি রসের ফসল জন্মাইয়াছেন সুপ্রচুর। ইহার তুলনা দেখিতে পাই আমরা বৈষ্ণব কবিতায়। পদাবলীর ভিতর যে অপরিমিত রস সঞ্চিত রহিয়াছে, খ্যাত ও অখ্যাত কত কবি যে কত নূতন রসের সঞ্চয় রাখিয়া গিয়াছেন, তার বিষয়-বস্তু কত ছোট। কৃষ্ণ-রাধিকার প্রেম মিলন ও বিরহের যে প্রাচীন সংক্ষিপ্ত কাহিনী, সেই একটি কাহিনী আশ্রয় করিয়াই সবাই লিখিয়াছেন। কিন্তু সেই কাহিনী লইয়াই প্রত্যেকে কত না অপরূপ রস সৃষ্টি করিয়াছেন।

কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের গৌরব তাঁর কথাবস্তুর প্রসারে নয়, রস-সৃষ্টির গভীরতায়। রসের দীঘি তিনি কাটেন নাই, কাটিয়াছেন রসের-খনি। সংক্ষিপ্ত বেষ্টনীর ভিতর আপনাকে আবদ্ধ করিয়া তিনি খুঁড়িয়া গিয়াছেন সুধু অন্তরের ভিতর। গভীর অন্তর হইতে মানবের চিত্তের ইতিহাস খুঁড়িয়া তুলিয়াছেন, আর সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়াছেন মানব-চিত্তের গর্ভগত অপরূপ রত্নরাজি।

তাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ঘটনার চমকপ্রদ বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু অশেষ বৈচিত্র্য আছে ভাবের। ঘটনার অপূর্ব্ব পারম্পর্য্যে তিনি চিত্ত চমকিত করেন না, কিন্তু ভাবের অপরূপ গতি অনুসরণ করিতে গিয়া তিনি চিত্তে যে চমক দেন, যে ব্যগ্রতা ও উৎকণ্ঠা জাগাইয়া তোলেন, তাহা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের চমকপ্রদ ঘটনার পারম্পর্য্যের চেয়ে কম নয়। 'গোরা'য় গোরা ও সুচরিতার চিত্তের ক্রমবিকাশে, "ঘরে-বাইরে"তে বিমলার চিত্তের পরিণতির ইতিহাসে যে অপূর্ব্ব রসচিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, তার প্রতি রেখাপাতে যে কি একটা উগ্র আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠা জন্মে তাহা তাঁর কোন্ পাঠক না অনুভব করিয়াছেন? কিন্তু এই effect সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁকে খুব চড়া করিয়া রং ফলাইতে হয় নাই, বর্ণের খুব তীব্র সংঘাত ঘটাইতে হয় নাই, সুধু সূক্ষ্ম রেখা ও বিন্দুপাতে পরিপূর্ণ করিয়া সমগ্র চিত্রটি আঁকিয়া পাঠকের চিত্তের এই মনোজ্ঞ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রফলকে অনেকগুলি মূর্ত্তি তিনি আঁকেন নাই। দুই-চারটির বেশী কোনও উপন্যাসেই তাঁর নাই। কিন্তু এই দুই-চারিটি চিত্র

এমন পরিপূর্ণতার সহিত এবং এমন অনবদ্য সৌষ্ঠবের সহিত আঁকিয়াছেন যে, তারা পূর্ণাঙ্গ হইয়া তাদের সকল মাধুর্য্য, সকল মহিমা, সকল শক্তি, সকল দুর্ব্বলতা উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। তাদের চরিত্রে mystery আছে, কিন্তু অস্পষ্টতা নাই। নিখিলেশের চরিত্রে mystery আছে, বিমলার ভিতর যে দুইটা সত্তায় সংগ্রাম তাতে একটা মনোজ্ঞ mystery আছে, সন্দীপের তীব্র শক্তির সঙ্গে নীতির অভাবের সমন্বয়ে, এবং নগ্ন শক্তির এত বড় প্রচণ্ড তাণ্ডবের সঙ্গে শেষ একটা "কিন্তু"র সমবায়ে mystery আছে। কিন্তু এর কোনও চরিত্রই অস্পষ্ট নয়। তারা যেমনটি তেমনি পরিপূর্ণভাবে যেন রক্তমাংসে গঠিত হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। তাদের চরিত্রের অন্তর্গত যে-সমস্যা সেটা সমাধান করিবার ভার পাঠকের।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় যেমন, উপন্যাসেও তেমনি আঁকিয়াছেন মানুষের ভাবজীবন। তাদের কর্ম্মজীবন শুধু ভাবজীবনের আনুষঙ্গিকভাবে যতটুকু দরকার তার বেশী তাঁর উপন্যাসে স্থান পায় নাই। মুখ্যতঃ তিনি কবি, উপন্যাস তাঁর কবিজীবনের পরিণতিমুখে একটা গৌণসৃষ্টি। কবি-হিসাবে তিনি ভাবদৃষ্টিতে মানুষের জীবনের দিকে চাহিয়াছেন। সে-জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, কোমলাতিকোমল ভাবকণাগুলি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিবার এবং সুকুমার রেখাপাতে তাহা ফুটাইয়া তুলিবার অপূর্ব্ব স্বাভাবিক শক্তি ও অর্জ্জিত পটুত্বই তাঁর কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ গৌরব, এবং সেই শক্তি ও পটুত্বই উপন্যাসেও ভাবধারার ভিতর এই অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি ও অপরূপ বিন্যাস-কৌশল দান করিয়াছে।

কাব্যে যেমন এক-একটি ভাব, জীবনের এক-একটি খণ্ড বা বিশিষ্ট প্রকাশ আপনি এক-একটি স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, উপন্যাসে তেমন হয় না। উপন্যাসের বিষয় হয় সমগ্র জীবন। জীবনের স্রোতের ভিতর এক বা একাধিক বিশিষ্ট ভাবধারা লইয়া উপন্যাস। কাজেই কাব্যে কবি ঠিক যে-প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন উপন্যাসে ঠিক সেই প্রণালীটি হইত সম্পূর্ণ অনুপ-যোগী। কেবল ভাবচিত্রের পর ভাবচিত্র বসাইয়া গেলেই উপন্যাস হয় না। উপন্যাসের রসের জীবন হইল একটা পরিণতির আকাঙ্ক্ষা। ঘটনা-স্রোতের

গতি অনুসরণ করিয়া পাঠকের চিত্তে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জাগ্রত হইয়া উঠে। পরিণতির একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মায়—সমাপ্তিতে সেই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সম্পাদন না করিলে উপন্যাস সার্থক হয় না। ঘটনার বা ভাবের মালা গাঁথিয়া গেলেই উপন্যাস হয় না। তার তলায় থাকা চাই একটা চলনশীল জীবনস্রোত।

তাই উপন্যাসে কবি আঁকিয়াছেন এই জীবনস্রোত। স্রোতের গতিমুখে যে ভাবের ফুলগুলি ভাসিয়া যাইতেছে সেগুলি তিনি অবজ্ঞা করেন নাই—তাঁর উপন্যাসের আদ্যোপান্ত এইসব খণ্ডরসে ভরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তবু তাঁর অখণ্ড মনোযোগ আছে এই জীবনস্রোতের উপর, আর সে জীবন-স্রোত এমন করিয়াই তিনি আঁকিয়াছেন, এমন করিয়াই সে-ভাবধারা বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, তার প্রতি রেখাপাতে আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠা তীব্র হইয়া জাগিয়া উঠিয়া সমগ্র উপন্যাসকে কথারসভূয়িষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। তার ভাব-বিশ্লেষণ সাইকলজির বিশ্লেষণ নয়, কবির বিশ্লেষণ। ইহাতে পাত্রপাত্রীর মন যেন পাঠকের সামনা-সামনি আসিয়া কথা বলিতে থাকে, আর দার্জ্জিলিঙ্গের ক্যালকাটা রোডের ধারে বসিয়া বদাওনের রাণী যেমন করিয়া শ্রোতার চিত্তকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, ক্ষুধিত পাষাণের অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল যেমন তার গর্ভের ভিতর সকলকে অসহায়ভাবে টানিয়া লইয়াছিল, তেমনি করিয়া এ কাহিনী চিত্তকে আকৃষ্ট ও বন্দীকৃত করে।

ভাবের বিশ্লেষণে এই রোমান্সের রোমাঞ্চ-সঞ্চার রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া করিয়াছেন তেমন আর কোনও ঔপন্যাসিক করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের হাতে উপাখ্যানটি সুধু একটা খাঁচা, তাঁর উপন্যাসের প্রাণ এই ভাবরস। ভাবের পুষ্টি ও পরিণতিই তাঁর উপন্যাসের প্লট। ঘটনাগুলি সুধু সেই পরিণতির সহায়ক। সুধু ঘটনা নয়, যা কিছু তিনি লিখিয়াছেন, তার ভিতর অনেক কথাই আছে—ধর্ম্মের কথা, সমাজ-তত্ত্বের কথা, পলিটিক্সের কথা, আরও কত কি আছে। সবগুলিই এই ভাব-ধারার সহায়ক মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির ভিতর যত তত্ত্বালোচনা আছে, ভারী ভারী তত্ত্বের সুগভীর আলোচনা যত আছে, এমন খুব কম বইয়ে আছে।

তত্ত্বের আলোচনা আরও অনেকে করিয়া থাকেন। এক-আধজন ঔপন্যাসিক আছেন যাঁরা তত্ত্বালোচনায় অশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন তাঁদের গ্রন্থে, যদিও উপন্যাসের রসধারার সঙ্গে সে-পাণ্ডিত্যকে মিশ খাওয়াইতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক উপন্যাসে তত্ত্বের অশেষ বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং এমন একটা ধারণাও অনেক স্থলে দেখা যায় যে, উপন্যাস যদি কোনও একটা গভীর তত্ত্বের বাহন না হয়, তবে সেটা তুচ্ছ। এই ভাবটা সবচেয়ে বেশী প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে রুশিয়ার অতি-আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনার ভিতর। আবার যাঁরা এই আধুনিক রুশ সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, আমাদের দেশের সেই এক শ্রেণীর সমালোচকদের ভিতরও এই ভাবটার পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর একজন সমালোচক একবার অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যিকদিগকে challenge করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি নূতন বাণী তাহারা দিয়াছে, কোন্ নূতন বার্ত্তা দেশবাসীকে শুনাইয়াছে? যেন কথা লিখিবার একমাত্র প্রয়োজন নূতন একটা message বা বাণী শুনান।

আমি সাবেক আমলের লোক। আমার বিশ্বাস, সাহিত্য-সৃষ্টির সার্থকতা তার message বা বাণীতে নয়, কোনও নূতন তত্ত্বের ব্যাখ্যানে নয়—রসের নূতন প্রকাশে। উপন্যাস উপন্যাস-হিসাবে সার্থক হইয়াছে কি-না, তার একমাত্র মানদণ্ড তার রস-সমৃদ্ধি। আর এই রস-সম্পদ তাকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়া রসগ্রাহিতার দ্বারা বিচার করিতে হয়, প্রত্যেক উপন্যাসকে স্বতন্ত্রভাবে একটি সমগ্র রসসৃষ্টি স্বরূপে বিচার করিয়া আলোচনা করিতে হয়। অনেকগুলিকে একসঙ্গে করিয়া তার সম্বন্ধে সমষ্টিগতভাবে একথা জিজ্ঞাসা করা চলে না যে, এই সমগ্র সমষ্টির মধ্যে নূতন রস আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তর হয় না, হইতে পারে না। কেন-না, রসবস্তুটির প্রকাশ হয় ব্যষ্টিরূপে, প্রত্যেক উপন্যাসে স্বতন্ত্রভাবে সে-রসের বিকাশ—তাদের কোনও সাধারণ পরিচয় হয় না।

উপন্যাস কোনও তত্ত্বের বাহন হইতে পারে; কিন্তু উপন্যাস হিসাবে তার সার্থকতা সে-তত্ত্বের গুরুত্ব বা যাথার্থ্য দিয়া বিচার করা চলে না। সাহিত্য হিসাবে তার দেখিবার বস্তু স্বধু এই যে, ব্যস্ত ও সমস্ত ভাবে তাহার ভিতর রস ফুটিয়া উঠিয়াছে কি-না, এবং সেই রসের গৌরব ও সমৃদ্ধিই উপন্যাসের গৌরবের পরিমাণ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনও উপন্যাসকে কোনও তত্ত্বের বাহন স্বরূপ রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কি-না বলিতে পারি না। তত্ত্বের সাগর আছে তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসে, তাহা হইতে তীব্র জিজ্ঞাসার উদ্ভব হইতে পারে, অশেষ শিক্ষার উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। সেই শিক্ষা প্রচার করাই তাঁর মনোগত ইচ্ছা ছিল কি-না জানি না। কিন্তু সেরূপ ইচ্ছা থাকিলেও তাঁর রসজ্ঞানের সমৃদ্ধিবশতঃ তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁর উপন্যাস-মালার মধ্যে অকৃপণভাবে তিনি ছড়াইয়া দিয়াছেন তত্ত্বালোচনা; কিন্তু সেই তত্ত্ব কোনও গ্রন্থেরই প্রতিপাদ্য হইয়া দাঁড়ায় নাই; উপাখ্যানের পরিপূর্ণ রসরূপের মধ্যে সে তত্ত্বালোচনা এমন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান পাইয়াছে যেখানে রসসৃষ্টির দিক্ হইতে তার থাকিবার প্রয়োজন ছিল।

'ঘরে-বাইরে' খুব তত্ত্ববহুল উপন্যাস। ইহার পত্রে পত্রে ভাবাইবার অনেক কথা আছে। 'গোরা' তার চেয়েও তত্ত্বভূয়িষ্ঠ। ধরিতে গেলে এই গোটা বইখানার সবচেয়ে মোটা অংশ গোরার সঙ্গে আর সকলের তত্ত্বালোচনা। কিন্তু এই যে তত্ত্ব ইহা অনাবশ্যক ভাবে জবরদস্তী করিয়া গ্রন্থের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় নাই এক স্থানেও। সর্ব্বত্রই এই তত্ত্বালোচনা উপন্যাসের রসমূর্ত্তির স্ফুরণের সহায়ক হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসের মত গোরাও প্রধানতঃ পাত্রপাত্রীদের চিত্তের পরিণতির সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ-বহুল ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পরিণতির পথে প্রত্যেকটি তত্ত্বের তর্ক হইয়াছে অপরিবর্জ্জনীয় সহায়ক। প্রত্যেকটি তর্কে, প্রত্যেকটি তত্ত্বব্যাখ্যানে স্বধু গোরা বা পরেশবাবু বা বিনয়ের বা সুচরিতার চরিত্র যে দীপ্তিমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই নয়, প্রত্যেকটি তর্কের পদে পদে এবং পরিসমাপ্তিতে পাত্র-পাত্রীদের কারও না

কারও চিত্তের পরিণতি-কাহিনী কতকটা দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। 'ঘরে-বাইরে'র তত্ত্বালোচনাও এমনি মনের পরিণতিমুখে এক-একটা ধাপ মাত্র। তত্ত্বের অনবদ্য মীমাংসা বা ব্যাখ্যানের অপেক্ষায় উপাখ্যানটি কোথাও বসিয়া থাকে নাই। তত্ত্ব-ব্যাখ্যানের গতিমুখে উপাখ্যান অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তত্ত্ব-ব্যাখ্যান এইরূপে উপন্যাসের রসমূর্ত্তির ভিতরে অপরিহার্য্য অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার একটি আলোচনা বাদ দিলে তার পরের অংশের গ্রন্থিসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে।

এইজন্য বহু তত্ত্ব, বহু আলোচনা, আপাত-দৃষ্টিতে বহু অবান্তর বিষয়ের প্রচুর সমাবেশ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটিই একটি পরিপূর্ণ রসবস্তু হইতে পারিয়াছে।

সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত্ত বিরাম নাই,
নিদ্রাহীন সারা দিন রাত।

এই ক'টি পংক্তিতে কবি নিজেই নিজের অন্তরের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর জীবনব্যাপী কবিতা ও সঙ্গীত সাধনা এরই স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। সত্তর বৎসরের মধ্যে হয়ত দশ বৎসর বয়সে তিনি এই ধ্বনি নিজে অস্পষ্টভাবে শুন্‌তে পেয়েছিলেন,—কে জানে,—"আজি মর্ম্মরধ্বনি কেন জাগিল রে।" তারপরে হয়ত আর দশ বৎসরের মধ্যে অপরকে শোনাতে পেরেছিলেন; সন তারিখ ঠিক দিতে পারব না,—"আনন্দ-ধ্বনি জাগাও গগনে।" তারপর থেকে সে ধ্বনি-প্রতিধ্বনির প্লাবনে বঙ্গদেশ ভেসে গেছে, দেশ-বিদেশে তার "তরঙ্গ-আঘাত" গিয়ে পৌঁচেছে, সে-কথা সকলেই জানে। তাঁর এই সত্তর বৎসর পূর্ণ হবার জয়ন্তীতে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন এই মধুর ধ্বনি শ্রবণ হ'তে আমাদের বহু বৎসর বঞ্চিত হ'তে না হয়, যেন তিনি সুস্থ দেহে সুদীর্ঘকাল বেঁচে থেকে আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসীকে তাঁর কবিতা ও সঙ্গীত-সুধা সহস্র ধারে পরিবেষণ কর্‌তে থাকেন।

"মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়-কমল-বন মাঝে।"

আমরা ছেলেবেলা থেকে এই সঙ্গীতের আবহাওয়াতেই মানুষ, সুতরাং নিরপেক্ষভাবে তার বিচার করা শক্ত। আর বিচারাসনে বসবার ধৃষ্টতাও আমার নেই। কথা ফোটবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর ভানুসিংহের পদাবলী গাইতে আরম্ভ করেছি—"গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশী বাজে।" বেশ মনে আছে, তখন "ইন্দু" কথাটার মানে জানতুম না, অথচ সিমলা পাহাড়ে বসে' গেয়ে যাচ্ছি—"ঢালে ইন্দু অমৃত-ধারা।" তারপর

আমাদের একটি স্বনামধন্য বন্ধু ও শ্রোতা বোধ হয় পরীক্ষাচ্ছলে সে-অজ্ঞতা ধরতে পেরে আমাকে "ইন্দু" কথাটির মানে আর মক্কা খাবার সদুপায় দু'টোই এক-সঙ্গে শিখিয়ে দিলেন; আর আজ পর্য্যন্ত সে দু'টোর কোনটাই ভুলিনি। তারও আগে, কিম্বা অনতিপরে, পূজনীয় ৺জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের 'অশ্রুমতী' নাটকের গান "প্রেমের কথা আর বোল না" লোকের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে গাইতুম, আর "ছোট মুখে বড় কথা" শুনে লোকে হাস্‌ত, মনে পড়ে। তবু তারা জান্‌ত না যে, বাড়ীতে আমরা কচি মেয়েরা আর অপোগণ্ড শিশু দিনেন্দ্রনাথ তথৈবচ "নিবার' নিবার' প্রাণের ক্রন্দন, কাটছে কাটছে এ মায়া-বন্ধন" এমন বয়সে গাইতেন, যখন আহারের জন্য সে-ক্রন্দন, এবং নিদ্রার জন্যই সে-মায়া হওয়া সম্ভব। তখনকার প্রচলিত গৃহনাট্য "মানময়ী" থেকে "এনে দে এনে দে বিষ, আর যে লো পারিনে"— অম্লানবদনে নির্ব্বিকার চিত্তে গেয়ে বেড়াতুম। এই "মানময়ী" এবং পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত "বসন্ত-উৎসব" গীতিনাট্যই আমাদের জীবনের প্রথম নাট্যস্মৃতি। "ধর্ লো ধর্ লো ডালা, এই নে কামিনী-ফুল" হ'চ্ছে শেষোক্তের প্রথম গান। একবার সখী সমিতির অধ্যক্ষতায় উক্ত নাট্যাভিনয়ের সময় আমার বুদ্ধিমান ভাইরা পশ্চাৎপটের উপর শুখ্‌নো ঘাসের আস্তরণে ডিমের খোলার প্রদীপ জ্বালিয়ে জোনাকীর নকল করতে গিয়ে কি-রকম অগ্নিকাণ্ড বাধিয়েছিলেন, সে-কথা ভোলবার নয়, এবং সহজেই অনুমেয়।

"বিবাহ-উৎসব" নামে আর-একটি ছোট গীতিনাটিকা আমাদের অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্ব স্মৃতির প্রথম পরিচ্ছেদ অধিকার করে, তার গান সম্পূর্ণ রবীন্দ্ররচিত বা রবি-জ্যোতির সম্মিলিত রচনা, তা' ঠিক মনে নেই। কিন্তু বাড়ীর কোন বিশেষ বিবাহের বাসরঘরে সেটা অভিনীত হবার সময় কনে-বেচারি হিষ্টিরিয়া-রোগে মূর্চ্ছিত ছিলেন, এবং গাঁটছড়া-বাঁধা বর-বেচারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' একলাই অভিনয় উপভোগ করছিলেন, সেটুকু মনে আছে। আর-একটা বিবাহ-সংক্রান্ত নাটক বহুকাল পূর্ব্বে রবিকাকা ও জ্যোতিকাকা মশায় দু'জনে অতিথি-সৎকারার্থে বৈঠকখানায় অভিনয় করেছিলেন মনে পড়ে। তখন আমরা নিতান্ত ছোট; এত ছোট যে, আমার

দাদা কোন বিশিষ্ট অতিথির ভাবোল্লাসের চোটে তাঁর কোল থেকে পড়ে গিয়ে চৌকীর তলায় আশ্রয় লাভ করেছিলেন। সেটা ঠিক পুরোদস্তুর নাটক নয়, কেবল বিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে যেন কবির লড়াইয়ের উতোর এবং চাপান; তবে লোকে খুব তারিফ্ করেছিল শুন্তে পাই। এ সব পুরনো গান ও নাটকের আজকালকার বাজারে যে দরই হোক্, আমার মনে হয় ইতিহাসের খোরাক হিসেবে এগুলি উদ্ধার করে' লিখে রাখা উচিত।

আমাদের বাল্যস্মৃতির গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুই ভাইকে সঙ্গীত-ক্ষেত্রে আলাদা করে' দেখা শক্ত, সে-কথা বোধ হয় "জীবন-স্মৃতি"তেও আছে। হয় ইনি গান বাঁধছেন, উনি তা'তে সুর দিচ্ছেন, নয় উনি ঝম্‌ঝম্ করে' পিয়ানোর গৎ তৈরি করছেন, ইনি তা'তে কথা বসাচ্ছেন। ওঁদের বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীও চট্ করে' সুরে কথা যোজনা করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এঁদের তিনজনের সংযুক্ত রচনার পুরনো খাতা হয়ত এখনো শ্রীমান রথীন্দ্রের কাছে খুঁজ্‌লে পাওয়া যায়। পুরাতনের মূল্য না থাক্‌লেও মোহ আছে, এ কথা কে অস্বীকার কর্‌বে? আমার এক নিকটাত্মীয় বলেন যে, ৺জ্যোতিকাকা মশায়ের সেইসব গৎ এখনকার jazz-এর পূর্ব্বপুরুষ। কথাটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দেবার নয়।

আমি যখন ইতিহাস লিখ্‌ছিনে, কেবল যদৃচ্ছাক্রমে স্মৃতিপট থেকে ছবি উদ্ধার করছি, তখন আগেকার কথা পরে বল্‌লেও দোষ নেই। মনে পড়ে' গেল যে, কবি সতের বৎসর বয়সে যখন বিলেত যান, তখন থেকে তাঁর ইংরিজী গানে হাতে-খড়ি। "Won't you tell me, Mollie darling" এবং "Darling, you are growing old", এই দুই সেকেলে গানের সুর "বহু যুগের ওপার হ'তে" আমার কানে ভেসে আস্‌ছে। তারপরে যখন আমার পিয়ানো বাজাবার বয়স হ'ল, তখন "If", "Come into the garden, Maud", "Goodnight Goodnight, beloved", "Goodbye, Sweetheart, Goodbye" প্রভৃতি কত রকম ইংরিজী গানই তাঁর সঙ্গে বাজিয়েছি। Tom Moore-এর Irish

Melodies ও আমাদের পুরনো বন্ধু তার কতকগুলি সুরে বাঙ্গলা কথাও বসানো হয়েছিল। যখন তিনি বলেন :—

"Oh, the heart that has truly loved, never forgets,
But as truly loves on to the close,
As the sun-flower turns to her god when he sets,
The same look as she turned when he rose!"

তখন সত্য হোক্ বা না হোক্ শুন্‌তে ভাল লাগে নিশ্চয়ই।

ইংরেজ জাত ব্যবহারে যতই রুক্ষ হোক, তাদের গান যে ভাবে গদগদ, তা' উক্ত নামেতেই প্রকাশ। Goodbye Sweetheart-এর প্রথম ক'লাইন :—

The sun is up, the lark is soaring,
Loud swells the song of chanticleer,
The leoret bounds o'er earth's soft flooring
Yet I am here—ye-e-et I am here!

যেন কোন্ মগ্ন চৈতন্য থেকে উঠে এল। এর মধ্যে যে ক'টি পশু-পক্ষীর উল্লেখ আছে, অবসর-বিনোদনার্থে প্রভুরা সেগুলির প্রাণপাতপূর্ব্বক উদরসাৎ করতে দ্বিধা বোধ করেন না, ভাবলে কবিত্বের আবেশ কিছু কমে' আসে অবশ্য। আর যাই হোক্, আমরা কোকিলের পঞ্চম স্বরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবার পরমুহূর্ত্তেই কোকিলের চচ্চড়ি রেঁধে খাইনে!—যদিও কোকিল-ভাজা খেলে গলা মিষ্টি হয়, লোকে বলে! যা হোক্, এরূপ অকবিজনোচিত খাদ্যে পুষ্ট না হ'য়েও কবি যে ভগবদ্দত্ত সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন, তার সাক্ষী সেই কণ্ঠাবশেষ। প্রথম বয়সে তিনি মধ্যমে, বা পঞ্চমে ছাড়া কখনো গান ধরতেন না, এবং অবলীলাক্রমে তারা সপ্তকের 'নি' পর্য্যন্ত গলা চড়াতে পারতেন; যদিও সাধারণতঃ আমাদের গানে দেড় সপ্তকের বেশি লাগে না। যাঁরা সেকালে তাঁর "অনন্ত সাগর মাঝে" বাগেশ্রীর গান শুনেছেন, তাঁরাই আমার কথার সমর্থন করবেন। আজও যে "মরা হাতী লাখ টাকা" তার পরিচয় সেদিন তিনি "নবীন" রঙ্গমঞ্চে দিয়েছেন। তফাতের মধ্যে তখন যা' শুন্‌লে আনন্দ হ'ত, এখন তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুন্‌লেও ভয় করে, মনে হয় কাজ ঠিক হচ্ছে না।—

"জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে।"

ইংরিজী গান গাবার অভ্যাস তাঁর অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল; অন্যান্য দুই-একটা য়ুরোপীয় ভাষার সঙ্গীতও চর্চ্চা করতেন। কিন্তু তাঁর স্বরচিত গানের উপর বিদেশী সুরের প্রভাব খুব কমই পরিলক্ষিত হয়, সেটা আশ্চর্য্যের বিষয়। সশরীরে যে বিদেশী সুর নিয়েছেন তা' নিয়েছেন বা ভেঙ্গেছেন, যথা "কালমৃগয়া" বা "বাল্মীকি-প্রতিভার" "সকলি ফুরালো", "কালী কালী বল রে আজ" ইত্যাদি। কিন্তু নিজে যে-সুর বসিয়েছেন, তা'তে সামান্য ছায়া ছাড়া সম্পূর্ণ বিদেশী ঢঙ খুব বেশি নেই, বলে' আমার বিশ্বাস। এইখানে না বলে' থাকৃতে পারছিনে যে, "বাল্মীকি-প্রতিভা"র মত একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গীতিনাট্য নিদেন আমার চোখে ত' আর পড়েনি। কেবলমাত্র গানে অমন সরসভাবে গল্প বলা, অমন চট্‌পট্‌ ঘটনা এগিয়ে দেওয়া, অমন বিচিত্র রস ব্যক্ত করা, যে-কথার যে-ভাব তা'তে অবিকল সেই ভাবের সুর যোজনা করা,—একাধারে আদর্শ গীতিনাট্যের উপযোগী এতগুলি গুণ এ দেশের আর কোন নাটকে আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় ত' দেখ্‌তে পাইনি। ছেলেবেলা থেকে কতবার এ নাটকের অভিনয় ঘরে-বাইরে দেখলুম, পুরুষানুক্রমে কত বাল্মীকি, কত সরস্বতী এল গেল, কিন্তু নাটক নিত্য নবীন রয়ে গেল, কখনো পুরনো হ'ল না; প্রত্যেকবার সেই একই আনন্দের সঞ্চার করে। অত অল্প বয়সে অমন সুন্দর গীতিনাট্য রচনা করতে পারাই কবির প্রতিভার প্রথম পরিচয় বলা যেতে পারে। নাম-ভূমিকায় অবতরণ করে' অভিনেতারূপেও বোধ হয় তিনি প্রথম যশস্বী হন।

বিদেশী সঙ্গীতের স্রোতে তিনি যে গা ভাসিয়ে দেননি, তার কারণ ছেলেবেলা থেকে তাঁদের বাড়ীতে ভাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবেত্তার যাতায়াত ছিল। যদু ভট্ট, মৌলাবক্স, এসব নাম আমাদের কানে শোনা মাত্র হ'লেও, তাঁদের চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন, এবং এঁদের কাছে হিন্দু সঙ্গীত শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল। বিষ্ণুরাম চক্রবর্ত্তী আমাদের কাল পর্য্যন্ত সে-সঙ্গীতের জের টেনে এনেছিলেন, এবং তার পরে নানা দেশে নানা ভাল মন্দ ওস্তাদ শোনবার সৌভাগ্য আমাদের অনেকেরই হয়েছে।

সুতরাং কোন বিশেষ ওস্তাদের কাছে রীতিমত শিক্ষা না পেলেও সবশুদ্ধ হিন্দু সঙ্গীতের মূলনীতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করবার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট হয়েছিল এবং ভাল হিন্দী গান-বাজনা শুনতে তিনি খুবই ভালবাসেন, তা' সকলেই জানেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের ব্রহ্ম-সঙ্গীত সকল প্রকার হিন্দী সুরের একটি রত্নাকর বিশেষ, তা' মন্থন কর্‌লে হেন হিন্দী রাগতাল নেই যা' পাওয়া যায় না। এবং তার দ্বাদশ ভাগের প্রথম তিন ভাগ বাদ দিলে, শেষ নয় ভাগের অধিকাংশ গানই বোধ হয় রবীন্দ্ররচিত। স্বদেশের ভাণ্ডারে এই সঙ্গীত ব্রাহ্ম-সমাজের একটি অপূর্ব্ব এবং অক্ষয় দান, যার যথার্থ মূল্য কালে নিরূপিত হবে। পূর্ব্ব দুই ভাগের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-গুলির একটি চয়নিকা স্বরলিপিসহ প্রকাশ করা ব্রাহ্ম-সমাজের একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ, যা' আর বেশি দেরী কর্‌লে হয়ত কোনকালে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।

কবির গানের সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, তিনি হিন্দী গানের গঠনপ্রণালী সর্ব্বদা মেনে চলেন; অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ গানে আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ, এই চার ভাগের ব্যতিক্রম করেন না। রাগরাগিণীও বজায় রাখেন, তবে অনেক সময়ে ইচ্ছামত মিশ্রিত করেন। মিশ্ররাগ আমাদের সঙ্গীত-শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু কালক্রমে যে কয়টি মিশ্রণ প্রচলিত রয়ে গেছে, তদতিরিক্ত কিছু করলেই শুচিবায়ুগ্রস্ত কানে খট্‌কা লাগে। সব নতুন জিনিষেরই এই ধাক্কা সামলাতে হয়,—পহিলা সামাল্‌না মুস্কিল হে। আমার মনে হয়, তাঁর প্রথম দিক্‌কার গানে মিশ্রণ কম। শেষেরগুলিতেই সেদিকে বেশি ঝোঁক দিয়েছেন; বিশেষতঃ "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু" গানে ভৈরোঁ (টোড়ী?) ও বিভাস মিশিয়ে, বাঘে-গরুকে এক ঘাটে জল খাইয়ে, বর্ণ-সঙ্করের চূড়ান্ত খেলা দেখিয়েছেন।

তানকর্ত্তব নেই বলে' লোকে মনে করে কবিবরের গান শেখা সোজা, কিন্তু তাঁর সূক্ষ্ম মীড় ও খোঁচখাঁচ বজায় রেখে গাওয়া মোটেই সোজা কাজ নয়; তার সাক্ষী বোধ হয় তাঁর গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্রছাত্রীগণ দিতে পারবেন। মুস্কিল এই যে, স্বরলিপিতে সে সূক্ষ্ম কারীগরী দেখানো শক্ত, এবং দেখেও না-দেখা সহজ; আজকাল

আমরা সকলেই সহজিয়াপন্থী। তাই স্বরলিপি দেখে তাঁর গান শিখ্‌লে ফল সব সময় ভাল হয় না, বিশেষ শিক্ষানবীশের বেলা। অথচ স্বরলিপিই গান-প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায়; সকলের ত' শান্তিনিকেতনে গিয়ে শেখবার সুবিধে হয় না। তবে যাঁরা সে-সুযোগ পান, তাঁদের সেটা অবহেলা করা উচিত নয়, যদি নির্ভুলভাবে কবির গান শিখ্‌তে চান। এইখানে গোপনে বলে' রাখি যে, তিনি নিজের গান নিজেই অনেক সময় মনে রাখ্‌তে পারেন না, তাই শ্রীমান দিনেন্দ্রই সে-বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট—অন্ততঃ আধুনিক গান সম্বন্ধে।

তাল সম্বন্ধে তাঁর তত বৈচিত্র্যের দিকে ঝোঁক নেই, মামুলী তিন ও চারের সরল ছন্দেই তাঁর আশ মেটে। শ্রীমান দিনেন্দ্রকে নাকি একবার তিনি বিরক্ত হ'য়ে বলেছিলেন যে, "আমি যে গানই তৈরি করি তুই বলিস্ তার তাল কাশ্মীরী খেমটা!" গুরু-গম্ভীর রাগরাগিণীকে নাচিয়ে তোলবার তাঁর একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেও তাঁর নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা একেবারে চাপা পড়েনি। "নবতাল" (নিবিড় ঘন আঁধারে) এবং "একাদশী" (দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া) তালের নূতনত্ব তার নামেই প্রকাশ, এবং "ঝম্পকে" ঝাঁপতাল উল্টে ফেলাতেও বোধ হয় তাঁর কিছু হাত আছে। তাঁর "সঙ্গীতের মুক্তি" নামক প্রবন্ধে গানের ছন্দ বা তাল সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য নিজেই বলেছেন।

তান সম্বন্ধেও যেন সম্প্রতি কবির একটু একটু সখ দেখা যায়। পাখীর ছানা যেমন প্রথম উড়্‌তে শিখে অল্প দূর উড়ে আবার মাটিতে পড়ে, তেমনি আজকাল এক-একটা গানে ছোট ছোট তান সংযোগ করবার ইচ্ছে যেন তাঁর মনে জেগেছে বলে' বোধ হয়। তার দৃষ্টান্ত "বাদল-মেঘে মাদল বাজে"-র প্রত্যেক কলির শেষে, এবং অন্যত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁর সুরও যেমন, সে তানও তেমনি, গানের অঙ্গাঙ্গী, সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি,—সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত,—তার উপর আর কোন গাইয়ের হাত (অথবা মুখ) চল্‌বে না। এইখানেই তাঁর গানের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব। প্রত্যেকটি একটি ব্যক্তি বিশেষ, শুধু জাতি বিশেষের অন্তর্গত নয়। হিন্দী গান

রাগিণী বা জাতিকে ফোটাতে চেষ্টা করে; তাই সেই রাগের পরিধির মধ্যে গায়কের স্বাধীনতা অপরিসীম; কিন্তু কবি নিজের কথাকে সুর দিয়ে প্রকাশ কর্‌তে চেষ্টা করেন, অথবা সম্মিলিত সুর ও কথায় "গান" নামক এক-একটি পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি গড়্‌তে চেষ্টা করেন, যার উপর স্থাব্‌রার টুক্‌টাক্ দিয়ে চেহারা বদ্‌লে দেবার পক্ষপাতী তিনি মোটেই ন'ন। হিন্দী গানের কথা সুর ফলাবার অবলম্বন মাত্র। বাঙ্গলা গানের সুরকে যে অপর পক্ষে কেবল কথা-প্রকাশের বাহন মাত্র হ'তে হ'বে, তা' আমি বলিনে। আমি বলি যে, গান এমন এক জিনিষ যাতে সুরেরও প্রাধান্য নেই, কথারও প্রাধান্য নেই; কিন্তু দুইয়ে মিলে-মিশে একটা তৃতীয় জিনিষ গড়ে' ওঠে যার রস আলাদা; যে-রস শুধু কবিতায়ও পাওয়া যায় না, শুধু সুরেও পাওয়া যায় না। শ্রেষ্ঠ গীতিকার পুরোহিত তিনিই, যিনি যোগ্য কথার সঙ্গে যোগ্য সুরের মিলন ঘটিয়ে "গীতরস" নামক একটি বিশেষ আনন্দ-রসের সৃষ্টি করেন।

"চিত্ত পিপাসিত রে গীত-সুধার তরে।"

সেই পিপাসা মেটাবার অফুরাণ উৎস কবির অন্তরে সঞ্চিত, উৎসারিত, উচ্ছ্বসিত, নিত্য বহমান। সেই বাল্যকালের "বাল্মীকি-প্রতিভা"র পর কত যে গীতি-নাট্য, কত যে গানে তা' প্রকাশ পেয়েছে, তার কি বর্ণনা কর্‌ব, কত হিসেব দেব! গীতি-নাট্যগুলি গান হ'লেও, গানের সমষ্টি বলে' তবু পথ-নির্দ্দেশক চিহ্নরূপে কতকটা ধরা যেতে পারে। "মায়ার খেলা" বোধ হয় ৪০।৪৫ বৎসর আগে রচিত। সেটাও মনে আছে, সখী সমিতির এক মেলা উপলক্ষ্যে প্রথম অভিনীত হয়। তা'তে মেয়েরা পুরুষ সেজেছিল, এবং মায়াকুমারীদের হাতে বিজলী বাতির ছড়ি একবার জ্বল্‌-ছিল, একবার নিভ্‌ছিল। তারপরে সেটা আরও কতবার কত রঙ্গমঞ্চে কত অভিনেতা দ্বারা অভিনীত হয়েছে, কিন্তু সেই প্রথম প্রমদার করুণ বিদায়-সঙ্গীত—"এই লহ, এই ধর, এ মালা তোমরা পর" এখনো সকলের কানে বাজ্‌ছে; তার তুলনা নেই, তার পুনরভিনয়ও আর কখনো হবে না। হঠাৎ একটা অবান্তর কথা বলবার ত্রুটি আশা করি মার্জ্জনীয়;—

প্রথম প্রথম "বাল্মীকি-প্রতিভা" ও "মায়ার খেলা"র অভিনয়ে পুরুষদের ঢিলে পায়জামা পরানো হত, কেন কে জানে? কিন্তু ইদানিং বরাবরই ধুতি পরানো হয়, সেটা যে ঢের বেশি সঙ্গত, শোভন ও স্বাভাবিক, সে-বিষয় সন্দেহ নেই।' যাক্ সে কথা। "কাল-মৃগয়া"ও পুরনো করুণ-রসাত্মক, তবে শিকারের দৃশ্যগুলি "বাল্মীকি-প্রতিভা"রই অনুরূপ। এটিরও পুনরুদ্ধার বাঞ্ছনীয়। আমাদের ঘরের একটি মেয়ে "কোথা সে ভাইটি মম" বলে'ই এত কাঁদ্‌ল যে, একবার অভিনয় বন্ধ করে' দিতে হ'ল; তা' ছাড়া অন্ধ মুনিও কিছুতেই নিজের তরুণ ভাগিনেয়কে মৃত মুনিপুত্র সাজ্‌তে দিলেন না।

"ফাল্গুনী" থেকে একটা নতুন সুর কবির গীতিনাট্যে প্রবেশ কর্‌ল বেশ মনে আছে, যদিও তারিখ মনে নেই;—সেটি রূপকের সুর, চির-যৌবনের সুর—চ'লে যায়, কিন্তু আবার ফিরে আসে। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা কতবার কত রকমে প্রকাশ করেছেন, এই সেদিন "নবীন"-এও বলে' গেছেন। "রাজা", "অচলায়তন", "রক্তকরবী", "মুক্তধারা", এ সবই রূপক নাট্য-স্রোতের এক-একটি তরঙ্গ, সবই গানে গানে ঝঙ্কৃত, অলঙ্কৃত—মানে খুব স্পষ্ট বোঝা যাক্ বা না যাক্। আমাদের এখন গান নিয়েই কথা। তা' ছাড়া তাঁর শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের জন্য রচিত 'ঋতু-উৎসব', 'বর্ষা-মঙ্গল' প্রভৃতি প্রকৃতি-নাট্যও এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে, যার প্রতিধ্বনি এই সহরের ইঁটকাঠকেও বৎসরে বৎসরে রঙিয়ে জাগিয়ে তোলে।

ব্যষ্টিগানও তাঁর এক-এক সময়কার রচনা হিসেবে এক-এক দলে ফেলা যেতে পারে। যথা:—"ওগো শোন কে বাজায়", "মরি লো মরি", "বনে এমন ফুল ফুটেছে"—এ সব এক দল। আবার "নিশি নিশি কত রচিব শয়ন", "এত প্রেম আশা", "আজি শরৎ-তপনে", "হেলা-ফেলা সারা বেলা"—এ সব একদল। তখনকার কালে "আমার প্রাণের পরে চলে' গেল কে" এবং "মরি লো মরি"র খুব রেওয়াজ ছিল। "রাজা ও রাণী" এবং "গোড়ায় গলদ"র গান সংখ্যায় কম হ'লেও উল্লেখযোগ্য। "শুধু যাওয়া আসা", "তবু মনে রেখো" ইত্যাদি পেরিয়ে "চিনি গো চিনি তোমারে"র

দল অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে এসে পড়ে। “গান” নামে সেকালের একটা বেঁটে মোটা বইয়ে তাঁর সব রকম বয়সের গান পাওয়া যাবে, যদিও সময়োচিতভাবে সাজানো নেই। জানিনে সে-বই এখনও বাজারে পাওয়া যায় কি না। তাঁর অনেক সুরে বাউল সঙ্গীতের প্রভাব খুব বেশি দেখা যায়। গীতি-নাট্যের যেমন, গানেরও তেমনি তাঁর একটা অভিব্যক্তি হয়েছে, বলা বাহুল্য। তবে তার গতি নির্দ্দেশ করা তত সহজ নয়। কারও সেকালের গান পছন্দ, কারো একালের; কারো এ ভাল লাগে, কারো ও। ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। তিনি নিজে বলেন, তাঁর আগেকার গান ছিল emotional, এখনকার গান হয়েছে æsthetic।

যেবার নোবেল প্রাইজ পেয়ে কবি দেশে ফেরেন—বোধ হয় ১৯১৪ সালে (?) এই সময়েই, সেই থেকে যে তাঁর গানের বন্যা খুলে গেছে, সে-স্রোত এখনো সমানে বইছে, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, দল নেই, সময় নেই। যদিও সম্প্রতি চিত্রাঙ্কণ তাঁর মনের ও সময়ের অনেকখানি জুড়ে বসেছে, তবু আশা করি বীণার স্থান তূলিতে বেদখল করবে না; সরস্বতীর উদার কোলে উভয়েরই জায়গা আছে। কবির কবিতার যেমন একটা চয়নিকা করা হয়েছে, তেমনি তাঁর অসংখ্য গানের মধ্যে সর্ব্বজন-প্রিয়তম শ’খানেক গান নির্ব্বাচন করে’ “সঙ্গীত-শতক” নামে একটা চয়নিকা করলে হয় না? তাঁর নিজের “ভোট”ও এবিষয়ে নেওয়া যেতে পারে।

ভাষা ও সঙ্কেত

— শ্রীরাজশেখর বসু

ভাষা একটা নমনীয় পদার্থ, ইহাকে টানিয়া বাঁকাইয়া চট্‌কাইয়া আমরা নানা প্রয়োজনে লাগাই। কিন্তু এরকম নরম জিনিষে কোনো পাকা কাজ হয় না, মাঝে মাঝে শক্ত খুঁটির দরকার, তাই পরিভাষার উদ্‌ভব হইয়াছে। পরিভাষা সুদৃঢ় সুনির্দ্দিষ্ট শব্দ, তাহার অর্থের সঙ্কোচ নাই প্রসার নাই। আলঙ্কারিকের কথায় বলা যাইতে পারে—পরিভাষার অভিধা-শক্তি আছে, কিন্তু ব্যঞ্জনা আর লক্ষণার বালাই নাই। পরিভাষা মিশাইয়া ভাষাকে সংহত না করিলে বৈজ্ঞানিক তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন না।

কিন্তু ভাষা আর পরিভাষাতেও সব সময় কুলায় না, তখন সঙ্কেতের সাহায্য লইতে হয়। যিনি ইমারত গড়েন, তিনি কেবল বর্ণনা দ্বারা তাঁহার পরিকল্পনা বোধগম্য করিতে পারেন না, তাঁহাকে নক্সা আঁকিতে হয়। সে নক্সা ছবি নয়, সঙ্কেতের সমষ্টি মাত্র—পুরাতন গাঁথনি বুঝাইবার জন্য হল্‌দে রঙ, নূতন গাঁথনি লাল, কংক্রিটে হিজিবিজি, থিলানের জায়গায় ঢেরা-চিহ্ন, ইত্যাদি। বস্তুর সহিত নক্সার পরিমাপগত সাম্য আছে, কিন্তু অন্য সাদৃশ্য বিশেষ কিছু নাই। অভিজ্ঞ লোকের কাছে নক্সা বস্তুর প্রতিমা স্বরূপ, কিন্তু আনাড়ীর কাছে তাহা প্রায় নিরর্থক, বরং ছবি দেখিলে বা বর্ণনা পড়িলে সে কতকটা বুঝিতে পারে।

গানের স্বরলিপিও সঙ্কেত মাত্র। গান শুনিলে যে সুখ, স্বরলিপি-পাঠে তাহা হয় না, কিন্তু গানের স্বর তাল মান লয় বুঝাইবার জন্য স্বরলিপির প্রয়োজন আছে।

একজনের উপলব্ধ বিষয় অন্যজনকে যথাযথ বুঝাইবার সুপ্রযোজ্য সংক্ষিপ্ত সস্তা উপায়—সঙ্কেত। সঙ্কেতের অর্থ যে জানে, তাহার পক্ষে উদ্দিষ্ট বিষয়ের ধারণা করা অতি সহজ, তাহাতে ভুলের সম্ভাবনা নাই, ভাল-লাগা মন্দ-লাগা নাই, শুধুই বিষয়ের বোধ। সঙ্কেতের কারবার

বুদ্ধিবৃত্তির সহিত, হৃদয়ের সহিত নয়। অবশ্য, নায়ক-নায়িকার সঙ্কেতের কথা আলাদা।

বৈজ্ঞানিক বহুপ্রকার সঙ্কেতের উদ্‌ভাবনা করিয়াছেন। তিনি আশা করেন, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনেক উপলব্ধিই কালক্রমে সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করা যাইবে। একদিন হয়ত গানের স্বরলিপির তুল্য রসলিপি গন্ধলিপি স্পর্শলিপিও উদ্‌ভাবিত হইবে, তখন আমরা দ্রাক্ষারসের স্বাদ, চূতমুকুলের গন্ধ, মলয়সমীরের স্পর্শ ফরমুলা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারিব; শারদাকাশ ঠিক কি রকম নীল, সমুদ্রকল্লোলে কোন্‌ কোন্‌ ধ্বনি কত মাত্রায় আছে, তাহাও ছক-কাটা কাগজে আঁকা-বাঁকা রেখায় দেখাইব। এখন যেমন জুতা কিনিবার সময় বলি—৮ নম্বর চাই, ভবিষ্যতে তেমনি সন্দেশ কিনিবার সময় বলিব—মিষ্টতা ৬, কাঠিন্য ২। হয়ত সুন্দরীর রঙের ব্যাখ্যান লিখিব—দুধ ৩, আলতা ২, কালি ৫। তখন ভাষার অক্ষমতায় বস্তু অপরঞ্জিত হইবে না, যাহা সত্য তাহাই সাঙ্কেতিক বর্ণনায় অবধারিত হইবে।

কবির ব্যবসায় কি উঠিয়া যাইবে? তাহার কোনও লক্ষণ দেখিতেছি না। ভাষার যে উচ্ছৃঙ্খল নমনীয়তা হিসাবী লোককে পদে পদে হায়রান করে, তাহারই উপর কবির একান্ত নির্ভর। তিনি বৈজ্ঞানিকের মতন নির্ব্বাচন করেন না, প্রত্যক্ষ বিষয় যথাযথ বুঝাইতে চেষ্টা করেন না। প্রত্যক্ষ ছাড়াও যে অনুভূতি আছে, যাহা মানুষের সুখদুঃখের মূলীভূত, বিজ্ঞান যাহার আশে-পাশে মাথা ঠুকিতেছে, সেই অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি কবি ভাষার ইন্দ্রজালে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেন। সর্ব্বথা-নমনীয় নির্ব্বাধ ভাষাই তাঁহার প্রকাশের উপাদান, তাহাতে ইন্দ্রিয়গম্য ইন্দ্রিয়াতীত সকল সত্যই ফুটিয়া ওঠে। পরিভাষা আর সঙ্কেতে কবির কি হইবে? তাহা ভাবের পিঞ্জর মাত্র।

আদিকবিকে নারদ বলিয়াছেন—

'—সেই সত্য যা রচিবে তুমি;
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।—'

যাঁহারা নিরেট সত্যের কারবারী, তাঁহারাও এখন মাথা চুল্‌কাইয়া ভাবিতেছেন—হবেও বা।

রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

রবীন্দ্র-জয়ন্তী বাংলার পরম গৌরব। এই অকাল-মৃত্যুর দেশে রবীন্দ্রনাথ যে আজিও বাঁচিয়া রহিয়া তাঁহার গানের সুধা বর্ষণ করিতেছেন, ইহা ভগবানের একটি শুভ অনুগ্রহ। আমাদের আনন্দ তাঁহার পরমায়ুতে আরও সুদীর্ঘ হউক, ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

রবীন্দ্রনাথ কবি। আমি রাসায়নিক হইলেও অরসিক। আমার সহিত পরিচয় তাঁহার রসলোকের নয়, তাঁহার ব্যক্তিত্বের। রবীন্দ্রনাথকে মানুষ হিসাবে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, তাঁহার লেখা পড়িয়া আনন্দে অভিভূত হই। সমালোচক আমি নই, সে-স্পর্দ্ধাও নাই, তথাপি এই কবির প্রতি আমার সকল শ্রদ্ধা আজ হৃদয়ে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে।

মনে হয়, বাংলাদেশের যে কি সম্পদ রবীন্দ্রনাথ, তাহা বিদেশী কেহ বুঝিবেন না। কৈশোর হইতে আজ পর্য্যন্ত, এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলার আসরে কাব্য গান গাহিতেছেন। বাংলার পথে ঘাটে হাটে মাঠে এমন-কি সুদূর নিভৃত পল্লীর ঘরে-প্রাঙ্গণে তাঁহার গানের সুর বাজিয়া উঠিতেছে। বাংলার চাষার ছেলেমেয়েরাও রবীন্দ্রনাথের গান গায়। তাহাদের অধিকাংশই কবির নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই; তাহারা জানে না এ গান কাহার লেখা, কি ইহার সুর, কি-ই বা ইহার তাল-মান; কিন্তু তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে সে-গান অতি সহজে আপনা-আপনি ধ্বনিয়া উঠে। আনন্দের আবেগ আসিলেই তাহারা রবীন্দ্রনাথের গান ধরে। রবীন্দ্রনাথের গান ও গীতি-কবিতা বাঙ্গালীর প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; বাংলার ভাবধারাকে এক নূতন রসে কোমল করিয়া সমাজের চতুর্দ্দিকেই এক নূতন সৌন্দর্য্য আনিয়া দিয়াছে। বাংলার নাড়ীর স্পন্দনে তাঁহার সুরে তাল শোনা যায়। আজ আমরা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া বাংলাদেশের কথা কল্পনাও করিতে পারি না।

ইহার কারণ অনেকগুলি। প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথ খাঁটী বাঙ্গালী কবি। রবীন্দ্রনাথের যে সত্যকার কবি-মূর্ত্তি, তাহা সেই বাংলার বৈষ্ণব কবিরই প্রতিচ্ছবি। জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস পর্য্যন্ত যে কবিগণ রাধাকৃষ্ণের সেই যমুনাপুলিনের অনন্ত প্রেমলীলার গান গাহিয়া গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই ভাবে-রসে পরিপুষ্ট; সেইজন্যই তাঁহার প্রেম ও ধর্ম্ম বিষয়ক সঙ্গীতগুলিতে বৈষ্ণব ভাব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

বাংলার এই নিগূঢ় রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি নূতন সুর বাজাইয়াছেন। তাহা হইল, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা। তাঁহার কাব্যে বাংলার আকাশ মাটি জল বাতাস, বাংলার পল্লীর সরল সুন্দর ছবিগুলি এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহার আর তুলনা নাই। বাঙ্গালী ঘরের অতি তুচ্ছ সুখ দুঃখ হাসি কান্নার কথাগুলি তাঁহার ভাষায় এমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, সাধারণ দরিদ্র বাঙ্গালীও তাঁহাকে অনায়াসে নিজেদেরই একজন মনে করিয়া লয়, কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। সম্ভ্রান্ত ধনীগৃহে রবীন্দ্রনাথ লালিত। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের সকল অভিমান ব্যর্থ করিয়া পল্লীজীবনের সঙ্গে এই-যে অন্তরের সহজ নিবিড় আত্মীয়তা, ইহা তাঁহার গল্পগুচ্ছের পাতায় পাতায় সৌরভের মতো ভরিয়া আছে। বঙ্গমাতার গভীর প্রেমে তাই তিনি গহিয়াছিলেন—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

আর—

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম, মাগো, তোমায় ভালবেসে'।

মনে হয় যে, সারা বঙ্গসাহিত্য একদা লোপ পাইলেও এই গানগুলি কখনও বাংলার কণ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে না।

রবীন্দ্রনাথের দেশ-প্রীতি এইখানেই শেষ নয়। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তিনি যেমন পিককণ্ঠ, বাঙ্গালীর জাতীয়তা-বোধেও তেমনি তিনি

মেঘমন্দ্র-স্বরে গান গাহিয়াছেন। সে-গান কর্ম্মের উদ্দীপনায় তেজস্বী, নির্ভীক, সাহসী। ১৯০৫ সালে বাংলাদেশ আলোড়ন করিয়া যেদিন স্বদেশী আন্দোলনের ডঙ্কা-নির্ঘোষ বাজিয়া উঠিল, সেদিন রবীন্দ্রনাথই সকলের আগে ভাবাবিষ্ট হইয়া, সেই উত্তেজনা-স্পন্দনকে এক শঙ্কাহরণ ওজস্বী জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত করিয়াছিলেন। বাংলার স্বাদেশিকতার বহ্নিশিখার পাশে সেদিন তিনি যে উদাত্ত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তাহাই বাংলার কর্ম্মের পিছনে দিল শ্রদ্ধা, জাতীয়তার পিছনে দিল মধুর দেশভক্তি, আর নব্য বস্তুবাদের পিছনে মেলিয়া ধরিল উদার আদর্শবাদ। যে-দিন সরকারী নিষেধের রক্তচক্ষু অবহেলা করিয়া বাংলায় রাখীবন্ধনের পুণ্যযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল, সেদিন তিনিই তাহার স্বস্ত্যয়ন করিলেন—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্!

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ভারতীয় জাতীয়তার কর্ম্মযোগ সাধন করিয়াছিলেন, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের জীবনে আমরা যেমন পাই তার জ্ঞানযোগ, রবীন্দ্রনাথের সাধনায় আমরা তেমনি পাই দেশ-প্রীতির ভক্তিযোগ।

কয়েক বৎসর না-যাইতেই স্বদেশী আন্দোলনের তপোবনের আড়ালে সহসা বিপ্লবের বিষধর ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার করিল। সে-দিন রবীন্দ্রনাথই আবার দেশবাসীকে সাবধান করিয়া বলিলেন,—এই শ্বাপদ-ক্রীড়া ভারতীয় সাধনার বহির্ভূত, এ ক্রীড়ায় কল্যাণ নাই। দেশকে সত্য ও শান্তির পথে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তিনি আবার লেখনী ধরিলেন। সেদিন রবীন্দ্র-নাথের নিকট হইতে আমরা যে ওজস্বী গদ্যভাষায় রচনাগুলি পাইলাম, তাহা বুঝি কবি রবীন্দ্রকেও চকিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আমার বিশ্বাস, আজিকার প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী যুবক-যুবতী যদি দৈনিক সংবাদপত্রের আবর্জ্জনা ফেলিয়া, রবীন্দ্রনাথের তখনকার লেখা 'স্বদেশ', 'সমাজ', 'সমূহ', ও 'রাজাপ্রজা', এবং বিশেষতঃ 'স্বদেশী-সমাজ', 'দেশ-নায়ক', 'সমস্যা',

'পথ ও পাওয়া' প্রভৃতি নিবন্ধগুলি অধ্যয়ন করেন ত' রাজনৈতিক জীবনে অনেক উপকার পাইবেন।

কিন্তু জাতীয়-জাগরণের ঝঞ্ঝাবর্ত্তে ভাবাদর্শ কোথায় উড়িয়া যায়, মানুষ যুক্তি-তর্ক হারাইয়া ফেলে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃই স্বদেশী উগ্রকর্ম্ম-স্রোত হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন অনুভব করিয়া বুঝিলেন, কবি কেবল জাগরণী-গান গাহিতে পারেন, বিপুল কর্ম্মতরীর কাণ্ডারী হওয়া তাঁহার সাধ্য নহে। কর্ম্ম-সাগরের তরঙ্গ-ভঙ্গে তাঁহার আসন নয়, তাঁহার আত্মা শুধু আকাশের ধ্রুবনক্ষত্রের মতো ঊর্দ্ধলোক হইতে রশ্মিপাত করিবে। অতএব দেশের অবস্থা-পরিবর্ত্তনে তাঁহার পূর্ব্বের আশায় আঘাত লাগিল। তিনি দূরে সরিয়া এইবার তাঁহার সাধনার তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত করিলেন। সংকীর্ণমনা কুটিল দেশপ্রেম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন আন্তর্জাতিক সৌখ্যের বাণী, মানবজাতির ঐক্য-সদ্ভাবের মূলমন্ত্র, বিশ্বপ্রেমের বার্ত্তা। ইহারি ফলে শান্তিনিকেতনের ক্ষুদ্র শিক্ষালয়টি দিনে দিনে এক সার্ব্বভৌম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইল। সেই শান্তিনিকেতন আজ প্রাচী-প্রতীচির সৃষ্টি-কলার মিলন-ক্ষেত্র, সর্ব্বদেশের মনীষী-বৃন্দের সঙ্গমতীর্থ। এইখানে রবীন্দ্রনাথ জগতের শিক্ষা-গুরু, এবং এইখানের কাব্যলোকে তিনি গীতাঞ্জলির কবি। তাঁহার ভাব-মধুর বিশ্বপ্রীতির গীতিকাব্য তাই অতি সহজেই পাশ্চাত্য সভ্য জগতের মন হরণ করিল। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ লাভ করিলেন। যে-রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার চারণ-কবি, ভারতীয় জাতীয়তার উদ্গাতা, তিনি হইলেন বিশ্ব-মানবের মিলন-যজ্ঞের ঋষি।

আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার এই বিশ্বপ্রেম-ঘোষণার ঠিক পর বৎসরেই পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্গার আরম্ভ হইল। জাতির পর জাতি সেই প্রলয়-কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পুড়িতে লাগিল। পাঁচ বৎসর ধরিয়া নরহত্যার তাণ্ডবলীলার পর আবার জাতিসমূহ দুঃসহ ক্লান্তি ও অবসাদে ভার্সেলের সন্ধিদ্বারা কোনমতে একটা জোড়াতালি-দেওয়া শান্তির আয়োজন করিল। ঐ বিগত মহাযুদ্ধে যে স্বার্থান্ধ আত্মম্ভরী উদ্ধত জাতীয়তাবাদ লম্ফঝম্ফ করিয়া আপনার অসম্ভবতায় আপনি আছাড়

খাইয়া মরিল, তাহারি বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্ব্বে বাংলাদেশে সতর্কতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। সেইজন্যই রণশ্রান্ত অবসন্ন জগতে তাঁহার সখ্য শান্তি মৈত্রীর বাণী মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় সাগ্রহে সমাদৃত হইল। এবং য়ুরোপ ও আমেরিকায় যে-দিন এই প্রাচ্য ঋষি তাঁহার আশা প্রেম বিশ্বাসের মন্ত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন, সে-দিন সে-দেশের নরনারী তাঁহাকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

আর, আমরা, তাঁহার স্বদেশবাসীর দল, আনন্দে গৌরবে মাতিয়া উঠিলাম যে, আমাদেরই কবি রবীন্দ্রনাথ, যাঁহার সঙ্গীতে এ-দেশের লক্ষ লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ে মাতোয়ারা হইয়াছে, যাঁহার বৈতালিক গীতে জাগিয়া এ জাতি দেশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, তিনিই অবশেষে সমগ্র সভ্যদেশের ঘরে ঘরে পূজিত হইলেন। বিশ্বপ্রেমের হোতারূপে তাঁহার আবির্ভাব ;—ইতিহাসের অনন্ত আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলে তাঁহার স্থান চির-কালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। আমাদের সেদিনের সে-আনন্দের কথা আমাদেরি প্রাচ্যভাষায় বলিতে হয়,—কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। আর, সেই আনন্দ আজিও আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া আছে। ভাবিতেছি, দেশের এই অসহায় দুর্ভাগ্যের দিনেও ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসের জননী ভারতভূমি রবীন্দ্রনাথের মতো আর-একটি বরপুত্র লাভ করিয়াছেন। আজিকার এই উৎসব-ক্ষণে সেই আনন্দই আমার একমাত্র সম্বল। অতএব আর্য্য-ঋষিদের সেই প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণই আমার শেষ কথা—

জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।

রবীন্দ্র-প্রশস্তি

—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

হে আকাশ নীলোজ্জ্বল, হে গভীর মত্ত পারাবার,
হে ধরণী সুশোভনা, হে দক্ষিণ বায়ু মন্দভার,
হে শারদ মেঘমালা, হে একাদশীর স্নিগ্ধ চাঁদ,
দুলাল কবিরে তব স্নেহ দাও, করো আশীর্ব্বাদ।

কেতকী, করবী, যূথী, বকুল, চম্পক, শেফালিকা,
হে আকন্দ অনাদৃত, হে অশোক, পলাশ, মল্লিকা,
হে তৃণ-কুসুম-গুচ্ছ, শুভ্র কাশ পবন-চঞ্চল,
হে নবীন-ধান্য-শীর্ষ, বরো তব প্রেমিকে উজ্জ্বল।

হে শৈবাল-দল-বক্ষ বঙ্গের অগণ্য নদ-নদী,
হে পদ্মা প্রলয়ঙ্করী—সৃজনে উদ্বেল নিরবধি,
হে বঙ্গ-প্রান্তর শ্যাম উন্মুক্ত দিগন্ত প্রসারিয়া,
করো করো স্নেহাশীষ তরঙ্গ-তৃণের বাহু দিয়া।

হে বর্ষণ ঝুরুঝুরু, হে সন্ধ্যার সোনার গরিমা,
হে নিস্তব্ধ-রাত্রি-গর্ভ হ'তে জাগা প্রচণ্ড মহিমা,
হে কাল-বৈশাখী নৃত্য, লঘু মেঘ আলো-ছায়া-করা,
দাও দাও মিত্রে তব স্নেহ দাও সুধা-প্রীতি-ভরা।

হে অতুলা বঙ্গবাণী, চণ্ডীদাস-বঙ্কিম-জননী,
গুপ্ত-মধু-ভূষাময়ী, রবি-পূতা, রবির বরণী,
দেশ-দেশ-নন্দিতা গো স্ফূর্ত্তা শ্যামা অপরূপ-জ্যোতি,
তোমারে দিল যে প্রাণ আজি তাঁরে দাও প্রাণগতি।

বৈদিক তাপস তুল্য, দৃষ্টি যার বিশ্বের অপার
রহস্তে করিয়া ভেদ, মানবের হৃদয়-আগার
তন্ন তন্ন করি' আনে গুপ্ততম সূক্ষ্ম যত ব্যথা,
সে-দৃষ্টি অক্ষয় হোক্ প্রকাশিতে বিচিত্র বারতা।

প্রীতি-অনুরাগ-বদ্ধ শুধু এ ভারতভূমি নয়,
স্বপনে উদিল যার অখণ্ড-মানব-পরিণয়,
কালে কালে গত অনাগত যুগে মানব-মিলন,
সাধিতে সাধনা যার, বিশ্ব তারে করে যে বরণ।

অজ্ঞাতে জানাল যেবা, অনাগতে করিল আগত,
অননুভূতেরে যেই অনুভবি' করে চিত্তগত,
সুদূরে নিকট সাথে যেইজন ঘটাইল বিয়া,
চেনাল অপরিচিতে,—সে যে আছে ভরি' সর্ব্ব হিয়া।

কল্যাণ-বার্ত্তায় ঋষি, প্রেমগানে উন্মত্ত প্রেমিক,
স্বদেশাত্মাদীক্ষাযজ্ঞে ক্লান্তিহীন সাধক ঋত্বিক,
রঙ্গালাপে রসমূর্ত্তি, অন্যায়দলনে রুদ্ররূপ,
ভারতীর রত্নাসনে আজি সে যে দণ্ডধর ভূপ ;

সুখহাসিটিরে যেই করি' দেছে অধিক উজ্জ্বল,
স্নেহসুধা মাখাইয়ে প্রিয়তর করে গৃহতল,
আরো মধু করে দান প্রেয়সীর নয়নে অধরে,
জননীর স্নেহ দেছে বাড়াইয়ে শিশু-মুখ 'পরে ;

কত শত সুর যেবা রেখে দেছে করিয়া মধুর,
কত না দুখের কাঁটা প্রীতি দিয়ে করি' দেছে দূর,
সাগরে গগনে বনে ধরণীতে দেছে নব শোভা,
আষাঢ়ে বসন্তে যেবা করিয়াছে আরো মনোলোভা ;

ভারতী যাহার গানে মুগ্ধা হ'য়ে রাখে নিজ বীণা,
সমৃদ্ধা গৌরব-পূর্ণা কণ্ঠে যার বঙ্গভাষা দীনা,
আকাশ নিস্তব্ধ যার শুনি' নব সুরের মূর্চ্ছনা,
যাহার মানস-রথে সৃষ্টি যান লভিল কল্পনা ;

গাহি তারি জয়গান, তারি জয় গাহে বঙ্গভূমি,
আলাপে আনন্দে দুখে সে যে আছে সর্ব্ব চিত্ত চুমি'।
লহ শ্রদ্ধা, লহ ভক্তি, লহ প্রীতি, লহ নমস্কার,
হে কবি, তোমারি জয়ে সুখহর্ষে হৃদয় দুর্ব্বার।

রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ

—শ্রীজলধর সেন

বিগত ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ সত্তর বৎসর অতিক্রম করেছেন।

কবির প্রতি আমাদের অসীম শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভক্তি নিবেদন করবার জন্য আমরা 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসবের আয়োজন করেছি। এ উৎসব শুধু বাংলা দেশের নয়, ভারতবর্ষের নয়—সমস্ত পৃথিবীর। কাঙ্গালের ঘরের কহীনূর—যে আজ জগৎ-সভার উজ্জ্বলতম রত্ন! বিশ্ব-কবির চরণে আজ তাই নিখিল ভক্তের শ্রদ্ধাঞ্জলি এসে পৌঁছেছে।

মহাকবির এই মহাপূজায় যোগ দেবার জন্য আমারও ডাক পড়েছে। আমার মত একজন জরাজীর্ণ অশক্ত বৃদ্ধ কি অর্ঘ্য দিতে পারে, আমি কিছুই তা এতদিন ভেবে পাইনি।

এই ভাবনার কথা একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে বল্‌তে তিনি বল্‌লেন, আপনার সহিত বিশ্ব-কবির অনেক দিনের পরিচয়, কতদিন কত ব্যাপারে আপনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, কত বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে, সেই কথাগুলিই গুছিয়ে বলুন না।

বন্ধুবরের এ-কথা অবশ্য আমাকে মানতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার অসংখ্য বার সাক্ষাৎ হয়েছে। অসংখ্য বার যে আমি তাঁকে দেখেছি, এ-কথা অস্বীকার করতে পারব না। কিন্তু, সে ত' আজকার কথা নয়—সত্তর বছরের কথাও নয়;—কালজয়ী কবির আয়ু কি বৎসর দিয়ে গণনা করা যায়? সে যে অগণিত যুগ-যুগান্তরের কথা—শত সহস্র বৎসরের কথা। বারে বারে—কালে কালে এই কবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু, সে কথা ত' গুছিয়ে বল্‌বার আমার শক্তি-সামর্থ্য নেই—সে-সাধনাও যে আমার নেই।

সে কোন্ স্মরণাতীত যুগে—কোন্ সত্যকালে, এই আর্য্যভূমির ব্রহ্মাবর্ত্তে, কোন্ পুণ্যতোয়া সরস্বতী-দৃষদ্বতীর পবিত্র তীরে শান্তরসাস্পদ

তপোবনে, কোন্ দেবকল্প মহামানবেরা জগতের অধিবাসীকে অভয়কণ্ঠে ডেকে বলেছিলেন—

"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—

সেই আত্মলব্ধ ত্রিকালজ্ঞ তত্ত্বদর্শীদের মধ্যে আমি সেদিন বরেণ্য রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

সেই যে কবে, কোন্ আরণ্যকের স্নিগ্ধ-ছায়াচ্ছন্ন যজ্ঞবেদী-মূলে সমবেত মহর্ষিবৃন্দ গগন-পবন মুখরিত ক'রে উদাত্তকণ্ঠে সামগান করেছিলেন, সেই অসামান্য গায়কমণ্ডলে আমি সেদিন সুকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

যে পুণ্যশ্লোক আর্য্য ঋষিগণ গম্ভীর কণ্ঠে জগতে অতুলনীয় বেদমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে পবিত্র হোমানলে অগ্নি-দেবতাকে যজ্ঞাহুতি দিতেন, আমি সেই মন্ত্রদ্রষ্টাদের মধ্যে ঋত্বিক্ রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম।

যে ব্রহ্মবিৎ তাপস-সংহতি একদিন সেই মহতো মহীয়ান্ সর্ব্বশক্তিমানের উদ্দেশে নতজানু হ'য়ে যুক্তকরে প্রার্থনা করেছিলেন—

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়"—

সেই নিত্যমুক্ত শুদ্ধস্বভাব পরমোপাসকদের মধ্যে আমি সাধক রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম—তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেয়েছিলাম।

সেই যে কোন্ দূরগত দিনে, নৈমিষারণ্যে এক মহতী পরিষদের অধিবেশন হয়েছিল, সেই পবিত্র স্থানে সমবেত মহাপুরুষগণের মধ্যে আমি জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানমূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম—তাঁর অভয়-বাণী শুন্‌তে পেয়েছিলাম।

তারপর, তাঁকে দেখেছি ব্যাধবাণাহত ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে তমসা-তীরে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে; তাঁকে দেখেছি জেতবন-বিহারে বৌদ্ধসঙ্ঘে শ্রীভগবান শ্রমণ গৌতমের পার্শ্বে আনন্দঘন রূপে; তাঁকে দেখেছি উজ্জয়িনীর রাজসভায় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-মণ্ডলে। এমনিতর শত সহস্র স্থানে, শত সহস্র রূপে, শত সহস্র বেশে, শত সহস্র বার আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি। বারেবারেই এই মহাপুরুষকে চিন্‌তে পেরে

আমার সভক্তি প্রণতি জানিয়েছি—সে যে অনেক কথা। এই স্রষ্টা, দ্রষ্টা, অদ্বিতীয় মহামানবের সঙ্গে আমার সে অনন্ত পরিচয় কেমন ক'রে আমি গুছিয়ে লিপিবদ্ধ কর্‌ব ?

এবারকার এই সত্তর বছরের মধ্যেও সেই যুগ-যুগান্তরের রবীন্দ্রনাথকে যে আমি দেখেছি, কখন রাজবেশে, কখন ফকিরের আঙরাখায়, কখন বাউলের আল্‌খল্লাপরা একতারা-হাতে নৃত্য করতে, কখন আত্মভোলা কবির বেশে, কখন জ্ঞানবৃদ্ধ তত্ত্বদর্শীর মূর্ত্তিতে। কখন দেখেছি স্বদেশের সুখ-দুঃখে কাতর মানুষের মত, কখন দেখেছি সর্ব্ব-মায়ামুক্ত, সকল বন্ধন-বিমুক্ত উদাসী ঋষির মত।

আজকের এই সত্তর বছরের রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ বর্ণনা কর্‌তে ব'সে আমি যে দেখ্‌তে পাচ্ছি সেই যুগ-যুগান্তরের মহাপুরুষকে—যিনি মৃত্যুঞ্জয়, আপনার অবিনশ্বর কীর্ত্তির চেয়েও যিনি মহৎ, যিনি লোকে লোকে চির-পূজিত। এই রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সম্যক্‌ বিশ্লেষণ আমার কাছে তাই অসম্ভব ব'লেই মনে হয়। সত্তর বছর দিয়ে কি তার পরিমাপ করা যায়, যা' সত্তর শতাব্দী ব'লেও শেষ করা যাবে না ? রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে যাঁরা সাহস ও স্পর্দ্ধা রাখেন, তাঁ'রা সে-কাজের ভার নিন্‌—আমার সে-শক্তি নেই—আমি সে-সাধনা করিনি।

আমাদের এই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর লেখা অনেক প্রবন্ধ আমি পড়েছি; কবির কথা নিয়ে রচিত দু'চারিখানি পুস্তকের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছে; কিন্তু, প্রত্যেকটি পড়্‌বার পর আমার অজ্ঞাতসারেই আমার মুখ দিয়ে যেন বেরিয়েছে—হ'ল না—হল না,—"ইহ বাহ্য, আরও কহ।" রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ নির্ণয় করা এত সহজসাধ্য নয়।

হয়ত এই 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসবে কবির উদ্দেশে রচিত বিশ্বের বন্দনা শুনেও আমাকে বল্‌তে হবে—

"ইহ বাহ্য, আরও কহ।"

রবি-প্রণাম

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দূরে অস্তগিরিচূড়ে রক্তমেঘকেতু উড়ে,
দিবা হ'য়ে আসে অবসান ;
"জয়তু অরুণচ্ছবি জয়তু প্রশান্ত রবি !"
উঠে বৈকালিকী স্তবগান।
আসন্ন রাতের ভয় কেমনে বা করি' জয়
কলকণ্ঠ তুলে বনপাখী !
তারা কি গো জাগে মনে নিশান্তে উদয়ক্ষণে
ও-রবি দিবে না কভু ফাঁকি ?
যে-রবি পশ্চিমে ডুবে' নিত্য পুন' উঠে পূবে
আমাদের সে রবি যে নয় ;
যে-রবির পাখী মোরা আকাশে নাহি যে জোড়া,
ডুবিলে ত' হবে না উদয়।
তাহারি সাঁঝের পাখী মোরা তারে পিছু ডাকি'
কহি আজ—ওগো বন্ধু, শোনো,
হোথা কি দেখিছ চেয়ে ? উঠে কি দিগন্ত বেয়ে'
সন্ধ্যার মতন ছায়া কোনো ?
নয় ত' ও সন্ধ্যা নয়, হয়ত মোদেরি ভয়
দিক্‌পারে রচে অন্ধকার।
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখা মেলি' তব গান ছায়া ফেলি'
যুগান্ত হ'তেছে না ত' পার ?
হয়ত তোমারি ছন্দে বাঁধিতে নূপুর-বন্ধে
দলে দলে অপ্সরীরা নামে,
তাদেরি রঙিন্ বাসে মায়াসন্ধ্যা উড়ে আসে
তাদেরি কাজলকেশদামে !

হয়ত তোমারি পাশে দূতমেঘ ফিরে' আসে
বহি' তব প্রিয়ারই বারতা !
হয়ত বা এতকালে কালের উদাস ভালে
তব সুরে ঘনাইল ব্যথা !

আমরা নীচের পাখী, এ পাখা বিধির ফাঁকি,
আকাশের সংবাদ না পাই,
ঘটিছে যা লোকে লোকে ছায়া পড়ে তব চোখে,
তাই, বন্ধু, তোমারে শুধাই—
দিক্ হ'তে ঘুরে' দিক্ তুমি কি জেনেছ ঠিক
এ জীবন নহে মরীচিকা ?
মরুব্যোমে প্রাণঝড়ে উড়ে লাগে, ছিঁড়ে পড়ে
দীপে দীপে আকস্মিকা শিখা ?
জ্বলে নেভে দীপমালা, তা ল'য়ে সাজায়ে ডালা
আদিত্যপিণ্ডের আরত্রিকে,
শূন্যমুখে বাষ্পাম্বরা বারম্বার ঘুরে ধরা
বিধিবদ্ধ আহ্নিকে বার্ষিকে !
এই পূজারতিমাঝে এ দীপ লাগে যে-কাজে
তাহে, বন্ধু, না পাই সান্ত্বনা ;
যত ধ্বনি মনে হয় জ্বালার এ অপব্যয়,
এ কেবল আপনা বঞ্চনা।
অমৃত যাহার গান সেও যদি ম্রিয়মাণ,
তবে, বন্ধু, কার মুখে চাই ?
তোমারও জয়ন্তী-দিন নহে পরাজয়হীন,
তবে আর কার জয় গাই ?

জানি, বন্ধু, জানি জানি তোমার কণ্ঠের বাণী
বিশ্বজনে রেখেছে ভুলায়ে,

ক্ষিতির কুসুমমালে ব্যোমকেশ-জটাজালে
তুমি, বন্ধু, দিয়েছে দুলায়ে।
জানি ওগো, জানি ফের জরাতুর বসন্তের
তুমি এসে' ফিরালে যৌবন,
অশ্রুক্লিন্ন অন্ধ রাতে আষাঢ়ের আঁখিপাতে
নামাইলে নবীন ক্রন্দন।
হেন রবি প্রাণময়, তারি রাত্রি অনুদয়!
জড়পিণ্ড ডুবিবে উঠিবে!
মূঢ় বিহঙ্গের দল নিত্য করি' কোলাহল
চিরদিন তাহারে বন্দিবে।
সেই অভিমানে মোরা শঙ্কা ল'য়ে বুকজোড়া
মোদের রবির গাহি জয়,
জগতে ত' কত ভ্রম, কত হয় ব্যতিক্রম,—
এ সন্ধ্যা কি না হ'লেই নয়?
ভবিষ্যনিশার পাখী আকাশ বাতাস ছাঁকি'
তব গীতে কণ্ঠ ভরি' লবে,
যে-কণ্ঠ গাহিছে গান তাহে জয়মাল্য-দান
হেন ভাগ্য তাদের না হবে।
সেই অহঙ্কারে আজ ভুলিয়া আসন্ন লাজ,
আমরা সাঁঝের পাখী তব
"জয়তু প্রসন্ন রবি! পাখীর প্রাণের কবি!"—
ক্ষীণ কণ্ঠ ঊর্দ্ধে তুলি' কব।
এ পঞ্জরে রক্তমাখা যে-পাখী ঝাপটে পাখা
বন্ধনবেদনে অবিরাম,
ছিন্ন তার ওষ্ঠপুটে যে-গান কাঁদিয়া উঠে
সেই গানে করে সে প্রণাম।

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান

—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথ আজন্ম রূপকার। রূপদৃষ্টির যে-প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মেছেন তার নব-নবোন্মেষশালিতার পর্য্যাপ্ত পরিচয় বহু-ক্ষেত্রে বহু রূপে সঞ্চিত হ'য়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের পুরোহিত; তাঁর কবি-প্রাণে "সুন্দরের জয়ধ্বনি-গানে" যে-বাঁশি চিরকাল মন্দ্রিত হ'য়েছে তাতে শুধু তাঁর জন্মভূমি নয়, সমস্ত পৃথিবীই মুখরিত হ'য়েছে। যে-সুন্দরের আরাধনায় তিনি তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন, তার সন্ধানে তাঁকে নিত্যই কত নব নব ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হ'য়েছে তা কারও অজানা নয়। রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও নিত্যনবীনতার কারণ এই যে, তাঁর জীবনদেবতাই তাঁকে বহু বিচিত্র ও নিত্য নূতন রূপে দেখা দিয়েছেন। তাই কবি নিজেই বিস্ময়বিমুগ্ধ-চিত্তে তাঁকে সম্ভাষণ করেছেন—"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিণী!", "এ কি কৌতুক নিত্যনূতন ওগো কৌতুকময়ী!" রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয়ে প্রত্যহ যে অগণিত ভাব সেই বহু বিচিত্রের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলেছে, তাঁর শিল্প-প্রতিভাও তেম্‌নি প্রতিদিনই তাকে অজস্ররূপে অভিব্যক্তি দান করেছে। তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভার আলোতে ভাব ও রূপ যে কত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে প্রকাশিত হ'য়েছে কবির নিজের কথাতেই তার প্রমাণ পাই।—

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।—১৭, উৎসর্গ

কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ভাবুক রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার বিষয় আমাদের আলোচ্য নয়, এস্থলে আমরা শুধু তাঁর রূপদক্ষতার বিষয়ই আলোচনা করব। রবীন্দ্রনাথের চিত্তপ্রকৃতি আপন সার্থকতা লাভের উপায়-স্বরূপ প্রথম থেকেই সৌন্দর্য্যের ধ্বনিরূপকেই আশ্রয় করেছে। তাঁর সহজাত রূপনৈপুণ্যের স্পর্শ পেয়ে সৌন্দর্য্যের ধ্বনি-স্বরূপ যে বিচিত্র ও অজস্র ধারায় উৎসারিত হ'য়েছে তা সত্যই বিস্ময়কর। ধ্বনিশিল্পী-

রূপে তিনি বাংলা ভাষায় যে-মায়ার সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা নেই। তিনি যে "সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে মৃত্তিকার কোলে" নেমে এসেছেন তাতে কে মুগ্ধ হয় নি? রূপস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ছন্দ ও সঙ্গীত, ধ্বনির এই উভয় প্রকাশকেই অবলীলাক্রমে যুগপৎ রূপসৃষ্টির কার্য্যে নিয়োগ করেছেন। ছন্দ ও সঙ্গীত ধ্বনিশিল্পের দু'টি প্রধান অঙ্গ। ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর শিল্প-প্রতিভা যে কত অভিনব রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এ স্থলে তা-ই আমাদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু একটি মাত্র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের যথাযোগ্য আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের মূলতত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি মাত্র কথার উত্থাপন কর্‌ব।

শুধু রূপদৃষ্টি নিয়েই কবি কাব্যরচনা করতে পারেন না; রচনা-কার্য্যে নিরত হ'য়ে তাঁকে প্রতি পদেই রূপতত্ত্বদৃষ্টির পরিচয়ও দিতে হয়। রূপতত্ত্ব-দ্রষ্টারূপে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে কত অসাধারণ, তাঁর ছন্দ-বৈভবের আলোচনায় সে-কথাটিই সকলের আগে মনকে আকৃষ্ট করে। কিশোর বয়স থেকেই তিনি বাংলা ভাষার ধ্বনিরূপের ওই অসাধারণ তত্ত্বদৃষ্টি নিয়ে রচনা-কার্য্যে অগ্রসর হয়েছিলেন ব'লেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ছন্দ-ভাণ্ডারে তাঁর দান এত অপরিমেয়; বাংলা কাব্য-জগতে তিনি যে কত নোতুন নোতুন ছন্দ সৃষ্টি করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এই বৈচিত্র্য-বহুলতাই তাঁর ছন্দের আসল কথা নয়; আসল কথা এই যে, তিনিই বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির সর্ব্বপ্রথম ও যথার্থ আবিষ্কারক। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা ভাষার মর্ম্মগত স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ন রেখে বাংলা ছন্দের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করেছেন; তাঁর এ আবিষ্কার পৃথিবীর ভাষাগত কোনো আবিষ্কারের চেয়ে কম নয়। বাংলা ভাষার আপাত-দৃশ্যমান স্থূল আবরণের অন্তরালে অবস্থিত যে ছন্দ-রাজ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন তা আট্‌লান্টিকের পরপারস্থ তরঙ্গপ্রচ্ছন্ন নোতুন মহাদেশ আবিষ্কারের চেয়ে কিছুমাত্র কম বিস্ময়কর নয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দ-জগতের সর্ব্বব্যাপী মূল মাধ্যাকর্ষণ-নীতিটি আবিষ্কার ক'রেই নিরস্ত হন নি; পরন্তু ঐ নীতিটিকে কাব্যসাহিত্যের বহুক্ষেত্রে বহু বিচিত্র উপায়ে

প্রয়োগ ক'রে বাংলা ছন্দে যে-হিল্লোল, যে-ঝঙ্কার, যে-নৃত্যলীলা ও সুরমাধুর্য্য তিনি সঞ্চারিত করেছেন তা' যথার্থই অপরিমেয়। ছন্দের দিক্ থেকে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত কবিতাতেই একাধারে নৃত্য ও সঙ্গীতের যুগপৎ অপূর্ব্ব সমাবেশ হ'য়েছে। কোন্ যাদুমন্ত্রের প্রভাবে বাংলা ছন্দকে এরূপ অদ্ভুত রূপে তরঙ্গিত ও মুখরিত ক'রে তোলা সম্ভবপর হ'ল তার আলোচনা করার সার্থকতা আছে।

"মানবের জীর্ণ বাক্যে ছন্দ মোর দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে।"

—ভাষা ও ছন্দ, কাহিনী

এই উক্তি আদি কবি বাল্মীকির কাব্য সম্বন্ধে যতখানি সত্য রবীন্দ্রনাথের নিজের কাব্য সম্বন্ধেও তার চেয়ে কম সত্য নয়। কিন্তু বাংলা ভাষার জীর্ণ বাক্যে তাঁর ছন্দ যে নব সুর দিয়েছে তার যথার্থ মর্য্যাদা উপলব্ধি করতে হ'লে প্রথমেই দেখা দরকার, তিনি বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত যে ছন্দ-শক্তিকে আবিষ্কার করেছেন তার মৌলিক নীতিসূত্রগুলি কি। ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহির্গঠন, কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। বাংলা ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতির আসল স্বরূপটি কি, সে-তত্ত্বের উপরই বাংলা ছন্দের শক্তি ও বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। তিনি যেদিন ওই তত্ত্বটি আবিষ্কৃত করলেন সেদিন থেকেই বাংলা ছন্দ সার্থকতা ও ঐশ্বর্য্য লাভের পথের সন্ধান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙালী কবিরা বহু শত বৎসর যাবৎ নানা প্রয়াস ও সাধনার ভিতর দিয়ে অতি মন্থর গতিতে বাংলা ছন্দের স্বরূপ সন্ধানের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন; কিন্তু সে-তত্ত্বের আবরণ কেউ উন্মোচন করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের নিবিড় অন্তর্দৃষ্টির রশ্মিতে যেদিন সে-তত্ত্ব উদ্ভাসিত হ'ল, সেদিন দেখা গেল, বাংলা ছন্দের শক্তিও ক্ষীণ নয় এবং তাঁর সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রও স্বল্পপরিসর নয়; সেদিন থেকে বাংলা ছন্দ তাঁর শঙ্খধ্বনির অনুসরণ ক'রে ত্রিপথগা ভাগীরথীর মতো তিনটি স্বতন্ত্র ও প্রবল ধারায় ব'য়ে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন কাব্যসাহিত্যের আসরে প্রথম প্রবেশ করেন তখন বাংলায় যে ক'টি ছন্দ প্রচলিত ছিল সে-সমস্তই অক্ষরবৃত্তের অন্তর্গত। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দগুলিও তখন পর্য্যন্ত সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় নি; ছন্দ নিয়ে তখন বহু পরীক্ষা চলেছে, অক্ষরবৃত্তের মূল তত্ত্বটি তখন পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃতই র'য়ে গেল। পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাতেই এ ছন্দগুলি সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে। সে-কথা যথাস্থানে আলোচনা করব। কিন্তু এস্থলে একথা বলা প্রয়োজন যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কৃত্রিমতা ও অপূর্ণতা প্রথম থেকেই তাঁর স্বাভাবিক প্রখর ছন্দবোধকে পীড়া দিচ্ছিল। তাই তাঁর বাল্য রচনাগুলিতে একটা অতৃপ্তি ও প্রচলিত ছন্দকে ভেঙে-চু'রে নোতুন ছন্দ-সৃষ্টির একটা অশ্রান্ত প্রয়াস দেখতে পাই। "শৈশব-সঙ্গীত" বা "কৈশোরকে"র সময় থেকে "ছবি ও গান"-এর সময় পর্য্যন্ত এই অতৃপ্তি ও প্রয়াসের যুগ। "কড়ি ও কোমল"-এ ছন্দ অনেকখানি শান্ত ও সংযত হ'য়েছে, কিন্তু ছন্দের আসল রূপটি আবিষ্কারের প্রয়াসের কিছুমাত্র বিরাম নেই। "মানসী"র যুগে যখন ছন্দের ধ্বনিমাত্রার অবিষ্কার হ'ল তখন থেকেই এই অবিশ্রান্ত সন্ধানের কতকটা তৃপ্তি ঘটল; তার পর হ'তেই রবীন্দ্রকাব্যনিকুঞ্জ বহু বিচিত্র ছন্দের স্তবকে স্তবকে রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের রচনায় যুক্তবর্ণের বিরলতা একটি বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। যুক্তবর্ণের এই বিরলতা আকস্মিক নয়। অযুক্ত ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনির মধ্যে যে একটি অবাধ প্রবাহ ও সঙ্গীত-মাধুর্য্য আছে, তা' তাঁর সঙ্গীতনিপুণ কিশোরহৃদয়ে সহজেই অনুভূত হয়েছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, যেখানেই যুক্তবর্ণের ব্যবহার হয় সেখানেই ছন্দের সহজ ধ্বনিপ্রবাহে বাধা ঘটেছে। এ-ই হচ্ছে তাঁর তরুণ বয়সের রচনায় যুক্তবর্ণের বিরলতার প্রধান কারণ। কিন্তু যুক্তবর্ণকে যদি ছন্দ থেকে একেবারে বর্জ্জন করা যায়, তা' হ'লে ছন্দের ধ্বনি বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে এবং অত্যন্ত তরল ও শক্তিহীন হ'য়ে পড়ে, একথাটিও তিনি তখন বুঝতে পেরেছিলেন। তাই যুক্তবর্ণের ব্যবহার সম্বন্ধে একটি প্রবল দ্বন্দ্ব কবির মনে দেখা দিয়েছিল।

"কড়ি ও কোমল"-এর সময় পর্য্যন্ত বহু রচনাতেই এই দ্বন্দ্বের প্রচুর আভাস রয়েছে। কিন্তু "মানসী"র যুগে তিনি যখন ছন্দের ধ্বনি-প্রবাহে ব্যাঘাত না ঘটিয়েও যুক্তবর্ণ ব্যবহারের যাদুমন্ত্রটি আবিষ্কার করলেন, তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত যুক্তবর্ণের পর্য্যাপ্ত ব্যবহারে তিনি যে ধ্বনির ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা নেই।

তখনকার দিনের কবিরা শুধু অক্ষর গুনেই ছন্দরচনা করতেন। তাঁরা একথা বুঝতে পারেন নি যে, লিপিবদ্ধ বা পঠিত অক্ষরের সঙ্গে ছন্দের কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই। ছন্দ একটি ধ্বনিশিল্প, সুতরাং ছন্দের গোড়ার কথাই হচ্ছে ধ্বনির তত্ত্ব। লিখিত অক্ষরের সংখ্যার উপর ছন্দ মোটেই নির্ভর করে না। রবীন্দ্রনাথ "মানসী"র সময়েই সর্ব্বপ্রথম এ কথাটি অনুভব করেন; তিনি বুঝতে পারলেন যে, অক্ষরগোনার অন্ধপদ্ধতি বর্জ্জন ক'রে ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ বা quantity-র উপরই ছন্দকে গ'ড়ে তুলতে হবে। তিনি আরও বুঝতে পারলেন যে, সংস্কৃত ছন্দের রীতিতে বাংলায় ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ বা quantity নির্ণয় করা চলবে না; কারণ বাংলার উচ্চারণ-পদ্ধতি সংস্কৃতের পদ্ধতি থেকে অনেক পৃথক। স্বরবর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু বাংলার পক্ষে নয়। বাংলায় কার্য্যত' দীর্ঘস্বরের ব্যবহার নেই বললেই হয়। অথচ শুধু হ্রস্বস্বরের ব্যবহারে ছন্দ বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে হ'য়ে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন যে, বাংলায় দীর্ঘ ধ্বনি নেই বটে, কিন্তু যুগ্মধ্বনি আছে; এবং এই যুগ্মধ্বনি স্বভাবত'ই গুরুমাত্রিক ও তরঙ্গায়িত। তা' ছাড়া যুক্তবর্ণ আসলে যুগ্মধ্বনিকে লিখিত আকারে প্রকাশ করার একটি বিশেষ প্রণালী ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং যখন থেকে তিনি অযুগ্মধ্বনিকে এক মাত্রা (metrical moment বা instant) এবং যুগ্মধ্বনিকে দু'মাত্রা ধ'রে ছন্দ রচনা করতে প্রবৃত্ত হ'লেন তখন থেকে ছন্দে যুক্তবর্ণ ব্যবহারের কল্পিত বাধাটি অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। পক্ষান্তরে যুক্তবর্ণ ছন্দের ধ্বনিকে বিচিত্র ও তরঙ্গিত ক'রে তোলার পক্ষে বিশেষ অনুকূলই হ'ল। এভাবে "মানসী"-র যুগ থেকেই তিনি বাংলা ছন্দে মাত্রিক পর্ব্ব বা quantitative measures-এর প্রবর্ত্তন করেন। এই মাত্রিক পর্ব্বের বহু বিচিত্র সমাবেশের

ফলে বাংলায় ছন্দের এক নোতুন ধারার উৎপত্তি হ'য়েছে। আমি ছন্দের এ ধারার সাধারণ নাম দিয়েছি **মাত্রাবৃত্ত**। ইংরেজিতে একে বলা চলে quantitative metre। ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে রচিত "ভুল-ভাঙা" নামক কবিতাটিই প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত সর্ব্বপ্রথম কবিতা, এই "ভুল-ভাঙা" কবিতাটিতেই সর্ব্বপ্রথমে শুধু অক্ষর গু'নে ছন্দ-রচনার ভুল ভেঙেছে। অক্ষরবৃত্তের শিকল-ভাঙা সর্ব্বপ্রথম বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দটির একটু নমুনা দিচ্ছি—

চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধন-পাশ
বাহুতে মোর।

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
আগের মতো;
জ্যোৎস্না-যামিনী যৌবন-হারা,
জীবন হত।

— ভুল-ভাঙা, মানসী

ওই "বন্ধন" কথাটিই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা ছন্দে অক্ষরগুন্‌তির বন্ধনপাশ ছিন্ন করেছে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যে-তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন সেটি হচ্ছে ধ্বনি-পরিমাণের তত্ত্ব। এ ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সুর-প্রাধান্য; তাই এ ছন্দ বাংলা গীতি-কবিতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহনরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে; বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতা-সমূহের অধিকাংশই এ ছন্দে রচিত। এই সুর-প্রবণতার একটা অসুবিধে এই যে, এর ধ্বনি অনেক সময়ই নিস্তরঙ্গ একঘেয়ে হ'য়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই কবিকে খুব সতর্ক ভাবে স্থানে স্থানে যুগ্মধ্বনির প্রয়োগ ক'রে ধ্বনিকে বিচিত্র ও তরঙ্গিত ক'রে তুল্‌তে হয়। সেজন্যেই দেখ্‌তে পাই, যে-রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে যুক্তবর্ণের ব্যবহারে অত্যন্ত কুণ্ঠাবোধ কর্‌তেন সেই রবীন্দ্রনাথই তাঁর

পরিণত বয়সের রচনায় প্রয়োজনমতো যুক্তবর্ণ তথা যুগ্মধ্বনির বজ্রকরতালি বাজিয়ে ছন্দকে উদ্বেল ক'রে তুলেছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর,
হে গম্ভীর।
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর,
ঝঙ্কৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর।
বর্ষণগীত হ'লো মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে,
নন্দিত তব উৎসব-মন্দির,
হে গম্ভীর।

— বর্ষামঙ্গল, বনবাণী

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে গীতি-কবিতার উপযোগী সুরমাধুর্য্য আছে; কিন্তু ওই সুরপ্রবণতার মধ্যে বাংলা উচ্চারণরীতির আসল তত্ত্বটিই ধরা পড়ে না। উচ্চারিত ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ নির্ণয়ের দ্বারা ও সুরসঞ্চারের দ্বারা মাত্রাবৃত্তের মাধুর্য্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমাদের নিত্য-উচ্চারিত ধ্বনির মধ্যে সুর নেই, আছে accent বা ঝোঁক; এবং মাত্রানির্ণয়ই ধ্বনির সবটুকু তত্ত্ব নয়। উচ্চারণের সময় কথার উপর আমরা যে ঝোঁক দিয়ে কথা বলি, ওই ঝোঁকটির মধ্যেই ধ্বনির আসল শক্তিটি নিহিত থাকে। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ওই ঝোঁকটিই সুরের আড়ালে গৌণ হ'য়ে যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের প্রথম থেকেই বাংলা ছন্দে ওই ঝোঁকটুকু সহ আমাদের সমগ্র উচ্চারণ-পদ্ধতিটাকেই অখণ্ড ও অক্ষুণ্ণরূপে সমাবিষ্ট করতে প্রয়াস পেয়েছেন। "ছবি ও গান"-এই তিনি সর্ব্বপ্রথমে আমাদের উচ্চারণ-তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

ঘুমের মত মেয়েগুলি
চোখের কাছে দুলি' দুলি'
বেড়ায় শুধু নূপুর রণ-রণি'।
আধেক মুদি' আঁখির পাতা
কার সাথে যে কচ্চে কথা,

শুন্‌চে কাহার মৃদু মধুর ধ্বনি।

—মাতাল, ছবি ও গান

"কড়ি ও কোমল"-এও এরকম ছন্দের প্রয়োগ আছে। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

ফুলের গন্ধ ঘিরে আছে সাতটি ভায়ের তনু—
কোমল শয্যা কে পেতেছে সাতটি ফুলের রেণু।
ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে স্বপন দেখে মাকে,
সকাল বেলা "জাগো জাগো" পারুল দিদি ডাকে।

—সাত ভাই চম্পা, কড়ি ও কোমল

কিন্তু এ দুই গ্রন্থে এ ছন্দ রচনার মধ্যে অনেক স্থানেই সন্দেহ ও শৈথিল্য রয়েছে। ছড়া জাতীয় কবিতা ছাড়া উচ্চ ভাবের রচনায় এ ছন্দ চল্‌বে কি না এবিষয়ে কবির মনে কতকটা সন্দেহ র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু "ক্ষণিকা"র যুগ থেকে তিনি নিঃসন্দেহে ও দৃঢ়হস্তে এ ছন্দ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।—

তোমার তরে সবাই মোরে
করচে দোষী,
হে প্রেয়সী।
বল্‌চে—কবি তোমার ছবি
আঁক্‌চে গানে,
প্রণয়-গীতি গাচ্চে নিতি
তোমার কানে;
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা
ঢাক্‌চে শেষে বাংলা দেশে
উচ্চ কথা।
তোমার তরে সবাই মোরে
করচে দোষী,
হে প্রেয়সী।

—ক্ষতিপূরণ, ক্ষণিকা

কিংবা

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশম রত্ন নব রত্নের মালে।

—সেকাল, ক্ষণিক

এসমস্ত কবিতা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কবি কেমন নিঃসংশয় চিত্তে এ-ছন্দ রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। "ক্ষণিকা"র পর "উৎসর্গে" তিনি এ ছন্দে খুব উচ্চ ভাবের কবিতা রচনা করেছেন এবং তার পর থেকে এ ছন্দে কত বিচিত্র ভঙ্গীতে কত অজস্র রচনা করেছেন তার ইয়ত্তা করা যায় না। এ ভাবে রবীন্দ্রনাথের অক্লান্ত সাধনা ও অসংখ্য রচনার ফলে এ ছন্দটি বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

দেখা যাক্, এ ছন্দের ভিতরকার তত্ত্বটি কি। লিপিবদ্ধ অক্ষরসংখ্যার মধ্যে এর প্রাণতত্ত্বের সন্ধান মিল্‌বে না; ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ অর্থাৎ quantity-র মধ্যেও এ ছন্দকে ধরা যায় না। এ ছন্দের ভিতরকার তত্ত্ব হচ্ছে, প্রাকৃত বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণপদ্ধতি ও ঝোঁক (accent) স্থাপনের রীতি। বিশ্লেষণ কর্‌লে দেখা যাবে, এ ছন্দের প্রতি পর্ব্বের অন্তরে রয়েছে আমাদের উচ্চারণরীতির অখণ্ড রূপটি; মাত্রাপরিমাণ নির্ণয়ের কোনো চেষ্টা এ ছন্দের মধ্যে নেই, আছে শুধু অখণ্ড ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যার হিসাব। প্রতি পর্ব্বের ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যার হিসাব স্থির থাক্‌লেই এ ছন্দের গঠন অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রত্যেকটি ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্-এর ভিতরকার কথা হচ্ছে, একটি যুগ্ম বা অযুগ্ম স্বরের অস্তিত্ব। তাই এ ছন্দের একেকটি পর্ব্বের নাম দেওয়া যায় স্বরপর্ব্ব বা syllabic measure। স্বরপর্ব্বের বিভিন্ন সমাবেশের ফলেই এ ছন্দ রচিত হয় ব'লে, আমি এ ছন্দের নাম দিয়েছি **স্বরবৃত্ত**; ইংরেজিতে একে বলা যায় syllabic metre।

মাত্রাবৃত্তের ন্যায় স্বরবৃত্তও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরই দান। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে এ ছন্দ বাংলায় ছিল না, এ কথা সত্য নয়। এ ছন্দ বহুকাল যাবৎই আমাদের পল্লীসঙ্গীতে, ছেলেভুলানো ছড়ায়, কবির গানে, বাউলের গানে, এক কথায় আমাদের লোকসাহিত্যে বহুকালই

প্রচলিত ছিল। রামপ্রসাদের গানে এ ছন্দের সঙ্গে সকলেরই পরিচয় ঘটেছে। ঈশ্বর গুপ্তের কয়েকটি কবিতায়ও এ ছন্দের সাক্ষাৎ পাই। মধুসূদন কিংবা হেমচন্দ্রের নিকটও এ ছন্দ অজ্ঞাত ছিল না। যথা—

বাহিরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্ম্ম-ধোয়া।
পুণ্যখাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামীতে চারটি পোয়া॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফল্‌লো ধর্ম্ম,
বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া॥

—মধুসূদন

হায় কি হলো—বঙ্গদর্শন বঙ্কিম দেছে ছেড়ে,
হায় কি হলো—দেশটা গেছে সাপ্তাহিকে জুড়ে।

—হায় কি হলো, কবিতাবলী, হেমচন্দ্র

লক্ষ্য করার বিষয়—প্রথম দৃষ্টান্তটিতে দু'টি পর্ব্বে (বাহিরে ছিল, বুড় শালিকের) ছন্দের ত্রুটি ঘটেছে এবং দু'টি দৃষ্টান্তই লৌকিক কায়দায় সাধারণের চিত্ত আকর্ষণের উদ্দেশ্যে রচিত ব'লে উভয়ত্রই স্বরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার হ'য়েছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও একস্থানে স্বরবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু এ স্থলেও লৌকিক বিষয়বস্তুই এ ছন্দে রচিত হ'য়েছে। দৃষ্টান্তটি হচ্ছে এই—

উমার কেশ চামরছটা, তামার শলা বুড়ার জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁপায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো।
উমার নথ চাঁদের চূড়া, বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া,
ছার কপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো।
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের ভার,
কেমন করে ওমা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চূড়া, ভাঙড় পাগল ওই না বুড়া,
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো।

—কোন্দল ও শিবনিন্দা, অন্নদামঙ্গল

এখানেও কয়েকটি পর্ব্বে ত্রুটি ঘটেছে। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বকালবর্ত্তী গোবিন্দদাসের রচনায়ও স্বরবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যথা—

চিকন কালা গলায় মালা বাজান নূপুর পায়।
চূড়ায় ফুলে ভ্রমর বুলে তেরছ নয়নে চায়।

রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্ত ছন্দের সৃষ্টি করেন নি। তাঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে প্রাকৃত বাংলার এই খাঁটি ছন্দটিকে লোকসাহিত্যের আসন থেকে উন্নীত ক'রে সর্ব্বপ্রকার রসসাহিত্যের উপযুক্ত বাহনরূপে তাকে অসংকোচে নিযুক্ত ক'রেছেন এবং এ ছন্দটিকে যথোচিতরূপে মার্জ্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে বহু শাখা-প্রশাখায় লীলায়িত ক'রে বাংলার ছন্দভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছেন। বাংলার এই খাঁটি ছন্দের শক্তি, সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্যের আবিষ্কারের দ্বারা তিনি আমাদের কাব্যসাহিত্যের যে সম্পদ্ বৃদ্ধি করেছেন তার পরিমাপ নেই।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ভিতরকার গঠন-কৌশলও তাঁরই হাতে পূর্ণতা লাভ করেছে। এটি বাংলা ভাষার আদিম ছন্দ না হ'লেও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রধান বাহন; কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস বাংলা রামায়ণ ও মহাভারত রচনার সময়ে এই অক্ষরবৃত্তকেই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু অক্ষরবৃত্তকে তার বর্ত্তমান সৌষ্ঠব ও সুসঙ্গতি দান করতে বাংলার প্রাচীন কবিদের বহু শতাব্দী সময় লেগেছে। বহুকাল যাবৎ বহু কবির অক্লান্ত পরিশ্রম, পরীক্ষা ও প্রয়াসের ফলে অক্ষরবৃত্ত তার বর্ত্তমান রূপে উপনীত হ'য়েছে। এ ছন্দটি মূলে মাত্রিক না ধ্বনিসংখ্যক, এর পর্ব্বগঠন কিরূপ হবে, প্রতি পংক্তিতে ক'টি 'অক্ষর' থাকবে, যতি-স্থাপনের বিধি কিরূপ, এর প্রকারভেদ কি উপায়ে উৎপন্ন করা যায়, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই প্রাচীন কবিদের মনে সর্ব্বদাই সংশয় থেকে যেত। তাই প্রাচীন কাব্যগুলিতে দেখ্‌তে পাই, এ ছন্দ কোথাও মাত্রিক, কোথাও স্বরসংখ্যক, এর পর্ব্বগঠন ও যতিস্থাপন অনিয়মিত, প্রতি পংক্তির অক্ষরসংখ্যাও অনির্দ্দিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে একদিকে সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব ও অক্ষরগোনার প্রয়াস, অন্যদিকে মাত্রা বা স্বরসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তার উপর সমস্ত ছন্দ সুর ক'রে গানের ভঙ্গীতে আবৃত্তি করার প্রথা,

এই সমস্ত বিভিন্ন প্রভাবের ফলে এ ছন্দটি একটি সুনির্দ্দিষ্ট আকার লাভ কর্‌তে পারে নি। শক্তিমান কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যেও এ ছন্দকে একটা অনিয়মিত অবস্থার মধ্যে দেখ্‌তে পাই। ভারতচন্দ্রের ছন্দ-বোধ অসাধারণ ছিল, সন্দেহ নেই এবং তাঁর হাতেই এ ছন্দ সর্ব্বপ্রথমে কতকটা নির্দ্দিষ্ট আকার লাভ করে। কিন্তু ভারতচন্দ্রও এ ছন্দের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি কর্‌তে পারেন নি। 'তাই দেখ্‌তে পাই, অন্নদামঙ্গল কাব্যে পয়ারের পংক্তিতে যদিও অক্ষরসংখ্যা সর্ব্বত্রই চোদ্দ ঠিক আছে এবং মিলের রীতিও সুনির্দ্দিষ্ট হ'য়ে এসেছে, তথাপি বহুস্থলেই যতিস্থাপন বিষয়ে শৈথিল্য দেখা যায়; অথচ যতিস্থাপনবিধি এবং পর্ব্ব-গঠন প্রণালীই ছন্দের মূল কথা। ভারতচন্দ্রের কাব্যে পয়ারের যতি-স্থাপনবিধির অনিশ্চয়তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

> কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
> নখে নখে বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥
>
> —কোন্দল ও শিবনিন্দা, অন্নদামঙ্গল

এ দৃষ্টান্তটির উভয় পংক্তিতেই সাত অক্ষরের পরে যতি পড়েছে। কিন্তু অক্ষরবৃত্তের একটি নিয়ম এই যে, এ ছন্দে প্রতি পংক্তির আদি, মধ্য, অন্ত কোথাও অসমসংখ্যক অক্ষরকে স্বীকার করে না। কাজেই সাত অক্ষরের পরে যতিস্থাপন এ ছন্দের স্বভাব-বিরুদ্ধ।

আধুনিক কালে মধুসূদন দত্ত অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে বাংলা কাব্যের জগতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। তাঁর প্রতিভার স্পর্শে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে নবশক্তির সঞ্চার হ'লো; তিনি যেদিন থেকে পয়ারের সংকীর্ণতা ঘুচিয়ে দিলেন সেদিন থেকেই ওই ছন্দে যথার্থ মহাকাব্য রচনা করা সম্ভবপর হ'লো। কিন্তু তাঁর অসামান্য শক্তির কাছেও এ ছন্দের প্রকৃত স্বরূপটি ধরা পড়ে নি। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সদ্যমুক্ত প্রবল শক্তির প্রচুর পরিচয় যেমন আছে তেম্‌নি ওছন্দ ব্যবহারের বহু ত্রুটি-বিচ্যুতির নিদর্শনও রয়েছে।

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে।

'মেঘনাদবধ' কাব্যের এই প্রথম পংক্তি-ক'টিতেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শক্তি এবং যতিস্থাপনের ত্রুটির প্রমাণ রয়েছে। মধুসূদন পংক্তির যে-কোনো স্থানে যতিস্থাপন কর্‌তে দ্বিধা করতেন না; অথচ অসমসংখ্যক অক্ষরের পর যতিস্থাপন এ ছন্দের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এ কথা পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে। তাঁর "আত্মবিলাপ" থেকে আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার,
পথিকে বাঁধিতে!

* * * *

মাৎসর্য্য-বিষদশন কামড়ে রে অনুক্ষণ,
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায়?

এই পংক্তি-ক'টিতে দু'জায়গায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সঙ্গতি নষ্ট হ'য়েছে। 'বাড়ায় মাত্র আঁধার' এবং 'মাৎসর্য্য-বিষদশন', এ দু'টি পদে এ ছন্দের একটি নিয়ম লঙ্ঘিত হ'য়েছে। এ ছন্দে কখনও তিন-দুই-তিন কিংবা দুই-তিন-তিন এই পর্য্যায়ে অক্ষর বিন্যাস করা সঙ্গত নয়, তাতে শ্রুতিকটুতা দোষ ঘটে। চার-চার কিংবা তিন-তিন-দুই—এই হচ্ছে এ ছন্দের অক্ষর-সমাবেশের বিধি। 'বাড়ায় শুধু আঁধার' কিংবা 'শুধু বাড়ায় আঁধার' কোনোটাই ভালো শোনায় না; কিন্তু 'বাড়ায় আঁধার শুধু' কিংবা 'আঁধার বাড়ায় শুধু' বল্‌লে বেশ ভালো শোনায়। তেমনি 'মাৎসর্য্য-বিষদশন' না ব'লে 'মাৎসর্য্যের বিষদন্ত' বল্‌লেই ঠিক্ শোনাত।

রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। তাঁর স্বাভাবিক ছন্দ'-বোধশক্তিই তাঁকে এ ছন্দের যথার্থ পথে চালিত করেছে। তাই তাঁর রচিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পূর্ব্বোক্ত দোষগুলো সযত্নে পরিত্যক্ত হ'য়েছে এবং তাঁরই

রচনা থেকে এ কথা সর্ব্বপ্রথমে বোঝা গেল যে, অক্ষরবৃত্ত আসলে একটি মিশ্রপ্রকৃতির ছন্দ। গোড়ায়, লিখিত হরফ বা অক্ষরের সংখ্যা গু'নে রচনা করার প্রথা থেকেই এ ছন্দের উৎপত্তি হ'য়েছে এবং বর্ত্তমানেও প্রধানত' অক্ষরসংখ্যা গু'নেই এ ছন্দ রচিত হয়। তাই এ ছন্দের নাম দেওয়া হয়েছে **অক্ষরবৃত্ত**। কিন্তু আসলে অক্ষরসংখ্যা এ ছন্দের মূলগত তত্ত্ব নয়; ধ্বনিবিচারহীন অক্ষরসংখ্যা কোনো ছন্দেরই মৌলিক তত্ত্ব হ'তে পারে না। গোড়া থেকেই অক্ষরসংখ্যা দেখে রচনা করার অভ্যাস থাকার ফলে এ ছন্দের স্বরূপ আবিষ্কৃত 'হ'তে এত বিলম্ব ঘটেছে। এ ছন্দের স্বরূপ এই যে, এর প্রত্যেক শব্দের শেষ অংশের (সিলেব্‌ল্‌-এর) প্রকৃতি মাত্রিক (quantitative) এবং বাকি অংশের প্রকৃতি স্বরসংখ্যক (syllabic)। একস্বর শব্দের ধ্বনিটিকে প্রান্তিক ব'লেই গ্রহণ কর্‌তে হয়; সুতরাং এপ্রকার শব্দের ধ্বনিটিও মাত্রিক প্রকৃতির। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

| ॥ | ॥ | | | |
প্রান্তর্‌-সীমায় ছায়াবটে

| | | | ॥ | | ॥
মৌনব্রত বউ্‌-কথা-কও্‌।

—হেমন্ত, নটরাজ

এখানে প্রত্যেক শব্দের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনি (যুগ্মদণ্ড চিহ্নযোগে নির্দ্দিষ্ট) দ্বিমাত্রিক রূপে উচ্চারিত ও গৃহীত হ'য়েছে। কিন্তু আদি বা মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি একমাত্রিক ব'লেই গণ্য হ'য়েছে। বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়— এখানে 'বউ' কথাটিতে দুই ধরা হয়েছে, 'বউ' না লিখে যদি 'বৌ' লেখা হ'ত, তা' হ'লে অক্ষরসংখ্যা কমে গেলেও ছন্দ ঠিক্‌ই থাকৃত এবং 'বৌ' কথাটিকেও দ্বিমাত্রিক ব'লেই গণ্য করতে হতো। অউ্‌-কার অর্থাৎ ঔ-কারের মতো যদি অও্‌-কারের জন্য একটি স্বতন্ত্র সঙ্কেতলিপি থাকৃত তা' হ'লেও 'কও' কথাটির দ্বিমাত্রিকতা অব্যাহতই থাকৃত। 'বউ-কথা-কও' কথাটিকে ছ'টি অক্ষরের সাহায্যেই লেখা হোক্‌, কিংবা চার অক্ষরের সাহায্যেই লেখা হোক্‌, এ কথাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সর্ব্বদাই 'ছয়' ব'লেই গৃহীত হবে; কারণ এখানে অউ্‌ এবং অও্‌ শব্দের প্রান্তে

আছে। পক্ষান্তরে 'মৌন'-কথাটিকে যদি 'মউ্ন্' রূপে লেখা হয় তা' হ'লেও এ শব্দটি দু' অক্ষরের শব্দ ব'লেই গণ্য হবে, কারণ এখানে অউ্-কার শব্দের প্রান্তে অবস্থিত নয়। এটিই হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূল তত্ত্ব। এ তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের রচনায় যেরূপ অব্যাহত আছে, তাঁর পূর্ববর্ত্তী অন্য কোনো কবির রচনাতেই তেমন অব্যাহত নেই। রবীন্দ্র-নাথের রচনায়ও এ নিয়মের দু'একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়; কিন্তু তাঁর রচিত বিপুল কাব্যসাহিত্যে সে দু'একটি ব্যতিক্রম অতি নগণ্য। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

কুর্‌চি, তোমার লাগি' পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
যে-ভ্রমর, শুনি নাকি তারে কবি করেছে ভৎ'সনা।
—কুর্‌চি, বনবাণী

জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে
হেথা আল্‌পনা আঁকে,
এ নিকুঞ্জ জানো আপনার।
—চামেলি-বিতান, বনবাণী

অক্ষরবৃত্তের নিয়ম অনুসারে 'কুর্‌চি' ও 'জ্যোৎস্না' শব্দে দুই এবং 'আল্‌পনা' শব্দে তিন অক্ষর ধরা উচিত। এ স্থলে তা' হয় নি ব'লে এ তিনটি শব্দকেই একটু টেনে বিলম্বিত উচ্চারণ কর্‌তে হচ্ছে। যদি লেখা হ'ত—

শুভ্র জ্যোৎস্না শাখা-ফাঁকে
হেথায় আল্‌পনা আঁকে···

তা' হ'লে খারাপ শোনাত না এবং ধ্বনিটিও একটু দৃঢ় হ'ত। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

উদয়-দিক্‌ প্রান্ত-তলে নেমে এসে
—পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী

এখানে 'দিক্‌প্রান্ত'-শব্দে তিন 'অক্ষর' ধরা হ'য়েছে। কিন্তু 'দিক্‌' কথাটি অন্য কথার সঙ্গে সমাসবদ্ধ হ'লেও একটি স্বতন্ত্র শব্দ এবং এর অন্তরে একটি যুগ্মধ্বনি রয়েছে। সুতরাং অক্ষরবৃত্তের নিয়ম অনুসারে

এই একস্বর শব্দটিকে দ্বিমাত্রিক ব'লেই ধরা উচিত এবং তা' হ'লে 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটিতে তিন না ধ'রে চার ধরাই সঙ্গত। সুতরাং

উদয়ের দিক্‌প্রান্ত-তলে নেমে এসে

এরূপ লিখলেই অক্ষরবৃত্তের নিয়ম অব্যাহত থাকৃত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই অন্যত্র 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটিতে তিন না ধ'রে চার ধরেছেন। যথা—

চ'লেছে উজান ঠেলি' তরণী তোমার,
দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার।

—নববধূ, মহুয়া

দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্রকলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা বলা।

—প্রত্যাগত, মহুয়া

অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও যে মাত্রিক গণনারীতির স্থান আছে তার প্রমাণ এই যে, উদ্ধৃত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে যদি 'ওই' না লিখে 'ঐ' লেখা হ'ত তা' হ'লে 'অক্ষর'-সংখ্যা ক'মে যেত বটে, কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দ অব্যাহতই থাকৃত। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে

—পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী

ঐ নামে একদিন ধন্য হ'ল দেশ দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।

—বুদ্ধদেবের প্রতি, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

উদ্ধৃত পংক্তি দু'টিতে অক্ষরসংখ্যা কম আছে; কিন্তু "ঐ" শব্দে দু'মাত্রা রয়েছে ব'লে ছন্দ অক্ষুণ্ণই আছে। অক্ষরবৃত্তের মাত্রিক প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি ('বিচিত্রা' অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮); সুতরাং এস্থলে এ বিষয় পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত, ছন্দের এ দু'টি ধারাই বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দও তাঁরই হাতে পূর্ণতা লাভ করেছে। বাংলা ভাষার ধ্বনি, উচ্চারণ-রীতি ও ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর দৃষ্টি নিয়ে রচনা

কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়ে তিনি বাংলা ছন্দে মাত্রিক (quantitative), স্বরসংখ্যক (syllabic) ও মিশ্র (অক্ষরবৃত্ত)—এই তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সমর্থ হ'য়েছেন। ধ্বনির একক বা unit নির্ণয়ের তিনটি স্বতন্ত্র প্রণালী থেকেই ছন্দের এই তিনটি ধারার উৎপত্তি হ'য়েছে। কিন্তু কয়েকটি unit-এর বিভিন্ন সমাবেশের ফলে যে ছন্দপর্ব্ব গঠিত হয় তার উপরেই ছন্দের ভিতরকার গঠন-কৌশল নির্ভর করে। ছন্দপর্ব্ব নির্ম্মাণ ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও কৌশল অপরিসীম। ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহের দুইটি যতির মধ্যবর্ত্তী যে-অংশ তারই নাম পর্ব্ব (foot)। ছন্দে যতিস্থাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি থেকে বিভিন্ন প্রকারের পর্ব্বের উৎপত্তি হয়। রবীন্দ্রনাথ যে কত বিচিত্র উপায়ে ছন্দে যতিস্থাপন ও পর্ব্বগঠন করেছেন তা' সত্যই বিস্ময়কর। তিনি যে শুধু নব নব বিচিত্র পর্ব্ব গঠনপদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন তা' নয়; তিনি বহু প্রচলিত ছন্দপর্ব্বকে পরিবর্ত্তিত এবং সুসঙ্গত করেছেন, এবং স্থল বিশেষে পরিত্যাগও করেছেন। এ বিষয়ে সংক্ষেপে দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

প্রথমেই মাত্রাবৃত্তের কথা। প্রতি পর্ব্বে চার, পাঁচ, ছয় কিংবা সাত মাত্রা ক'রে থাকৃতে পারে; এই হিসেবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। চতুর্মাত্রিক ছন্দ সম্বন্ধে এস্থানে আলোচনা করব না। পঞ্চমাত্রিক ছন্দ গীতগোবিন্দে ব্যবহৃত হ'য়েছে; কিন্তু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পঞ্চমাত্রিক ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে ব'লে মনে হয় না। জয়দেবের "অহহকলয়ামি বলয়াদি-মণিভূষণং" কিংবা "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী" ইত্যাদি ছন্দের অনুসরণ ক'রেই রবীন্দ্রনাথ বাংলায় পঞ্চমাত্রিক ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। এখন পঞ্চমাত্রিক ছন্দ আমাদের কবিদের একটি অতি প্রিয় ছন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এটি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ দান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর "মদনভস্মের পূর্ব্বে," "মদনভস্মের পরে" প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে ষণ্মাত্রিক ছন্দ। সংস্কৃত সাহিত্যে এ ছন্দের অনুরূপ কোনো ছন্দ আছে ব'লে মনে হয় না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ষণ্মাত্রিকের দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

ঈষৎহসিত বদনচন্দ
তরুণী-নয়ন নয়ন-কন্দ।
বিম্ব-অধরে মুরলি ঘুরলী
ত্রিভুবন-মনোমোহিনী।
—গোবিন্দদাস

কিন্তু প্রাচীন কবিরা কেউ এ ছন্দের যথার্থ মর্য্যাদা উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং এ ছন্দের প্রকৃত বাংলা আকৃতি কি হবে তা' নিঃসংশয়ে স্থির করতে পারেন নি; অনেক স্থলেই তাঁরা যুক্তবর্ণের বাহুল্য এবং সংস্কৃত রীতিতে হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রেই এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে এ ছন্দের স্বরূপ ও মর্য্যাদা উপলব্ধি ক'রে একে বাংলার উচ্চারণ-রীতিতে রূপান্তরিত ক'রে বাংলা ছন্দভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করেছেন। ষণ্মাত্রিক ছন্দ যে বাংলা সাহিত্যের কত বড়ো সম্পদ তা' সাহিত্যানুরাগী মাত্রই জানেন। রবীন্দ্রনাথ যদি এ ছন্দের প্রবর্ত্তন না করতেন তবে বাংলা কাব্যজগতের একটি বৃহৎ মহাদেশই অনাবিষ্কৃত র'য়ে যেত। বর্ত্তমানে বাংলা গীতি-কবিতা, গাথা প্রভৃতি বহুধরণের অসংখ্য কবিতারই বাহন এই ষণ্মাত্রিক ছন্দ। দৃষ্টান্ত দেওয়া বাহুল্য, শুধু এটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, পূর্ব্বোক্ত "মানসী"র "ভুল-ভাঙা" কবিতাটিই বাংলার প্রথম খাঁটি ষণ্মাত্রিক ছন্দের কবিতা।

সপ্তমাত্রিক ছন্দও ষণ্মাত্রিকেরই মতো সংস্কৃত সাহিত্যে অজ্ঞাত এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রবর্ত্তিত। দু'টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

নন্দ-নন্দন-চন্দ চন্দন-গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥

* * * * *

কঞ্জ-লোচন কলুষ-মোচন শ্রবণ-রোচন-ভাষ।
অমল-কোমল-চরণ-কিশলয়-নিলয়-গোবিন্দদাস॥
—গোবিন্দদাস

কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল,
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে।

বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী
করিলা রাজধানী অশোকমূলে।
—অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান, অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র

প্রথম দৃষ্টান্তটি সংস্কৃত পদ্ধতিতে রচিত; বাংলার উচ্চারণ রীতি এখানে পীড়িত হয়েছে এবং একস্থলে ('গোবিন্দদাস') ছন্দে ত্রুটি ঘটেছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে বাংলার উচ্চারণ-রীতি বজায় আছে; কিন্তু ছন্দ নিখুঁত নয় এবং বিশেষভাবে একটি শব্দের ('বসন্ত') দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এ ছন্দটি অক্ষর গুনেই রচিত হয়েছে, ধ্বনির মাত্রা-বিচার স্বীকৃত হয় নি। রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে এ ছন্দকে নিখুঁত এবং খাঁটি বাংলা পদ্ধতিতে সাহিত্যে প্রবর্ত্তন করেছেন।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'
জগৎ আসি' সেথা করিছে কোলাকুলি!
—প্রভাত-উৎসব, প্রভাত-সঙ্গীত

"প্রভাত-সঙ্গীতে"র উদ্ধৃত পংক্তি দু'টি এ ছন্দের একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত। কিন্তু তখনও রবীন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন নি; তাই তিনি ধ্বনিসঙ্গতি রক্ষার জন্যে এই কবিতাটিতে সযত্নে যুক্তাক্ষরকে বর্জ্জন ক'রে চলেছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এ ছন্দে যুগ্মধ্বনি ব্যবহারের দ্বারা অতি চমৎকার কবিতা রচিত হয়েছে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বিভিন্ন প্রকারের পর্ব্ব গঠন ক'রেই রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত হন নি। নানাপ্রকারের পর্ব্বের একত্র সমাবেশের দ্বারাও তিনি ছন্দে বহু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণ দিচ্ছি।—

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী,
বিরহ-তপোবনে আনমনে উদাসী।
—বিরহানন্দ, মানসী

এস্থলে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, অগ্রজ কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-কাব্যের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর কতখানি পড়েছে তার পরিচয় তিনি 'জীবনস্মৃতি'তেই বিশেষভাবে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছন্দের আলোচনায় 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-কাব্যের ছন্দের আলোচনা করাও বিশেষ প্রয়োজন

মনে করি। এস্থলে সে-কার্য্যে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি শুধু উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির সঙ্গে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিকে মিলিয়ে দেখ্‌লেই এ কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে।—

দু'-সখী, এইরূপে, চুপে চুপে কহিল কত।
শোভা, কবির সনে, আলাপনে, হইল রত॥
কখনো চড়ে গিরি, ধীরি ধীরি; কখনো সবে
নদীর ধারে ধারে, পদ চারে, নবোৎসবে॥

—১২৫-২৬, দ্বিতীয় সর্গ, স্বপ্নপ্রয়াণ

রবীন্দ্রনাথের পর্ব্ব-সমাবেশের আরেকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।—

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি',
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি স্বর সাতটি যেন পোষা পাখী।

—গানভঙ্গ, সোনার তরী

'কথা'র "মস্তকবিক্রয়" কবিতাটিও এই ছন্দেই রচিত; শুধু একটি অতিরিক্ত মিলের জন্যই অধিকতর শ্রুতিমধুর হয়েছে।

স্বরবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত' চতুঃস্বর পর্ব্বকেই অবলম্বন করেছেন। দ্বিস্বর বা ত্রিস্বরের পর্ব্ব তিনি রচনা করেন নি, কিন্তু ত্রিস্বর ও চতুঃস্বরের যোগে তিনি পর্ব্বগঠনের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। যথা—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।

—১৮, গীতালি

অক্ষরবৃত্তের পর্ব্বগঠন সম্বন্ধে এ তত্ত্বটি তাঁরই রচনায় প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে যে, ও ছন্দ কোথাও অসমসংখ্যক অক্ষরকে স্বীকার করে না। সুতরাং প্রাচীন কবিরা যে-সব ছন্দোবন্ধে তিন, পাঁচ, সাত প্রভৃতি অসমসংখ্যক অক্ষরের ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি সে-সব ছন্দোবন্ধকে অক্ষরবৃত্ত থেকে মাত্রাবৃত্তের এবং স্থল বিশেষে স্বরবৃত্তের এলাকায় স্থানান্তরিত করেছেন। তাঁরই রচনা থেকে একথা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দগঠনের মূল উপাদান চার অক্ষরের পর্ব্ব, অক্ষরবৃত্ত

আসলে চতুরক্ষর পর্ব্বেরই ছন্দ। কিন্তু বহুস্থলে দু'টি পর্ব্বের সংযোগে আট অক্ষরের একেকটি যুক্তপর্ব্ব এ ছন্দকে একটি বিশেষ গাম্ভীর্য্য দান করে। আবার চার অক্ষরের একটি পূর্ণ পর্ব্ব এবং দু'অক্ষরের একটি অর্দ্ধপর্ব্বের সংযোগেও অনেক সময় একটি যুক্তপর্ব্বের উৎপত্তি হয়; কিন্তু এ ধরণের খণ্ডিত যুক্তপর্ব্ব সচরাচর পংক্তির শেষ প্রান্ত ব্যতীত অন্যত্র স্থাপিত হয় না। চার অক্ষরের পূর্ণ পর্ব্ব আট অক্ষরের যুক্তপর্ব্ব এবং ছ'অক্ষরের সার্দ্ধপর্ব্ব, এ তিনটি উপাদানেই সমস্ত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচিত হয়েছে। কতকটা অস্পষ্টভাবে হ'লেও মধুসূদনই এ তত্ত্বটি প্রথম অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি পর্ব্বগঠন ও যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যের দ্বারা বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন কর্‌তে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এ তত্ত্বটি তিনি কখনও স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেন নি, তাই মেঘনাদবধ-কাব্যে ছন্দের এমন প্রবল গতিবেগ থাকা সত্ত্বেও বহুস্থানেই ছন্দপতন ঘটা সম্ভবপর হয়েছে এবং সেজন্যই তাঁর রচনায় "বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে" ইত্যাদি অদ্ভুত রকমের ছন্দবিকৃতির সাক্ষাৎ পাই। যা হোক্, এ কথা মনে রাখা উচিত যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দেও অমিত্রাক্ষরতাই আসল কথা নয়; বাংলা পয়ার ছন্দে মিলের অভাব ঘটানোই মধুসূদনের কৃতিত্ব নয়। পয়ারের সংকীর্ণতা অর্থাৎ ও ছন্দে পর্ব্বগঠন ও যতিস্থাপনে যে একটা একঘেয়ে ভাব ছিল, সেটাকে ঘুচিয়ে দিয়ে পর্ব্বগঠন ও যতিস্থাপনে বৈচিত্র্য ঘটিয়ে কবির ভাবকে দু'টি মাত্র পংক্তির গণ্ডী থেকে মুক্তি দিয়ে বহু পংক্তির মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়াতেই মধুসূদনের কৃতিত্ব। পয়ার ছন্দের দুর্ব্বলতাই এই যে, ও ছন্দে প্রতি পংক্তির অন্তে পূর্ণ যতি স্থাপন কর্‌তেই হবে এবং দু'টি মাত্র পংক্তির মধ্যেই একটি ভাবকে সমাপ্ত করা চাই। তাই মধুসূদনের বিদ্রোহী মন পয়ারের এই সীমাঘেরা গণ্ডীর বিরুদ্ধে উদ্যত হ'য়ে কবির ভাবকে পংক্তির পর পংক্তিতে ছড়িয়ে দিল; তাঁর প্রবর্ত্তিত ছন্দে পংক্তি যেখানে শেষ হয়, ভাব ও ছন্দের প্রবাহ সেখানেই বিরত হয় না। ভাব ও ছন্দের এই প্রবহমানতা (enjambement)-ই মধুসূদনের বিশেষ দান। 'মেঘনাদবধ'-এর বিশেষত্বই হচ্ছে ওই (enjambement) বা

প্রবহমানতা; অমিত্রাক্ষরতা ওই ছন্দের অচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। সুতরাং 'মেঘনাদবধ'-এর ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বল্‌লে সব কথা, এমন-কি আসল কথাটিই, বলা হয় না। Blank verse-এর বাংলা নাম 'অমিত্রাক্ষর' হ'তে পারে; কিন্তু অমিত্রাক্ষরতা blank verse-এরও মূল কথা নয়। সুতরাং মধুসূদনের প্রবর্ত্তিত ছন্দের যদি কোনো যথার্থ নাম দিতে হয় তবে তাকে বলা উচিত প্রবহমান পয়ার ছন্দ। এ ছন্দ অ-মিলও হ'তে পারে, স-মিলও হ'তে পারে; মিলের অভাবে কিংবা সদ্ভাবে এর আসল প্রকৃতিতে কোনো পার্থক্য ঘটে না।

মধুসূদনের প্রবর্ত্তিত ছন্দ সম্বন্ধে এতটা বিস্তৃত আলোচনা করার উদ্দেশ্য আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, ও ছন্দও রবীন্দ্রনাথের হাতে এসেই পূর্ণতা লাভ করেছে। কি ভাবে করেছে সে-কথা আলোচনা করার বিশেষ সার্থকতা আছে। মধুসূদনের ছন্দের পূর্ণ পরিচয়জ্ঞাপক নাম হচ্ছে—অমিল প্রবহমান পয়ার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখ্‌লেন যে, মিলের অভাবটাই ও ছন্দের আসল তত্ত্ব নয়; বরং অন্যান্য সকল ছন্দেরই মতো ও ছন্দেও মিল থাকার একটা সার্থকতা আছে। মিল ছন্দের অপরিহার্য্য অঙ্গ না হ'লেও ছন্দের একটি অতি প্রধান অঙ্গ, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জ্জন, রাজা ও রাণী প্রভৃতি নাট্য-কাব্যে অমিল প্রবহমান পয়ার ছন্দই ব্যবহার করেছেন, কারণ নাট্যকাব্যে মিল না থাকার সার্থকতা আছে। কিন্তু অন্য সর্ব্বত্রই তিনি ওই ছন্দে সর্ব্বদাই মিল রক্ষা করেন। তাঁর স-মিল প্রবহমান পয়ারের চমৎকার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর 'মেঘদূত', 'যেতে নাহি দিব', 'মানস-সুন্দরী', 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রবহমান পয়ার সম্বন্ধে এ স্থলে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যে বহুকাল যাবৎ চোদ্দ অক্ষরের পয়ারই চ'লে আস্‌ছে। কিন্তু পয়ারকে শুধু চোদ্দ অক্ষরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে হবে, এমন অপরিহার্য্য কোনো বিধান তো নেই। তাই ষোল অক্ষরের পয়ার রচনার প্রয়াস অনেকেই করেছেন; রবীন্দ্রনাথও এক সময়ে ষোল অক্ষরের পয়ার রচনা করেছেন। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আরেকটি স্বভাব হচ্ছে এই যে,

এই ছন্দ সর্ব্বদাই প্রতি পংক্তির শেষ প্রান্তে একটি ক'রে ছ' অক্ষরের সার্দ্ধপর্ব্বের অপেক্ষা রাখে, তাই চোদ্দর স্থানে ষোল অক্ষরের পয়ার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সুবিধাজনক হ'লো না। রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তীকালে ষোল অক্ষরের পয়ার রচনা করেন নি এবং আজকালকার কবিরাও তা' করেন না। কিন্তু পয়ার ছন্দে যদি দ্বিতীয় পর্ব্বের পরেই চার অক্ষরের আরেকটি পর্ব্ব যোগ ক'রে দেওয়া যায় তবে আঠারো অক্ষরের একটি চমৎকার নূতন ধরণের পয়ারের উৎপত্তি হয়। এ ছন্দের নাম দেওয়া যায় বর্দ্ধিত পয়ার। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যেই এই বর্দ্ধিত পয়ার ছন্দের প্রথম দৃষ্টান্ত পাই। তার পর রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে এ ছন্দ যে কি শক্তি ও সৌষ্ঠব অর্জ্জন করেছে তা' কারও অজানা নেই। এখন এ ছন্দটি বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর একটি অতি প্রিয় বাহন-রূপেই গৃহীত হয়েছে। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দটিকেও শুধু দু'পংক্তির মধ্যেই আবদ্ধ ক'রে রাখেন নি; বহু পংক্তির মধ্যে একে মুক্ত ও প্রবহমান করেছেন। এ ছন্দের পরিসর বেশি, তাই এ ছন্দের প্রবাহধারা মধুসূদনের পয়ারের চেয়ে বিপুলতর ও প্রবলতর আকার ধারণ করেছে। এ ছন্দের কোনো অ-মিল দৃষ্টান্ত আমার চোখে পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের স-মিল প্রবহমান বর্দ্ধিত পয়ারের দৃষ্টান্ত রূপে তাঁর "সমুদ্রের প্রতি", "এবার ফিরাও মোরে" প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে কৃত্রিম বন্ধন থেকে এতখানি মুক্তি দিয়েও রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত হ'তে পারেন নি। সমস্ত ছন্দেই বন্ধনের একটা সার্থকতা আছে, কিন্তু মুক্তিরও একটা সার্থকতা আছে। তাই তিনি ছন্দকে অধিকতর মুক্তির পথে চালিয়ে নিতে প্রয়াসী হ'লেন। সাধারণ পয়ার বা বর্দ্ধিত পয়ারের প্রতি পংক্তিতে অক্ষরসংখ্যার যে-বন্ধনটি রয়েছে তার সার্থকতা কোথায়? ছন্দ যখন প্রতি পংক্তির অন্তস্থিত বিরাম-যতিটিকে স্বীকার ক'রে চলে তখন ওই অক্ষরসংখ্যার সীমাবন্ধনটির প্রয়োজনীয়তা থাকে। কিন্তু ছন্দের ধারা যখন অক্ষরসংখ্যা ও পংক্তির অন্তস্থিত বিরামের তীরকে অতিক্রম ক'রে পংক্তির পর পংক্তিকে প্লাবিত ক'রে প্রবাহিত হ'তে থাকে, তখনও প্রতি ছত্রকে একটি নির্দ্দিষ্ট

অক্ষরসংখ্যার গণ্ডীতে আবদ্ধ ক'রে রাখার কোনো আবশ্যকতাই থাকে না। এ তত্ত্বটি অনুভব ক'রেই রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান ছন্দে পংক্তি-নির্দ্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যার গণ্ডী দৃঢ় হস্তে ভেঙে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই চরম মুক্তি ঘটেছিল 'সবুজ পত্র' বা 'বলাকা'র যুগে। বলাকায় যে মুক্ত ছন্দের সন্ধান পাই তাতে কৃত্রিম বন্ধনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে। সুতরাং এ ছন্দের নাম দেওয়া যেতে পারে **মুক্তক** ছন্দ। যে-ছন্দকে আমরা vers libre বা free verse নামে জানি তাকেই 'মুক্তক' নামে অভিহিত ক'রলুম। কিন্তু মনে রাখ্‌তে হবে, কোনো ছন্দের পক্ষেই সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়; কারণ বন্ধনই ছন্দের প্রাণ; সকল বন্ধনকে অতিক্রম করলে ছন্দ আর ছন্দই থাক্‌বে না—সে হবে তার পক্ষে আত্মঘাত। কিন্তু ছন্দের পক্ষে সকল বন্ধনেরই মর্য্যাদা সমান নয়। যে-বন্ধন ছন্দের অপরিহার্য্য সে বন্ধনই হচ্ছে ছন্দের প্রাণ বা মূলতত্ত্ব; পর্ব্বগঠন-পদ্ধতি ও যতিস্থাপন-রীতি এ বন্ধনের অন্তর্গত। আর যে-বন্ধন ছন্দের পক্ষে অপরিহার্য্য নয় সে-বন্ধন স্থল বিশেষে ধ্বনিপ্রবাহের বাধা হ'লেও অধিকাংশ স্থলেই তা' ছন্দের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে; পংক্তি ও শ্লোক নির্ম্মাণ পদ্ধতি ও মিলস্থাপনের রীতি এ শ্রেণীর বন্ধনের অন্তর্গত। যা হোক্, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, মুক্তক ছন্দে দ্বিতীয় প্রকার বন্ধন থেকেই মুক্তিলাভ ঘটে, প্রথম প্রকারের বন্ধন থেকে নয়। মুক্তক ছন্দকেও পর্ব্বগঠন ও যতিস্থাপন সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মেনে চল্‌তে হয়; কিন্তু পংক্তি ও শ্লোক নির্ম্মাণ এবং মিলস্থাপন বিষয়ে এ ছন্দের প্রচুর স্বাধীনতা রয়েছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দগঠনের মূলতত্ত্বগুলিকে এ ছন্দে রক্ষা করতে হয়, অন্য বিষয়ে এর গতিপ্রকৃতি বিধিবদ্ধ নয়। মুক্তক ছন্দ সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে; কিন্তু আমাদের পক্ষে এ স্থলে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়।

গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকগুলিতে বহুস্থলে একপ্রকার মুক্ত ছন্দের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে, গিরিশচন্দ্রের ছন্দ রবীন্দ্রনাথের মুক্তক ছন্দের সঙ্গে সমজাতীয় নয়। গিরিশচন্দ্র অভিনয়-সৌকর্য্যের জন্য সাধারণ অমিত্রাক্ষর ছন্দকেই ভেঙে অসমপংক্তিতে বিন্যস্ত

করেছেন মাত্র। তাতে চোদ্দর নিয়মকে অতিক্রম করা হয়েছে বটে; কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দের যে মূলগত রীতি তাকেও অনেক সময় লঙ্ঘন করা হয়েছে। যা হোক্, এ উভয় ছন্দের মধ্যে তুলনা ঘটাবার উপযুক্ত স্থান এটা নয়।

অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তক' ছন্দটি ইউরোপ থেকে এদেশে আমদানি করেছেন। এ কথা সত্য হ'তে পারে। কিন্তু তাতে তাঁর ছন্দ-প্রতিভার কিছুমাত্র লাঘব ঘটে না। কারণ বিদেশী free verse এবং আমাদের 'মুক্তক' ছন্দ বাইরের আকৃতিতে সদৃশ হ'লেও, ও-দু'ছন্দের মৌলিক প্রকৃতি কখনও এক নয়। বাংলা ভাষার ধ্বনি ও উচ্চারণ-পদ্ধতি অব্যাহত রেখে ছন্দকে মুক্তিদান করার যে কৃতিত্ব, ইউরোপের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে থাক্‌লেও রবীন্দ্রনাথের সে কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণই থাক্‌বে। বিলিত blank verse-এর অনুসরণ ক'রে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করায় মধুসূদনের কবিপ্রতিভা ম্লান হয়েছে, না উজ্জ্বলতর হয়েছে?

কিন্তু এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, 'বলাকা'র যুগের বহু পূর্ব্ব থেকেই মুক্ত ছন্দ রচনার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের অন্তরে দেখা দিয়েছিল। তাঁর কবিজীবনের সূচনাতেই দেখ্‌তে পাই ছন্দের বাধাগুলোকে অতিক্রম করার একটা দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাত-সঙ্গীত' এবং 'ছবি ও গান'-এ তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। বস্তুত' নব নব ছন্দ রচনা করা ও যুগপৎ ছন্দের বাধাকে লঙ্ঘন ক'রে যাবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আজও রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে সমানভাবে জাগরূক ও সক্রিয় আছে। যা' হোক্, এ-কথা বলা প্রয়োজন যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায় মুক্তক ছন্দও প্রবহমান, মুক্তক ছন্দেও ধ্বনির প্রবাহ পংক্তির পর পংক্তিতে ব'য়ে চলে। প্রবহমান পয়ারে যেমন মিল না-দেওয়াটাই অপরিহার্য্য নয়, প্রবহমান মুক্তকেও তেমনি মিল দেওয়াটাই অত্যাজ্য নয়। অ-মিল মুক্তক রচনা করাও সম্ভব, যদিও তাতে মিলের মাধুর্য্যের অভাবটা শ্রুতিকে কতকটা পীড়া দেয়। Collins-এর Ode to Evening নামক কবিতাটি অ-মিল মুক্তক ছন্দে রচিত। আর "মানসী"র যুগে রচিত রবীন্দ্রনাথের "নিষ্ফল কামনা" নামক চমৎকার

কবিতাটিও বাংলায় অ-মিল মুক্তক ছন্দের একটি সুন্দর নিদর্শন। এ কবিতাটিকে 'বলাকা'র যুগের স-মিল মুক্তক ছন্দের অগ্রদূত মনে করা যেতে পারে।

অক্ষরবৃত্তে যত রকম ছন্দোবন্ধ রচনা করা যায় স্বরবৃত্তেও সেস মস্তকেই স্বচ্ছন্দে চালানো যায়, এ সত্যটিও রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেই প্রতিপন্ন হয়েছে। অক্ষরবৃত্তের সাধারণ পয়ার, বর্দ্ধিত পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি বহু ছন্দোবন্ধকেই তিনি চমৎকাররূপে স্বরবৃত্তে রূপান্তরিত করেছেন। সুতরাং আশা করা যায়, "বসুন্ধরা", "এবার ফিরাও মোরে" প্রভৃতির ন্যায় উচ্চ অঙ্গের প্রবহমান কবিতাও স্বরবৃত্ত ছন্দে রচনা করা সম্ভব। কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রবহমান কবিতা বাংলা সাহিত্যে খুব কমই রচিত হয়েছে। Paradise Lost প্রভৃতির ন্যায় মহাকাব্য যখন ইংরেজি ছন্দে রচনা করা সম্ভব হয়েছে তখন বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দকেও ও রকম মহাকাব্য জাতীয় কবিতার বাহন করা অসম্ভব নয়; কারণ ইংরেজি ছন্দ ও বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে, এ তথ্যটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই আমাদের জানিয়েছেন। স্বরবৃত্ত ছন্দে ওই ধরণের কাব্য রচনার বাধা কবে দূর হবে অর্থাৎ স্বরবৃত্তকে কবে মেঘনাদের মতো কাব্যের বাহন করা সম্ভব হবে জানিনে। কিন্তু তার সূত্রপাতও রবীন্দ্রনাথই করেছেন। তাঁর রচনায় একটি মাত্র স্বরবৃত্তে রচিত প্রবহমান পয়ারের দৃষ্টান্ত পেয়েছি। পূরবী-গ্রন্থের "পূরবী" নামক প্রথম কবিতাটি ওরকম প্রবহমান স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত হয়েছে। কিন্তু তার পরে তিনি প্রবহমান স্বরবৃত্তে আর কোনো কবিতা রচনা করেছেন ব'লে মনে হয় না।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রবহমান কবিতার দৃষ্টান্ত খুব বিরল হ'লেও, ও ছন্দে যে খুব চমৎকার মুক্তক ছন্দ রচনা করা যায় তাও রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন। 'সবুজপত্রের' যুগেই তিনি এ তত্ত্বটিকে উদ্ঘাটিত করেন। 'পলাতকা'র কবিতাগুলিতেই এ ছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তির চরম প্রকাশ হয়েছে। এ ছন্দের গঠনপ্রণালী মুক্তক অক্ষরবৃত্তের মতোই; শুধু স্বরবৃত্তের বিশেষ রীতিগুলিকে মেনে চল্‌তে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মাত্রাবৃত্তকেও অক্ষরবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তের মতো মুক্তকে পরিণত করা যায় কি না এ বিষয়ে সংশয় রয়েছে, কারণ মাত্রাবৃত্তের সুরপ্রবণতাই ও ছন্দের দৃঢ় গতিভঙ্গীর একটি প্রবল অন্তরায়। কিন্তু পঞ্চমাত্রিক ছন্দে সুরের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত কম এবং এ ছন্দটিই চতুঃস্বর-পর্ব্বিক ছন্দের নিকটতম মাত্রিক প্রতিরূপ। তাই পঞ্চমাত্রিক ছন্দে মুক্তক ছন্দ রচনা করা একেবারে অসম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের "সাগরিকা" কবিতাটি (মহুয়া) কতকটা মুক্তক ছন্দেই রচিত হয়েছে। এ কবিতাটিতে পংক্তির দৈর্ঘ্য বিষয়ে কোনো স্থিরতা নেই; এ বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতাই রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়—এই কবিতাটির ভাব অধিকাংশ স্থলেই দু'টি পংক্তির মধ্যেই আবদ্ধ আছে, বহু পংক্তিতে প্রবাহিত হয়ে যায় নি। সুতরাং এ ছন্দটিকেও পূর্ণ বা প্রবহমান মুক্তক বলা যায় না।

এ স্থলে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাঁর ছন্দোবন্ধের অজস্র বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আরও বহু বক্তব্য র'য়ে গেছে। বাংলা ছন্দে তিনি যে কত অসংখ্য ভঙ্গীতে পর্ব্ববন্ধ (বা পংক্তিগঠন) ও শ্লোকবন্ধ (বা stanza) রচনার রীতি প্রবর্ত্তন করেছেন, বাংলা ভাষার নিস্তরঙ্গ ছন্দে অদ্ভুত ধ্বনিতরঙ্গ (rhythm) ও সুরমাধুর্য্য (melody) জাগিয়ে তুলেছেন, সে-সমস্ত কথার বিশদ আলোচনা না করলে বাংলা ছন্দে তাঁর দানের পরিমাণ যে কত বিচিত্র ও অফুরন্ত তার ধারণা করা যাবে না। এমন-কি ছন্দপংক্তির অন্তিম প্রান্তে' মিল দেবার মামুলি একঘেয়ে পদ্ধতিতেও তিনি যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছেন এবং তার স্থলে বাংলা ছন্দে যে মূর্চ্ছনা বা cadence উৎপাদনের ও মিল (rhyme) ঘটাবার দ্বিদল, ত্রিদল (dissyllabic, trisyllabic) প্রভৃতি পদ্ধতি দেখিয়েছেন তার মূল্যও কিছুমাত্র কম নয়। তা' ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ছন্দপ্রসঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরেজি ছন্দ এবং উচ্চারণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে আপেক্ষিক আলোচনা, বিশেষত' তাঁর ছন্দের সঙ্গে সঙ্গীত ও সুরতালের ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে আলোচনা করার বিশেষ সার্থকতা আছে। কিন্তু এ প্রবন্ধে সে-সমস্ত প্রসঙ্গের উত্থাপন করাও সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার প্রতি যুগপৎ দৃষ্টিস্থাপন করলে একথা ভেবে বিস্মিত হ'তে হয়, কত বিচিত্র ও অবিশ্রান্ত তাঁর ভাব ও রূপসৃষ্টির প্রবাহ এবং কবিজীবনের সেই প্রথম অভ্যুদয় থেকে আজ পর্য্যন্ত সমগ্রজীবন-ব্যাপী নব নব ছন্দ, সঙ্গীত, ভাব ও রূপ রচনার সাধনা তাঁর কত বিপুল, কত অজস্র ও অবিরাম। তাঁর এই সমগ্র জীবনব্যাপী অফুরন্ত রূপসৃজনের মহোৎসবের আনন্দে যোগ দেবার জন্যে আজ আমরা তাঁরই ছন্দে ও ভাষায় সকলকে সাদর আমন্ত্রণ করছি।—

উদয়-রবি যে রাঙা রঙ্ রাঙায়ে
পূর্ব্বাচলে দিয়েছে ঘুম ভাঙায়ে—
অস্তরবি সে রাঙা রসে রসিল,
চির-প্রাণের বিজয়-বাণী ঘোষিল,
অরুণ-বীণা যে সুর দিল রণিয়া
সন্ধ্যাকালে সে সুর উঠে ঘনিয়া,
নীরব নিশীথিনীর বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনিয়া।
আয় রে তোরা আয় রে তোরা আয় রে
বাঁধন-হারা রঙের ধারা ঐ-যে ব'হে যায়রে॥

বিশ্ব-ভারতীর পূর্ব্বাভাষ

—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

তারিখ হিসাবে দেখ্‌লে ১৩২৮ সালে (১৯২১ খৃষ্টাব্দে) ৭ই পৌষ উৎসবের সময়ে বিশ্ব-ভারতী স্থাপিত হয়। কিন্তু এর সূত্রপাত তার অনেক আগে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

ঠাকুর পরিবারের অতুল ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাসের আয়োজনের মধ্যে একুশ বৎসরের যুবক দেবেন্দ্রনাথের সাম্‌নে কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল উপনিষদের একখানি ছেঁড়া পাতায় একটী শ্লোক :—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ কস্যসিদ্ধনং।

মনে প'ড়ে গেল রামমোহনের কথা। শৈশবকাল অবধি রামমোহনের সঙ্গে তাঁর সংশ্রব। রামমোহনের প্রশান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি তাঁর মনে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হ'য়ে আছে। অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে রামমোহন সম্পাদিত ইশোপনিষদের একটী শ্লোক দেবেন্দ্রনাথকে পথ দেখিয়ে দিলে।

পাঁচ বৎসর পরে, ১২৫০ সালে (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) ৭ই পৌষ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বোলপুর ষ্টেশন থেকে রায়পুরের পথে এক জারগায় বিস্তৃত প্রান্তর, 'যতদুর দেখা যায় শুধু তৃণশূন্য তরঙ্গায়িত রক্তবর্ণ মরু-প্রান্তরের অবাধ প্রসার আর উপরে বর্ণচ্ছটা-বিচিত্র অসীম আকাশ'। মাঠের মাঝখানে শুধু দুইটী ছাতিম-গাছ। ১২৬৮ সালে (১৮৬১ খৃষ্টাব্দে) রায়পুরের সিংহ পরিবারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বোলপুরে গিয়ে জায়গাটী তাঁর বড়ো ভালো লাগ্‌লো। এখানে তাঁর নির্জ্জন সাধনার উপযোগী একটী বাগান ও বাড়ী করার জন্য ১২৬৯ সালে জমি নেওয়া হয়। ছাতিম-গাছের তলায় তাঁর সাধনার স্থানে বেদীর উপর এখন লেখা আছে :—

"তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ; আত্মার শান্তি।"

এই শান্তিনিকেতনের আশ্রমের ব্যবস্থা-পত্রে আছে যে, এই আশ্রমে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে যে কোনো দেশের লোক ঈশ্বরোপাসনা করতে পারবেন ; এখানে সকলের অবাধ প্রবেশ।

মহর্ষির দীক্ষা ও শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার দিন, ৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষ্যে, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :—

"বহুকাল পূর্ব্বে কোন্ একদিনে মহর্ষি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সে ক'জন লোকই বা জান্ত? "কিন্তু এই দীক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারটীকে সেই সুদূর কালের ৭ই পৌষ নিজের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ ক'রে ফেল্‌তে পারে নি। সেই একটী দিনের মধ্যেই একে কুলিয়ে উঠ্‌ল না। সেদিন যার খবর কেউ পায়নি এবং তার পরে বহুকাল পর্য্যন্ত যার পরিচয় পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল সেই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিন আজ অমর হ'য়ে বাৎসরিক উৎসবের দিনে পরিণত হয়েছে।"

এই আশ্রমটীর মধ্যে তপোবনাত্মজ ভারতবর্ষের ও অনাগত কালের একটী নিগূঢ় আবির্ভাব আছে।

(খ)

কবির বাল্যকাল থেকেই তাঁর জীবনে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ এই দুই মনীষীর প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করেছে। রামমোহন সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন :—

"তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করবার জন্য একদিন দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্ব্বকে ত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্য বঙ্গের পত্তন করিয়াছেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্ম্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার

সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন;—আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে, পৃথিবীর যে-দেশে যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দুর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনিই আমাদের আপন, তাঁহাকে লইয়া প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সঙ্কুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্য্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস, কোনো ক্ষুদ্র অহঙ্কার বশতঃ মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নাই;—যে-অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়-পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মতো বহন করিয়াছেন।"

"বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য" (১২৮৪) প্রবন্ধে তিনি যেমন বাংলা দেশের আর্থিক দুরবস্থা ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলনের কথাও বলেছেন।

"ইউরোপের স্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভাব, পূর্ব্বদেশীয় গম্ভীর ভাব ও পশ্চিম দেশীয় তৎপরভাব, ইউরোপের অর্জ্জন-শীলতা ও ভারতবর্ষের রক্ষণশীলতা, পূর্ব্ব-দেশের কল্পনা ও পশ্চিমের কার্য্যকরীবুদ্ধি, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইয়া কি পূর্ণ চরিত্র গঠিত হইবে।"

তিনি কল্পনার চোখে দেখেছেন যে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে আবার এমন সব জ্ঞানালোচনার স্থান গ'ড়ে উঠেছে যেখানে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আগত অতিথি সমাবেত। কিশোর চিত্তের উদ্বোধনের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর কবি-মনে বিশ্বভারতীর এই মূল-ভাবটীর পূর্ব্বাভাষ উদ্বোধিত হয়েছিল।

৩০ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের চাষীর সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সুরু হয় তারই ফলে

চাষীর অভাব মোচন ও গ্রামের উন্নতি নিয়ে তখন থেকে গত চল্লিশ বৎসর তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এসেছেন। ১২৯৯ সালে "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, "শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আমাদের প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রার উপযোগী ক'রে তুল্‌তেই হ'বে, নইলে জাতির রক্ষা নাই।"

ভারতবর্ষের এই নানা সমস্যা ও তার সমাধানের চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের মনে ক্রমে প্রাচীন ভারতবর্ষের যে একটী ছবি গ'ড়ে উঠ্‌লো সে হচ্ছে তপোবনের মধ্যে লালিত ভারতবর্ষ। প্রাচীন ভারতবর্ষে সভ্যতার মূল প্রস্রবণ ছিল অরণ্যে, মানুষের মনের উপর বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাব তার ভিতরকার ভাব। "নিখিল চরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক ক'রে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।"

"ভারতবর্ষের দুই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চ'লে গেছে,—বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগ। সেই দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে।

"ভারতবর্ষের পুরাতন কথায় যা কিছু মহৎ, আশ্চর্য্য, পবিত্র, যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য সমস্তই সেই প্রাচীন তপোবন-স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজত্বের কথা সে মনে ক'রে রাখবার চেষ্টা করেনি, কিন্তু নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী ক'রে আজ পর্য্যন্ত সে বহন ক'রে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।"

১৩০১-২ সালে লেখা "ব্রাহ্মণ," "ধনে ও রাজ্যে," "সভ্যতার প্রতি," "বন," "তপোবন," "প্রাচীন ভারত," "ঋতু-সংহার," "মেঘদূত" প্রভৃতি কবিতার মধ্যেও এই ভাবটী প্রকাশ পেয়েছে। কালিদাসের কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শের কথা বারবার বলেছেন। আসলে এ হচ্ছে কবির নিজেরই কথা। পনের বৎসর বয়সে লেখা, অধুনা-লুপ্ত, 'বনফুল' নামে ছোটো কাব্যটীতেও এই একই কথার আভাষ পাওয়া যায়।

বাংলা দেশের শিক্ষাসমস্যা নিয়ে ভাব্‌তে গিয়েও এই তপোবনের কথাই তাঁর মনে পড়েছে।—

"আমরা যদি মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হ'বে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা নয়—আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে—প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে তপস্থার দ্বারা পবিত্র হ'বে।"

তাই ব'লে প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শের কথা বল্‌তে কবি কিন্তু আধুনিক বাংলা দেশের কথা ভোলেননি। তিনি নিজেই বলেছেন :—

"ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলি করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা-করা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লীহা-রোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।"

আরও স্পষ্ট ক'রে লিখেছেন :—"অতএব, আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জ্জনে, মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞান-চর্চ্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।"

"যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক :—এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্রেরা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গরু থাকিবে এবং গো-পালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।"

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রাণ-উৎস সন্ধান ক'রে দেখ্‌তে গেলে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, সুদূর ১২৫০ সালের ৭ই পৌষ যেদিন মহর্ষি দীক্ষা-গ্রহণ

করেন সেইদিন সাধকের ধ্যানরত চিত্তে শান্তমদ্বৈতমের যে-মহিমা প্রকাশিত হ'য়েছিল এবং যে-মহিমার মঙ্গলালোকে শান্তিনিকেতনের আকাশ ও বনভূমি পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে, বিশ্বভারতীর প্রকৃত উদ্বোধন সেই মহিমার প্রকাশে—সেই বহুদূর অতীত কালের ৭ই পৌষে। কবির চিত্তে তারই প্রেরণা এবং পরিপূর্ণ মানবত্বার মধ্য দিয়ে দেশ-সেবার এই ভাবের উদ্বোধনই বিশ্বভারতীর কার্য্য-সূচনার প্রাণ-স্বরূপ। তাই বিশ্বভারতী আজ নিখিল জগৎ-সভায় ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সম্মানের আসনটী অনায়াসে অধিকার করেছে।

কবি-কথা

—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

কবির পরিচয় তাঁহার কাব্যে, তাঁহার রচনাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। মানুষ আসে যায়, থাকে কেবল তাহার কীর্ত্তিকলাপ। এই অর্থে মহাকবিগণ অমর, কারণ যুগে-যুগে তাঁহাদের বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে; নানা দেশে, নানা ভাষায় তাঁহাদের রচনা প্রচারিত হয়, নানা জাতি সাগ্রহে পাঠ করে। কিন্তু কবিদিগের বিরচিত কাব্য হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া এবং আনন্দ উপভোগ করিয়া পাঠকের কৌতূহলের তৃপ্তি হয় না, কবির ব্যক্তিগত পরিচয় জানিবার ইচ্ছা হয়। জীবিতাবস্থায় কবি কি করিতেন, কাব্যরচনা ব্যতীত তাঁহার আর কি কর্ম্ম ছিল? তিনি সুখী ছিলেন না দুঃখী ছিলেন? প্রাচীন মহাকবিদিগের সম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই। কিছু প্রবাদ, কিছু কিম্বদন্তী থাকিতে পারে, কিন্তু যথার্থ কোন কথাই জানিতে পারা যায় না। অন্ধ কবি হোমর পথে-পথে গান করিয়া বেড়াইতেন—এই প্রবাদ আছে; কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান কেহই জানে না; সেই সম্মান ও সৌভাগ্যের জন্য সাত সহরে কাড়াকাড়ি। আদি কবি বাল্মীকির সম্বন্ধে আমরা কি জানি? রামায়ণে যাহা লেখা আছে, তাহা ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না। বেদব্যাস যে কবে কোথায় তাঁহার মহাকাব্য ও পুরাণাদি রচনা করিয়াছিলেন, কেহ তাহা বলিতে পারে না। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে প্রধান রত্ন এই মাত্র আমরা জানি, আর তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি অদ্ভুত প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই মহাকবিদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদের কাব্যেও তাঁহাদের আত্মপরিচয় পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বকালে জীবনচরিত লিখিবার প্রথা ছিল না, সংবাদপত্র কেহ জানিত না, তাড়িত-বার্ত্তাবহ দ্বারা দেশ-বিদেশে নিমেষের মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইত না, অল্পকালের মধ্যে বহু দূর ভ্রমণের কোন উপায় ছিল না। এখন যুগ উল্টাইয়া গিয়াছে,—পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর

প্রান্ত পর্য্যন্ত অবারিত সংবাদস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, মানুষের কৌতূহলের পারতৃপ্তির জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এখন কোন মহাপুরুষ অথবা প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবন-কাহিনী অজ্ঞাত নাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুধু যে জগতে সর্ব্বত্র পরিচিত এমন নয়, তাঁহার বিরচিত কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহ জগতের প্রায় সকল ভাষাতেই অনুবাদিত হইয়াছে; পৃথিবীর অনেক দেশে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন; সকল জাতির লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে, তাঁহার বাণী স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছে। সকল দেশে ঘরে-ঘরে তাঁহার প্রতিকৃতি রক্ষিত আছে, সর্ব্বত্রই তিনি অশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন। বাঙালী পরাধীন জাতি, স্বাধীন জাতির সভায় ভারতবাসীর স্থান নাই; কিন্তু এই বাঙালী কবি নিজের জীবদ্দশায় যেরূপ জগৎব্যাপী সম্মান লাভ করিয়াছেন, কোন কবির জীবনে সেরূপ সৌভাগ্য ঘটে নাই। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভায় জগৎ যেমন মুগ্ধ হইয়াছে, তাঁহার সৌম্য, সুন্দর ঋষিতুল্য মূর্ত্তি দেখিয়া সেইরূপ তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। বিধাতা তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে এই কবিকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন। এই মহাকবি কেবল ছন্দবন্ধে বিচিত্র-কুশলী নহেন, দেবী সরস্বতী ইঁহার কণ্ঠে সঙ্গীতের আকর স্থাপন করিয়াছেন। পীযূষকণ্ঠ, প্রিয়দর্শন কবি তাঁহার প্রতিভার মোহিনী শক্তিতে সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার এরূপ সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কোন-না-কোন গ্রন্থকার প্রতি বৎসর এই প্রাইজ পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই এরূপ সকল জাতির হৃদয়ে উচ্চ আসন লাভ করেন নাই। নোবেল প্রাইজ পাইয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথমে পাশ্চাত্য জগতে পরিচিত হইয়াছিলেন, এই মাত্র বলিতে পারা যায়। তাহার পর সকল জাতিতে, সকল ভাষায় তাঁহার যশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনুবাদে তাঁহার কাব্যের ও কবিতার অমৃতময়ী মোহিনী শক্তি রক্ষিত হয় না। শব্দের লালিত্য, ছন্দের মাধুর্য্য, ভাষার কমনীয় সৌষ্ঠব অপর কোন ভাষায় রক্ষা করা যায় না; একমাত্র ভাব-অনুবাদ করিতে পারা যায়। সেই কারণে পাঠকেরা অন্য ভাষায় কবির মর্ম্ম গ্রহণ

করিতে সক্ষম হন। রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়াছেন ও তাঁহার অনুবাদই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। অপর সকল ভাষায় অনুবাদের অনুবাদ, মূল বাংলা ভাষা হইতে কেবল ইংরাজীতে অনুবাদ হইয়াছে, ফরাসী ভাষায় দুই-একখানি গ্রন্থ মূল হইতে অনুবাদিত। শুধু অনুবাদ পড়িয়াই সকল জাতির সকল পাঠকেরা মুগ্ধ হইয়াছেন।

প্রতিভাশালী কবিদিগের রচনা অনেক দেশে, অনেক ভাষাতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে সর্ব্বত্র যেরূপ আগ্রহ দৃষ্ট হয়, তাহা বিরল। এই কবির রচনায় এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যাহাতে দেশ-জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রচণ্ড খরতাপ নাই, কৌমুদীর স্নিগ্ধ, শান্ত, কোমল, রহস্যময় আলোক আছে। পথশ্রান্ত, রৌদ্রক্লান্ত পথিক যেমন মহীরুহের শীতল ছায়া আশ্রয় করে, সংসারক্লিষ্ট ব্যক্তি সেইরূপ এই কবির বাণীতে শান্তি লাভ করে। অন্তরের গূঢ় বেদনা এই কবির ছন্দে ধ্বনিত হইতেছে, প্রাণের মূক ব্যথা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় অভিব্যক্ত হইতেছে। যাহা মনে আসে, মুখে আসে না, যে-তৃপ্তি হৃদয় চায় অথচ পায় না, তাহাই যেন মধুময় ছন্দে ছন্দে গাঁথা রহিয়াছে। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে-আকাঙ্ক্ষা উঠে, ভাষাতীত যে-সকল ভাব অশরীরী ছায়ার মতন মনের মধ্যে সঞ্চরণ করে, কবির প্রতিভাবলে তাহারা জাগ্রত জীবন্ত মূর্ত্তি ধারণ করে। সকল বাণীর অপেক্ষা আশার বাণী, শান্তির বাণী শ্রেষ্ঠ, এবং এই কবির বীণায় সেই বাণী ঘোষিত হইয়াছে। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ সকল দেশের সকল পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন, সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

যে-দেশে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে-দেশে চিরকাল মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে। লোকগুরু, ধর্ম্মশিক্ষক, মহাকবি, দার্শনিকগণ এই প্রাচীন ভারতকে পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু বহু শতাব্দী হইতে ভারতের সে গৌরব অস্তমিত হইয়াছে, বহু শত বর্ষ হইতে ভারত পরাধীন, নানারূপ ভাবে ভারতবাসী পীড়িত। আজ বহুকাল পরে ভারতের সুপ্তিভঙ্গ হইয়াছে, সর্ব্বত্র জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

এই যে মুক্তির নূতন আশা, স্বাধীনতার কামনা, ইহারও পূর্ণ বিকাশ রবীন্দ্রনাথের রচনায় বর্ত্তমান। উপাধি-প্রাপ্তির জন্য এদেশের লোকেরা লালায়িত, পঞ্জাবে অত্যাচারের পর রবীন্দ্রনাথ রাজদত্ত উপাধি স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করিলেন। স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার জয়ধ্বনি তাঁহার গানে ও কবিতায় ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার রচিত জাতীয় সঙ্গীত সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম-সঙ্গীত অতুলনীয়। কবিতায় ও গানে যে ভাবে তিনি ঈশ্বরের সহিত মানুষের নিকট সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পারস্য দেশের সূফী কবিদিগের রচনা ব্যতীত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে বাউলের গানেও ভগবৎপ্রেম বড় মধুর, প্রত্যক্ষ ও সহজ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে, নানা দিক হইতে এই প্রেম ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রেম এত গভীর যে, সাধারণতঃ তাহা অতলস্পর্শ মনে হয়। এই কারণে কবির ভাষা সহজ সুন্দর হইলেও স্থানে স্থানে তাঁহার ভাব গ্রহণ করা কঠিন। ভাবুক নহিলে অনেক সময় কবির মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। পরমার্থতত্ত্ব কেবল ধ্যান-ধারণার সামগ্রী নয়, প্রত্যক্ষ অনুভবের বস্তু, এই কবির সঙ্গীতে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

কাব্য ও কবিতা রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সমাধান হয় নাই। তাঁহার প্রতিভা যেরূপ শতমুখী, তাঁহার সাধনাও সেইরূপ বিচিত্র। তাঁহার লেখনী সাহিত্যের সকল অঙ্গেরই পুষ্টি সাধন করিয়াছে। তিনি যেমন অক্লিষ্টকর্ম্মা, তাঁহার প্রতিভার প্রসারও বহুস্থানব্যাপী। উপন্যাস, নাটক, সমালোচনা, মানসতত্ত্ব, সাহিত্যের সকল বিভাগই তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন। যেমন তাঁহার প্রতিভার অতুল বিভব, সেইরূপ মুক্তহস্তে তিনি তাঁহার রত্নরাশি দান করিয়াছেন। সকল ভাষায়, সকল সাহিত্যে তাঁহার প্রদত্ত ঐশ্বর্য্য সাদরে সঞ্চিত হইয়াছে।

প্রাচীন কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিয়া যে-অতৃপ্তি আছে, এই কবির সম্বন্ধে সেরূপ ক্ষোভের কোন কারণ নাই। তাঁহার জীবন-স্মৃতির কিয়দংশ তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা

ছাড়া তাঁহার জীবনীও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা এই যে, তিনি স্কুল-কলেজে কিছুমাত্র শিক্ষালাভ করেন নাই। কিছু দিন স্কুলে পড়িয়াই স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। নিজের প্রযত্নে, নিজের অধ্যবসায়ে কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় তাঁহার গ্রন্থাদিতেই পাওয়া যায়। পুরাকালে মহাকবিগণ কাহার কাছে শিক্ষা লাভ করিতেন? হোমরের শিক্ষাগুরু কে, বাল্মীকি অথবা কালিদাস কোথায় শিক্ষা অর্জ্জন করিয়াছিলেন? প্রতিভা নিজের পথ নিজে আবিষ্কার করে, কবির সাধনা তাঁহার নিজের পুরুষকার। ভাষার উপরে আধিপত্য তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ, শিক্ষা তাঁহারা নিজের চেষ্টায় লাভ করেন। যাঁহারা সরস্বতীর বরপুত্র তাঁহাদের অন্য অধ্যাপকের প্রয়োজন কি?

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের ও কিশোর বয়সের সঙ্গী অনেকেই ইহলোকে নাই। প্রথম বয়সে কবিতা রচনা করিয়া তিনি যাঁহাদিগকে শুনাইতেন, যাঁহাদের সহিত সাহিত্য-আলোচনা করিতেন, তাঁহারা অনেকেই পরলোক-গমন করিয়াছেন। যে কয়জন আছেন, তাঁহারা সেই সময়ের আনন্দ-স্মৃতি কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। কখন কখন রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সঙ্গীতের, কাব্যের, সাহিত্যের চর্চ্চা হইত। সাহিত্য-রসগ্রাহী বন্ধুবান্ধবগণ রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভায় মুগ্ধ হইতেন। তখন বঙ্গ-সাহিত্যে "উদীয়মান কবি" বলিয়া তাঁহার যশ বিস্তার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে মহাকাব্য রচনা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এইরূপ একটা সাধারণ ধারণা আছে যে, মহাকাব্য রচনা না করিলে কেহ মহাকবি হইতে পারে না। ইহা যে ভ্রান্ত ধারণা, রবীন্দ্রনাথের রচনাই তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ। শুধু বঙ্গদেশে কেন, জগতে তাঁহার তুল্য অধিক-সংখ্যক কবি নাই। তাঁহার যশ সাগর পার হইয়া জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে; সকল দেশেই তিনি সম্মানিত হইয়াছেন; সকল জাতিই তাঁহার বাণী 'কিছু-না-কিছু বুঝিয়াছে। জগতের সুধী-সমাজ তাঁহার সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহাকে সাদর সসম্ভ্রম অভিনন্দন করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য

—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বাংলা সাহিত্য বলিতে আমি আধুনিক বাংলা সাহিত্য বুঝিব। যে-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ, যার রূপে ও রসে আমরা, একালের বাঙ্গালী, আমাদের প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার অবকাশ পাইয়াছি, সেই বহু-প্রাচীন-নির্ম্মোক-মুক্ত অভিনব-কলেবর-সমৃদ্ধ নূতন আত্মপুষ্টিমূলক সাহিত্যের কথা চিন্তা করিয়া, আমি সেই সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিমাপ করা আমার কাজ নয়; আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সেই প্রতিভার প্রভাব আমি যেমন বুঝিয়াছি, তাহাই নিবেদন করিতে অগ্রসর হইয়াছি মাত্র। তথাপি ইহাও জানি যে, বাংলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালীর শিক্ষা-দীক্ষায় এ-প্রভাব এখনই সমাপ্ত হয় নাই; এ-জাতি যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার জাতীয় ভাব-পুষ্টির ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ নামক অধ্যায় চিরকালের জন্য সন্নিবিষ্ট হইয়া গেছে, এবং সে-প্রভাব কোন্ দিকে কতখানি কল্যাণপ্রদ হইবে, ভবিষ্যৎ তাহা ভালরূপেই নির্ণয় করিবে।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের মর্ম্মমূল হইতে তাহার শাখাপ্রশাখায় পত্র-পল্লবে যে গূঢ়সঞ্চারী প্রাণরস প্রবাহিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই যে তাহার প্রধান, অথবা প্রায় একমাত্র উৎস, এ-কথা অত্যুক্তি নহে। রবীন্দ্রনাথ যেন ইহার ভিত্তি হইতে শিখর পর্য্যন্ত সমুদয় বদ্‌লাইয়া দিয়াছেন; তিনি কেবল এ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন নাই, ইহাকে নূতন করিয়া সংস্থাপিত করিয়াছেন। আর কোন সাহিত্যে কোন একজনের সৃষ্টি-শক্তি এতখানি প্রভাবশালী হইতে দেখা যায় নাই।

ইতিপূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যের অধিনায়ক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের প্রতিভাই সর্ব্বপ্রথম এদেশে আধুনিক সাহিত্যের পত্তন করিয়াছিল, বাঙ্গালীর রসবোধের উদ্বোধন ও সাহিত্যিক রুচির সংস্কার সাধনে ব্রতী হইয়াছিল। এই আধুনিক সাহিত্যের প্রবর্ত্তনায় মাইকেল যেমন কবি-কল্পনাকে মুক্তির আশ্বাসে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, বঙ্কিম তেমনই বাঙ্গালীর রসবোধ জাগ্রত

ও পুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যের কৌলীন্য-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; সে-হিসাবে বঙ্কিমই বাংলা সাহিত্যকে এক নূতন পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সে-পথে অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই বাংলা সাহিত্যের পুনরায় গতি-পরিবর্ত্তন হইল; এই পরিবর্ত্তন যেমন সম্পূর্ণ বিপরীত, তেমনই গভীর ও ব্যাপক। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনায় আমরা যে-মন্ত্রের পরিচয় পাই, পরবর্ত্তী যুগে যদি তাহারই প্রসার ঘটিত তবে বাংলা সাহিত্য তাহাতে কোন্ দিকে কতখানি লাভবান হইত, সে-আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আমরা জানি, সে-সাধনার ধারা বাংলার সাহিত্য-ভূমিকে উর্ব্বর করিয়া পরে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, এবং তাহার স্থানে রবীন্দ্রনাথের সাধন-মন্ত্রই এ-যাবৎ জয়ী হইয়া আছে। আমরা কেবল ইহাই দেখিব যে, এ ঘটনা সম্ভব হইল কেমন করিয়া; রবীন্দ্রনাথের সাধন-মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য কি;—সে-প্রভাবের বিস্তার ও গভীরতা কতখানি। এজন্য প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস এবং একালে সেই মানস-ধর্ম্মের সাহিত্যিক প্রয়োজন চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়; আশা করি, ইহা হইতেই আর সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারিবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার একটা লক্ষণ এই যে, তাহাতে য়ুরোপীয় সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রেরণা বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম পূর্ণভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল; বাঙ্গালীর ভাবানুভূতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে-কাব্যালোক উদ্ঘাটিত করিলেন, তাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব-পিপাসার সঙ্গে একটি মহিমাবোধ যুক্ত হইল, সাহিত্যে এই জগৎ ও জীবন এক নূতন ভাব-কল্পনায় মণ্ডিত হইল; ভারতীয় সাহিত্যের সুচির-প্রতিষ্ঠিত-রসের আদর্শ বিচলিত হইল; কবি-কল্পনা অতি গভীর হৃদয়-সংবেদনাকে আশ্রয় করিয়া বাস্তবকেই এক নূতন রসরূপে বৃহৎ ও মহিমময় করিয়া তুলিল। বহিঃপ্রকৃতি ও মানবহৃদয় এই উভয়ের সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে অন্তর মথিত হইয়া যে-রসের উৎসার হয়—প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন-জনিত সেই গভীর অতৃপ্তির রসোল্লাস সেই একজন বাঙ্গালীর প্রতিভায় খাঁটি য়ুরোপীয় আদর্শে কাব্যসৃষ্টির শক্তিলাভ করিয়াছিল। রূপরস-পিপাসার সঙ্গে উৎকৃষ্ট কল্পনা-শক্তির সমাবেশ ঘটিলে কিরূপ কাব্যসৃষ্টি হয়—এই প্রকৃতি-পারবশ্যই পুরুষের চিত্তে

কি রস-প্রেরণার সঞ্চার করে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে বাঙ্গালী তাহার পরিচয় পাইল। কিন্তু এ-রসের চর্চ্চায় তাহার স্থায়ী অধিকার জন্মিল না। অতি দুর্ব্বল ভাবপ্রবণ হৃদয়ে কল্পনার সংযম রক্ষা করা দুরূহ। এ-সাহিত্যের রসবোধে যে বিবেক বা রুচির শাসন আবশ্যক তাহা অতি সবল, সুস্থ জীবন-চেতনা ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই সাহিত্যে এই নবমন্ত্রের সাধনা বঙ্কিমের দৈবী-প্রতিভায় যে সাফল্যলাভ করিয়াছিল, সে-যুগের সকলের পক্ষেই তাহা অনধিকারীর বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, এ শাক্তসাধনার পক্ষে প্রাণমনের যে স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, যে দৃঢ় ও অসঙ্কোচ অনুভূতি-বলে বস্তু ও ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সাহিত্যে সেই ধরণের রসরূপ প্রতিষ্ঠা করা যায়—বাঙ্গালীর জীবন-ধর্ম্মে তাহার অবকাশ ছিল না। তাই দেখা যায়, হেম-নবীনের কাব্য অধিকাংশ স্থলে ছন্দে গাঁথা উচ্ছ্বাসময় গদ্য; যে প্রাকৃত ভাববস্তুর উপাদানে তাঁহারা কাব্যসৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহাতে ভাব অথবা বস্তু কোনটারই রস-পরিচয় নাই; তাই তাঁহাদের কাব্যের বাণীরূপ এত দীন, এত অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু ইহাতেই সে-যুগের বাঙ্গালীর শব্দাড়ম্বর-প্রিয়তা ও অবোধ ভাবাতিরেক কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্ত হইয়াছিল—সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর রসবোধ যে ইহার উপরে উঠিতে পারে নাই, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। যে কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ পড়িয়া মুগ্ধ হয়, তাহার নিকট বৃত্রসংহারও উপাদেয়। তাহার কারণ, বাঙ্গালীর অন্তরের বন্ধন-দশা তখনও ঘোচে নাই;—অন্ধকার গৃহে বসিয়া সে রন্ধ্র-পথে আলোক-শলাকা দেখিয়া মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু আলোক-পিপাসা তাহার জাগে নাই। য়ুরোপীয় কাব্যের আদর্শ তাহার রসবোধের পক্ষে নিরর্থক—কাব্যের সে রসরূপ তাহার দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহাতে সাড়া দিবার মত চিৎশক্তি তাহার নাই। তাই বঙ্কিমের কল্পনা তাঁর উপন্যাস কয়খানিতেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। আর কাহারো প্রতিভায়, আর কোনো সাহিত্যিক রূপ-সৃষ্টিতে সে কল্পনার প্রসার ঘটিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের নায়কতায় বাংলা সাহিত্যে একটি বারোয়ারী উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল—বাঙ্গালী একটি সার্ব্বজনীন সাহিত্য-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বড় উৎসাহ বোধ করিয়াছিল; সাহিত্যক্ষেত্রে এই উদ্যম ও পুরুষকারকেই

তিনি সর্ব্বাগ্রে চাহিয়াছিলেন। নিজে উৎকৃষ্ট কল্পনা-শক্তি ও রসবোধের অধিকারী হইয়াও সাহিত্য-বিচারে তিনি ছিলেন পূরামাত্রায় ক্লাসিসিষ্ট (classicist); সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শের মূল্য বিচার করিয়া, সকল সংস্কারের আমূল পরিবর্ত্তন তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই—খাঁটি সাহিত্যবোধের উদ্রেক অপেক্ষা তিনি বাঙ্গালীর জীবনে সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কৃতির প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। তাই সমসাময়িক সাহিত্যক্ষেত্র কতকগুলি স্থূল অনাচার হইতে মুক্ত থাকে, এবং বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি ও বিদ্যাবুদ্ধির যাহাতে অধিকতর উন্মেষ হয়, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। একটা অতিশয় স্ব-তন্ত্র, ব্যক্তিগত, দূরবিচ্ছিন্ন ভাবদৃষ্টি লইয়া, একটা পৃথক মনোভূমিতে দাঁড়াইয়া, সর্ব্বসংস্কার-মুক্ত হইয়া, দেশ ও জাতির বর্ত্তমান পরিচয়কে একটা সার্ব্বভৌমিক সত্যের মানদণ্ডে যাচাই করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না। তিনি ছিলেন কিছু মুক্ত, কিছু জড়িত। তাই তিনি যেমন একদিকে ভারতীয় দশভূজামূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া সাহিত্যের উৎসব জাঁকাইয়া তুলিলেন, তেমনি আর একদিকে সেই উৎসবের বাদ্য-কোলাহলে দেবীর বোধন-মন্ত্র যে ভাল করিয়া শ্রুতিগোচর হইল না—বাণীপূজায় বাঁশীর সুর অপেক্ষা কাঁসির আওয়াজই যে বাঙ্গালীর কানে অধিকতর উপাদেয় হইবার উপক্রম করিল, জাতি-স্নেহমুগ্ধ বঙ্কিম সে-আশঙ্কায় বিচলিত হন নাই।

কিন্তু সমস্যা শুধু ইহাই নয়। য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে-আদর্শ অতিশয় অভিনব, অনভ্যস্ত এবং জাতির জীবন-সংস্কারের বিরোধী বলিয়া চমক লাগাইলেও, সত্যকার রসবোধ উদ্রিক্ত করে নাই বলিয়াছি—সাহিত্যের সে-আদর্শ সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া সেখানকার কাব্যেও বিশেষ বিচলিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছিল; এবং যে কারণে তাহা সেখানে অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল সেই যুগান্তরকারী ভাব-চিন্তার প্রভাব আমাদের দেশে এই অপ্রবুদ্ধ জীবন-চেতনার মধ্যেও নিগূঢ়ভাবে সঞ্চারিত হইতেছিল। এজন্য আমাদের দেশেও এই নূতন সাহিত্যিক উৎসাহের মূলে যেন একটা সংশয়-বিমূঢ়তা ঘটিয়াছিল; তাহার ফলে য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে-ভঙ্গী আমরা অনুকরণ করিতেছিলাম তাহাতে আর তেমন আস্থা বা উৎসাহ

রক্ষা করা ক্রমেই তুরূহ হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যেও বাঙ্গালীর জাতিগত কবি-প্রবৃত্তি, তাহার স্বাভাবিক গীতি-রস-প্রবণতা যেন পথ না পাইয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্যের সঙ্গে যতই তাহার পরিচয় বৃদ্ধি পাইল ততই তাহার কল্পনা যেন পুনরায় নূতন করিয়া সঞ্জীবিত হইল। এই কাব্য-সাধনার আদর্শে সে যেন একটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও আত্ম-স্বভাব-সুলভ পন্থা খুঁজিয়া পাইল; শুধু তাহাই নয়, ইহা হইতে ভাবের যে-স্বাতন্ত্র্যমন্ত্রে সে দীক্ষালাভ করিল, তাহাতে দেশ, কাল ও বহির্জীবনের প্রতিকূল অবস্থা হইতে সে কতক পরিমাণ মুক্তির উপায় করিয়া লইল। অতএব এ-যুগে আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার অভ্যুদয় আকস্মিক বোধ হইলেও অপ্রত্যাশিত নয়। এইবার এ-সম্বন্ধে আমি কিছু বিস্তারিত আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে মুখ্যতঃ গীতিধর্ম্মী তাহাতে বাঙ্গালীর জাতিগত প্রতিভারই জয় হইয়াছে; কিন্তু তাহার মূলে যে-কল্পনাভঙ্গী আছে তাহা ভারতীয় কাব্যপন্থার অনুগত না হইলেও ভারতীয় ভাব-সাধনার আদর্শেই অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথের মত খাঁটি ভারতীয় মানস-প্রকৃতি বঙ্কিমচন্দ্রেরও নহে; বরং সে-হিসাবে কবি-বঙ্কিম য়ুরোপেরই মানসপুত্র। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যাহা ফুটিয়াছে, ভারতীয় তত্ত্বচিন্তায় তাহার প্রেরণা চিরদিন ছিল। ভারতীয় ভাব-সাধনার যাহা বৈশিষ্ট্য—সমগ্র জগৎকে একটি রস-চেতনায় আত্মসাৎ করার সেই অপূর্ব্ব প্রতিভা চিরদিন ভাবকে লইয়াই তৃপ্ত হইয়াছে, রূপেরও অরূপ-সাধনা করিয়াছে। জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়-ক্ষেত্রে, এই প্রকৃতির রূপরেখা-লিপির সুস্পষ্ট সঙ্কেতে, রসস্বরূপ ব্রহ্ম যে-ভাবে মানুষের সহজ ইন্দ্রিয়-চেতনার পথেই আত্ম-সাক্ষাৎকার করাইতেছেন, কাব্যই যে সেই অনুভূতির বিশিষ্ট সহায়, এবং রসজ্ঞানী সাধক বা জ্ঞানরসিক ঋষি যাহা পারেন না—রূপের মধ্যেই ভাবকে প্রত্যক্ষ করা ও রূপের ভাষাতেই তাহাকে প্রকাশিত করা,—তাহা যে কবি-কর্ম্মেরই আয়ত্ত, এই ভাব-সর্ব্বস্ব জাতি এতদিন তাহা ভাবিতেও পারে নাই। মানুষের সার্ব্বজনীন অধিকার সম্বন্ধে সংশয়, এবং রূপকে ত্যাগ করিয়া অরূপে ভাবদৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রবৃত্তি—এই

দুই কারণে ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশে ভাব-সাধনা কখনও উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে নাই।

য়ুরোপীয় কাব্যে যে কবি-প্রতিভা এতদিন রূপের আরাধনা করিতেছিল, প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে মানব-প্রাণের বিচিত্র বিক্ষোভকেই একটি অবশ আত্মমুগ্ধ রস-পিপাসায় পরিণত করিয়া কল্পনার তৃপ্তিসাধন করিতেছিল—ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই প্রতিভায় এক স্ব-তন্ত্র কবি-মানসের উদ্ভব হইল। এ-যুগের কবিগণ রূপের উপরে ভাবের প্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তথাপি এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক সাধনার মূলে প্রকৃতির প্ররোচনাই প্রবল ছিল বলিয়া—এই বহিঃসৃষ্টির বহুবিচিত্র রূপবিলাসের অন্তরালে এইসকল সাধকেরা স্ব স্ব ভাব-কল্পনায় এক অব্যভিচারী চিন্ময় আদর্শের সন্ধান করিয়াছিলেন বলিয়া—এ-প্রবৃত্তি কবি-প্রতিভারূপেই প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং কাব্যের সঙ্গীতে ও কাব্যের ভাষায় ভাবকে রূপ দিবার এক প্রকৃষ্ট পন্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রূপের এই অভিনব ভাবভঙ্গী, অনির্ব্বচনীয়কে বাক্যের সাহায্যেই হৃদয়-গোচর করার এই বাণী-প্রতিভা এ-যুগের ভারতীয় কবি-মানসকে আশ্বস্ত করিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী ও তথা য়ুরোপীয় কাব্য কেবল এই হিসাবেই রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিপোষক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাবমন্ত্র সম্পূর্ণ ভারতীয়, য়ুরোপীয় কবির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও রবীন্দ্রনাথের আত্মসাধনায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভারতীয় ভাবপন্থা য়ুরোপীয় কাব্যপন্থায় মিলিত হইয়াছে—এই মিলনের গূঢ় তাৎপর্য্য না বুঝিলে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় মিলিবে না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে-আদর্শে বাংলা সাহিত্য প্রথমে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহার সম্যক্ সাধনার পথে প্রধান অন্তরায় ছিল নানা সংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙ্গালীর অতি দুর্ব্বল জীবন-চেতনা। জীবনের বাস্তব অনুভূতিক্ষেত্রে যে-বস্তুর পরিচয় নাই, তাহাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করিবে কেমন করিয়া? অথচ য়ুরোপীয় সাহিত্যের রূপ তাহাকে মুগ্ধ করে, কাজেই বিড়ম্বনার অন্ত নাই। এ-অবস্থায় সত্যকার সাহিত্য-সৃষ্টি

করিতে হইলে, এ-যুগের বাঙ্গালীর পক্ষে যে-মুক্তির প্রয়োজন, বাহিরে বাস্তব জীবন-ব্যাপারে সেই মুক্তি বহুবিঘ্নময় বলিয়াই তাহার একমাত্র পন্থা স্ব-তন্ত্র ভাব-সাধনা। ইহা এই ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনারই অনুপন্থী। চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা জগৎকে আত্মচেতনা হইতে বহিষ্কার করিয়া, অথবা আত্মচেতনার প্রত্যয়ানন্দে এই জগতের এক আধ্যাত্মিক রসরূপ কল্পনা করিয়া পরিত্রাণ লাভের যে উপায়, তাহা ভারতীয় প্রতিভার নিজস্ব সম্পদ। কিন্তু একালের মুক্তি-সাধনায় এই mystic পন্থা তেমন প্রশস্ত নহে; এবং সত্যকার কাব্যে তাহা কোন কালেই চলে না। কারণ, কাব্যে শুধু ভাব নয়, অরূপ-রসের অর্দ্ধব্যক্ত উল্লাসও নয়—এই জগৎ ও জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে রসরূপে পূর্ণ প্রকাশিত করাই কাব্যের একমাত্র সার্থকতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় কাব্যে কবি-কল্পনার যে মুক্তিপ্রয়াসের কথা বলিয়াছি, তাহাতেও এই বহিঃপ্রকৃতির প্ররোচনাই প্রবল, তাহাতে প্রকৃতি-প্রভাব-জনিত জীবন-চেতনাই নিগূঢ়-ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এ ধরণের প্রকৃতি-প্রভাব আমাদের জীবনে কোন কালেই প্রবল হইতে পারে নাই। এই ভাব-সঙ্কটে রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা এক অভিনব মুক্তির সন্ধান পাইল; এবং সে কল্পনার মূলে যে সেই ভারতীয় ভাব-সাধনার মন্ত্রই শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, ইহাই বিস্ময়কর। যে-প্রেরণা এতকাল কাব্যকে দূরে রাখিয়া ভাব-সাধনার অন্যতর মার্গে ধাবিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই ভাব হইতে রূপে নূতন পন্থায় প্রবর্ত্তিত করিলেন। ঋষির মন্ত্রদৃষ্টিকে, সাধকের ইষ্টস্বপ্নকে, অপরোক্ষদর্শী রসজ্ঞানীর প্রত্যয়ানন্দকে তিনি অন্তর হইতে বাহিরে—এই বিচিত্ররূপা প্রকৃতির হাবভাবের মধ্যেই উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছেন; তাঁহার কল্পনায় সেই মোহিনী অসতীই সতীমূর্ত্তির কল্যাণশ্রীতে মণ্ডিত হইয়াছে। আমাদের দেশে কবির কাজ ছিল স্বতন্ত্র; কাব্যামৃত রসাস্বাদকে সংসার-বিষবৃক্ষের অমৃতফল বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও সংসারটা বিষবৃক্ষই ছিল। সেই বিষবৃক্ষ হইতে অমৃত ফল আহরণ করিতে হইলে নিছক কল্পনা বা বাস্তব-বিস্মৃতির যে কৌশল, তাহারই নাম কবি-কর্ম্ম। কাব্যশাস্ত্রবিনোদ একটা চিত্তরঞ্জন বা মন-ভুলানো ব্যাপার; অতএব বাস্তব জীবন-চেতনার কোন উৎপাত রস-সৃষ্টির

পক্ষে নিতান্তই অবান্তর। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে রস একটি mystic অনুভূতির অবস্থামাত্র; এজন্য কাব্য-বিচারে কবি ও কাব্য অতি সহজেই অব্যাহতি পাইয়াছে—কাব্যবস্তু বা কবি-মানসের কোন বিশেষ পরিচয় বা মূল্য-নিরূপণের প্রয়োজন তাহাতে নাই। এজন্য একদিকে কবি-কল্পনা ও তাহার বিষয়ীভূত বস্তুজগৎ যেমন অতিশয় সঙ্কীর্ণ, তেমনি কাব্য-বিশেষের রসনির্ণয়ে একটি অতি স্থূল পদ্ধতির প্রয়োগই যথেষ্ট। কতকগুলি সাধারণ লক্ষণেই যাহার প্রমাণ, যাহাতে কোন বিশেষ বস্তু-পরিচয় বা মানস-পরিচয়ের অবকাশ নাই, তাহাতে কবি-কল্পনার প্রসার কোথায়? রসের এই ধারণা হইতেই বুঝা যায়, এদেশে জগৎ ও আত্মচেতনার মিলন-ক্ষেত্ররূপে, কাব্যের সীমা-বিস্তার কেন হয় নাই; রসের আদর্শকে মহিমান্বিত করিলেও, আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। আলঙ্কারিক শিষ্য ইহার উত্তরে কি বলিবেন, জানি; কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে, আধুনিক মানুষ এমনই বেরসিক যে, তাহা বুঝিতে চাহিবে না। আধুনিক মানুষের রস-পিপাসায় কোনও চিন্তালেশহীন মানসিকতাবর্জ্জিত তুরীয় অবস্থার আস্বাদন-কামনা নাই। কাব্যের মধ্যেও সে একটা জগৎকেই চায়; সে এমন জগৎ, যেখানে এক উচ্চতর মানস-বৃত্তি-পূর্ণ লীলার অবকাশ পায়—এই জগতের সকল অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাকে একটি অখণ্ড রস-চেতনায় সুসমঞ্জস করিয়াই তাহার চিত্ত নির্বৃত্তি লাভ করে। এই মানস-বৃত্তির আমরা বাংলা নাম দিয়াছি কল্পনা; ইহার সংজ্ঞানির্দ্দেশে এখনও গোল আছে। দেশীয় কাব্যশাস্ত্রে এই বৃত্তির সম্যক্ সন্ধান নাই, তার কারণ, কাব্যসৃষ্টিতে কবির যে ভাবদৃষ্টি সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানমূলক সুন্দর-বোধের সাহায্যে এই জগৎ ও জীবনের রসরূপ আবিষ্কার করে, রসবাদী তাহাকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে এই বৈরাগ্য ভারতীয় রস-বাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত,—এই রস ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর, তাহার আস্বাদনে যে-মুক্তি ঘটে তাহা বাস্তব মুক্তিও বটে। কিন্তু য়ুরোপীয় কাব্যে কবি-কর্ম্মের যে বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বাস্তবকে স্বীকার করিয়াই তাহার উপরে আধিপত্য

চেতনায় একরূপ রসমুক্তির পরিচয় আছে—সেখানে বাস্তবকেই কাব্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রবৃত্তি আছে—সে-কাব্যের রস শেষ পর্য্যন্ত বস্তু-চেতনার উপরেই নির্ভর করে।

এক্ষণে দেখা যাইবে, যে-সাধনা আমাদের কাব্যে কখনও প্রশ্রয় পায় নাই, অথচ যাহা ভারতীয় মানস-প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগত—রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভায় তাহা কেমন কাব্যসৃষ্টির অনুকূল হইয়াছে। যুগ-প্রভাব ও যুগ-প্রয়োজনের বশে এ-সাধনা প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল কবি বিহারীলালের কাব্য-ভঙ্গীতে। তথাপি বিহারীলাল শেষপর্য্যন্ত mystic ; তিনি রূপ হইতে ভাবে আরোহণ করিয়া সেইখানেই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন ; রবীন্দ্রনাথ "ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা"র রহস্যে মুগ্ধ হইয়া জগতের এক নূতন রসরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিহারী-লালের সারদা—'স্বপনে বিচিত্রারূপা দেবী যোগেশ্বরী'। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া বলিতেছেন—"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিণী।" বিহারীলাল তাঁহার ভাব-দেবতাকে এই যে 'দেবী যোগেশ্বরী' বা 'যোগানন্দময়ী-তনু, যোগীন্দ্রের ধ্যানধন' বলিয়াছেন, ইহা নিরর্থক নহে ;—অন্তর ও বহির্জ্জগতের এই যোগাত্মিকা রস-সাধনাই ভারতীয় ভাবুকতার আদর্শ। বিহারীলাল এই ভারতীয় আদর্শকেই সর্ব্বপ্রথম কাব্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্যসৃষ্টিতে সে-কল্পনা সিদ্ধিলাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাথ এই অন্তর-গহনের দীপ-শিখাকেই বস্তু-পরিচয়ের মানস-রঙ্গভূমিতে প্রতিফলিত করিয়া কাব্যরস-ধারাকে এক নূতন উৎস হইতে প্রবাহিত করিলেন। তাঁহার কল্পনায় ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ এক অভিনব ভোগবাদের সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছে ; বৈরাগ্যসাধনের মুক্তি অপেক্ষা অন্যতর মুক্তির পন্থা এই বহির্জীবনের নাটমন্দিরে কবিকরধৃত বাণীদীপের আরতি-আলোকে সুপ্রকাশিত হইয়াছে। বহুকালাগত সংস্কারকে এমন করিয়া উল্টাইয়া ধরা কবির পক্ষেও কম দুঃসাহস নয় ; তাহার ফলে আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের নিকট উহা এক মনোহর হেঁয়ালী হইয়া আছে। যাহারা পুরাতন কাব্য-রসে অভ্যস্ত তাহারা এ-রস আস্বাদনে সঙ্কুচিত ; যাহাদের

রসবোধ অপেক্ষাকৃত উদার, তাহারা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের কাব্যমন্ত্রদ্বারা এ-রস শোধন করিয়া তবে আস্বাদন করিয়া থাকে ; যাহারা কোন রসেরই রসিক নয়, এ কাব্যের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রাকৃত সংস্কার বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায় উচ্চতর ভাবসিদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার মনে হয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যে মনুষ্য-জীবনের যে নবতন মহিমা-বোধ আমাদিগকে আশ্বস্ত* করে, মানুষের অতিক্ষুদ্র সাধারণ সুখ-দুঃখের উপরে, অতি পরিচিত সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার উপরেও তাঁহার সর্ব্বাশ্রয়ী রস-কুতুহলী কল্পনা যে দিব্য আলোক প্রতিফলিত করিয়াছে, সর্ব্ববস্তুতে আব্রহ্মস্তম্বব্যাপী বিরাট সত্তার যে রসরূপ আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এমন ভিন্নমুখী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনার এই অতি মৌলিকভঙ্গী সেকালে আমাদের মত ব্যক্তিকেও কিরূপ মুগ্ধ ও সচকিত করিয়াছিল তাহা বলিব। তখন আমার বয়স ১৫।১৬ ; তাহার বহুপূর্ব্বে নিতান্ত বালক বয়সেই একপ্রকার কাব্য-প্রীতি জন্মিয়াছিল। মাইকেলের মেঘনাদবধ, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ তখন আমার সেই ক্ষুদ্র হৃদয় জয় করিয়াছে—বাংলা সাহিত্যের নব উৎসব-প্রাঙ্গণে সেকালের তরুণ আমরা এইসব লইয়াই মাতিয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু সে-সময়েও, অর্থাৎ ১৯০০ হইতে ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে নাই ; অতিসামান্য যাহা ঘটিয়াছিল তাহাতে সে-ভাষা, সে-সুর কেমন অদ্ভুত মনে হইত। রবীন্দ্র-সাহিত্য তখনও সুপ্রচারিত হয় নাই ; তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের মধ্যাহ্ন-প্রতিভাকেও তখনকার দিনের প্রচলিত সাহিত্য-সংস্কার যেন একটা মেঘাবরণে অন্তরাল করিয়াছিল। কিন্তু যেমনই স্কুল ছাড়িয়া কলেজের পাঠপদ্ধতির তাড়নায় ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে বৃহত্তর ও ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের সূত্রপাত হইল, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের একখণ্ড গল্পগুচ্ছ হাতে পড়িল ; তারপর কি হইল তাহা তখন ঠিক বুঝি নাই ; কারণ মুগ্ধ অবস্থায় আত্মপরীক্ষা সম্ভব নয়, তাহার প্রয়োজনও থাকে না। সেই কয়টি গল্প পড়িয়া যে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, আমার সমস্ত মানস-শরীরে যে-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, আজ

তাহা বুঝিতে পারি। মনে হয়, এতদিন যেন পৃথিবী হইতে চন্দ্রলোকের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম; কিন্তু ইহার পর যেন চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীকে দেখিতে লাগিলাম; যেন এমন একস্থান হইতে এমনভাবে এই নিত্যকার জগৎকে দেখিবার সুযোগ পাইলাম যাহাতে অতিপরিচিতের মধ্যেই অপরিচিততম সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত আয়োজন হৃদয়গোচর হয়। বাস্তবে ও স্বপ্নে যেন ভেদ নাই; সমগ্র ভাবদৃষ্টির কেন্দ্রই যেন অকস্মাৎ এমন একদিকে সংস্থাপিত হইল যে, বস্তু-সকল এক নূতন ছায়া-সুষমায় নবমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইল। এই গল্পগুচ্ছই ছিল আমার রবীন্দ্রকাব্যপ্রবেশিকা। এখন বুঝি, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-শক্তির মূলে আছে—অন্তর ও বাহির, ভাব ও বস্তু, চিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গতিমূলক এক অপূর্ব্ব গীতিপ্রবণতা; ইহাতেই তাঁহার মনের মুক্তি; সেই মুক্তির আনন্দে তাঁহার কল্পনা সকল সংস্কার, সকল বিরোধ উত্তীর্ণ হইয়া এমন এক রসভূমিতে অধিষ্ঠান করে, যেখানে জীবনের সকল অসামঞ্জস্য, বাস্তবের সকল বৈষম্য কবির প্রাণে একটা ভাবৈক-পরিণাম রাগিণীতে সমাহিত হয়। গদ্যে হোক, পদ্যে হোক—তিনি যখন যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গত এই সঙ্গীত পাঠককে আবিষ্ট করে, তাহার সমগ্র চেতনাকে সেই সর্ব্বসমঞ্জসকারী গীতিরাগে বিগলিত করিয়া যে ভাবদৃষ্টির অধিকারী করে তাহাতে জগতের কোন-কিছুতে উচ্চ-নীচ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সত্য-মিথ্যার অভিমান থাকে না—একটি সুগভীর সর্ব্বাত্মীয়তার প্রীতি-কল্পনায় ধূলিও পরম বস্তু হইয়া উঠে। গল্পগুচ্ছের কথা-অংশে বস্তুগত রোমাঞ্চ-বিস্ময়ের আয়োজন নাই, তথাপি তাহা যে বিস্ময়-রসে হৃদয় আপ্লুত করে তাহার কারণ, তুচ্ছতম বস্তুর উপাদানে লেখক মহত্তমের প্রকাশ দেখাইয়াছেন: আকাশের গ্রহতারকা হইতে ধূলিতলের তৃণপুঞ্জ পর্য্যন্ত যে একটি মহিমা অব্যাহত রহিয়াছে, প্রাণ তাহারি ভাবসঙ্গীতে পূর্ণ হইয়া ওঠে; তখন আর বাস্তবে ও কল্পনায় কোনও বিরোধ-বুদ্ধির অবকাশ থাকে না; কে বলিবে, গল্পগুচ্ছের কতটুকু বাস্তব, আর কতটুকু কল্পনা? গল্পগুচ্ছে এই ভাব যে-রূপ পাইয়াছে, তাহা সহজেই হৃদয়-মনের গোচর হয়, এবং যে একবার এই ভাবমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্ম্মসঙ্গীত তাহার কানে ও প্রাণে কোথাও আর বাধা পায় না।

গল্পগুচ্ছের মধ্য দিয়াই আমার এই দীক্ষালাভ—একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হইলেও, আমার মনে হয়, আমার মত সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে রবীন্দ্র-প্রতিভার সহিত সহজ পরিচয়ের উহাই উৎকৃষ্ট সোপান। এবং ইহাও আমার বিশ্বাস যে, গল্পগুচ্ছের মধ্যে কবিদৃষ্টির যে অতি-স্বতন্ত্র ও নিগূঢ় ভঙ্গী এবং রস-সৃষ্টির যে-কৌশল আছে, তাহা এখনও আমাদের দেশের সকল রসিক চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, পারিলে, অন্ততঃ একদিক দিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিবার পক্ষে এত প্রতিবন্ধক ঘটিত না।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা আর নাই। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে-পরিমাণে মুগ্ধ হইয়াছি ততখানি সঞ্জীবিত হই নাই, ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ কি? রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবাণীকে ভাষায় ও ছন্দে যে নব কলেবর ধারণ করাইয়াছেন তাহাতেই একালের বাংলা সাহিত্য তাঁহার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী। কিন্তু ওই বাণীরূপের অন্তরালে যে ভাবের আত্মা আছে, তাহা বাঙ্গালীর রসবোধে সম্যক ধরা দেয় নাই—একটা স্ব-তন্ত্র ভাব-মুক্তির পরিবর্ত্তে অন্ধভাবের ঘোর সৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহার সঙ্গীত কানে সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সেই কাব্যকলার মূল প্রেরণা অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের কল্পনাকে স্ব-তন্ত্র মুক্তির সন্ধান দেয় নাই। এ-যুগে যে-কেহ বাংলা লিখিয়াছেন বা লিখিতেছেন, তাঁহার ভাষা ও রচনা-ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের এই বাহ্যপ্রভাব অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। বস্তু-জগতের বৈচিত্র্যকেই ভাবসঙ্গীতের সুষমায় মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়োজনে রবীন্দ্র-নাথের কবি-প্রতিভা বাংলা ভাষাকে যে রূপ দান করিয়াছে, সে রূপের প্রভাব অজেয়; বাংলা ভাষা সেই সঙ্গীতরসে বিগলিত হইয়া এমন একটি সৌষ্ঠব ও নমনীয়তা লাভ করিয়াছে যে, অতঃপর সর্ব্ববিধ সাহিত্য-গঠন-কর্ম্মে ভাষার এই রূপ শিল্পীমাত্রেরই বরণীয় হইতে বাধ্য। এখন যাহা সাধারণ বাংলা লেখকের অতি সুসাধ্য অনুকরণকর্ম্মের সহায় হইয়াছে, তাহাই যে একদিন নানা উৎকৃষ্ট প্রতিভার ভাবপ্রকাশপন্থাকে বহু পরিমাণে সুগম করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হিসাবে বাংলা

সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সর্ব্বব্যাপী হইলেও যাঁহারা সাহিত্যে রবীন্দ্র-পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ক্বচিৎ দুই-একজন সত্যকার কবি-শক্তি বা মৌলিক সৃষ্টি-প্রতিভা দাবী করিতে পারেন; যাঁহারা সে-প্রভাব স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদের রচনা প্রায়ই সাহিত্যপদবাচ্য নহে। রবীন্দ্র-নাথের সমসাময়িক যে দুই-চারিজন লেখক গদ্যে পদ্যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও তাঁহাদের কল্পনা রবীন্দ্র-বিরোধী নহে, এজন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের বৃহত্তর মণ্ডলের মধ্যেই তাঁহারা নির্ব্বিরোধে অবস্থান করিতেছেন। অতএব বাংলা সাহিত্য বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি, তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথকে পৃথক করিয়া ধরিলে সে-সাহিত্যের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না; এ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অংশে রবীন্দ্র-নাথের রচনাই এত অধিক যে, ইহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অপেক্ষা তাঁহার নিজের কীর্ত্তিই সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান হইয়া আছে।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ব্যাপক হইলেও তাহা যে তেমন গভীর হইতে পারে নাই, ইহার কারণ আপাততঃ এই বলিয়া মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথকে আমরা বুঝি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা বুঝিয়া-ছিলাম, কিন্তু সে-সাধনার শক্তি আমাদের ছিল না—অতিশয় সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে, এই নিতান্ত নিম্নভূমিতলে দাঁড়াইয়া আমরা সেই গগনবিহারী গরুড়ের পক্ষ ও বক্ষ-বল আয়ত্ত করিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ এই ভূমিতলে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই আমাদের মানস-নেত্রের দৃষ্টি পরিবর্ত্তন করাইয়া ভিতর হইতেই যে মুক্তির উপায় করিয়া দিলেন, তাহাতে এককালে মনে হইয়াছিল, এ-সাধনায় আমরা অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব। কিন্তু তাহা হয় নাই। অতিশয় বর্ত্তমান কালে সাহিত্য-প্রেরণা মন্দীভূত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে; কোনও জাতির জীবন-সঙ্কট-কালে তাহার যাবতীয় শক্তি অন্য প্রয়োজনে নিয়োজিত হয়, তখন রস-কল্পনার তেমন স্ফূর্ত্তি আর আশা করা যায় না। তথাপি এ-সাহিত্যে পূর্ব্ব হইতেই শক্তি ও সজীবতার অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। রবীন্দ্র প্রতিভার ছায়াতলে, সাহিত্য রচনার কৌশল, ভাষা ও ছন্দের কারিগরী, যতটা সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহার অনুপাতে নবসৃষ্টির

প্রেরণা যে ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাঙ্গালীর মনে সাড়া জাগাইলেও তাহার অনুকরণ যেমন দুরূহ ছিল, রবীন্দ্রনাথের সাধন-মন্ত্র হৃদয়ঙ্গম না হইলেও তাহার বাণীলীলার মোহময় ভঙ্গী তেমনি সহজ অনুকরণের বস্তু হইয়াছে। এমন হইল কেন? একদিকে রবীন্দ্রনাথের নিত্যনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টি-প্রতিভা ও অপরদিকে সমসাময়িক সাহিত্যে তাহার প্রভাব ও প্রতি-প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছে এক্ষণে তাহাই লিপিবদ্ধ করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথে অভিনব কবি-কল্পনা আমাদের রস-পিপাসাকে আশ্বস্ত করিয়া বিশুদ্ধ সাহিত্য-প্রীতির উদ্রেক করিয়াছিল। সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে-ধরণের সাহিত্য-সমালোচনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাতেও একটি সুস্থ রসবোধ জাগিয়াছিল। হেম-নবীনের কাব্যে যে রস-সৃষ্টির অভিপ্রায় আছে তাহার ব্যর্থতা আমরা অনুভব করিলাম; ইংরাজ কবি পোপ, এমন-কি বায়রণও, আর তেমন করিয়া মুগ্ধ করিল না; স্কট অপেক্ষা জর্জ্জ ইলিয়টের উপন্যাস আমাদিগকে অধিকতর আকৃষ্ট করিল। এজন্য, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ব হইতেই যে রূপ-সৃষ্টির প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, তাহাই যেন আরও পরিশুদ্ধ হইয়া একটি পূর্ণতর বাণী-সাধনার আশায় আমাদিগকে উন্মুখ করিয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার এই প্রেরণা কবির নিজস্ব আত্ম-সাধনার প্রয়োজনে ভিন্নপথে প্রয়াণ করিল—রূপ হইতে পুনরায় অরূপের পানে ভাবের "খেয়া"য় পাড়ি জমাইল—কবির কাব্য-সাধনায় আত্মভাব সাধনা প্রধান হইয়া উঠিল। তারপর হইতে আজ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কাব্যকে সঙ্গীতের অধীন করিয়া তাহার বস্তুভার হরণ করিয়াছেন; রূপের স্বরূপ কল্পনার পরিবর্ত্তে তাহার অরূপ-রসে আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় য়ুরোপ পাইয়াছে ও চাহিয়াছে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যে গীতাঞ্জলিই যদি রবীন্দ্র-নাথের শ্রেষ্ঠ দান হইত তবে বাংলা সাহিত্যের কি কোনও ভরসা থাকিত?

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় ভারতীয় মানস-প্রকৃতির যে-প্রভাব সম্বন্ধে

পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, তাহাই যেন সে প্রতিভার যৌবন-শেষে তাঁহার কাব্য-প্রেরণাকে অভিভূত করিয়া তাহার স্বধর্ম্মকেই জয়ী করিয়াছে। এ-ঘটনা প্রাচীন ভারতের পক্ষে গৌরবজনক হইলেও আধুনিক ভারতের ইহা সৌভাগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ যে এককালে সেই ভারতীয় ভাব-সাধনার mysticism-কেই প্রতীচ্যের রূপ-সাধনার সঙ্গে যুক্ত করিয়া আমাদের সাহিত্যে কাব্য ও জীবনের অপরূপ সমন্বয় সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাই ভারতের সৌভাগ্য ও রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ গৌরব। রবীন্দ্রনাথের নিজেরই সাধনার এই যে পন্থা পরিবর্ত্তন, তাঁহার প্রতিভা ও সাহিত্য-কীর্ত্তির সম্যক পরিচয়ের পক্ষে ইহাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান বাধা। শুধুই কল্পনা বা কাব্যের ভঙ্গী-বৈচিত্র্যে নয়, ভাষা ও রচনার নিত্যনব রীতি পরিবর্ত্তনে অনধিকারীর চিত্তে একটা মোহময় প্রহেলিকার সৃষ্টি হয়; ইহার ফলে কোনও একদিক দিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার একটা স্পষ্ট ধারণা হওয়া দুরূহ। এইজন্যই এই দীর্ঘকালেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি সুসঙ্গত আলোচনা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইল না; এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে, তাহাতে কোন সাহিত্যিক আদর্শের সন্ধান নাই; তাহা ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস—সমালোচনা নয়, সুখালোচনা মাত্র। এক্ষণে এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠদান যে—ভাবের রূপ-সৃষ্টি, কোনও প্রকার mysticism নয়, তাহা আমরা বুঝিতে সম্মত নই। তাঁহার কাব্যে সনাতনী ভাবধারা বা বিশ্ববাণী যে-ভাবেই উৎসারিত হউক, তাহার মূলপ্রেরণা যে অতিমাত্রায় আধুনিক এবং তাঁহার কবি-মানস যে আদৌ mysticism-এর অনুকূল নয়, ইহা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। আধুনিক মনের রসপিপাসা-নিবৃত্তির যে একটি পন্থা তাঁহার কাব্য-সাধনায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই তাঁহার প্রতিভার বিশিষ্ট গৌরব। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির যে একটি লক্ষণ সম্বন্ধে কাহারও ভুল হইতে পারে না তাহা এই যে, এমন সদাজাগ্রত মনোবৃত্তি, এমন সুনিপুণ ভাবগ্রাহিতা, এমন সর্ব্বতোমুখী বোধশক্তি এতবড় কবি-প্রতিভার সহিত মিলিত হইতে সচরাচর দেখা যায় না। ইহার ফলে তাঁহার কাব্যসৃষ্টি যেমন বিচিত্র, তেমনি তাঁহার কল্পনায়

কুত্রাপি অতিসচেতন মানস-ক্রিয়ার অভাব লক্ষিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনা যে-রীতিই অবলম্বন করুক, তাঁহার কবিচিত্ত ভাব ও বস্তুর যখন যেটাকে আশ্রয় করিয়া যত বিচিত্ররসের সৃষ্টি করুক—তাহাতে Idealism থাকিলেও mysticism নাই। ভাব ও বস্তু,—Ideal ও Real—এই উভয়ের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ভারতীয় ভাব-সাধনা ও য়ুরোপীয় রূপ-সাধনার যে-সমন্বয় সাধন করিয়াছে, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমার প্রধান বক্তব্য তাহাই, এজন্য সেই কথাটাই আর একবার ভালো করিয়া বলিয়া লইয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্র-প্রতিভার যে দিকটি আধুনিক জীবন ও আধুনিক কাব্যের সঙ্গতি সাধনে অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়াছে সেই দিকটিই আমাদের লক্ষ্য-বহির্ভূত হইয়াছে; অথবা, এককালে যাহা ক্রমশঃ লক্ষ্যগোচর হইতেছিল তাহা পরে আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়াছে,—রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন একটি সুস্পষ্ট ভেদ-রেখায় দ্বিধাবিভক্ত হইয়াই আমাদের মনে এই দ্বিধার সৃষ্টি করিয়াছে। 'সোনার তরী' ও 'বলাকা' পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে এই ভেদ-রেখা কাহারও অগোচর থাকে না।

আমি বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় আধুনিক মনের রসপিপাসা-নিবৃত্তির একটি প্রকৃষ্ট কাব্যপন্থা মিলিয়াছে, অথচ এই প্রতিভার উদ্বোধন করিয়াছে প্রাচীন ভারতের সেই ভাবমন্ত্র। যে-ভাবমন্ত্রের সাধনায় রূপ কখনও প্রাধান্যলাভ করে নাই, যাহা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্ষেত্রে অন্তর ও বাহিরের যোগসাধনায় তৎপর হয় নাই, যে-মন্ত্রের সাধনায় কখনও কোন কবি-সাধক বস্তু-জগতের রূপে তন্ময় হইয়া এই জীবনের সমস্যাকেই রসোজ্জ্বল করিয়া তোলে নাই, রবীন্দ্র-প্রতিভার যৌবনকালে সেই মন্ত্রই কাব্য-সাধনার অনুকূল হইয়াছিল; যাহা এতকাল তত্ত্ব ছিল তাহাই রসরূপে ধরা দিয়াছিল। আধুনিক মানুষের রস-পিপাসায় জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে প্রশ্নকাতরতা আছে, তাহার নিবৃত্তি এইরূপ কাব্য-সাধনাতেই সম্ভব। যে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা পশ্চিমের কাব্যকেও আক্রমণ করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহারই সম্মুখে তাঁহার কাব্যের ভিত্তি অকুতোভয়ে স্থাপনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার কাব্যে তখনও বস্তু বা ভাবের কোনটাই নিরতিশয় প্রাধান্য লাভ করে নাই, বাস্তব হইতে পলায়ন করিয়া ভাবের দুর্গম দুর্গে আশ্রয় লইবার প্রয়োজন তখনও ঘটে নাই। রূপের জগতেই ভাবের সাম্যরক্ষা করিয়া একসঙ্গে রস-পিপাসা ও বস্তু-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করাই আধুনিক কবির শ্রেষ্ঠ সাধনা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় সেই সাধনাই জয়যুক্ত হইয়াছিল। আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যে এই প্রশ্নকাতরতা নিবারণের যত উপায় দেখা দিয়াছে, তাহার কোনটিতেই কবি-কল্পনা সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হইতে পারে নাই; এমন-কি ক্ষেত্রবিশেষে কাব্য স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া বিধর্ম্মের সাধনা করিয়াছে। কবি-কল্পনা রূপ হইতে অরূপে ফিরিবার প্রয়াসও করিয়াছে। এককালে য়ুরোপীয় কাব্যে আধুনিক মন যে-ভাবমন্ত্রের সাধনা করিয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগের জ্ঞানবিষজর্জ্জরিত ইংরাজ কবি তাহাতে সংশয়মুক্ত হইতে পারেন নাই, তাই শেক্‌স্‌পীয়ারের কবি-প্রতিভার উদ্দেশে তিনি হতাশভাবে বলিয়াছিলেন—

> " Others abide our question—Thou art free!
> We ask and ask—Thou smilest and art still,
> Out-topping knowledge:"

শেক্‌স্‌পীয়ারে কল্পনা যে-ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে সেখানে সকল জিজ্ঞাসা স্তম্ভিত, সে-প্রজ্ঞা জ্ঞানকেও অতিক্রম করে। তাই ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্ শেক্‌স্‌পীয়ারের সেই উত্তুঙ্গ কবিসিংহাসনের পানে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়াছেন। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ারের এই সিদ্ধিলাভ ত' অরূপ-সাধনায় ঘটে নাই—এত বড় রূপস্রষ্টা কবি আর কে জন্মিয়াছে! আর কে এমন করিয়া নিজে নির্ব্বাক থাকিয়া জগৎ-রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যগুলি কেবলমাত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছে! শেক্‌স্‌পীয়ারের মত নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার বাস্তবজয়ী বস্তু-কল্পনা এ যুগে সম্ভব নয়; তথাপি শেক্‌স্‌পীয়ারের কাব্যসিদ্ধির দৃষ্টান্তে আমরা কাব্য-সাধনার স্বরূপ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছি। এই বহির্জগৎ, এই সৃষ্টির মধ্যেই যে-কল্পনা আপনাকে মুক্তি দিয়া—যেন একপ্রকার বিশ্বচেতনার সঙ্গে আত্মচেতনা মিলাইয়া, সর্ব্ববিরোধ সর্ব্ববৈচিত্র্যের তীব্র তীক্ষ্ণ

অনুভূতিকেই দ্বন্দ্বাতীত করিয়া তোলে, তাহাই উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনা। আধুনিক কাব্যের কবি-কর্ম্ম আরও দুরূহ, এখনকার কালে কাব্যরসের আস্বাদনে এইরূপ আত্মবিলোপ অতিশয় দুঃসাধ্য; কারণ, তীব্রতর জগৎ-চেতনার ফলে এখন আত্মচেতনাও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি কবিকে কাব্যসৃষ্টি করিতে হইলে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্বকেই অন্য উপায়ে উত্তীর্ণ হইতে হইবে; ভাবকে রূপের অধীন করিতে না পারিয়া কেবল রূপকে ভাবের অধীন করিলেই চলিবে না; য়ুরোপীয় কাব্যে সে-পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। এখন একমাত্র পন্থা—এই সজ্ঞান দ্বৈতের মধ্যেই অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এককালে কবি-কল্পনার এই লীলাই আমরা দেখিয়াছি—সেখানে ভাব ও রূপের সাযুজ্যসাধনে এক অপূর্ব্ব রসের অভিব্যক্তি হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার এই বৈশিষ্ট্য কেবল কাব্যসৃষ্টিতেই প্রকাশ পায় নাই—তিনি তাঁহার এই কাব্যমন্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ, তাঁহার এই কবি-ধর্ম্মের সানন্দ উল্লাস, বহুবার বহুবিধ ভাবে জ্ঞাপন করিয়াছেন; আমরা তাহা বুঝিতেও চাহি নাই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের এই পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগের বা পূর্ণ যৌবনের সাধনা তাঁহার উত্তর জীবনের সাধনার দ্বারা আপাততঃ আচ্ছন্ন হইয়া আছে। যাঁহারা আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের এই দীর্ঘ কাব্য-সাধনায়, তাঁহার কল্পনার নিত্যনব ভঙ্গীকে একই কবিব্যক্তির মানস-পরিণতির বিভিন্ন স্তর-বিকাশ মনে করিয়া আশ্বস্ত হন, তাঁহাদের সঙ্গে এই হিসাবে আমার মতবিরোধ নাই যে, সে-ক্ষেত্রে কাব্যই মুখ্য নয়, কবি-মানসই মুখ্য—সে-বিচারের ক্ষেত্রই স্বতন্ত্র। কিন্তু যেখানে কাব্য-বিচারই মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে কাব্যের উপরে কবি-মানসকে স্থান দেওয়া কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আধুনিক কালের কাব্য-সমালোচনায় গীতিকাব্যের আদর্শই অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করায় কাব্যরস অপেক্ষা কবি-মানসই আলোচনার মুখ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাও আর একদিকে অতিচার। সংস্কৃত আলঙ্কারিকের কাব্য-বিচারে যেমন কবি-মানসের কোন স্থান ছিল না—তেমনি আধুনিক কাব্য-বিচারে যদি কবি-মানসই সকল স্থান জুড়িয়া বসে, তবে কাব্য যে বস্তুকে ছাড়িয়া একেবারে

ভাবের তুরীয়লোকে রঙ্গীন ছায়ারচনা হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা বোধ হয় কোন সত্যকার কাব্যরসিক অস্বীকার করিবেন না। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার কৃতিত্ব-আলোচনায় আমি তাঁহার কাব্যে ভাব ও রূপের যে অভিনব সমন্বয়ের কথা বলিয়াছি তাহা আপনারা স্মরণ করিবেন, অথবা আধুনিক যুগের কাব্য-সাধনায় যে-সমস্যার উল্লেখ করিয়াছি তাহাও স্মরণ করিতে বলি। এ প্রবন্ধে কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে পৃথক্ আলোচনার অবকাশ নাই, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে আমি এসম্বন্ধে যে-ধারণা ব্যক্ত করিয়াছি, আশা করি, সুধীজন তাহা অগ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম,—রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আমাদের কাব্যবুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া গেছে; এই হতচেতনার একটি প্রমাণ—রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বতন কবি-কীর্ত্তির পরিচয় আজকাল বড় কেহ রাখে না। আজকাল রবীন্দ্রনাথ যে-ধরণের ভাব-সাধনায় নিমগ্ন আছেন, ভাষা ও ছন্দের ভিতর দিয়া তাহার সে সুর আমাদের কানে বাজিতে থাকে—বুঝি বা না বুঝি, চক্ষু মুদিয়া আমরা তাহারই রসাস্বাদনের ভাণ করি। এ সাধনার সঙ্গে আধুনিক জীবন-চেতনার সহজ সম্পর্ক নাই, এবং উহার অন্তর্গত প্রেরণা খাঁটি কবি-কল্পনার অনুকূল নয়। তথাপি এই সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি অগ্রাহ্য করিবার নয়; তাই আধুনিকতম বাংলা সাহিত্যে একদিকে অস্পষ্ট ভাবের ঘোর এবং অপর দিকে তাহারি বিরুদ্ধে বিকৃত মানস-বিলাস প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-সাধনার গতি-প্রকৃতি যদি আমরা বুঝিতে পারিতাম, তাঁহার কবিজীবনের আদি, মধ্য, অন্তকে, সাহিত্যের আদর্শ ও তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনার আদর্শ, এই উভয় আদর্শে সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়া লইবার সামর্থ্য যদি আমাদের থাকিত, তবে আমাদের সাহিত্যবোধ আরও সজাগ ও সজীব হইয়া উঠিত। কিন্তু তাঁহাকে কোনদিক দিয়াই আমরা বুঝি নাই। আধুনিক কালে সাহিত্যের যে-আদর্শ, রস-সৃষ্টির যে-রহস্য, কাব্য-বিচারে যে নূতন সমস্যার সমাধান দাবী করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের কবি-কীর্ত্তির মধ্যে সেই সমস্যা পুরামাত্রায় বিদ্যমান; তাহার বিচারেও সেই রহস্যের সন্ধান, সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু আমরা এই সাহিত্য-ধর্ম্মকে

এখনও স্বীকার করি না, তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকেও যথার্থভাবে বরণ করিয়া লইতে পারি নাই। এতকাল পরে এ যুগেও কেহ কেহ যে-ভাবে কাব্য-জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাকে, কাব্য-পরিমিতি কেন, কাব্য-জ্যামিতি বলাও চলে ; সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূত্র অনুসারে তাঁহারা যে-ভাবে রবীন্দ্র-কাব্যের রস-প্রমাণে যত্নবান হইয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, শুধুই রবীন্দ্র-সাহিত্য নয়, সকল আধুনিক সাহিত্যের রসাস্বাদে তাঁহারা এখনো পরাঙ্মুখ।

রবীন্দ্রনাথের এমন দিব্য-প্রতিভাও যে এ-যুগে বাঙ্গালীর সাহিত্যিক জীবনে আশানুরূপ শক্তি সঞ্চার করিতে পারিল না, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে শুধুই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার ধারা বা তাঁহার কবি-মানসের পরিচয় করিলেই হইবে না ; সেই সঙ্গে, বাঙ্গালীর জীবন, তাহার শিক্ষাদীক্ষা ও সাধারণ সংস্কৃতির কথা ভাবিয়া দেখিতে হয়। তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই দুর্ভাগ্যের জন্য রবীন্দ্র-প্রতিভার গৌরব হানি হয় না। বাংলা সাহিত্যে তিনি যাহা দিয়াছেন—তাঁহার স্ব-তন্ত্র সাধনা সত্ত্বেও তিনি বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার মূল্য বুঝিবার শক্তি যে আমাদের নাই, ইহাও কম দুর্ভাগ্য নহে। আর একদিক দিয়া দেখিলে রবীন্দ্র-প্রতিভার গৌরবে বাঙ্গালীর গৌরবান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, শুধু বাংলা দেশের কেন, বর্ত্তমান জগতের যুগ-প্রয়োজনে বাধ্য না হইয়া, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-বিসর্পী এক সার্ব্বভৌমিক রসপ্রতিষ্ঠার সাধনা করিয়াছে—সে-সাধনায় ভারতীয় অধ্যাত্মদৃষ্টিই তাঁহার সহায় হইয়াছে। এ-সাধনায় যেমন একটি সুমহান আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে, ইহার প্রভাবে যেমন কূপমণ্ডূক মহাসাগর-দর্শনের অধিকারী হয়, ইহা যেমন বাঙ্গালীর মানস-মুক্তির একটি চিরস্থায়ী উপায় হইয়া থাকিবে, তেমনি,—দুঃখের বিষয় এই যে, ইহা তাহার বর্ত্তমান দেহ-দশায় তাহার দুর্ব্বল প্রাণ-ধর্ম্মের পক্ষে উপযুক্ত পথ্য নয় ; ইহাকে পরিপাক করিবার শক্তি তাহার নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায় যে নূতন রস-সৃষ্টির পরিচয় আছে তাহার স্বরূপ নির্ণয় আমার মত ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নয় ; বাঙ্গালী যদি বাঁচিয়া থাকে, যদি তাহার দেহ, মন, প্রাণ নবজীবনে

সঞ্জীবিত হইয়া সত্যসুন্দরের সাধনায় পূর্ণশক্তি লাভ করে, তবে একদিন আমার প্রাণের এই ক্ষীণ প্রতিধ্বনির পরিবর্ত্তে, এ যুগের এই মহাকবির শ্রদ্ধাতর্পণে, বহুকণ্ঠের সত্যতর মন্ত্রোচ্চারণ শুনা যাইবে। বিশ্বসাহিত্যের উদার প্রাঙ্গণে ভবিষ্যকালের বিচারেও রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। আমার এমনও মনে হয় যে, এতকাল কবি-প্রেরণা যে-পথে রস-সৃষ্টি করিতেছিল তাহার মূলমন্ত্র যেমন শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকীয় কল্পনাতেই চূড়ান্ত সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তেমনি কাব্যসাধনার যে আর-এক পন্থা য়ুরোপীয় সাহিত্যেই সূচিত হইয়াছে, যাহা ডাহিনে বামে নানা ভঙ্গীতে নানা দিকে আজও অগ্রসর হইয়া চলিতেছে—কাব্য-সাধনার সেই পন্থায় যে চূড়ান্ত সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় ভাব-কল্পনা হয়ত তাহাতেও শক্তিসঞ্চার করিবে; প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সেই পূর্ণমিলন-যজ্ঞের উদ্‌গাতারূপেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সার্থক হইবে। সাহিত্যের সে-রূপ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই—রবীন্দ্রনাথও সে-সাহিত্যের মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র, রূপস্রষ্টা নহেন। য়ুরোপের রূপবাদ ও ভারতের ভাববাদ রবীন্দ্র-সাহিত্যে যেটুকু সমন্বয়ের অবকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও মোটের উপর এপর্য্যন্ত ভাবের প্রাধান্যই অধিক; তথাপি, কাব্যরস-পিপাসার সঙ্গে জগৎ-জিজ্ঞাসার যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আধুনিক কালে উত্তরোত্তর প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক, সেই অতিশয় আত্মসচেতন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-মূলক কল্পনাই এপর্য্যন্ত আর কোথাও এমন বিশ্বাত্মীয়তার রসে পৌঁছিতে পারে নাই। এদিক দিয়া চিন্তা করিলে য়ুরোপই এ মার্গের নিকটতর অধিকারী,—দেশের তুলনায় বিদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত আদর যে অধিক, তাহা ক্ষোভের বিষয় হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসভূমিতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালীকে এখনও অন্যতর মন্ত্রের সাধনা করিতে হইবে। রূপ-সাধনা না করিয়া ভাব-সাধনার গহন পন্থায় প্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা আজিকার অবস্থায় বাঙ্গালীর পক্ষে সত্যও নহে, স্বাভাবিকও নহে। রবীন্দ্র-প্রতিভার মূলমর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহার অনুকরণ করিলে, অথবা, তাহার প্রতি-আক্রোশ করিয়া সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিলে বাংলা সাহিত্যের অপমৃত্যু ঘটিবে। এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়—

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠতর পরিচয় সাধনের চেষ্টা; এবং য়ুরোপীয় সাহিত্যের আধুনিকতম রূপটিকেই চরম আদর্শ মনে না করিয়া সকল কালের সাহিত্য হইতে সাহিত্যের স্বরূপ ও স্বধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়া উদার রসবোধের প্রতিষ্ঠা করা; তবেই বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালীর প্রকৃত মানস-মুক্তি ঘটিবে; তখন রবীন্দ্র-সাহিত্যের দুর্ল্লভ সম্পদকে আমরা আত্মসাৎ করিতে পারিব—সে-প্রতিভার গৌরবে আমরা যথার্থ গৌরবান্বিত হইতে পারিব।

রবীন্দ্র-বন্দনা

—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

মর্ত্ত্যের মানব ছিলে মহেন্দ্রের সুখ-স্বর্গ-তলে,
জ্যোতির্ম্ময় শিখা
নিত্য জ্বলে ভালে যার ; ছিলে সেই উদয়-অচলে
যার জয়-টীকা
অম্লান মন্দার-দলে রেখে যায় অপূর্ব্ব আলোক ;
হাসি আর গানে
ছিলে সেই পুণ্যালোকে যেখানে চেনে না কেহ শোক,
অশ্রু নাহি জানে !

প্রাণহীন সে আনন্দ—সে তোমার লাগে নাই ভালো
চিত্তের বেলায়
ছিল এ মর্ত্ত্যের স্মৃতি—যেথা জাগে আলেয়ার আলো,
প্রেয়সী ঘুমায়,
জননীর অশ্রু খসে, প্রভাতে ফুটিয়া ওঠে ফুল,
সন্ধ্যাবেলা ঝরে।
তাইতো স্বর্গেরে ছাড়ি' নেমে এলে উন্মুখ ব্যাকুল—
ধরণীর 'পরে।

তাই আজ অকস্মাৎ অতন্দ্রিত বৃষ্টিধারা সম
ডাহিনে ও বামে
ছন্দ নামে, নির্ঝর জাগিয়া ওঠে নৃত্যে অনুপম,
এই মর্ত্ত্যধামে
উর্ব্বশী নামিয়া আসে কল্পনার অকুণ্ঠ আলোতে
অপূর্ব্ব রূপসী,
অচ্ছোদের স্বচ্ছতীরে কামের বিহ্বল বাহু হ'তে
ধনু পড়ে খসি'।

ব্রহ্মার তপস্যা-শেষে একদিন জেগেছিল যবে
স্বষ্টির কামনা,
তখনি পেয়েছে প্রাণ দেহে মনে জলে স্থলে নভে
স্থূল ধূলি-কণা।
তোমারো তপস্যা শেষ—ছন্দ তাই আনন্দ ছড়ায়,
প্রাণ ওঠে জেগে,
অপরূপ ইন্দ্রধনু দেখা দেয় এক নভ-গায়
রৌদ্রে আর মেঘে।

ভৈরব জলদ গর্জ্জে, দিক ভাঙি' বর্ষা নেমে আসে,
জলে বজ্র-রেখা,
হরিৎ ধান্যের শীর্ষে, নব আম্র-মুকুলের বাসে
দীপ্তি দেয় দেখা।
ফুকারিয়া দিকে দিকে তৃষার্ত্তের তপ্তবিভীষিকা
প্রলয়-পিনাক,
উজ্জ্বল পিঙ্গল জটা নেমে আসে রুদ্র-রৌদ্র-শিখা
ধূসর বৈশাখ।

অকস্মাৎ চেয়ে দেখি সাগরের শব্দবন্ধ টুটি'
জাগে তব নাম,
সহস্র বিদেশী বক্ষে বন্দনার পুষ্প ওঠে ফুটি'—
করিছে প্রণাম।
কে তারে পাঠায়ে দিল কোন্ ক্ষণে কবে চুপে চুপে
কেহ নাহি জানে,—
তারা শুধু বরি' নিল প্রতিভার একচ্ছত্র ভূপে
বিস্ময়ে—সম্মানে

যাহারে চাহেনি কেহ—ডাকে নাই—পায়ে গেছে দলে',
আমি ভাবি আজ,
ক্ষুদ্র তারে ঘিরে' কেন এগৌরব উচ্ছ্বাসি' উচ্ছলে—
এ কাহার কাজ !
ধরার সংহত বক্ষ তন্দ্রাতুর—যার ছন্দরবে
নৃত্যে স্পন্দমান,
সে বঙ্গভাষারে আজি তুচ্ছ বলি' কে কহিবে ভবে—
দিবে না সম্মান ?

একদিন তমসার ঘন বন অন্ধকারে বসি'
সুপ্ত নীরে চাহি',
তেজ-পুঞ্জ মহাঋষি একতার বীণায় পরশি'
কি উঠিল গাহি'—
শত যুগ যুগান্তের ক্ষয়হীন পাষাণ-পঞ্জরে
আছে তাহা আঁকা,
কবির স্বপ্নের সৃষ্টি—জয়ী তাহা কালেরো উপরে,
পড়ে না সে ঢাকা।

নিখিল বিশ্বের নেত্র ঐ সূর্য্য মধ্যাহ্নে ভাস্বর,
সায়াহ্নে সে ম্লান,
জ্যোতির্বাষ্প নিভে যায়, অন্ধকার নিবিড় নিথর
তারে করে পান।
সন্ধ্যা টানিয়াছে রেখা তোমার ললাট-তট 'পরে
চির জ্যোতির্ম্ময়ী
তোমার প্রতিভা তবু দিক্ হ'তে ঝরে দিগন্তরে—
দীপ্তি আনে বহি'।

অমর তোমার বীণা, বিশ্বেরে নিয়েছে জিনে, কবি,
জয়—তব জয়—
সাধনা জাগিয়া থাকে জন্ম জন্ম জয়-মাল্য লভি',
নাহি তার ক্ষয়।
নিখিল কাব্যের পরে মূর্ত্ত দীপ্ত সাধনা তোমার
র'বে চিরদিন,
এ নহে স্তুতির ভাষা, ক্ষুদ্র আত্ম-প্রবঞ্চনা ভার,
অসত্য মলিন।
বিদেশে উঠেছে রব—জয় হোক্—জয় হোক্ তব—
ফুটে তব স্তব,
স্বদেশের নর-নারী এক সঙ্গে গাহে অভিনব
জয়-জয় রব।
তারি সাথে ভক্ত আমি—জয় হোক্ গাহি' উচ্চৈঃস্বরে,
হে বিশ্বের কবি,
জয় হোক্—জয় হোক্—গাহি গর্ব্বে—গাহি স্পর্দ্ধা-ভরে,
জয় হোক্ রবি!

রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

ঊর্দ্ধ আকাশে জীবনদেবতা আলো ও ছায়ার খেলা খেলিতে খেলিতে কখন যে এক বিচিত্র প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করিলেন, ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তাহা যে মানবগৃহে বিশ্বচিত্তের একটী বিশিষ্ট প্রতীকে রূপান্তরিত হইবে কেহ কি তাহা কল্পনা করিয়াছিল? জীবনদেবতার সৃষ্টি-চাতুর্য্য আজ যাহা বিশ্বের নিকট ধরা পড়িয়াছে, তখন স্নেহপ্রবণ বাঙালী-হৃদয় ছাড়া আর কোথাও প্রকাশ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তাঁহার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে এত সমগ্র, সর্ব্বতোমুখী হইয়া দেখা দিয়াছে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা নিতান্তই বিরল। বিশ্বকবি আখ্যা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেমন খাটে, পৃথিবীর অন্য যুগে অন্য দেশের কোন কবির পক্ষে তেমন খাটে না। যাহা নাই রবীন্দ্রনাথে, তাহা নাই ভারতে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বা জনসাধারণের লৌকিক সাহিত্যের তিনি যে উত্তরাধিকারী শুধু তাহাই নহে। তাঁহার কাব্যে আমরা যেমন ভারতীয় সাহিত্যের সুদূর ঊষার স্নিগ্ধকিরণসম্পাত লক্ষ্য করি, যেমন মধ্যযুগের বৈষ্ণবকবিগণের রস-মাধুর্য্যের আস্বাদ পাই, আধুনিক অপরিচিত আউল-বাউলগণের হারানিধির সন্ধান পাই, তেমনি আরও পাই প্রতীচ্য সাহিত্যের তীব্র আবেগ, তাহার বাধাবন্ধনহীনতা, দেশকাল-বিবর্জ্জিত মানবিকতা। বিশ্বপ্রাণের সহস্র ধারা রবীন্দ্রনাথের ভাব ও কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বহু ও বিচিত্র ভাবে। এই কারণেই সকল দেশ ও কালের মহাকবিগণের সঙ্গে তাঁহার এত নিবিড় মিলন। তাই তাঁহার কাব্য যুগাতীত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে বিশ্বমানবিকতা নানা ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা তাঁহার সাহিত্যকে বিশ্বের নিকট অমর করিয়া রাখিবে। 'সোনার তরী', 'বলাকা', 'প্রবাহিনী', 'পূরবী' প্রভৃতির ভিতর যে বিশ্বমানবের মহাব্যাকুলতা ও আদর্শের প্রকাশ, তাহা যুগে যুগে বিশ্বের চিত্তকে হরণ করিবে। সহস্র যুগের সুখ-দুঃখে যে তাঁহার কাব্যের সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত, শতবর্ষ পরে যখনই

মানবের পিপাসিত চিত্ত অমৃতের সন্ধান করিবে, তাঁহার কাব্য শতলক্ষ সুরে অসংখ্য ভাবস্রোতে সে-পিপাসা মিটাইবে।

রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি আধুনিক নাটকগুলি, তাঁহার 'ঘরে-বাইরে', 'যোগাযোগ' প্রভৃতি উপন্যাস ও ব্যক্তির সহিত সমাজের, জীবনের সঙ্গে আবেষ্টনের, মানবের চিরন্তন গূঢ় পুলকের সহিত বিধিনিষেধ যন্ত্রতন্ত্রের যে অব্যক্ত বা পরিস্ফুট দ্বন্দ্ব উত্থাপিত করিয়াছে, তাহাও বিশ্বের বৃহৎ খেলাঘরের পরিচিত দ্বন্দ্ব। কবির নাটক-উপন্যাসেও আমরা যুগধর্ম্মের ইঙ্গিত পাই, বর্ত্তমান বৃহৎ রাষ্ট্র বৃহৎ যন্ত্র কর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত নরনারীর ব্যাকুল আলাপ-আবেদনের মধ্যে তাঁহার বিপুল আশ্বাসবাণী শুনি। বর্ত্তমান সভ্যতার প্রধান সমস্যা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব নহে, মানুষের সঙ্গে সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্র ও শিল্পযন্ত্রানুষ্ঠানের বিরোধ। পৃথিবীময় মানুষ সর্ব্বভুক্ অতিকায় রাষ্ট্র ও যন্ত্রপদ্ধতির কবলে আক্রান্ত, নিষ্পেষিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটক-উপন্যাসে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন সমগ্র ব্যক্তিত্বের জয় ঘোষণা করিয়াছেন, যেখানে মানুষের গূঢ় আনন্দের উৎস নিয়ত উৎসারিত হয়, শতলক্ষ বাধা অবহেলা করিয়া সেই গোপন পুরে তিনি বিশ্বের চিত্তকে লইয়া গেছেন।

কিন্তু একদিকে যেমন তিনি রাষ্ট্রের নির্লজ্জ পেষণ ও জাতীয়তার বিশ্বগ্রাসী হিংস্র আস্ফালন দূরে পরিহার করিয়াছেন, আর একদিকে তিনিই বাংলার সেই প্রথম রাষ্ট্রীয় ভাবুকতার যুগে জাতীয় আন্দোলনের একজন প্রধান পুরোহিত ছিলেন। পথে পথে সারে সারে 'বাংলার মাটী, বাংলার জল' গাহিয়া বাঙালী যে ভাবোন্মাদে দিশাহারা হইয়াছিল, সেই ভাবুকতার আশ্রয় হইয়াছিল কবিপ্রাণের মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ব্যাকুল আবেগে কবি যখন গাহিয়া উঠিয়াছিলেন—'এবার মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা ব'লে ভাসা তরী', বাংলার জাতীয় জীবনের শীর্ণতোয়া গঙ্গা তখন কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, রাষ্ট্রীয় কল্পনার সুন্দর তরণীতে পাল তুলিয়া তখন বাঙালী যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিল, সেই যাত্রার নিরন্তর সঙ্গী ছিলেন কবি। কূল নাই, সন্দেহের ঘোর অমানিশায়, নিরাশাঝটিকার ভরে তরণী নিমগ্নপ্রায়, কবির অভয়-আশ্বাসভরা বিশাল উত্তোলিত হস্ত তখন

দিক নির্ণয় করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় আবেদন-আন্দোলনের ভিক্ষার ঝুলি ত্যাগ করিয়া তিনিই ত প্রথম 'স্বদেশী সমাজ' গড়িতে বলেন। এখনও দেশের রাজনৈতিকগণ পার্লামেণ্ট শাসনের মোহে অন্ধ। কিন্তু কখনও ভারতবর্ষ যদি আপনার সমাজ-বিন্যাস ও পল্লী-সভ্যতার উপযোগী প্রজাতন্ত্র গড়িয়া তুলিবার সুযোগ পায়, তাহাতে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্তৃত্বের পরিবর্ত্তে জাগিবে জনসাধারণের কর্ম্মদক্ষতা এবং তাহার কেন্দ্রস্থল হইবে স্বাধীন সর্ব্ব-শিক্ষা-অনুষ্ঠানের আধার পল্লীগ্রাম। অসংখ্য বন্ধনহীন পল্লীর সমবায়ে যে বৃহৎ রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে তাহা পার্লামেণ্টের মত কৃত্রিম বিদেশী নহে, তাহাই ভারতের সমাজ-শান্তির আশ্রয়, সভ্যতার পরিপোষক হইবে। রাষ্ট্র-গঠনের দিনে আজ 'স্বদেশী সমাজের' ইঙ্গিত ভুলিলে দেশের অনিষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রীয় ব্যাপার জিনিষটা আজকাল বণিকের ক্রয়-বিক্রয়ের মত দাঁড়াইয়াছে। রাষ্ট্রশক্তি যে সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তির প্রকাশ, তাহা ভুলিলে চলিবে না। রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজ-বিন্যাসের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ দেশনায়কের কল্পনা করিয়াছিলেন শুচি ত্যাগী ব্রাহ্মণের সৌম্য মূর্ত্তিতে। যে-শ্রেণী রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, তাহা যদি অব্রাহ্মণের মত রাজপদ-প্রত্যাশী বা যশ-প্রতিষ্ঠার ভিখারী হয়, তাহা হইলে ঘোর অমঙ্গলের সম্ভাবনা। সৌভাগ্য-বশতঃ দেশের জনসাধারণের পক্ষে যাঁহারা ভারতীয় স্বাধীনতার আজ দাবী করিতেছেন তাঁহারা নিস্পৃহ, নিষ্কাম। জাতিধর্ম্ম হিসাবে রাজ-নৈতিক ব্রাহ্মণপর্য্যায় ভুক্ত হওয়া চাই, তবেই দেশের ও দশের কল্যাণ।

পররাষ্ট্র অপেক্ষা বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষা দেশের পক্ষে অধিকতর অনিষ্ট-প্রদ, এ ধারণা আজ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের উত্তেজনায় আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশই অগ্রণী। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রথম অধিবেশনের দিনে বাঙালীর কবি রবীন্দ্রনাথ শুভমঙ্গলাশীর্ব্বচন করিয়াছিলেন। সাহিত্যসম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের দিনেও রবীন্দ্রনাথ বাংলার পল্লীজনপদের গাথা আখ্যায়িকা কথা কাহিনী সংগ্রহের জন্য দেশকে আহ্বান করিয়াছিলেন। জাতির মর্ম্মকে খুঁজিতে চাহিলে যে রাজধানীর বিপুল অট্টালিকাবিপণি ত্যাগ

করিয়া পল্লী-প্রান্তরে কথক ভিখারী আউল বাউলের সঙ্গে ফিরিতে হয় তাহা তিনি তখন বুঝাইয়াছিলেন। জাতীয় ইতিহাস, লোক-সাহিত্য, লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান, আমোদ-প্রমোদ, লৌকিক চারুশিল্পকলা ইত্যাদি দেশের বিচিত্র মনোময় রূপটী উদ্‌ঘাটন করে। নিরাভরণা পল্লীবধূর মত ইহা আজকালকার বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষা-প্রাপ্ত নবীন যুবকের চক্ষু এড়াইয়াছে, কিন্তু এই রূপটীর অভিব্যক্তির উপর, জনসাধারণের অন্তর্জীবনের বাধা-বন্ধনহীন বিকাশের উপর, দেশের ভবিষ্যৎ সভ্যতা নির্ভর করিতেছে। কি হইবে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লইয়া যদি আমরা লৌকিক আমোদ-প্রমোদের আনন্দ হারাই, পল্লী-কুটীরের শিল্পকলার কৌশলচাতুর্য্য নষ্ট করিয়া বসি, অজ্ঞ ও নিরক্ষর সাধারণের সহজ সরল ধর্ম্মবোধকে অবহেলা করি। সভ্যতার প্রাণবস্তু প্রকাশ পায় শুধু রাষ্ট্র ও সমাজবিন্যাসে নহে—জাতির শিল্পপ্রণালীতে, তাহার চারুশিল্পকলায়, তাহার লৌকিক আনন্দ-উৎসবে, তাহার সাধারণ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানে। রবীন্দ্রনাথ এই বহুমুখীন জাতীয়তার পরিপোষক। জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় চিত্রকলা, জাতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের যখন যাহা কিছু উদ্যম ও আয়োজন এদেশে দেখা গিয়াছে, তাহাদের সকলেরই মধ্যে তাঁহার উদার সৃষ্টিকুশল ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে।

শান্তি ও শ্রী-নিকেতনে তিনি যে নূতন শিক্ষাবিধির আয়োজন করিয়াছেন তাহারও লক্ষ্য চিত্রকলা, সঙ্গীত, উচ্চসাহিত্য, দর্শন, কৃষি সব ক্ষেত্রেই জাতীয় স্বরূপটী ফুটাইয়া তোলা এবং তাহার সাহায্যে কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজের নহে, জনসাধারণের আত্মনিহিত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। উচ্চশিক্ষিত ও জনসাধারণের মধ্যে যে-বিচ্ছেদ দেশে দেখা গিয়াছে, তাহা তিনি দূর করিতে চাহিয়াছেন এক নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে বিজ্ঞান কৃষি এবং যন্ত্র সকল দিক হইতে নিরন্ন নিরক্ষর ও নিঃসহায় কৃষকের প্রয়োজনে নিয়োজিত হয়। শ্রী-নিকেতনের আদর্শে উচ্চশিক্ষিতেরা নির্ব্বাক জনসাধারণের জীবনযাত্রার ভার লইতেছে। নানা মেলা উৎসব পার্ব্বণে জনসাধারণের সহিত বিশ্বভারতীরও যোগ রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন রাশিয়ায় যাইয়া সেখানকার জনসমাজের

শিক্ষাবিধি ও সমবেত লোকযাত্রার এত পক্ষপাতী হইয়াছেন তাহার মূলে রহিয়াছে সমাজের প্রতি স্তরেই যে মানবাত্মা সৃষ্টির প্রয়াসী তাহার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা। বাস্তবিক একদিকে এ দেশের কৃষকসমাজের জড়তা ও নিঃসহায়তা এবং রাশিয়ার জনসাধারণের পূর্ণ জাগরণ তাঁহার অন্তরে যে-আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছে, তাহার ফলে দেশে যদি পল্লী-সংস্কারের একটি নূতন উদ্যম শ্রী-নিকেতনকে কেন্দ্র করিয়া প্রসারলাভ করে তাহা হইলে জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ হইবে, সন্দেহ নাই।

এ-দেশের নিয়মই এই যে, যখন কোন যুগ-প্রবর্ত্তক আসিয়াছেন তখনই তিনি তাঁহার চিন্তা ও কর্ম্মের মধ্যে একটা নূতন ধর্ম্মের সাধনা ও আদর্শের ইঙ্গিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে গানে ও চিন্তায় যে একটা নূতন মর্ম্মবাণী শুনাইয়াছেন তাহারও সন্দেহ নাই।

যে-কবি জীবনের মধ্যাহ্নে "বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি যে ধর্ম্মজীবনে শাস্ত্র ও আচারের বাহিরে জীবনের সহজ সরল গতির ইঙ্গিতের মধ্যে সাধনার গভীর আদর্শের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিচিত্র নহে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যে বৈষ্ণব পদকর্ত্তা, মরমিয়া বা বাউলগণ এত প্রিয় তাহার প্রধান কারণ ইঁহারা দেবতাকে মানব-সম্বন্ধের ভাবাতিশয্যের মধ্যে একেবারে আপনার ঘরের মানুষ করিয়া লইতে পারিয়াছেন। ধর্ম্মের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ মানবিকতা-কেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। মানুষ দেবতার সঙ্গে সমান, দেবতা মানুষের নিকট তাহার অসীম প্রেমে অনন্তকাল বাঁধা। সে-প্রেমেরও যেমন বিনাশ নাই, দেবতা ও মানুষের চিরন্তন লীলার ও তাহাদের নিবিড় বিচিত্র সম্বন্ধেরও অন্ত নাই। কিন্তু মানব-মনের ভাব ও অভিজ্ঞতারও একটা সীমা আছে। কবি তাহারও নির্দ্দেশ পাইয়াছেন। তাই কবির বন্ধনে একটা অজানা অপরিচিতের যাক্সা আছে, যাহা মানবকে কোন সুদূর অলক্ষিতের ঠিকানা দেয়।

আমারে বাঁধ্‌বি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে?—
আমি যে বন্দী হতে সন্ধি করি সবার কাছে॥

সে যে ভাই হাওয়ার সখা, ঢেউয়ের সাথী, দিবারাতি গো।
কেবলই এড়িয়ে চলার ছন্দে তাহার রক্ত নাচে॥

নানা গানে ও কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই সহজ যোগসাধনার ইঙ্গিত করিয়াছেন। যেমন প্রেমে তেমনি বন্ধনে বিশ্বতত্ত্ব সহজ ও সমান ভাবে পাওয়া ভারতের উপনিষদের ঋষির যেমন সাধনা ছিল—তেমনি উত্তর ভারতের মরমিয়ার ও বাংলার নাথযোগী বৈষ্ণব ও বাউলের সাধনা। "যত্র তত্র মনো যাতি তত্রৈব ব্রহ্মদর্শনম্" যেমন উপনিষদের বাণী, তেমনি উত্তর ভারতের মরমিয়ারও। এই বিশ্বতত্ত্ব মরমিয়ার একটী সুন্দর গানে সে-দিন শুনিলাম,—"মরমিয়ার কাছে মিলনেও যাহা বিচ্ছেদেও তাহাই, তিনি যে সকল স্থানে সকল কার্য্যে। সুতরাং, ধ্যান কিম্বা কাম দুয়েতেই তাঁহার পরিচয়।" ইহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের—

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

—কোন প্রভেদ নাই।

জীবনের নানাবিধ ক্ষুদ্র ঘটনা রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টি এড়ায় নাই। ইতিহাসের রাজা-বাদশাহের কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী কেহ ভুলে না; কিন্তু তিনি সংসারের অভ্যস্ত পরিচিত জিনিষেও লোকাতীত আনন্দ পাইয়াছেন, এবং সেগুলিকে গানে গাঁথিয়া, ছন্দে বাঁধিয়া সৌন্দর্য্যের অমরাবতীতে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। সংসারের হাজার আবর্জ্জনা ও বেদনার স্তূপে কবি নিঃশঙ্ক সহজ চিত্তে দিন অতিবাহিত করিয়াছেন, চারিদিক হইতে অমৃত সঞ্চয় করিয়া, যাহা কুৎসিৎ তাহাকে দূরে ফেলিয়া।

বাঙালীর ধর্ম্মজীবনে যখন যে-সাধনা দেশের প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে, তাহারই মধ্যে আমরা দুই বিপরীত ভাবের সমন্বয় দেখিতে পাই। বাঙালী যুগে যুগে ফিরিয়াছে এক দিকে, মনোময় পথে গুহাহিত পরম অমৃতের সন্ধানে; অপর দিকে সেই লোকাতীত পরম বিশ্বতত্ত্বকে প্রাণের নানা ছন্দে, নানা ভাষায় ও বিচিত্র লীলায়িত গতিতে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। অধ্যাত্মজীবনের এই অন্তর ও বাহিরের সমাবেশ অতি সুন্দর ও সহজ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে বাঙালীর নির্জ্জন সাধনায়,

বাঙালীর লৌকিক ধর্ম্মের বিরাট আয়োজন-উৎসবে, তাহার নৃত্যগীত-সংকীর্ত্তনের উন্মাদক অনুরণনে। এই জাতিগত সাধনা রবীন্দ্রনাথের জীবনে ধর্ম্ম ও কর্ম্মে প্রকাশ পাইয়াছে বিচিত্রভাবে, নূতন নূতন রূপে। এক দিকে তাঁহাতে পাই তুরীয়-পথযাত্রীর সীমাহীন নির্জ্জনতা, অপরদিকে অসংখ্য মানবের দুঃখে বেদনায় হাসিতে অশ্রুতে দৈনন্দিন লোকযাত্রায় আপনার প্রাণকে নিঃশেষ করিয়া বিলাইয়া দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অপরূপ বিচিত্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে বাঙালীর যুগ-যুগান্তর-লব্ধ আধ্যাত্ম-সাধনা।

বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে যে কত বড় মরমিয়া এবং বাঙালীর ভাবসাগরের কত গভীর অতলে গিয়াছেন তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বিশ্বের প্রাণবস্তুর সহিত তাঁহার সহজ লক্ষবিধ আনন্দযোগ। কবির সমস্ত কাব্য তাঁহার জীবনের মত বার বার সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়—সেই দিবসের কথা, 'মন যবে ছিল মোর সর্ব্বব্যাপী হ'য়ে জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে, আকাশের নীলিমায়'; কুসুম-কোরক হইয়া যখন তিনি আকুল আনন্দে বৃন্তের মুখে ফুটিয়াছেন, আপনার মাঝে ষড়ঋতুর হিল্লোল, তরুরাজির পত্রফুলফলবর্ষণ কিম্বা জন্ম-মৃত্যুর অন্তহীন সমুদ্রদোলন অনুভব করিয়াছেন। কবির জীবন-দেবতাও আর কিছু নহে সেই বিশ্বের প্রাণবস্তু ছাড়া। তাই কবি বিশ্বের নব নব রূপ নব নব শোভার মধ্যে আপনাকে 'নিতুই নব' করিয়া পাইয়াছেন; জীবনকুঞ্জে তাঁহার অভিসার-নিশা কখনও যে ফুরায় নাই। তাঁহার রস-ভরপূর জীবনের সঙ্গে বিশ্বের জীবন বাঁধা বলিয়াই কবি যখন আপনার হৃদয়বেগে গান গাহেন তখন তাহাতে বিশ্বচিত্তের স্পন্দন শুনা যায়। বসন্তকালের আম্রমুকুল-সুরভি সন্ধ্যায় তরুণ-তরুণীর গান যখন তিনি গাহিয়াছেন তখন তাহাতে সাড়া দিয়াছে বিশ্বের সকল তরুণ-তরুণী। আষাঢ়ের ঘন গম্ভীর অন্ধকারে যখন তিনি গাহিলেন তখন দেশকালের ভেদ রহিল না। অতীতকালের বিরহী যক্ষের বেদনা নবদম্পতির গূঢ় ব্যাকুলতার সহিত মিশিয়া গেল। হাজার হাজার গান তিনি লিখিয়াছেন, হাজার হাজার গানের রূপে তাঁহার ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন আজ

সহস্র দিকে বিস্তৃত। ঘরে ঘরে শত শত নরনারীর সংসার-খেলায় তিনি রহিয়াছেন, তাহাদের সরল জীবন-যাত্রা, সুখদুঃখ-বিষাদ-নিরাশার মধ্যে তিনি আজ অন্তরে অন্তরে গাঁথা। আর শতবর্ষ পরে বসুন্ধরার এই পরমাত্মীয়টীকে শারদীয় উষার প্রথম কিরণ-সম্পাতে স্বর্ণক্ষেত্রের শিহরণের মধ্যে ভবিষ্যৎ লোক প্রত্যক্ষ করিবে; যখন নদীপ্রান্তে বালুকার তীরে কৃষ্ণপক্ষের আধখানা চাঁদ দেখা দিবে তখন পথিক আর-একজন সঙ্গী পাইবে, আপনাকে একাকী নির্ব্বাসিত মনে করিবে না; বৈশাখের তাণ্ডবলীলায় যখন পৃথিবী সর্ব্বহারা, রিক্ত তখন তিনি ,শূন্যপথে জীর্ণবেশে বৈরাগীর একতারা লইয়া শতবর্ষ পরেও গাহিবেন, "তাইরে নাইরে নাইরে না"; চির-কলতান-উদার গঙ্গায় তরী বাহিয়া যখন কেহ সুদূর যাত্রায় বাহির হইবে তখন নদীজলে তাঁহারই গান ভাসিবে, নদীকূলের ছায়ানিবিড় কুটীরের সরস কৌতুকের মধ্যে তাঁহার হাসি সকলের মুখে ফুটিবে; আবার জীবন যখন নিরাশার অন্ধকারে ঢাকা, মহা আশঙ্কায় চিত্ত বিমূঢ়, তখন নরনারী তাঁহার ইঙ্গিত শুনিবে,

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা;

সকল আশা ভরসা জলাঞ্জলি দিয়াও নিদারুণ ভাগ্যকে তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবে "হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।" তাহার পর জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় যখন মন আশ্রয় খুঁজে, জন্মান্তরের জীবন-লীলার আনন্দ চাহে, তখনও তাঁহার আশ্বাস শুনিবে,—

কে বলে গো সেই প্রভাতে সেই আমি;
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি,
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসব যাব চির-দিনের সেই আমি।
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাকলে।

বিশ্বের বিপুল প্রাণের উৎস যেখানে সেখান হইতে কবি তাঁহার জীবন ও কাব্যের সন্ধান পাইয়াছেন। তাই কবির কাব্য তাঁহার জীবনের মতই সকলের পরমাত্মীয়, দেশ ও কালের বন্ধনমুক্ত, বিশ্বের মতনই চিরন্তন। কিন্তু কবি ধ্যানে বিশ্বের রহস্যময় শেষকেও পাইয়াছেন। সেথানে মানুষও নাই, বিশ্বও নাই। সেই নিগূঢ় নিস্তব্ধ তমসায় কবির কণ্ঠ নীরব, জীবন স্পন্দনহীন। সেই নামহীন, প্রেমহীন অন্ধকারে শতবর্ষ পরে জীবনদেবতা আবার কবিকে চিনিয়া মধুর চিরপরিচিত স্বরে ডাকিবেন। অমনি কবি কোন্ যুগান্তরে আবার গাহিয়া উঠিবেন, অমনি অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে আলোক জ্বলিয়া উঠিবে, সুরের ক্রন্দনে নিখিল বিশ্ব আবার জাগিবে কবির সঙ্গে,

সেথানে কি পুষ্পবনে গীতিহীনা রজনীর তারা
নবজন্ম লভি'
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী॥

অপূর্ব্ব মুকুরে

— শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

তোমার কবিতা নহে কবিতা কেবল—
সৃজিয়াছ মায়াঙ্কনে অপূর্ব্ব মুকুর···
সুখী দেখে আপনার হাসি-শতদল,
আপন বক্ষের শ্বাস বেদনা-বিধুর।—
যার চাহি ভগবান—চির-রূপ তাঁর
হেরে সে স্বরূপে—তাঁর হসিত আনন ;
অবিশ্বাসী দেখে তার কোথা’ অনাচার,
সন্দেহীর কোথা’ দুঃখ অজ্ঞাত পতন।—
পথভ্রষ্ট চলিয়াছে কোন্ মৃত্যু-পথে,
অন্তরাত্মা গুমরিছে কোন্ হতাশায়,
নিখিল হৃদয়হীন কোন্ মিথ্যা ব্রতে—
পরিণাম নাহি জানি’ ছুটেছে কোথায়···
আপনারে ছাড়ি’ বিশ্ব গেছে কত দূরে—
দেখায়েছ, ঋষি, তাহা তোমার মুকুরে।

রবীন্দ্রনাথ

— শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

কে জানে রহস্য এই, তোমারি স্বপন
নব নব রূপ নিল—নদী-গিরি-বন!
তব গোপনতা তার মহিমা বাড়ালো,
সবুজেরে ঘাস বলি, বলি না এ আলো।
যে-অঙ্কুর তোলে আজ উদ্ধত অঙ্গুলি
তোমা পানে স্পর্দ্ধাভরে, গিয়াছে সে ভুলি'
তব আলোকের সে যে নব রূপান্তর।
যে-মেঘেরে উচ্চে তোলো দিয়ে নিজ কর
তোমারে ঢাকিতে চায় তাহার আবেগ;
বিনিময়ে হাসো তুমি; দন্ত-কালো মেঘ
রঙে রঙে হেসে ওঠে সে-হাসির সাথে।
তোমার রঙীন ধনু হেরি তারি হাতে॥

চতুরঙ্গ

— শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, তাহাতে দুই পরস্পর-বিরোধী রসের সম্মিলন হইয়াছে। তাঁহাকে মিষ্টিক বা মরমী কবি বলা হইয়া থাকে। অথচ তাঁহার কাব্যের মধ্যে একটা বিশিষ্ট সুর আছে যাহা মরমী কবিদের কাব্যে সাধারণতঃ দেখা যায় না। মরমী কবি পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের অন্তরালে অরূপের সন্ধান করেন, ইহার বিচিত্রতার মধ্যে এক বিরাট একক আত্মার স্পন্দন শুনিতে পান। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মরমী কবিতার এই বিশেষ সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্য তাহার রূপের অফুরন্ত মাধুর্য্যও ফুটিয়াছে। বিদেশী কাব্যের সহিত তুলনা করিলে বলা যাইতে পারে যে, তিনি কীট্‌সের মত বাহ্য সৌন্দর্য্যের রূপ ও গন্ধ আহরণ করিয়াছেন, আবার শেলির মত অরূপরসেরও সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে অসীম ধরা দিয়াছে সীমার মধ্যে, অনন্ত তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে খণ্ড সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থলে। তিনি মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছেন অসংখ্য বন্ধনের মাঝে, তাঁহার মর্ম্মের গেহিনী মানসসুন্দরী ধরণীর প্রতিবেশিনী খেলার সঙ্গিনী হইয়া তাঁহার কাছে ধরা দিয়াছে, বিশ্বের বিচিত্ররূপের মধ্যে তিনি তাহাকে বধূরূপে বরণ করিয়াছেন। 'উর্ব্বশী মাতা নহে, কন্যা নহে, বধূ নহে—সে চিরসুন্দর। কিন্তু এই চিরসুন্দর বালিকাবয়সে মণিদীপদীপ্ত কক্ষে তাহার শৈশবের খেলা খেলিয়াছে, আর পৃথিবীর যত খণ্ড সৌন্দর্য্য তাহাও এই চিরসুন্দরেরই অভিব্যক্তি। অরূপকে রূপের ক্ষেত্রে আনিয়াই কবি সন্তুষ্ট থাকেন নাই, পৃথিবীর সমস্ত খণ্ডরূপের মধ্যে অরূপের সন্ধান করিয়াছেন। তাজমহল রূপের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, কিন্তু কবির কাছে তাহার বাহ্যরূপই শেষ কথা নহে, ইহার রূপকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে সেই বিরাট রূপহীন শক্তি—প্রিয়া যাহাকে রাখিতে পারে নাই, রাজ্য যাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে, সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী যাহাকে ভরিতে

পারে নাই। কবির পক্ষে "শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল"—প্রিয়ার রূপ ছবির খণ্ড সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করিয়া অরূপ অনন্ত হইয়া নিখিলের সত্তার মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। এম্‌নি করিয়া যাহা নিতান্ত দৈনন্দিন, একান্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ তাহার মধ্যে তিনি ভূমার সুষমা দেখিতে পাইয়াছেন। "যেতে নাহি দিব" কবিতাটিতে একটি ছোট মেয়ের ছোট ব্যথার কথা লেখা হইয়াছে। প্রতিদিন প্রতিগৃহে এম্‌নি কত ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিতেছে কে তাহার সন্ধান রাখে? কিন্তু এই ছোট মেয়ের ছোট ব্যথা—কবির কাছে ইহার মধ্যে নিখিল বিশ্বের বেদনা বাজিয়া উঠিয়াছে। আকাশে, আলোকে, বাতাসে তিনি এই ব্যথারই অভিব্যক্তি দেখিতে পাইয়াছেন।

(১)

একটু বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার মূল সূত্র রহিয়াছে এইখানে—রূপ ও অরূপের এই সম্মিলনে। তাঁহার অধিকাংশ গদ্যরচনার মধ্যেও এই অপরূপ মিলনের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। চতুরঙ্গ তাঁহার শ্রেষ্ঠ গদ্যকাব্য। ইহার মধ্যে এই দুইটি জিনিসকে পৃথক করিয়া ও মিলিত করিয়া দেখান হইয়াছে। চতুরঙ্গের সত্যিকার অঙ্গ হইতেছে দুইটি—ইহার মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধি ও অনুভূতির উপর ভর করিয়াছে আর কেহ কেহ রসের সন্ধান করিয়াছে। রূপ ও রসের এই লুকোচুরিই এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য। শচীশ এই দুইয়েরই সন্ধান করিয়াছে, কাজেই এই কাব্য বিশেষ ভাবে শচীশের মনের ইতিহাস। শচীশ নানা উপায়ে সত্যের সেবা করিয়াছে, বার বার তাহার মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু সত্যের প্রতি তাহার অনুরাগ চিরকাল অবিচলিত রহিয়াছে। তাহার চেষ্টা ও বিফলতায় একটা গভীর ট্র্যাজেডি আছে, কিন্তু শেষের দিকে একটা পরিপূর্ণতার সন্ধানও মিলিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শচীশের জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিস হইতেছে তাহার জ্যাঠামহাশয়ের সঙ্গ। এই জ্যাঠামহাশয়ের জীবনটা বড় অদ্ভুত। তিনি ছিলেন

ঘোর নাস্তিক, "তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন এমন কথা বলিলে কম বলা হয়, তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধজাহাজের কাপ্তানের যেমন জাহাজ চালান অপেক্ষা জাহাজ ডুবানই বড় ব্যবসা, তেমনি যেখানে সুবিধা সেইখানেই আস্তিক্য-ধর্ম্মকে ডুবাইয়া দেওয়াই জগমোহনের ধর্ম্ম ছিল।" যাহাকে আমরা ধরিয়া থাকি তাহা হইতেছে আমাদের ধর্ম্ম, কিন্তু অ-বিশ্বাসকে ধরিয়া থাকা যায় না, কাজেই তাহা লইয়া ধর্ম্ম হয় না। তাই জগমোহনের ধর্ম্মের একটা 'আস্তিক্য' দিকও ছিল। তাহা হইতেছে মানব-সাধারণের উপকার সাধন। তিনি মিল, বেন্থামের রচনা পড়িয়াছিলেন ও প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। কিন্তু এইখানেই ছিল প্রধান গলদ—আর এই গলদ শুধু তাঁহার ধর্ম্মের নয়, utilitarianismএর গোড়ায় গলদ। শুধু স্বার্থবুদ্ধি দিয়া মানবসাধারণের উপকারে আত্মনিয়োগ করা যায় না। জগমোহন ছিলেন বস্তুতান্ত্রিক ও বুদ্ধিজীবী। কিন্তু শুধু বুদ্ধি দিয়া পরোপকারের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি খুব তীক্ষ্ণধী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরোপচিকীর্ষার কোন সন্তোষজনক যুক্তি তিনি নিজেই দিতে পারেন নাই। এখানে তাঁহার যুক্তিতর্ক হার মানিয়াছে। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনে আপনার গরজটা কি" ?—তিনি বলিতেন, 'কোন গরজ নাই, সেইটেই আমার সবচেয়ে বড় গরজ'। তিনি শচীশকে বলিতেন, "দেখ্ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক থাকিতে হইবে।" ইহা যুক্তি হিসাবে একেবারে অগ্রাহ্য। ইহাতে শুধু একটা কথাই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, জগমোহনের বুদ্ধির অতীত এক বৃত্তি ছিল, যাহা তাঁহাকে অজ্ঞাতসারে অরূপের সন্ধান দিয়াছে। তিনি তাঁহার ভাই হরিমোহনকে বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মান, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি, তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়; তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।" কিন্তু তিনি একটা জিনিসে ভুল করিতেন, কোন কিছুকে মানিতে হইলেই একটা বৃত্তির দরকার,

যাহা চক্ষু-কর্ণের অতীত। যাহা সজীব ও রূপবান তাহাকে মানিতে হইলেই রূপের অন্তরালে যে-অরূপ রহিয়াছে তাহাকে উপলব্ধি করিবার শক্তি থাকা চাই। তাঁহার সেই শক্তি ছিল, কিন্তু বোধ ছিল না। তাই তাঁহার অনুভূতি চিরকাল অপরিপূর্ণ রহিয়া গেল। বিশ্বাস রূপকে আশ্রয় করে, কিন্তু তাহার নিজের কোন রূপ নাই। জীবনের বহু সত্যকে বুদ্ধি দিয়া উপলব্ধি করা যায় না, এবং এই বড় সত্যের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিল "পাপিষ্ঠা ননীবালা"। বিধবা ননীবালাকে পুরন্দর নানা উপায়ে লাঞ্ছিত করিয়াছিল। কিন্তু এই লম্পটকে ননী ভালবাসিত আর এই লম্পটই ছিল তাহার মৃত সন্তানের জনক। পুরন্দর প্রভৃতির অত্যাচার হইতে জগমোহন ননীকে উদ্ধার করিলেন এবং শচীশ তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইল। এই দয়া ও মহত্ত্বের সীমা নাই, এই বন্দোবস্তও হইল অতি চমৎকার বন্দোবস্ত। কিন্তু বুদ্ধি দিয়া ত সব জিনিসের পরিমাপ করা যায় না। ননীর মন কিছুতেই ধরা দিল না। বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে সে আত্মহত্যা করিল—একখানা চিঠিতে লিখিয়া রাখিয়া গেল, "বাবা, পারিলাম না, আমাকে মাপ কর। তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাঁকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই।"

(২)

জগমোহনের কাহিনী এইখানে শেষ। তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ শচীশের আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত। তিনি সমস্ত জীবন বুদ্ধির চর্চ্চা করিয়াছেন, সজীব দেবতাকে মানিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু ননীবালার আচরণ তাঁহার বুদ্ধির অতীত। পাপিষ্ঠ পুরন্দর তাহার সহিত পশুর মত ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু শেষে সেই পশুর কথা স্মরণ করিয়াই ননীবালা অন্য সকল আকাঙ্ক্ষা এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিল। "সজীব" দেবতার আইনের সঙ্গে ইহার ত কোন সংস্রব নাই। বুদ্ধি দিয়া এই ত্যাগের বিচার হইতে পারে না। তাই জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ এই বুদ্ধির বাঁধন ছিন্ন করিতে চাহিল। শচীশ বুঝিল যে, শুধু বুদ্ধি দিয়া সত্যের

গভীরতম উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় না, রূপ আপনাতে আপনি পরিসমাপ্ত নহে। রূপের মর্ম্মে যে-অরূপ রহিয়াছে তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, প্রত্যক্ষের দিবালোকের অতীত অন্তরীক্ষের যে অন্ধকার তাহাও কম সত্য নহে, এবং সেই গভীরতর সত্যের সন্ধান পাইতে হইলে বুদ্ধির অতীত বৃত্তির সাহায্য লইতে হইবে। তাই বুদ্ধিকে ছাড়িয়া সে এবার রসের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল। জ্যাঠামহাশয় শুধু কাজ বুঝিতেন, কাজেই শচীশ এবার এমন পথ গ্রহণ করিল যাহা সেই পূর্ব্ব পরিচিত পথের বিরুদ্ধগামী। জ্যাঠামশায় সব চেয়ে বেশী ঘৃণা করিতেন সন্ন্যাসীদের। তিনি বলিতেন, "এই বৈরাগীগুলা······ফেলিয়া দেওয়া মেকী টাকা, জীবনের কারবারে অচল।" সন্ন্যাসীরা নিবৃত্তি-পন্থী, কর্ম্ম-বিরাগী। তাঁহারা অরূপের সন্ধান করেন—আর এই সন্ধানের মধ্যেই শচীশ নিজেকে ভাসাইয়া দিল। সে নিজেই বলিয়াছে, "জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়াছিলেন তখন মুক্তি দিয়াছিলেন কাজের ক্ষেত্রে, ছোট ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোট ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সেই মুক্তিও ভোগ করিয়াছি, এখন রাতের বেলাকার এই মুক্তিই বা ছাড়ি কেন?" শচীশ সত্যের উপাসক—রূপাশ্রয়ী বুদ্ধিকে দিয়া যাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া পায় নাই এবার অরূপের সন্ধানী রসোপলব্ধির দ্বারা তাহার সেবা আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে সে যখন শ্রীবিলাসকে আলিঙ্গন করিয়াছে তখন বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে, আর এখন যে শ্রীবিলাসকে আলিঙ্গন করিল, সে-শ্রীবিলাস শ্রীবিলাস নহে—সে "সর্ব্বভূত"—একটা আইডিয়া। বন্ধুর রূপ আছে, সর্ব্বভূত অরূপ।

শচীশ খুব জোর করিয়া লীলানন্দ স্বামীর সেবা আরম্ভ করিয়া দিল এবং রসের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিল। বাহিরে দেখিয়া মনে হইল শচীশ নিজেকে গুরুর পা টেপা ও তামাক সাজার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু বাহিরের বন্ধনেই তাহার আত্মা মুক্তির আস্বাদ পাইল। লীলানন্দ স্বামী খুব একজন সাধারণ লোক। তাঁহার মধ্যে এমন কোন বিচার শক্তি ছিল না যাহা দ্বারা তিনি শচীশকে বাঁধিতে পারিতেন। এই

হিসাবে তিনি নিতান্ত নগণ্য লোক। কিন্তু লীলানন্দ স্বামী শুধু একটি উপলক্ষ্য মাত্র। শচীশের ইতিহাসের একটা প্রধান কথা হইতেছে তাহার মনের অবাধ উন্মুক্ত গতি। কাহারও দ্বারা সে ভারাক্রান্ত হয় নাই—বুদ্ধি ও তাহার নিজের, আর রসোপলব্ধি ও তাহার আপনার জিনিস। জ্যাঠামহাশয় গুরুগিরি জিনিসটিকে খুব অপছন্দ করিতেন, শচীশ ছিল তাঁহার সঙ্গী—চ্যালা নহে। আর এই লীলানন্দ স্বামী—ইনি শচীশের ভাবরসের রূপকমাত্র। শচীশের স্বাধীন মনকে তিনি কখনও ভারাক্রান্ত করিতে পারেন নাই। যেদিন শচীশের মনে হইয়াছে যে গুরু থাকাতে সত্যোপলব্ধির পথে বাধা হইতেছে, সেই দিনই অবহেলা-ভরে সে লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে। কোন জঞ্জালের বোঝা তাহার চিত্তকে চাপিয়া ধরিতে পারে নাই। শ্রীবিলাসকে সে বলিয়াছে, "ওগো, আমার অন্তর্য্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন—গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।...আর সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায় কিন্তু ধর্ম্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতে মুষ্টি ভিক্ষা নহেন, যদি তাঁকে পাই ত আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।" শচীশ যখন নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গুরুর সেবা করিয়া দিনরাত অস্থির হইয়া ছিল তখনও যে গুরু তাহাকে চঞ্চল করিত সে তাহার অন্তর্য্যামী—লীলানন্দ স্বামী অন্তর্নিহিত "ভাবরসের রূপক মাত্র।"

(৩)

কিন্তু লীলানন্দ স্বামীর আখড়ায় শচীশের সহিত আর একটি লোকের পরিচয় হইল; এই কাহিনীতে তাহার স্থান স্বামীজির চেয়ে অনেক উঁচুতে। দামিনী লীলানন্দ স্বামীর এক শিষ্যের বিধবা স্ত্রী। দামিনীর স্বামী জীবিত কালে স্ত্রীর প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য করিলনা, আর মরিবার সময়ও উইল করিয়া সমস্ত সম্পত্তি সমেত স্ত্রীকে গুরুর হাতে সমর্পণ করিয়া গেল। দামিনী রসের ধার ধারেনা, গুরুর প্রতি তাহার ভক্তি নাই। লীলানন্দ স্বামীকে সে অগ্রাহ্য করে, অবজ্ঞা করে, ঘৃণা করে। সে ভোগপিপাসু—

ধর্ম্মে তাহার মতি নাই। গুরুর কোন আদেশ সে পালন করিতে চায় না, সে তো নিবৃত্তিপন্থী নয়। শচীশ তাহার বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছে, "দামিনীর মধ্যে নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি—সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবন-রসের রসিক।...সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না, পণ করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু ভোগপিপাসু হইলেও দামিনী ভোগের কীট নহে। শচীশ জীবন ভরিয়া সত্যের সন্ধান করিয়াছে, দামিনীও তেমনি সত্যের উপাসক। ভোগের মধ্য দিয়া সে সত্যকে চাহিয়াছিল, যেমন করিয়া শচীশ সত্যের সন্ধান করিয়াছিল রসোপলব্ধির পথে। কাজেই দামিনীর একটা প্রবল আকর্ষণ রহিল সেই মহামানবের প্রতি, যে লোভের পথ ও লাভের পথ বর্জ্জন করিয়া রূপহীন রসের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। দামিনী লীলানন্দকে চিনিয়াছিল, সে শচীশকে বুঝিতে চেষ্টা করিল। সে জানিত যে, লীলানন্দ স্বামী সংসার ত্যাগ করিলেও লিপ্সা বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তিনি "দলচর" লোক—তাঁহার কাছে সত্য অপেক্ষা দলের মূল্য বেশী। তিনি দল ভর্তি করিতে চাহেন—তাঁহার কাছে রস-সন্ধানের আড়ম্বর আছে, কিন্তু রসোপলব্ধির দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই। তিনি দামিনীর স্বামী শিবতোষকে, দামিনীকে, শচীশ ও শ্রীবিলাসকে তাঁহার দলে টানিয়া আনিয়াছেন—তাঁহার ভোগের লোভ না থাকিতে পারে, কিন্তু শিষ্যের লোভ আছে। কিন্তু শচীশ অন্য ধাতের মানুষ। তাহার মধ্যে দামিনী দেখিল সেই নির্লিপ্ততা, যাহা প্রকৃত রস-সন্ধানীর নির্লিপ্ততা, যাহা শ্রীবিলাসের মত অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও সর্ব্বভূতে মিলাইয়া দেয়। তাই দামিনী চাহিয়াছে শচীশকে বশ করিতে, সেবা করিতে, পূজা করিতে। শচীশের শারীরিক ক্লেশ দূর করা, তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়ান—ইহাই হইল দামিনীর শ্রেষ্ঠ কাজ। সে নিজেই বলিয়াছে, "আমি যে স্ত্রীজাত—ঐ শরীরটাকেই দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম্ম। ও যে একেবারে মেয়েদের কীর্ত্তি। তাই যখন দেখি শরীরটা কষ্ট পাইতেছে তখন এত সহজে আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে।" দামিনী রূপ-পন্থী, শচীশ

রূপকে ছাপাইয়া রসের সন্ধান করে। শচীশের কাছে দেহের কোন মূল্য নাই, কারণ রসের তো কোন রূপ নাই। দামিনীর কাছে দেহের মূল্যই সবচেয়ে বেশী, কারণ দেহ যে রূপের আধার।

শচীশের সংস্পর্শে আসিয়া দামিনীর বিদ্রোহবহ্নি নিবিয়া গেল। সেবা খুব বাস্তব concrete জিনিস, বাস্তবপন্থী দামিনী তাহার মধ্যে পরিতৃপ্তির আস্বাদ পাইল। শচীশও তাহার শান্ত, নম্র, সংযত ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইল, কিন্তু সে দামিনীকে চিনিতে পারিল না। সে দামিনীর শোভাই দেখিতে পাইল—কিন্তু দামিনীকে দেখিতে পাইল না। সে বুঝিল না যে, ইহা ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা নহে, লীলানন্দ স্বামীর প্রতি ভক্তি নহে—ইহা সেবার পরিতৃপ্তি, রসোপলব্ধির পরিপূর্ণতা নহে। যে রূপকে ত্যাগ করিয়াছে, যে দেহকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, যে অরূপ অনন্তের সন্ধানী, দামিনী তাহাকে আপনার করিয়া পাইতে চাহে, ভক্তিবিহ্বলচিত্তে তাহার সেবা করিয়া নিজেকে চরিতার্থ করিতে চাহে। শচীশের জীবনের যে-দিকটা রসের প্রতি উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, দামিনী তাহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, কিন্তু তাহার প্রতি তাহার ভক্তি আছে। যে-রূপের রাজ্য শচীশ অতিক্রম করিয়াছে সেইখানেই তাহার বাস এবং সেইখানে বসিয়াই সে তাহাকে পাইতে চায়। এই সেবা কোন আইডিয়াকে সে দেয় নাই—ইহা সে দিয়াছে রক্তমাংসে গড়া শচীশকে। এই সেবা চরমে পঁহুছিল সাগরতীরে সেই গুহার মধ্যে যেখানে রাত্রিতে দামিনী শচীশের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল। শচীশ ভাবরসের রসিক—বাহিরের বাস্তব পদার্থের সঙ্গে তাহার সংস্রব নাই। অন্ধকারে যে রমণী তাহার পা জড়াইয়া ধরিল, তাহাকে সে চিনিতেই পারিল না—তাহার মনে হইল—"এ এক আদিম বুনো জন্তু, ইহার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে ;—সে অনন্ত কাল এই গুহার মধ্যে বন্দী—তার মন নাই,—সে কিছুই জানে না। কেবল তার ব্যথা আছে—সে নিঃশব্দে কাঁদে।" না বুঝিয়া শচীশ দামিনীর মনের কথা ঠিক করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছে। দামিনী সৃষ্টির প্রথম জন্তু—যাহার দেহ আছে, অনুভূতি আছে, যে বাস্তবকে চেনে ও তাহাকে চায়। সে ঐ আশ্রমের

রসের গুহায় আবদ্ধ হইয়া আছে—সেখান হইতে মুক্তি চায়, শচীশকেও মুক্ত করিয়া লইতে চায়। কিন্তু শচীশ তাহাকে বুঝিল না, চিনিল না। শচীশ এখন রসে ভরপূর—রূপকে অগ্রাহ্য করিল। শচীশ এই জন্তুকে পা ছুঁড়িয়া লাথি মারিল—অন্ধকারে সে চলিয়া গেল।

সেই হইতে দামিনী আবার বিদ্রোহী হইল। তাহার সাধনা ছিল শচীশকে রসের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আনা। সেই শচীশ তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে—কাজেই ইহাদের সেবায় তাহার আর আনন্দ নাই। দামিনী হইল তাহাদের রসসেবার মূর্ত্তিমান রসভঙ্গ। শচীশ একদিন তাহাকে রসচর্চ্চার মাহাত্ম্য বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু সেইদিন রাত্রিতে শচীশ দামিনীর মর্ম্মের কথা বুঝে নাই, আজ দামিনী শচীশের মুখের কথা শুনিবে কেন? শচীশ দামিনীকে রসের শান্তির আস্বাদ গ্রহণ করিতে বলিল, দামিনী তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার মন অশান্ত হইতে পারে, কিন্তু শচীশের পথ শান্তির পথ নহে। মাটির পৃথিবীতে অবশ্য শান্তি নাই, কিন্তু রসের স্বর্গেই বা শান্তি কোথায়? অলক্ষ্যে এই কথাটা শচীশের মনে একটা গভীর রেখাপাত করিল। এতদিন সে দামিনীর বাহিরের শোভা দেখিয়াছে এবার তাহার অন্তরের ব্যথা অনুভব করিল। পৃথিবীর বুকের ভিতরকার কান্না আজ রসের সমুদ্রে ঢেউ তুলিয়া দিল। রূপ ও রসের দ্বন্দ্বের এই আর এক পর্ব্ব আরম্ভ হইল। শ্রীবিলাস বলিয়াছে, "গুরুজি, আমাদের দুজনকে যে রসের স্বর্গলোকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, আজ মাটির পৃথিবী তাহাকে ভাঙ্গিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিল। এতদিন তিনি রূপকের পাত্রে ভাবের মদ কেবলি আমাদিগকে ভরিয়া ভরিয়া পান করাইয়াছেন, এখন রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকি হইয়া পাত্রটা মাটির উপরে কাৎ হইয়া পড়িবার জো হইয়াছে।" জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে শচীশ শুধু বাস্তবের চর্চ্চা করিয়াছে। কিন্তু ননীবালা তাহাদিগকে নারীর এক বিশ্বরূপ দেখাইল যাহাতে বাস্তবের প্রতি তাহার বিশ্বাস বিচলিত হইল। যে-নারী পাপিষ্ঠের কলঙ্ক গ্রহণ করিয়া, নিজেকে হত্যা করিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিয়া দিল, সেই মরণ-রসিক রমণী তাহাকে প্রথম অরূপ রসের সন্ধান দিয়াছিল। আর যে এই রসের স্বর্গ হইতে মাটির পৃথিবীতে তাহাকে

টানিয়া আনিল,—সেও আর এক নারী। জ্যাঠামশায় সজীব বাস্তবকে ভালবাসিতেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সন্ন্যাসীর নির্লিপ্ততা ছিল। তিনি জীবিত কালে পরের উপকার করিয়া বেড়াইয়াছেন আর নাস্তিক হইয়াও martyrর মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। কিন্তু দামিনী নির্লিপ্ত নহে, তাহার ব্যক্তিগত জীবনের ব্যথাই তাহাকে রসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়াছে। সে শুধু পৃথিবীর ভোগ বাড়াইতে চায় না, নিজেও ভোগ করিতে চায়। জ্যাঠামহাশয় বস্তুকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার বুদ্ধিকে দিয়া, তিনি রসের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতেন। দামিনী বস্তুকে চাহিয়াছিল অনুভূতির দিক দিয়া। রসের অস্তিত্ব লইয়া সে মাথা ঘামায় নাই, সে দেখিয়াছে সংসারের ক্ষেত্রে ইহা অচল। নবীনের স্ত্রী তার মাতৃহীনা বোন্‌কে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল। ইহারা কুলীন, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া দায়। মেয়েটিকে দেখিতে ভালো। নবীনের ছোট ভাই তাহাকে বিবাহ করিবে বলিয়া পছন্দ করিয়াছে।............এমন সময়ে নবীনের স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িল যে, তার স্বামীর ও তার বোনের পরস্পর আসক্তি জন্মিয়াছে। তখন তার বোন্‌কে বিবাহ করিবার জন্য সে স্বামীকে অনুরোধ করিল। ....বিবাহ চুকিয়া গেলে পর নবীনের প্রথমা স্ত্রী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিল। দামিনী শচীশকে কহিল, "আমাকে বুঝাইয়া দাও তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাতে পৃথিবীর কি প্রয়োজন? তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে?......তোমার গুরু যে-পথে সবাইকে লইয়া যাইতেছেন সে-পথে ধৈর্য্য নাই, বীর্য্য নাই, শান্তি নাই। ঐ যে মেয়েটা মরিল, রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কি তার কুৎসিত চেহারা সে তো দেখিলে?" নিছক আত্মত্যাগে রস থাকিতে পারে, কিন্তু রূপ নাই। সকল আদর্শই রূপহীন, কাজেই যাহারা বস্তুকে চায় তাহারা আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ননীবালা ও নবীনের স্ত্রী জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহাদের নিজেদের জীবন যে ব্যর্থ হইয়া গেল, সেই শূন্যতা ভরিবে কিসে?

শচীশকে দামিনী গুরু বলিয়া মানিয়া লইল। সে তাহার কাছে এমন মন্ত্র চাহিল যাহাতে সে বাঁচিয়া যাইতে পারে। শচীশ দামিনীকে কেমন

করিয়া বাঁচাইল তাহার আলোচনা পরে হইবে। কিন্তু দামিনী শচীশকে বাঁচাইয়া দিল—শচীশের জীবনে ইহাই বড় কথা। শচীশ বুঝিল যে, রূপহীন রস, অনুভূতিহীন উপলব্ধি, প্রীতিহীন ধর্ম্ম—ইহার কোন মূল্য নাই। সে ধীরে ধীরে তাহার অন্তর্য্যামীকে চিনিতে পারিল। সে বুঝিতে পারিল যে, রূপ ও রসের সম্মিলনেই সত্য। যিনি বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি রূপহীন, তিনি সচ্চিৎ। তাই তিনি নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন বিশ্বরূপে, বিশ্বের অনন্ত বিচিত্রতায়। কিন্তু এই অনন্তরূপ একটা জিনিসেরই অভিব্যক্তি—সেই অভিব্যক্তি হইতেছে প্রাণরসের। সৃষ্টির মূলে আনন্দানুভূতি আছে কি না তাহা লইয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু অশরীরী শক্তি যে বিচিত্র উপায়ে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? Life force, Evolution, Creative Evolution—ইহারা এই রূপহীন অনন্ত শক্তির বিভিন্ন নাম মাত্র। মানবজাতি এই চির-প্রকাশমান অরূপ শক্তির অভিব্যক্তির একটা অঙ্গ। এই প্রকাশ এইখানে থামিয়া যায় নাই, কারণ অভিব্যক্তির স্রোত কোথায়ও নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারে না। মানুষকে মনে রাখিতে হইবে যে, সেই শক্তির অভিব্যক্তি হইয়াছে রূপের মধ্য দিয়া, কাজেই রূপকে ছাড়িয়া যে-রস তাহাতে মুক্ত আত্মার আনন্দ থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষ তাহাকে লইয়া বাঁচিতে পারে না। মানুষের আনন্দ মুক্তিতে, কিন্তু সেই মুক্তি আসিবে অসংখ্য বন্ধনের মাঝে। তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, যাহার সন্ধানে সে ফিরিতেছে, সেই অরূপ ধরা দিয়াছে রূপে এবং সে নিজেও এই রূপের একটি অঙ্গ। আবার তাহাকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, রূপ যদি তাহার নিজের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হইয়া যায়, তবে তাহা পঙ্গু হইবে; তাহাতে সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু সুন্দর তাহাকে ছাপাইয়া উঠিবে। জ্যাঠামহাশয় যে-বাস্তবকে লইয়াছিলেন, দামিনী যে-রূপের উপাসনা করিয়াছে তাহাতে পৃথিবীর প্রয়োজন থাকিতে পারে কিন্তু তাহা অপূর্ণতায় ভরা। তাই জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যুর পরেই সে জ্যাঠামশায়ের চিহ্নিত পথ ছাড়িয়া দিল। আবার দামিনী যখন তাহাকে ঘরে লইয়া যাইতে চাহিল, তখনও সে বলিয়া উঠিল, "যাঁকে আমি খুঁজিতেছি

তাঁকে আমার বড় দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া কর, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।"

কিন্তু নিছক রসচর্চ্চায়ও কোন শান্তি নাই, কোন সত্য নাই, কারণ, পৃথিবীতে তাহার কোন প্রয়োজন নাই, তাহা মরণ আনিতে পারে কিন্তু বাঁচাইতে পারে না। শচীশের আবার পরিবর্ত্তন হইল, আর সেই পরিবর্ত্তনেরও একটা বৈশিষ্ট্য রহিল। "একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁওয়া, স্নান-তর্পণ, যোগ-যাগ, দেব-দেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না ; তারপর একদিন এই সমস্তই মানিয়া লওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল—কি মানিল আর না মানিল কিছুই বোঝা গেল না।" এখন শচীশ মানা না-মানার অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছে। সে বুঝিয়াছে মানা আর না-মানা—উভয়ই খণ্ড সত্যানুভূতির ফল। যে রূপকে ভালবাসে সে রসকে মানিবে না, যে রসের স্বর্গে আছে সে মাটির পৃথিবীকে মানিতে চাহিবে না। কিন্তু রূপ ও অরূপের মিলনেই তো পরিপূর্ণ সত্য। তাহার কাছে কোন বিশেষ কিছু মানা না-মানার প্রশ্ন অবান্তর। রূপের অন্তরে রহিয়াছে অরূপ আর অরূপ নিজেকে ধরা দিয়াছে রূপের বন্ধনে। ইহার পূর্ব্বে সে শান্তি খুঁজিয়াছে, কিন্তু পায় নাই। দামিনী তাহাকে বুঝাইয়াছিল যে, তাহারা যে-রসের চর্চ্চা করিত তাহাতে কোন শান্তি নাই, তাহারা দিন-রাত্রি ঢেউ তুলিয়া পাগল হইয়াছে, কিন্তু পরিতৃপ্তি পায় নাই। কিন্তু আজ শচীশ শান্ত, নীরব হইয়া বসিল। আজ আর কোন ঝঞ্ঝা তাহাকে আলোড়িত করিতে পারে নাই। আজ আবার সে কাজ আরম্ভ করিল—"আগেকার মত আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে, কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের ঝাঁঝ নাই। আগেকার মত কাজ আছে, কিন্তু আগেকার মত কোলাহল নাই। কাজের অতীত যে অমৃত আলোক, এবার সে তাহারই সন্ধান পাইয়াছে, কাজ যে শুধু আপনার মধ্যেই পরিসমাপ্ত হয় না, বস্তু যে তত্ত্বেরই রূপমাত্র, এবার সেই সত্য সে উপলব্ধি করিয়াছে। রূপের মধ্যে পরিতৃপ্তি আছে, কিন্তু পরিপূর্ণতা নাই, আবার রসের মধ্যে পরিপূর্ণতা আছে, কিন্তু

পরিতৃপ্তি নাই। রূপের মহিমা অরূপে, কিন্তু রূপকে ছাড়িয়া সে বাঁচিতেই পারে না। এই সত্য দামিনী শিখিল শচীশের সংস্পর্শে আসিয়া, কিন্তু এই দামিনীকেই সে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। দামিনী একজন মানবীমাত্র, তাহার সেবা-যত্নের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করিলে নিজের সত্তাকে খণ্ডিত করিয়া ফেলা হইবে। সে যাঁহাকে চায়, তিনি যে বিশ্বরূপ, সমগ্র বিশ্বে তাঁহার প্রকাশ, সমগ্র বিশ্বের কর্ম্মে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। লীলানন্দ স্বামীর আখড়ায় যখন সে রসচর্চ্চায় নিমগ্ন হইয়া ছিল, তখন শ্রীবিলাসকৈ আলিঙ্গন করিয়াছিল—বন্ধুহিসাবে নহে, একটা রসের রূপক হিসাবে। সে শ্রীবিলাস সর্ব্বভূত, সে একটা আইডিয়া। এখনও সে দামিনী ও শ্রীবিলাসকে ভালবাসিত, তাহাদের বিবাহে উপস্থিতও হইল। কিন্তু তাহারা বিশেষ প্রিয় বলিয়া নহে, বিশ্বরূপের তাহারা যে একটা অংশ, "সর্ব্বভূত" যে তাহাদের মধ্যেও অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহারা শুধু আইডিয়া নহে, শুধু ব্যক্তিও নহে—তাহারা সজীব বিশ্বের অংশ। শচীশ সন্ন্যাসীর মত নির্লিপ্ত নহে, আবার ভোগীর মত লিপ্সুও নহে। শচীশ নিজেই বলিয়াছে, সে "কবি"। কবির মত সে রূপদক্ষ। আবার কবির মতই রসপিপাসু। তাই এবার সে যখন কাজে লাগিল তখন ঝগড়া বিবাদের ঝাঁঝ রহিল না কিছুই। এই শিক্ষা তাহার হইল দামিনীর সাহচর্য্যে আসিয়া। শচীশ দামিনীর গুরু, সে তাহাকে বাঁচাইয়াছে। কিন্তু দামিনীও শচীশকে বাঁচাইয়াছে।

(৪)

শচীশ দামিনীকে বাঁচাইল কেমন করিয়া? সে এমন কি মন্ত্র দিল যাহাতে দামিনা বাঁচিয়া গেল, দামিনী এমন কি শিক্ষা পাইল যাহাতে সে শচীশকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইল! দামিনী শচীশের কাছে পাইল—তাহার নির্লিপ্ততা। দামিনী রূপকে লইয়া থাকিত; শচীশের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার খণ্ডতা ও অপূর্ণতা দেখিতে পাইল। শচীশ লীলানন্দ স্বামীর মত "দলচর" নহে। শিষ্যের সম্পত্তির প্রতি অথবা শিষ্যাণীর ভক্তির প্রতি তাহার লোভ নাই। শচীশের এই মহৎ ঔদাসীন্য দামিনীর

কাছে অরূপের সন্ধান আনিয়া দিল। সে শচীশের কথা বুঝে নাই, কিন্তু শচীশকে বুঝিত। সে বুঝিত ইহার অনুভূতি আছে, ব্যথার বোধ আছে, অথচ ইহার মধ্যে একটা প্রগাঢ় নির্লিপ্ততাও আছে। শচীশ যে সত্যের সন্ধানী একথা দামিনী বুঝিয়াছিল। দামিনী শুধু বস্তুকে লইয়াই থাকিতে চাহিত। যাহা স্থূল, যাহাতে পৃথিবীতে একান্ত প্রয়োজন, সে তাহার মধ্যেই পরিতৃপ্তি পাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। সে শচীশের সেবা করিতে, তাহাকে সংসারের অন্য দশ জন মানুষের মত সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখিতে চাহিত। শচীশ তাহার যত্নকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, দামিনীকে দুঃখ দিয়াছে। কিন্তু শচীশ যে সত্যের উপাসক—রূপ যেখানে রসের সহিত মিশিয়া গিয়াছে সেই রাজ্যের অধিবাসী। তাই যাহা নিতান্ত ব্যক্তিগত, যাহা ক্ষুদ্র, তাহার মধ্যে তাহাকে বাঁধিয়া রাখা যাইবে কেন? শচীশের কাছে প্রত্যেক মানুষের এক দর, দামিনী ও শ্রীবিলাস—ইহাদের কোন মূল্য নাই, বিশেষ দাবী নাই। দামিনী তাহাকে ঘরের মধ্যে ভাল ছেলে করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল; খণ্ডতার সীমা অতিক্রম করিয়া সে অসীমের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিল; সে সংসারের কাজে লাগিয়া গেল, কিন্তু এই কাজ নির্লিপ্তের কাজ—ইহাতে তীব্রতা নাই, ঔদাসীন্যও নাই। শচীশ সুন্দরের উপাসক,—যে চির-সুন্দর বিশ্বের বিচিত্র রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। দামিনী সসীমের খণ্ডতার মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিল, সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল, তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে। দামিনী তাহার নিজের সাধনার অপরিপূর্ণতা বুঝিতে পারিল, দামিনী বাঁচিল। সে ইহাও বুঝিল যে, তাহাকে বাঁচাইতে যাইয়া শচীশ কত বড় স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, কত ব্যথা পাইয়াছে। দামিনীর সেবা, তাহার ভক্তি—ইহাকে অগ্রাহ্য করা, ইহাকে ছাড়িয়া যাওয়া শচীশের পক্ষেও একান্ত পীড়াদায়ক কাজ। কিন্তু এই কঠিন ত্যাগ সে করিয়াছে—শুধু তাহার নিজের প্রয়োজনে নহে, দামিনীর প্রয়োজনেও। দামিনীর জন্যই দামিনীকে ত্যাগ করিতে হইয়াছে। সেই গুহার মধ্যে শচীশের পদাঘাতে দামিনী সত্যের এই দিকটার প্রথম সন্ধান পাইয়াছিল; সেই গুহায় সে যে ব্যথা পাইয়াছিল, তাহাই তাহার জীবনের প্রথম সম্বল, প্রধান সম্পদ।

এইখানেই সে রসের প্রথম আস্বাদ পাইয়াছিল ; এই ব্যথা তাহার গোপন ঐশ্বর্য্য, ইহা তাহার পরশমণি। শচীশ যখন তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, তখন এই গোপন ঐশ্বর্য্যের যৌতুক লইয়াই তো সে শ্রীবিলাসের স্ত্রী হইতে পারিয়াছিল।

এই বিবাহটা খুব রহস্যময়। শ্রীবিলাস নিজেই বলিয়াছে, "আমার সঙ্গে দামিনীর বিবাহ হইয়াছে। এই বিবাহের রহস্য কি তা' সকলে বুঝিবে না। বোঝারও প্রয়োজন নাই।" শ্রীবিলাস শচীশের বন্ধু, শচীশের সমস্ত অভিযানে সে তাঁহার সঙ্গী। সে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কাজ করিয়াছে আবার লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে রসচর্চ্চাও করিয়াছে। শচীশের মত তেজ তাহার নাই, কিন্তু তাহার বিচার-বুদ্ধি বেশী। সে মহামানব নহে, কিন্তু সাধারণ, তুচ্ছ লোকও নয় ; তাহার সুতীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি মহামানবেরও অতীত। রস ও রূপের যে সন্ধিমূলে শচীশ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিল, তাহার মধ্যে তাহার স্থান নাই, কিন্তু সে তাহার আস্বাদ পাইয়াছে। তাই সে যে দামিনীকে বিবাহ করিতে রাজি হইবে, ইহাতে তেমন কিছু "রহস্য" নাই। কিন্তু দামিনী!—সে শ্রীবিলাসকে গ্রহণ করিল কেমন করিয়া? দামিনী যে ঠিক কেমন করিয়া শচীশকে পাইতে চাহিয়াছিল তাহা বলা কঠিন। মানব-মনের সমস্ত রহস্য তাহার নিজের কাছেই স্পষ্ট হয় না, পরের কাছে প্রকাশ ত' দূরের কথা। দামিনী নিজেই জানিত না, সে শচীশকে কেমন করিয়া পাইতে চাহিয়াছিল। শচীশ তাহার গুরু, শচীশ তাহাকে বাঁচাইয়াছে। কিন্তু শচীশের জন্য তাহার যে টান ছিল, তাহা গুরুর তত্ত্বের জন্য নহে, রক্তমাংসে গড়া মানুষের জন্য। তবে সে কি শচীশকে স্বামীরূপে বরণ করিতে চাহিয়াছিল? পার্ব্বতী যেমন করিয়া তপোনিষ্ঠ মহেশ্বরকে সেবা করিত, দামিনী কি তেম্‌নি করিয়া শচীশকে পূজা করিত, তাহার উদ্দেশ্যও কি তপোনিষ্ঠের তপোভঙ্গ? দামিনী শচীশকে কি ভাবে চাহিয়াছিল—গুরুভাবে না স্বামীভাবে? দামিনীর নিজের মনের কথা নিজের কাছেই স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় নাই। তত্ত্বের প্রতি তাহার ঔদাসীন্য দেখিয়া মনে হয় যে, হয়ত তাহার আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষা, যাহার দ্বারা রমণীর মন উদ্বেলিত হয় তাহার পরম প্রেয়কে

দেখিলে। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সাধারণ জীবনের তুচ্ছতা নাই — এই আকাঙ্ক্ষা চন্দ্রের জন্য নলিনীর আকাঙ্ক্ষা, দিনের জন্য রাত্রির আকাঙ্ক্ষা, সুদূরের জন্য নিকটের আকাঙ্ক্ষা। শচীশকে সে যখন বুঝিল, তখন এই আকাঙ্ক্ষারও নিবৃত্তি হইল। সেই বিরাট মানবের জন্য যে-চিত্ত পিয়াসী হইয়াছিল, সে এখন তাহার সমানধর্ম্মীর জন্য লালায়িত হইল। শ্রীবিলাসের সঙ্গে তাহার মনের আন্তরিক যোগ ছিল। উভয়েই মাটির পৃথিবীর মানুষ, আবার উভয়েই রসের স্বর্গের আস্বাদ পাইয়াছে। শিবতোষের সঙ্গে দামিনীর মনের মিল ছিল না, কাজেই সেই বিবাহ সার্থক হয় নাই। শ্রীবিলাসের সঙ্গে এই নিবিড় যোগ ছিল, তাই এই বিবাহ সকল দিক দিয়া পরিপূর্ণ ও আনন্দময় হইল।

এই বিবাহের আর-একটা বিশেষত্ব হইতেছে, বর-বধূর মধ্যে একান্ত পরিচয়। রহস্য যাহা কিছু ছিল, তাহা বাহিরের লোকের কাছে, তাহাদের কাছে অজ্ঞাত, অপরিস্ফুট ছিল না কিছুই। ইহাই এই বিবাহের রোমান্স। শ্রীবিলাস নিজেই বলিয়াছে, "কোন রাঙ্গা চেলীর ঘোমটার নীচে সাহানা রাগিণীর তানে তো আমাদের শুভদৃষ্টি হয় নাই। দিনের আলোতে সব দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া বুঝিয়াই একাজ করিয়াছি।" শচীশ হইয়াছিল এই বিবাহের সম্প্রদাতা, বর-বধূকে তাহার মত নিবিড় করিয়া কে জানিত, আর তাহাদের জীবনে তাহার প্রভাবের মত বড় জিনিস আর কি আছে ? তাহার সত্যসন্ধানের বিশেষ ছাপটি ইহাদের দাম্পত্য-জীবনে মুদ্রিত হইয়া রহিল—তাই দামিনী কেবলমাত্র ঘরের গৃহিণী হইয়া রহিল না, "সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্য্যন্ত দামিনী !" এ-বিবাহে বাস্তবের রূপ রহিল কিন্তু পঙ্ক থাকিল না, অরূপের পরিপূর্ণতা ছিল কিন্তু তাহার শূন্যতা সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিল। ইহাই তো শচীশের শিক্ষা, তাই শচীশই কন্যা সম্প্রদান করিল, আর বৌভাতের একমাত্র আহূত ছিল ঐ শচীশ। কিন্তু শচীশ সেখানে রহিল না। তাহার কাজ অন্যত্র, বিশ্বরূপে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াই তো সে অরূপের সন্ধান পাইবে। দামিনীর মৃত্যুতে শ্রীবিলাস অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু শচীশের কথা কিছু লেখা হয় নাই।

যাহা ব্যক্তিগত, যাহা খণ্ড ও একক তাহার মধ্যে সে নিজেকে আবদ্ধ রাখিবে কি করিয়া? সে কি কাজ করিল, কেমন করিয়া করিল তাহারও কোন হিসাব দেওয়া হয় নাই। সেই হিসাব দিতে গেলে গল্পকাব্য ফলিত গণিত হইয়া পড়িত।

রবি-বরণ

—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

জীবন-প্রভাতে যবে বাহিরিনু নিরুদ্দেশ পথে,
অজানিত শঙ্কা ছিল ; শিহরিল বক্ষ নানা মতে
সৃষ্টির রহস্য মাঝে। সেদিনের পূর্ব্বাকাশ-তলে
তুমি, রবি, উদিলে সুন্দর। তব স্নিগ্ধ স্বর্ণাঞ্চলে
অমৃত ছড়ায়ে পড়ে রূপে রসে গন্ধে গীতিকায়,—
হেরিলাম এ ধরণী মনোহরা বিচিত্র লীলায়।
তোমার কিরণ-পাতে আঁখি মোর উঠিল জ্বলিয়া
সুদূর দিগন্ত লাগি'। তোমার চলার বাণী নিয়া
মোর যাত্রা হ'লো সুরু, গতি হ'লো সহজ শোভন।
তোমার গানের ছন্দে মুখরিত মর্ম্মরিত বন
বিহগের কলগীতে, সমীরণ বহে শান্ত সুরে ;
গ্রাম-পথে স্বপ্ন বাজে বালিকার চপল নূপুরে ;
ঘট ভরি' বধূ চলে ; মাঝি ঘাটে তরণী ভিড়ায় ;
সহসা দূরের পান্থ স্মিত হাস্যে নয়ন ফিরায়।
সৃষ্টির রহস্য ভেদি' দিকে দিকে অনন্ত বিকাশে
অপূর্ব্ব সুন্দরী ফোটে, হেরিলাম দাঁড়ায়ে সে হাসে।
সেই নারী যুগে যুগে কবিদের মানস-প্রতিমা,
অনন্ত-যৌবনা সখী, প্রেমে তার নাহি মিলে সীমা।
বক্ষে নাহি ধরা যায়, শুধু তারে অনুভবে প্রাণ,
সংসারের মায়াপথে বাজে তার 'অশেষ-আহ্বান'।
মিলন-গানের সুরে বেজে উঠে বিরহ-বেদনা,
সুখে দুঃখে অকস্মাৎ তারি লাগি' হই অন্যমনা।

তারপর এ জীবনে বেলা যবে মধ্যাহ্ন প্রখর,
তোমার প্রদীপ্ত তেজ জ্বলি' উঠে, হে রবি ভাস্বর,

আমারে জাগ্রত করি'। হেরি মোর পথপ্রান্ত ভরি'
পিঙ্গল বৈশাখ জাগে বনে বনে বহ্নি-বাণ ধরি'।
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে পিপাসার মৃত্যু-গান বাজে।
নির্ম্মম তপস্যামন্ত্রে চলে মন বৈরাগ্যের সাজে।
'ঈশানের পুঞ্জমেঘে' অকস্মাৎ ধেয়ে আসে ঝড়,
সকল সংশয় দ্বিধা চূর্ণ করি' সঙ্কীর্ণ অন্তর
কোথায় উড়িয়া যায়! নেমে আসে নবীন জীবন
পূর্ণের ইঙ্গিত নিয়া। ব'হে যায় আনন্দ-প্লাবন।
আমার হৃদয়-কুম্ভ ভরি' উঠে গভীর মিলনে,
উচ্ছল দিনের কণ্ঠে গীত ঝরে ঝিল্লীরব সনে।
অকথিত বাণীগুলি বলা হয় পরিপূর্ণ সুখে,
ফাল্গুনের ঝরা-ফুল লভি পুন' শ্রাবণের বুকে।

সে-দিন, হে রবি, তব ধৌত স্নিগ্ধ অপরাহ্ণ-ভাতি
মৃদু হেসে তৃণাসনে স্বপ্নশয্যা ধীরে দেয় পাতি'।
কুহেলি-গুণ্ঠন-তলে দৃষ্টিখানি স্তিমিত উদাস,
রূপসী ধরণী ফেলে কেন জানি সুকরুণ শ্বাস।
কহে মোরে,—"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে",
চকিত হরিণী সম চাহি পুন' সুদূরের পানে।
সেথায় সুনীল সিন্ধু মরণের অসীম রোদনে
দিগন্তে লুটায়ে পড়ে; অস্তাচলে অন্তহীন স্বনে
বাজে 'পূরবীর' তান। হে রবি, তোমার রশ্মিদল
শেষের কিংশুক বর্ণে সিন্ধুজলে করে ছলছল।
প্রশান্ত সৈকতে আমি দাঁড়ায়েছি বিস্ময়ে নীরব,
অতন্দ্র তরঙ্গ কোটী শ্রান্তিহারা করে কলরব।
উত্তর হিমের বায়ে ভেসে আসে পশ্চাতের ভাষা,—
হারানো দিনের সেই মোর 'লীলা-সঙ্গিনীর' আশা

গুঞ্জরিয়া আসে মৃদু প্রেয়সীর মিনতির মতো ;
'বকুল-বনের পাখী' শেষ গান বিদায়-বিনত
আমারে চিনিয়া গাহে। আমি হেরি চাহিয়া সম্মুখে,
হে রবি, বসেছ ধীরে অস্তপাটে সহজ কৌতুকে।
আজি তব শুদ্ধ মূর্ত্তি, নাহি কোন কীর্ত্তি-অভিমান,
শুধু বাজে ধ্যান-কণ্ঠে অপরূপ গমনের গান।
নাহি জানি যাত্রা-পথে পেলে কিনা নিগূঢ় উদ্দেশ,
ওপারের অন্ধকারে তব লক্ষ্য হবে কিনা শেষ
কোন্ ধ্রুবতারকায় ! এ সন্ধ্যার দীপ্তিখানি তব
সেথায় কি স্বর্গলোকে ইন্দ্রধনু সম অভিনব
ঝলিবে মেদুর বর্ণে বিকশিত উমার নয়নে,
তপোভঙ্গ করি' দিবে ধ্যানাসীন মহেশ্বর-মনে
প্রেমের নূতন প্রাতে ?

তোমার অন্তিম আলোখানি
আজি মোরে দিয়ে যাও,—তব শেষ আশীর্ব্বাদ-বাণী।
তোমারি মতন যেন বায়ু সম বন-গন্ধ হরি'
গান গেয়ে যেতে পারি: ধরণীর স্নেহাঞ্চল ধরি'।
'সোনার গোধূলি খনে' সীমাহীন সিন্ধুবুকে খেলি'
যেন ভেসে মিশে যাই সর্ব্ব চিহ্ন ধুয়ে মুছে ফেলি'।

প্রণয়-বাসর মাঝে, দীপ জ্বালি' তোমার আলোকে,
হেরেছিনু যে-সুষমা প্রিয়ার সে কালো দুটি চোখে ;
শিশুদের খেলাঘরে জগতের পারাবার-তীরে
যে-মাধুরী স্বপ্নে তব নৃত্য করি' গেল মোরে ঘিরে ;
রাজপথে কোলাহলে ঘর্ম্মসিক্ত কর্ম্ম-আয়োজনে
যে-হাসি ফুটিল সুখে তব গীতে অমৃত-সিঞ্চনে ;

সিংহাসনে নৃপতির উড়িল যে গৈরিক-বসন
তব ধ্যান-মন্ত্রে জাগি' দেবতারে করি' আমন্ত্রণ ;
প্রাচীর তোরণ হ'তে পশ্চিমের রুদ্ধ দ্বার ধরি'
তোমার সুরের পরী নাচে যারা আনন্দে শিহরি' ;
আজি সব গাঁথা হ'লো একখানি পুষ্প-মালিকায়,—
তোমার প্রসাদ সেই । বিকশিত রূপের শিখায়
এ মালা—দুলিবে জ্বলি' মানুষের মানসীর গলে ।
রবির আলোর গান র'বে নিত্য জীবন-কমলে ।

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

এমন অনেক শিল্পীর কথা আমরা জানি যাঁদের হাতের ছোঁয়া লেগে পাষাণ হয়েছে অহল্যার মতো শাপমুক্তা সুন্দরী, কিন্তু যাঁদের নিজেদের জীবনের বেলায় তাঁদের শিল্পীত্ব খাটেনি। সে-ক্ষেত্রে তাঁরা অবস্থার দাস এবং তাঁদের জীবনের আদর্শও দুর্ব্বল। অথচ শিল্পী নন্ এমন কোনো কোনো মানুষের জীবন এক-একখানি শিল্পীসৃষ্টির মতো সযত্নরচিত, সুসঙ্গত, অবান্তরতাবিহীন।

রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁর অপরাপর কাব্যের মতো ক'রে তাঁর জীবনকালকেও ছন্দে মিলে উপমায় ব্যঞ্জনায় কল্পনার প্রসারে ও অনুভূতির গভীরতায় একখানি গীতিকাব্যের ঐক্য দিয়েছেন। সেটি বেশ একটি গোটা জিনিষ হয়েছে, ভাঙা ভাঙা বা অসম্বদ্ধ হয়নি, অন্তর্ব্বিরোধ-সম্পন্ন বা অসঙ্গতি-বহুল হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তাঁর জীবন। তাঁর অন্যান্য কীর্ত্তি বিস্মৃত হ'য়ে যাবার পরও তাঁর এই কীর্ত্তিটি জীবিত মানুষের আন্তরিকতম যে-জিজ্ঞাসা—"কেমন ভাবে বাঁচব?"—সেই জিজ্ঞাসার একটি সত্য ও নিঃশব্দ উত্তর হ'য়ে চিরস্মরণীয় হবে।

দেশের অতি বড় দুর্গতির দিনে যখন পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শকে লোকে যুগপৎ উপহাস ভয় ও সন্দেহ করছে তখন রামমোহন রায়ের জন্ম। এই মহাপুরুষ শাশ্বত ভারতবর্ষকে আবিষ্কার ক'রে তাকে একটি বৃহত্তর পরিধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন দেশকালের অতীত হ'য়ে বাঁচ্‌বার দৃষ্টান্ত। আধুনিক ভারতবর্ষের জনক ঋষি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের জনক। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন ঋষি-দৃষ্টি ও মহত্ত্বের প্রতি নিয়ত আকাঙ্ক্ষা। ঠাকুর পরিবারে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আধুনিক পৃথিবীর সমন্বয় ঘটেছিল। যৌবনারম্ভে মহর্ষি উপনিষদের পৃষ্ঠা কুড়িয়ে পান্ ও মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁকে Geologyর গ্রন্থ পড়্‌তে দেখা গেছ্‌ল। এই দুটি ঘটনা থেকে ঠাকুর পরিবারের আবহাওয়া অনুমান

করা যায়। ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, ত্যাগে ও ভোগে, কলায় ও বিদ্যায়, স্বাজাত্যে ও বিশ্ব-মানসিকতায় ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল; স্কুল-কলেজের অপেক্ষা রাখেনি। এই পরিবারের কাছে ও মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পেলেন তাঁর বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা।

স্কুল-যন্ত্রের কবল থেকে অক্ষত দেহ মন নিয়ে বেরোতে পারা রবীন্দ্রনাথের মতো শক্তিধর ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব হ'ত। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, রুটিন ও এগ্‌জামিনের যুগল হস্তের ঘন ঘন চপেটাঘাতে কল্পনাবৃত্তি অসাড় হ'য়ে যায় ও পাঠ্যপুস্তকে নিবদ্ধ হ'য়ে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি হয় আড়ষ্ট। পাছে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে ও তার ফলে বিক্ষেপ জাত হয় তার দরুণ স্কুল-ঘরের চারদিকে চার দেওয়াল প্রহরীর মতো খাড়া। যঃ পলায়তি স জীবতি। রবীন্দ্রনাথ স্কুল-পালিয়ে নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন। আজও সে-দায়িত্বে ঢিল দেননি। তাঁর মতো বহুবিদ্য ব্যক্তি যে-কোনো দেশে বিরল। কিন্তু অধীত বিদ্যা প্রচার করার চেয়ে বিদ্যার সৌরভ বিকীরণ করাই যথার্থ পাণ্ডিত্য। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাকে রসায়িত ক'রে কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন, তা নিয়ে থীসিস্ লেখেননি। তাঁর লঘুতম রচনাতেও মার্জ্জিত বুদ্ধির যে-দীপ্তি দেখ্‌তে পাই সে-দীপ্তি অশিক্ষিত পটুত্বের নিদর্শন নয়। প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমাদের একটা ভ্রান্তি আছে—তাঁরা বিনা সাধনায় সাফল্য লাভ করেন, যেহেতু তাঁরা দৈবশক্তিসম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথ ডায়েরী রাখেননি, কিন্তু তাঁর "ছিন্ন পত্র" থেকে জানি তিনি যেমন সব্যসাচী লেখক তেমনি সর্ব্বভুক্ পাঠক এবং তাঁর পর্য্যবেক্ষণশীলতা ও কল্পনাকুশলতা কি প্রকৃতির সংসার,—কি মানবের সংসার—উভয়ের অন্তর-বাহির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করেছে।

স্কুল-কলেজে না গেলে ভদ্র সমাজে এক-ঘরে হ'তে হয় এবং জীবিকা সম্বন্ধেও অতি বড় ধনী সন্তানের ভয় থাকে। রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে স্কুল ত্যাগ ক'রে তাঁর নিজের দিক থেকে ঠিক ক'রলেও অন্য সকলে নিশ্চয়ই তাঁকে নিরস্ত কর্‌বার চেষ্টা করেছিলেন ও তিনি ভুল কর্‌লেন ব'লে দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয়েছিলেন। জীবনশিল্পী এমনি ক'রেই নিজের পরিচয় দেন।

পশু-পক্ষীর মতো শিল্পীপ্রকৃতি মানুষের মধ্যেও ইন্‌টুইশনের ক্রিয়া অমোঘ। কোন্ পথে মহতী বিনষ্টি তা ওঁরা লাভ-লোকসান তৌল না ক'রে যুক্তি-তর্কের মধ্যে না নেমে আপনার অপ্রবৃত্তি থেকেই উপলব্ধি করেন এবং আত্মহত্যার পথকে সমগ্র শক্তির সহিত পরিহার করেন।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনোদ্‌গমে বিলাত-যাত্রা তাঁর স্কুল-পরিত্যাগেরই মতো একটি অর্থপূর্ণ ব্যাপার। তখনো আমাদের সমাজে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ও অপ্রচলিত ছিল। অথচ বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় কেবলমাত্র বিদেশী গ্রন্থপাঠের দ্বারা হ'বার নয়। পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'ল না, এর মতো দুঃখের কথা অল্পই আছে। বিশেষত যে-মানুষকে একদিন মানব মাত্রের বন্ধু হ'তে হবে, প্রতিভূ হ'তে হবে, মানব সম্বন্ধে তুলনা-মূলক জ্ঞান তার সাধনার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ কর্‌বার পূর্ব্বে স্বদেশের সঙ্গে বিদেশকে ও নিকটের সঙ্গে দূরকে মিলিয়ে দেখা, পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় মহাদেশের বহুকালীন আদর্শ। তার ফলে মাত্রাজ্ঞান জন্মায়, অহঙ্কার ও মোহ কিছু কমে এবং নিজের ও পরের মাঝখানকার সত্যকার সীমারেখাটি আবিষ্কৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শোনা গেছে যে, তিনি জমিদার হিসাবেও বিচক্ষণ ছিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ জমিদার হ'বার দরুণ তাঁর বাণী তিক্ত, উদ্ধত বা বিষয়ীসুলভ হয়নি। পরন্তু বিচক্ষণ জমিদার হ'বার দরুণ তাঁর রচনা রুগ্ন আদর্শবাদ ও গলদশ্রু ভাবালুতা থেকে মুক্ত। পরোপকার কর্‌তে চাইলেও করা উচিত নয়, যদি তার ফলে পরের আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা হয় বিড়ম্বিত। আমাদের দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, কাঙালীভোজন ইত্যাদি আদর্শ এমন অস্বাস্থ্যকর যে, যথার্থ করুণা ও লোকপ্রীতির পৌরুষ তাতে নেই।

প্রাচীন ভারতবর্ষের গার্হস্থ্যের আদর্শ ই হচ্ছে সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব কালের পূর্ণবয়স্ক মানুষের আদর্শ। তার মধ্যে ভোগ ও ত্যাগ, আনন্দ ও সংযম পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। কেবল বিপন্নকে অভয়দান ও আতুরের সেবা নয়, অন্যায়কারীকে আঘাত ও অশিষ্টকে শাসনও তার অন্তর্গত। বিষয়-সম্পত্তিকে উক্ত আদর্শ বিষের মতো পরিহার করতে বলেনি, বৃদ্ধি কর্‌তে,

রক্ষা করতে ও বিজ্ঞের মতো ব্যবহার করতে বলেছে। এই সম্পূর্ণতার আদর্শ সেকালে কিম্বা একালে বহু মানুষকে নেশা পাওয়াতে পারেনি। তাই সেকালে লোকে সন্ন্যাসী হ'য়ে যেত, একালে সোশ্যাল সার্ভিস নিয়ে মাতে। বিচিত্র সংসারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্ত্তব্যগুলোর প্রত্যেকটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাতে চরিত্রের প্রতি অঙ্গের চালনা হয়। এই চালনাই স্বাস্থ্যকর। দুনিয়ার দুঃখদৈন্য দূর হ'ল কি-না সেটা ভাবতে যাওয়া অস্বাস্থ্যকর।

রবীন্দ্রনাথের গৃহস্থাশ্রমের দৃশ্য আমরা তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পত্র-বিনিময়ের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাই। ক্রমে ক্রমে যখন অন্যান্য চিঠিপত্রের বাতায়ন-দ্বার মুক্ত হবে তখন পূর্ণ দৃশ্যটি উদ্‌ঘাটিত হবে। সেটির এটা-ওটা ক'রে অনেক রেখা ও রঙ, আমাদের অপছন্দ হ'লেও আমাদের কাছে সমগ্র চিত্রখানির মূল্য কম্‌বে না। রবীন্দ্রনাথ কাঁচা বা পাকা যা-কিছু লিখেছেন, হাতের লেখার দিক থেকে প্রত্যেকটি সুন্দর এবং সাহিত্যের দিক থেকে প্রত্যেকটি স্বকীয়। এর থেকে অনুমান হয় যে, তুচ্ছ বা মহৎ কোনো কাজই তাঁর পক্ষে হেলাফেলার যোগ্য নয় এবং তাঁর অন্তঃপ্রকৃতি সর্ব্বমুহূর্ত্তে সতর্ক থাকে পাছে তাঁর বহিঃপ্রকৃতিতে কিছুমাত্র কুশ্রীতা বা মামুলিয়ানা প্রকটিত হ'য়ে পড়ে।

একালের মানুষ দিন দিন পল্লীকে ছেড়ে নগরে জুটছে। নগরের প্রধান আকর্ষণ তার নিত্য নূতন চমক, নিত্য নূতন খবর, নিত্য নূতন শিক্ষা, নিত্য নূতন সঙ্গ। এ আকর্ষণকে উপেক্ষা করা যায় না। কত অঞ্চলের কত দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা হয়; তাদের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের অভ্যস্ত আচার ও মনগড়া বিচারকে আমরা আর-একটু উদার করি। কিন্তু হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র চরিতার্থতার জন্যে পল্লীই ছিল ভালো এবং পল্লীতে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে পশুপক্ষী-বৃক্ষলতা-নদী-পর্ব্বতের বৃহত্তর সমাজে ছিলুম। নগর যেমন নিত্য নূতন, পল্লী তেমনি চিরন্তন। দুটোই সত্য এবং দুটোকে জড়িয়েই সত্য। রবীন্দ্রনাথ পল্লীর প্রতি পক্ষপাত করলেও নগরকে বর্জ্জন করলেন না। প্রকৃতির সুধা ও জনসংঘাত-মদিরা পান ক'রে তিনি উভয় সত্যের স্বাদ গ্রহণ করলেন। পদ্মাবক্ষে নৌকা-বাসের দিনগুলি আধুনিক যুগের নাগরিক মানুষের কাছে কেমন

রোম্যান্সের মতো লাগে। অতটা নির্জ্জনতা আমাদের সয় না। তাতে আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্নিমান্দ্যের সূচনা করছে। পল্লী ও নগর উভয়কে উপভোগ কর্‌তে পারা চাই। শুধু একবার চোখ বুলিয়ে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়া উপভোগ করা নয়। একান্তভাবে সভ্য ও আধুনিক হ'তে গিয়ে যা সৃষ্টি করব তা আধুনিকতার মতো অচিরস্থায়ী ও সভ্যতার মতো অগভীর হবে। অবিমিশ্র নাগরিক অভিজ্ঞতার উপদ্রব আমরা সাহিত্যে পোহাচ্ছি। চিড়িয়াখানায় গিয়ে জীব-চরিত্র অধ্যয়ন করার মতো নগর থেকে কি মানব-চরিত্র, কি বিশ্বব্যাপার—কোনোটার ঠিক মতো নিরিখ হয় না। বাস্তব ব'লে যাকে চালাই সেটা একটা বিশেষ অবস্থায় বাস্তব। বদ্ধ ঘরে প্রতিধ্বনির মতো জীবনের হাহাকারকে নগর অতিরঞ্জিত করে। জীবনের দুঃখ-দৈন্যগুলোকে অপরিমিত কালের পট-ভূমিকায় প্রসারিত কর্‌লে তাদের সত্যিকারের পরিমাণ উপলব্ধি করি এবং মানুষের সংসারকে অপরিমিত প্রাণলোকের অধিকারভুক্ত ব'লে জান্‌লে যা নিয়ে উত্তেজিত পীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করছি তার দিকে সুদূরের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আনন্দ পাই।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনের দিনগুলি অল্প পরিসরের মধ্যে সত্য ছিল, সম্পূর্ণ ছিল। সংসারিক উচ্চাভিলাষ তাঁর ছিল না এবং সাহিত্য তাঁকে দেশের সর্ব্বত্র পরিচিত কর্‌লেও দেশের কর্ম্মপ্রবাহ থেকে তিনি দূরেই ছিলেন। হঠাৎ একদিন দেশে নব-যুগের প্রাণ-স্পন্দন এল, সে যে কী অপূর্ব্ব জন্মলক্ষণ "ঘরে-বাইরে"তে তার বর্ণনা আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিভৃত সাধনা ছেড়ে সকলের সঙ্গে যোগ দিলেন। বৃহৎ সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য একদিন-না-একদিন কর্‌তেই হবে—দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি। কিন্তু সেই কর্ত্তব্য যার প্রতি, সে যে-পরিমাণে বৃহৎ, কর্ত্তব্যের পূর্ব্বাহ্নের সাধনাও যেন সেই পরিমাণে বিপুল হয়। দেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা কেবলমাত্র পণ্যনিবদ্ধ ছিল না, দেশের ধর্ম্ম, সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের মতো তাঁরও অনুরাগের সামগ্রী ছিল। দেশের শিল্পদ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা এঁরা স্বদেশী আন্দোলনের চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই

ক'রে আস্‌ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি জনকয়েক মিলে একটি স্বদেশী বস্ত্রের দোকানও খুলেছিলেন। দেশে জন্মেছি ব'লে দেশ আমার নয়, দেশকে নিজের তনু-মন দিয়ে সৃষ্টি করেছি ব'লে দেশ আমার, পেট্রিয়টিজ্‌মের এই সূত্রটি দেশকে রবীন্দ্রনাথ ধরিয়ে দিলেন। দেশ এর মর্য্যাদা তখন বুঝ্‌ল না, এতদিন পরে আজ বুঝ্‌ছে।

দেশের প্রাচীন শিক্ষাকে আধুনিক কালের উপযুক্ত ক'রে দেশকে একদিক থেকে সৃষ্টি করার ব্রত নিলেন তিনি নিজে। এই উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা। আধুনিক কালে 'আশ্রম' কথাটির অর্থ বদ্‌লে গেছে। এখন আমরা 'আশ্রম' বল্‌তে সাধনাপীঠ বুঝে থাকি। যথা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম প্রাচীন অর্থের আশ্রম অর্থাৎ অবস্থা। রবীন্দ্রনাথের গার্হস্থ্যাশ্রম ও তাঁর শিষ্যগণের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরস্পরের পরিপূরকতা করল। এর আরম্ভ অতি সামান্য আকারে। এর দ্বারা রাতারাতি দেশের দুঃখমোচনের আশা ছিল না। নিরক্ষরতা দলন নয়, অর্থকরী বিদ্যাবিস্তার নয়, জনসেবা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। জীবনের সর্ব্বাঙ্গীনতার প্রতি দৃষ্টি রেখে জীবনের প্রথম অঙ্গের অনুশীলন, পরিপূর্ণরূপে বালক হওয়া। আজ যারা পরিপূর্ণরূপে ফুল হ'তে পেরেছে, তারাই কাল পরিপূর্ণরূপে ফল হ'তে পারে, অপরে নয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী বালকের দেহ-মনকে নানাদিকে স্ফূর্ত্তি দেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ খেলা, অভিনয়, গান ও উপাসনা এগুলিকে বিদ্যাশিক্ষার মতোই প্রয়োজনীয় ব'লে গোড়া থেকেই জেনেছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা বা নীতিশিক্ষাকে স্ফীত হ'তে দেননি এবং অপরগুলিকে ওর কোনোটার বাহন করেননি। বিদ্যার্জ্জনই বালকের একমাত্র বা প্রধান করণীয়, সভ্য-সমাজ থেকে এই বদ্ধমূল কুসংস্কার যদি কোনো দিন ঘোচে তবে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশ ও জগৎ আরেকটু ভালো ক'রে বুঝ্‌বে।

অল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিক প্রিয়-জনের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের দারুণ দুর্ভাগ্য। কিন্তু এই করুণ অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ অপচিত হ'তে দেননি। তাঁর "খেয়া" ও "গীতাঞ্জলি" এই বেদনার রূপান্তর। তাঁর জীবন ও তাঁর কাব্য যেন এমনি একটা পরিণতির প্রতীক্ষা করছিল।

ফলের পক্কতার পক্ষে প্রখর রৌদ্রের প্রয়োজন ছিল। তাঁর মধ্যে কারুণ্যের সঞ্চার না হ'লে তিনি সকলের সবকালের কবি ও প্রতিভূ হ'তে পারতেন না। প্রিয়-বিয়োগের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়ত্বকে একান্ত mystic-ভাবাপন্ন করলে। তিনি ভগবানের মধ্যে হারানো প্রিয়দের সঙ্গ পেলেন, তাই ভগবান হ'লেন তাঁর প্রিয়তম। যিনি এতদিন পিতা ছিলেন, তিনি হলেন সখা ও প্রেমিক। "গীতিমাল্য" ও "গীতালি" রচিত হ'ল।

অকস্মাৎ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী-ব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হন্। ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ নেই। রোগশয্যা-বিনোদনের জন্যে কয়েকটি বাংলা রচনার ইংরেজী তর্জ্জমা করেছিলেন, সেগুলি কী মনে ক'রে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আইরিশ কবি ইয়েট্‌স্‌কে পড়তে দেন। একদা যেমন দুর্ঘটনার ভিড় জমেছিল একদিন তেমনি যশ, অর্থ ও সম্মান বন্যার মতো দিক্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত ক'রে এল। দুঃখের সময় যিনি অভিভূত হননি সুখের দিনেও তিনি অভিভূত হ'লেন না। বঙ্গের কবি বিশ্বের অর্ঘ্য সহজভাবে নিলেন। ছিন্ন ভিন্ন পরাধীন দীন দরিদ্র দেশের মানুষ সাধনা করেছিলেন দিগ্বিজয়ীর মতো, আরম্ভ করেছিলেন রাজকীয় ধরণে। হাতে রেখে দান করেননি, হাতে-হাতে ফল চাননি। যাঁর অধিক মূলধনের কারবার, তাঁর বিরাট ক্ষতি, বিরাট লাভ; তাঁর লাভের জন্যে ত্বরা নেই। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ও ব্যাপক যোগাযোগ, মানুষের গভীরতম চরিত্রে আস্থা, ভগবানের কল্যাণবিধানে সংশয়হীন বিশ্বাস, সৌন্দর্য্যের রসায়নে ব্যবহারিক জীবনকেও রসায়িত করা—এতগুলো বড় জিনিষ কি ছোট একটি দেশে আবদ্ধ থাকতে পারত? দু'দিন আগে না হ'লে দু'দিন পরে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ত। তারপর রবীন্দ্রনাথ চিরদিন up-to-date; বিশ্ব-সাহিত্য তাঁর ভালো ক'রে জানা, বিশ্বের আধুনিকতম ভাবনাগুলো তাঁরও ভাবনা। বাংলা দেশের পদ্মা নদীতে নৌকা-বাস করবার সময় তিনি বিশ্বের কেন্দ্রস্থলেই বাস করেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত হ'বার পর থেকে তাঁর দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। বৃহত্তর মানব-সংসারের ব্যাপারে তাঁর ডাক পড়ল। গত মহাযুদ্ধের

বিনষ্টির ক্ষণে Nationalism সম্বন্ধে তাঁর নির্ভীক উক্তি তাঁকে তখনকার মতো অপ্রিয় কর্‌লেও আজ সভ্যজগতের বহু মনীষী ব্যক্তি তাঁরই মতে মত মিলিয়েছেন। মানুষের নতুন ভবিষ্যতের তিনি অন্যতম স্রষ্টা, সেই ভবিষ্যতের প্রতি বাৎসল্য তাঁর স্বদেশ-বাৎসল্যকেও ছাড়িয়ে যায়, তাই তাঁকে আমরা ভারতবর্ষের নেশন্ হওয়ার দিনে পাচ্ছিনে। কিন্তু যখনি ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে, তখনি তিনি আমাদের পক্ষে। জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের প্রতিবাদ কর্‌তে তিনি মুহূর্ত্ত মাত্র দ্বিধা বোধ করেননি।

মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপখণ্ডে লীগ্ অব্ নৈশন্‌স্-এর প্রতিষ্ঠায় Nationalism-এর জড় মর্‌ল না। যা যেমন ছিল তা প্রায় তেম্‌নি থাক্‌ল। মানুষের চরিত্রে যা শ্রেষ্ঠ, তা নিয়ে নেশন্‌ও নয়, লীগ্ অব্ নেশন্‌স্‌ও নয়। স্বার্থের ঊর্দ্ধে না উঠতে পার্‌লে মিলন সত্যকার হ'তে পারে না। হাট-বাজারকে আমরা মিলনস্থলী বলিনে। মানুষ যেখানে জ্ঞান-বিনিময়, প্রীতি-বিনিময় করে, সেইখানে তার মিলন-তীর্থ। রবীন্দ্রনাথ একপ্রকার বে-সরকারী লীগ্ স্থাপন কর্‌লেন, অব্ নেশন্‌স্ নয়—অব কাল্‌চার্‌স্। তাঁর বিশ্বভারতী বিশ্বের সকলের ভারতী। মহাযুদ্ধের মহাপ্রলয়ের পর এই একটি সৃষ্টির মতো সৃষ্টি। আজ যথেষ্ট মর্য্যাদা পাচ্ছে না এ। বটবৃক্ষের বীজের মতো এর আকার ক্ষুদ্র, আয়োজন অল্প। কিন্তু বিপুল সম্ভাবনা যদি কোন অনুষ্ঠানের থাকে তবে এরই আছে। আমাদের গৌরব এই যে, "এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে" এমন একটি পুণ্য তীর্থের প্রতিষ্ঠা হ'ল।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হ'য়ে, শতায়ু হ'য়ে, তাঁর জীবন-শতদলের অপরাপর দলগুলি উন্মোচন কর্‌তে থাকুন। সেইতো তাঁর মুক্তি। একটি মুক্ত পুরুষের দৃষ্টান্ত লক্ষ মুক্ত পুরুষের আবাহন করে। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা; রবীন্দ্রনাথের সম-ধর্ম্মীগণ এই ব'লে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ রইবেন যে, মানুষকে মানুষের যা চরম উত্তরাধিকার তাই তিনি দিয়ে গেলেন। সেটি হচ্ছে, "কী ভাবে বাঁচ্‌ব" এই প্রশ্নের নিঃশব্দ উত্তর।

রবীন্দ্র-কাব্য-জিজ্ঞাসা

—শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ভবভূতি বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কালের জন্য সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়াছিলেন—কারণ, সাহিত্য দেশকালনিরপেক্ষ। সাহিত্যের রসবিচারে সাহিত্যিকের দেশ ও কালের সহিত নিগূঢ় পরিচয়ের নাকি কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু সাহিত্যিকের প্রতিভা-বিচার করিতে হইলে যে বিশিষ্ট সমাবেষ্টনের মধ্যে তিনি সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়াছেন—সে-সমাবেষ্টনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। অথচ সাহিত্যিক যে-মনোভাবের প্রেরণায় আপনার সাহিত্য-সৃষ্টি করেন—সে-মনোভাবের গঠনে সহায়তা করে শুধু সমসাময়িক কালের প্রচলিত ভাবধারা নহে। জাতির গভীরতর অন্তর্জগতে যেমন বহুযুগাগত সংস্কারের একটা সুস্পষ্ট প্রভাব থাকে—মানুষের মনোধর্মেও ঠিক সে-প্রভাব সুপ্রত্যক্ষ থাকে। অনেক সময় ইহা থাকে অতি জাগ্রত, আবার অনেক সময় ইহা থাকে অবচেতন। এইসকল অতীত সংস্কৃতির সহিত যুগোচিত ভাবস্রোতের সংঘর্ষে জাতির এবং ব্যক্তি বিশেষের মনোজগতে যে অভাবনীয় বিপ্লব খেলিয়া যায়, তাহার জটিল সূত্রগুলির মূল নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। অথচ পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষগোচর সকলপ্রকার ভাবধারার সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ না করিলে কোন প্রতিভারই সুধু পরিমাপ করা সম্ভব নহে।

রবীন্দ্রনাথের দৈবী-প্রতিভা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কী করিয়া একার্দ্ধ শতাব্দীকালের মধ্যে একসহস্র বর্ষের সমৃদ্ধি দান করিয়াছে—তাহা বুঝিতে হইলে বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ধারাটিকে বুঝিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে। তৎকালীন বাংলা সাহিত্য এবং য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব কি করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সাহিত্যকে অনির্ব্বচনীয়তা, বিচিত্রতা এবং উৎকর্ষ প্রদান করিল—তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে।

বাংলা সাহিত্যের অভ্যুদয়কালে বিদেশী ভাবধারার প্রভাবে বাঙ্গালী আপনার জাতীয় ভাব-চিন্তাকে বিসর্জ্জন দিবার উপক্রম করিয়াছিল।

বাংলার সমাজ-জীবনে সে-অবস্থা ছিল একান্ত স্বাভাবিক। শিক্ষালোক-প্রাপ্ত বাঙ্গালীর কাল্‌চার-পিপাসাকে পরিতৃপ্ত করিবার মত জাতীয় কাল্‌চার তখনও গড়িয়া উঠে নাই। দাশু রায়ের পাঁচালী এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দর বাঙ্গালী মনকে শেক্‌স্‌পায়্যার, হুগো, গ্যয়টে প্রভৃতি য়ুরোপীয় কবি-কাব্যের অবশ্যম্ভাবী মায়াজাল হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপের বহুবিচিত্র এবং মনোহারী সাহিত্যের রস-সম্ভারের পিপাসা বাঙ্গালীকে এমনভাবে পাইয়া বসিল যে, তাহার কবল হইতে মুক্ত হইয়া আপনার জাতীয় কাল্‌চারের এবং জাতীয় সাহিত্যের কৃষ্টি সাধনের চেষ্টা করিবার মত অবস্থা বাঙ্গালীর আর রহিল না। বাঙ্গালী জাতির এবং বাংলা ভাষার এমনি দুর্দ্দিনে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং মধুসূদনের আবির্ভাব।

সেই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া এই মহর্ষিযুগল পৌরুষের পাঞ্চজন্য নিনাদ করিয়া বাঙ্গালীর মোহভঙ্গ করিতে প্রয়াস পাইলেন। বাঙ্গালী জাতির সে কী বিরাট বিস্ময়! সে কী বিরাট জাগরণের উৎসব! সেই দুইটি বিভিন্নমুখী সভ্যতার ভাবধারার স্রোতাবর্ত্তে দাঁড়াইয়া এই দুইটি কাণ্ডারীর অভাবে যে বাঙ্গালী আপনাকে নিঃশেষে হারাইয়া ফেলিত সে-বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বাঙ্গালীর প্রাণসাগর সেই আন্দোলন-আলোড়নে চঞ্চল এবং উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল; সেই অতি-বিক্ষুব্ধ মানসসাগর মন্থিত করিয়া এই দুই অবতার-কল্প প্রতিভা যে-অমৃত সঞ্চিত করিয়াছিলেন—তাহাই বাঙ্গালীকে আশু মরণের পথ হইতে উদ্ধার করিয়া অনন্ত অমৃতের পথে পরিচালিত করিয়াছিল। মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর প্রাণধর্ম্মকে শুধু জাগ্রত করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই—তাহাকে এক সুবিশাল আত্মপ্রসারের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

দুইটি পরস্পর-বিরোধী মনোধর্ম্মকে এক সুষ্ঠু সমন্বয়ে সংযুক্ত করিয়াই মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রেরণা দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন-পথে চলিয়াছিল। বাহিরের কাঠামোকে অব্যাহতভাবে সর্ব্বপ্রকারে ভারতীয় রাখিয়া মধুসূদন অন্তরে য়ুরোপীয় ভাবধারার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আর

বঙ্কিমচন্দ্র যুরোপের আদর্শে ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া ভারতীয় সনাতনী ভাব-সমুচ্চয়কে এক অপরূপ রসাঞ্জন মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-কাব্যে এবং মধুসূদনের মহাকাব্যে যুরোপীয় এবং ভারতীয় এই দুই বিপরীতধর্ম্মী মনোজগতের ভাবধারার একত্র সমন্বয়ের যে সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহারই বৃহত্তর বিকাশ হইল কবি বিহারীলালের কাব্যে। কবি বিহারীলাল, যুরোপীয় সমাজ-জীবনে এবং সাহিত্য-জীবনে যে রূপ-সাধনা প্রচলিত ছিল—তাহাকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ বা অরূপ-সাধনার সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের পূর্ণ রসস্রোত হইতে অনুপ্রেরণা পাইয়া এক স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব ভাবজগৎ-এর সৃষ্টি করিয়া বিহারীলাল সাহিত্য-সৃষ্টির এবং খাঁটি রস-রসিকতা ও সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচয় দিয়াছিলেন। এতবড় আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্মচেতনা, এমন রসগ্রাহী ও রসস্রষ্টা শিল্পীর আবির্ভাবেই বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আগমনকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। বিদেশী ভাব-কল্পনা ও রূপভোগ-প্রবৃত্তিকে জাতীয় আধ্যাত্মিকতার সহিত সংযুক্ত করিয়া বিহারীলাল বাঙ্গালীর অতি-সঙ্কীর্ণ এবং অতি-সূক্ষ্ম জীবন-ধর্ম্মের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়াই বাংলা সাহিত্য আজ শতপত্রবিস্তারে দিগন্ত প্রসারিত হইয়া বিশ্বসাহিত্যে আপনার বিশিষ্ট স্থানটি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিহারীলালকে, মধুসূদনকে এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে পাইবার সৌভাগ্য বাংলার হইয়াছিল বলিয়াই বিদেশী সভ্যতা এবং বিদেশী সাহিত্যের সংঘাত-উপঘাতে বাঙালীর জাতীয়-সাহিত্য বিলয়প্রাপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বলিষ্ঠতর আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

বিহারীলালই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার পথদ্রষ্টা এবং মন্ত্রগুরু। বিহারীলালের গীতিকাব্যসুধা পান করিয়াই রবীন্দ্রনাথের লিরিক্-প্রতিভা শৈশবে পরিপুষ্টি পাইয়াছিল। এই বিহারীলালের কাছেই রবীন্দ্রনাথ যুরোপীয় ভাবমার্গস্থ রূপলোকে এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ হইবার প্রবেশদ্বারের সন্ধান পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকে বুঝিতে হইলে এই ঐতিহাসিক তথ্যের মূলে প্রবেশ করিতে হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সমাজ-জীবনে এবং সাহিত্য-জীবনে তখন বস্তুতন্ত্রের যুগ। মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপের ভাস্বর আলোকে রূপকে উদ্ভাসিত করিয়া তাহার উপভোগ করাই ছিল য়ুরোপীয় ভাব-সাধনার সর্ব্বোত্তম আদর্শ। এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর রূপ-সাধনাই ছিল য়ুরোপীয় সাহিত্যের মূলগামী তত্ত্ব। য়ুরোপীয় কবি-কল্পনাও তাই বহিঃপ্রকৃতির বিচিত্র এবং অপরূপ রূপরসোদ্ধত অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই কবি-মানসের সহিত প্রকৃতির এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সর্ব্বরসউৎসরূপিণী বহিঃপ্রকৃতির বিশ্ব-ব্যাপ্ত প্রত্যক্ষগোচর সৌন্দর্য্য য়ুরোপীয় কবির মানস-দীপশিখাকে ইন্দ্রিয়ানু-ভূতির হোমবহ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল। এইরূপে মানুষের দেহ-চেতনার সহিত এক প্রকৃতিসর্ব্বস্ব বিশ্বচেতনা আসিয়া অপূর্ব্ব সম্মেলনে মিলিত হইয়াছিল।

অপর দিকে ভারতীয় ভাব-সাধনার ধারা ছিল সনাতন অধ্যাত্মবাদের মধ্যেই সম্পূর্ণ। বহিঃসৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়গোচর অনুভূতির অনেক ঊর্দ্ধে এক সূক্ষ্মতর রসবিলাসেই ভারতীয় কবি-কল্পনার চরম সার্থকতা লাভ হইয়াছিল। এই দেহাতীত এবং রূপাতীত ভাবলোকে ভারতীয় কবি-প্রকৃতি এক অনির্ব্বচনীয় রসাস্বাদনের অনুপ্রেরণা পাইয়াছিল। বিশ্বপ্রকৃতির বাহ্যসৌন্দর্য্যের সহস্র বিচিত্রতার মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন যোগ-সূত্র বর্ত্তমান। তাহারই অনুসরণ করিয়া ভারতের কবি এক অবাঙ্ মানস-গোচর তুরীয় লোকে উপনীত হইয়াছেন। সেই ইন্দ্রিয়াতীত জগতের মহান্ সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার কবিপ্রাণ পুলকে আত্মহারা হইয়াছে—বহিঃসৌন্দর্য্যের স্থূল অনুভূতি তাহার ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিবশ করিয়া ফেলে নাই—বৃহত্তর আত্মচৈতন্যকে নিরুদ্ধ করিয়া দেয় নাই।

তাই ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্য-রসাস্বাদকে ব্রহ্ম-স্বাদ-সহোদর বলা হইয়াছে। এই অতি-সূক্ষ্ম ভাব-সাধনাকে য়ুরোপের ইন্দ্রিয়ানুভূতি-গোচর রূপ-সাধনার সহিত যুক্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-কল্পনাকে এক অবাধ উন্মুক্ত ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিসের প্রেরণায় ভাবতন্ত্র,

রূপতন্ত্র এবং বস্তুতন্ত্রকে তিনি একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন—তাহা তাঁহারই কবিতাতে পরিস্ফুট হইয়াছে—

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে হারা।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও সাহিত্যে এই দ্বন্দ্বের অপরূপ মীমাংসা হইয়াছে। তাই তিনি কাব্যকে করিয়াছেন দর্শন—আর দর্শনকে করিয়াছেন কাব্য। ইন্দ্রিয়াতীতকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেষ্টনের মধ্যে আনিয়া তাহাকে উপলব্ধি-গোচর করিয়াছেন; আবার ইন্দ্রিয়গোচর অনুভূতিসাপেক্ষ সকল বস্তুকে এক অরূপ এবং অতীন্দ্রিয় জগৎ-এর মধ্যে অপূর্ব্ব লীলাবিন্যাসে সজ্জিত করিয়া অফুরন্ত রস-উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যানুভূতি এবং সৌন্দর্য্য-চেতনার আদর্শ ও প্রকৃতি-বিচার করিলেই ঐ কথা প্রমাণ হইবে। তাঁহার কাব্য-জগৎ-এর বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিচিত্র পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সৌন্দর্য্য-প্রেরণা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের রূপাতীত অপ্রত্যক্ষ মনোবিলাসে পর্য্যবসিত হয় নাই—আবার য়ুরোপের রূপাশ্রয়ী ইন্দ্রিয়-চেতনাসর্ব্বস্ব সৌন্দর্য্যানুভূতিতেও পরিণত হয় নাই। ইন্দ্রিয়-বোধের দ্বারকে রুদ্ধ করিয়া—অন্তরকে বাহিরের বিশ্ব হইতে পৃথক্ করিয়া যে অন্তর্মুখী সৌন্দর্য্য-আরাধনার আদর্শ ভারতীয় ব্রহ্মবাদী কবি এবং আলঙ্কারিক স্থাপিত করিয়াছেন—তাহাকে তিনি সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ না করিলেও পরিহার করিতে পারেন নাই। অবচেতন আত্মার গোপন-লোকে ফল্গুধারার মত অন্তঃসলিলা হইয়া সে-সনাতন ভাবধারা তাঁহার অন্তরকে ছাপাইয়া দিয়াছে। কিন্তু কোথাও এই মানসবৃত্তির উদগ্রতায়

তাঁহার কবি-কল্পনা কেন্দ্রাতিগ ভাবমার্গে স্বপ্নপ্রয়াণ করে নাই। ভারতীয় সুপ্রাচীন তামসিক দেহধর্ম্মদ্বারা ভারতের যে জীবন-ধর্ম্ম লুপ্ত হইতে গিয়াছিল—জড়কে, বিশ্বকে ভূমা-আরাধনার প্রেরণায় উপেক্ষা করিয়া যে হৃদয়বৃত্তি নিরুদ্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছিল—তাহাকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু এই তুঙ্গপ্রতিষ্ঠ ভাব-তান্ত্রিকতাকে বর্জ্জন করিয়া তাঁহার কবি-মানস কখনও অতিবাস্তব-চেতনার মোহে পঙ্কবিলাসে নিয়োজিত হয় নাই। বাস্তব-চেতনা হইতে তিনি যে দিব্যানুভূতি লাভ করিয়াছেন—তাহাকে আপনার কল্পনা ও ভাবনামণ্ডিত করিয়া একাধারে অপ্রাকৃত এবং ইন্দ্রিয়োপলব্ধিগোচর সৌন্দর্য্যলোক সৃষ্টি করিয়াছেন; অতিচারী কামজৃম্ভন কিম্বা স্বপ্নপ্রকৃতির অস্বাস্থ্যকর ব্যভিচারজনিত মায়ালোক-রচনাও করে নাই। মোটের উপরে একাধারে জীবন-বেদনা ও প্রত্যক্ষ বাস্তব-চেতনা এবং অতীন্দ্রিয় কল্পনাবিলাস এই উভয়কে আশ্রয় করিয়াই রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যানুভূতি ও রস-চেতনা উন্মথিত হইয়াছে। রোমান্টিক্ কবিগণের অনুকরণে যেমন বাস্তব-জগৎ-এর শতবিচিত্র অভিজ্ঞতাদ্বারা তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধ উদ্রিক্ত হইয়াছে—তেমনি ভারতীয় ব্রহ্মবাদী কবি ও আলঙ্কারিকের অনুকরণে দেহতত্ত্ববিবর্জ্জিত ভাবস্বপ্ন ও তাঁহার সৌন্দর্য্য-প্রেরণাকে উৎসারিত করিয়াছে। রূপ-জগৎএ যেমন তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন—ভাব-স্বর্গেও তেমনি তিনি যদৃচ্ছ বিচরণ করিয়াছেন।

এই যে "ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা"—এই আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন তাঁহার কবি-কল্পনাকে শতবৈচিত্র্যে মণ্ডিত করিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।

এইরূপে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য কাব্যরীতিকে রবীন্দ্রনাথ এক-বৃন্তে বিধৃত করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের আবেগ-চঞ্চল ভাবাতিরেক এবং সকল চৈতন্য-পরিব্যাপক এক আধ্যাত্মিক ভক্তি-প্রেরণা যেমন তাঁহার সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছে, য়ুরোপীয় গীতি-কাব্যের কল্পনা-গভীরতা, অনুভূতির তীব্রতা এবং সর্ব্বোপরি সীমাহীন বৈচিত্র্যও তাঁহার সাহিত্যকে তেমনি অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য এবং সংস্কৃত দর্শন যেমন তাঁহার ভাষা ও ভাবকে সুসমৃদ্ধ এবং মনোহারী করিয়া তুলিয়াছে—

য়ুরোপীয় সাহিত্য এবং দর্শনও তেমনি তাঁহার ভাষাকে মুক্ত, সহজ, সাবলীল এবং ভাবকে সংস্কার-হীন, বন্ধন-হারা করিবার অনুপ্রেরণা দিয়াছে। এই দুইটি বিভিন্ন ধারার মিলন করাইয়া ভাব-গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা, রবীন্দ্রনাথের মত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যেন বহুদূরবর্ত্তী এক মোহন-চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া দুইটি বিভিন্ন মনোজগৎকে আপনার দৈবী-প্রতিভালোকে সমুদ্ভাসিত করিয়া—এই দুই মানস-জগৎ-এর বিচিত্র সৌন্দর্য্য-সম্ভার এবং রসবস্তু একটি দিব্যপুষ্পাধারে সন্নিবিষ্ট করিয়া অমর দেব-দেবীগণের অমৃত-ভোজনের অফুরন্ত আয়োজন করিয়াছেন। দান্তের মহাকাব্যে নাকি দশটি মূক শতাব্দী বাণী পাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কিন্তু সৃষ্টির প্রথম দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে আদি-অন্তহীন অসংখ্য কবি-সম্প্রদায় কালের তুষার-শীতল স্পর্শে ভাষাহীন, বাণীহীন হইয়াছে—সেই অগণিত কণ্ঠের বিপুল-ধ্বনি এক আনন্দময় জীবন-প্রাচুর্য্যের উল্লাসে সপ্তমহাসাগরের একত্র-স্তনিত কল্লোল-ধ্বনির মত প্রকাশ পাইয়াছে।

> "অতীতের গৃহছাড়া কত যে অশ্রুত বাণী
> শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি ;
> খোঁজে তারা আমার বাণীরে
> লোকালয়-তীরে তীরে।
> আলোকতীর্থের পথে আলোহীন সেই যাত্রীদল
> চলিয়াছে অশ্রান্ত চঞ্চল।
> তাদের নীরব কোলাহলে
> অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে
> মোর চিত্তগুহা ছাড়ি'
> দেয় পাড়ি
> অদৃশ্যের অন্ধ মরু, ব্যগ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে,
> আকারের অসহ্য পিয়াসে।"

অতীতের এই সংখ্যাতীত "অশ্রুত বাণী" ও বিশ্রুত ধ্বনিকে, "অস্ফুট ভাবনা" ও প্রস্ফুট কল্পনাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে একত্র সংহত

করিয়াছেন। বিশ্ববাসী কবিমনের ভাব-কল্পনা তাঁহার অন্তরে "আকারের অসহ্য পিয়াসে" যে তীব্র অনুভূতি এবং বেদনা সঞ্চার করিয়াছিল—তাহা রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যে অপরূপ ব্যঞ্জনা পাইয়াছে। সকল কালের সকল দেশের সকল কবির কাব্যসুধাকে তিনি অগস্ত্যের ন্যায় এক গণ্ডূষে নিঃশেষ করিয়াছেন।

কারণ দেশে দেশে যত কবির আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহারা তো মানব-মনের হাসি-অশ্রু, মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগ, আকুতি-মিনতি ও বিরহ-মিলনের বহুবিচিত্র প্রকাশলীলাকে আশ্রয় করিয়াই মানবচিত্তকে পুলক-রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন—আর রবীন্দ্রনাথের লিরিক্-প্রতিভার বিকাশও তো হইয়াছে দেশকালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বমনের চিরন্তন এবং শাশ্বত অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া।

হুইট্‌ম্যান্ নাকি তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—Who touches this, touches a man.

ঐ উক্তি হুইট্‌ম্যান্-এর কাব্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে কি-না, সে বিষয়ে মতভেদের স্থান হয়ত থাকিতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের এই মানবত্বটুকুতে সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ নাই। মানুষের অন্তরের সকল বিচিত্র অনুভূতিকে এমন নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহাকে এমন সুন্দর, সরস ও সার্থক অভিব্যক্তি দিতে কালিদাস ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এই বিশ্বাত্ম-চেতনা ও পরকীয়া ধর্ম্মের প্রভাবে জাতিধর্ম্মকে বা যুগধর্ম্মকে তিনি পরিহার করেন নাই। একটি মাত্র মানব-মনের সুখ-দুঃখের অনু-ভূতির রঙে তিনি বিশ্ব-মানবের মনোলোককে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন—শিশির-শিক্ত তৃণশষ্পে প্রতিফলিত অতি-ক্ষুদ্র সূর্য্য-কিরণের বিচিত্র বর্ণরাগের ভিতর নিখিলের সমস্ত আনন্দ-লীলার অভিব্যক্তি দেখিয়াছেন। ঘটাকাশের মধ্যে পটাকাশ দর্শন এবং বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু দর্শন করিয়াছেন।

সে-কথা আপাততঃ স্থগিত থাকুক। বিশ্ব-সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত যত প্রকার ভাবস্রোত বহিয়াছে তাহাকে রবীন্দ্রনাথ এক সমন্বয়-মূলক

একীকরণ-সূত্রে গ্রথিত করিয়া আপনার স্বর্ণ-বীণায় তন্ত্রী যোজনা করিয়াছেন। তাই একই বীণায় সহস্র ধ্বনিকে ঝঙ্কৃত করিতে পারিয়াছে এক রবীন্দ্রনাথের মত দেব-দুর্লভ প্রতিভা। যে-বীণায় আমরা মানসী, সোনার তরী, চিত্রার গান শুনিয়াছি—ঠিক সেই একই বীণা-তারে গীতাঞ্জলি, পূরবীর সুর ধ্বনিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। ব্যর্গসোঁর দর্শন-কাব্যে যেমন তিনি এক নিজস্ব বিশিষ্টতা আরোপ করিয়াছেন, মাতেরলেঁকের রূপকতা বা সিম্বলিজিম্‌-কেও তিনি স্বতন্ত্র রূপ দান করিয়াছেন। কিন্তু এই অসম্ভব এবং অসম্ভাব্য বিচিত্রতার মধ্যে কোথাও যোগ-সূত্র বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সকল বৈচিত্র্যের মধ্যেও তিনি ঐক্যটিকে হারাইয়া ফেলেন নাই। তিনি এক অদ্বৈতের মধ্যে সকল কিছুর সমাধান করিয়াছেন। এই 'অদ্বৈতবাদ'ই হইল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক আদর্শের মূলগত বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন সাহিত্যিক-আদর্শ সম্বন্ধেই শুধু তিনি অদ্বৈত-পন্থী নহেন। তাঁহার সকল দর্শনের গোড়ার কথাই এই অদ্বৈতবাদ। সাহিত্য-ধর্ম্ম হইতে সুরু করিয়া সমাজ-ধর্ম্ম ও জীব-ধর্ম্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি অদ্বৈত-উপাসক। মানুষের জীবন-ধর্ম্মের সকল প্রকাশকেই তিনি অদ্বৈতের আলোকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, এবং সেই দৃষ্টিই তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধীয় রোমান্টিক্‌ আদর্শটিকে অনেক ভাবে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। সে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার রোমান্টিক্‌ আদর্শ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় রোমান্টিক্‌ সাহিত্যের সমগোত্রস্থ, সে-বিষয়ে কোন মতদ্বৈধের স্থান নাই। শেলী, কীট্‌স্‌, হুগো প্রভৃতির কাব্য-পরিক্রমার সহিত রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্যের এক অন্তর্নিহিত যোগ-সূত্র বহু পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি এই আদর্শ যে শেলী, কীট্‌স্‌ প্রভৃতির নিকটেই পাইয়াছেন এমন সমাধান করার কোনই প্রয়োজন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের রসে আবাল্য-পরিপুষ্ট রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে বিদেশে যাইবার কোনই প্রয়োজন হয় নাই। কালিদাসের কাব্য ও নাটকে আধুনিক রোমান্টিক্‌ সাহিত্যের সকল লক্ষণই ষোল কলায় বর্ত্তমান। মেঘদূতম্‌, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্‌

এবং কুমারসম্ভব কাব্যের সহিত যাঁহার জন্মাবধি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, সেই রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিজ্‌ম্‌-এর * মূল সন্ধান করিতে বাহিরে যাওয়ার আবশ্যক নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আবার এরূপ মনে করিলে চলিবে না যে, এইসকল য়ুরোপীয় রোমান্টিক্ কবি রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করেন নাই। ইঁহাদের প্রত্যেকের প্রভাবই তাঁহার কাব্য ও সাহিত্যে সুস্পষ্ট এবং অবিসংবাদিতরূপে বর্ত্তমান। এবং ইঁহাদের অত্যন্ত গভীর প্রভাবেই তাঁহার সাহিত্যকে এত বিচিত্রতার রূপ দিয়াছে। ইঁহাদের আদর্শের সহিত তাঁহার আদর্শের ঐক্যও অত্যন্ত সুপ্রত্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য-বিচার করিতে গিয়াছেন, তখনও এই আদর্শের অনুপ্রেরণাতেই করিয়াছেন। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার যে দর্শন, তাহার মূলেও রহিয়াছে এই রোমান্টিজ্‌ম্‌। সাহিত্য-বিচারে তাঁহার এই রোমান্টিক্ পক্ষপাত অতিশয় সুন্দর এবং লিরিক্যাল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার জয়-পরাজয় গল্পে। তাঁহার নিজের অজ্ঞাতে আপনার রোমান্টিক্ আদর্শের প্রতি তিনি সেখানে স্পষ্ট পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন।

উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর আর দাক্ষিণাত্যের দিগ্বিজয়ী কবি, পুণ্ডরীক-এর কাব্য-বিচার হইল। উদয়নারায়ণ-এর রাজা এবং পারিষদ্‌-বর্গ পুণ্ডরীক-এর জয় ঘোষণা করিলেন; কারণ পুণ্ডরীক শুধু ব্যস্ত এবং সমস্ত, দ্বিব্যস্ত এবং দ্বিমস্তক, বৃত্ত, তার্ক্ষ্য, সৌত্র, চক্র, পদ্ম, কাকপদ, আদ্যুত্তর, মধ্যোত্তর……ইত্যাদি শব্দচাতুরী দেখাইতে পারিতেন, তাহাই নহে—তিনি শার্দ্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে রাজার স্তবগানও করিতে পারিতেন—আবার শেখর শব্দের শেষ দুই অক্ষর গ্রহণ করিয়া অনর্গলভাবে হাস্য-রসাত্মক কবিতা রচনাও করিতে পারিতেন। গুরুগম্ভীর শব্দ-যোজনা

* ইংরেজী রোমান্টিসিজ্‌মের যে-দেশে প্রথম উদয় এবং পরিবর্দ্ধন সেই ফরাসীদেশে ইহাকে বলা হয় Romantisme, আমি এই কথাটিই বাংলাতে ব্যবহার করিব।

অধুনা-প্রচলিত 'রাগাত্মকতা' বা 'কল্প-প্রবণতা' প্রভৃতির কোনটাই ইহার সমগ্রতার ভাবটি প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়া বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিব না।

—লেখক।

দ্বারা অর্থের প্রহেলিকা সৃষ্টি করিতে তিনি সুপটু।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সুচতুরভাবে শেখরের জয়-ঘোষণাই করিয়াছেন। শেখরের তিনি যে-চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে, শেখর হইল পরিপূর্ণ রোমান্টিক্ কবি।

"যেদিন কোন নূতন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বসিয়া রাজাকে শুনাইতেন, সেদিন কণ্ঠস্বর ঠিক এতটা উচ্চ করিয়া পড়িতেন, যাহাতে তাহা সেই সমুচ্চগৃহের উপরিতলের বাতায়ন-বর্ত্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীগণের কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে। যেন তিনি কোন এক অগম্য নক্ষত্রলোকের উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গীতোচ্ছ্বাস প্রেরণ করিতেন, যেখানে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জীবনের একটি অপরিচিত শুভগ্রহ অদৃশ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছে।"

"কখন ছায়ার মতন দেখিতে পাইতেন, কখন নূপুর-শিঞ্জনের মত শোনা যাইত; বসিয়া বসিয়া মনে মনে ভাবিতেন, সে কেমন দুইখানি চরণ যাহাতে সেই সোনার নূপুর বাঁধা থাকিয়া তালে তালে গান গাহিতেছে। সেই দুইখানি রক্তিম শুভ্র কোমল চরণতল প্রতি পদক্ষেপে কি সৌভাগ্য, কি অনুগ্রহ, কি করুণার মত করিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করে। মনের মধ্যে সেই চরণ দুইটি প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি অবসরকালে সেইখানে আসিয়া লুটাইয়া পড়িত এবং সেই নূপুর-শিঞ্জনের সুরে আপনার গান বাঁধিত।

রোমান্টিক্ শেখরের গানও রোমান্টিক্।—

"পরদিন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন:—বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে; তখন গোপিনীরা জানে না কে বাজাইল, জানে না কোথা হইতে বাজিতেছে। একবার মনে হইল, উত্তরে গিরিগোবর্দ্ধনের শিখর হইতে ধ্বনি আসিতেছে, মনে হইল উদয়াচলের উপর দাঁড়াইয়া কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে, মনে হইল অস্তাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহশোকে কাঁদিতেছে, মনে হইল যমুনার প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁশির ছিদ্র—অবশেষে কুঞ্জে-কুঞ্জে, পথে-ঘাটে, কূলে-কূলে, জলে-স্থলে, উচ্চে-নীচে, অন্তরে-বাহিরে বাঁশি সর্ব্বত্র হইতে বাজিতে লাগিল—বাঁশি কি বলিতেছে তাহা কেহ স্থির করিতে পারিল না, এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কি বলিতে চাহে তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না; কেবল দু'টি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল; এবং একটি আলোক-সুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল।"

"সভা ভুলিয়া, রাজা ভুলিয়া, আত্মপক্ষ-প্রতিপক্ষ ভুলিয়া, যশ-অপযশ, জয়-পরাজয়, উত্তর-প্রত্যুত্তর, সমস্ত ভুলিয়া শেখর আপনার হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একেলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতির্ম্ময়ী মানসী-মূর্ত্তি, কেবল কানে বাজিতেছিল দুইটি কোমল চরণের নূপুর-ধ্বনি।

কবি যখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলেন, তখন একটি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে একটি বৃহৎব্যাপ্ত বিরহব্যাকুলতায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিল, কেহ সাধুবাদ দিতে পারিল না।"

কিন্তু এ' ভাব-ব্যঞ্জনাকে বুঝিবার মত রসবোধ উদয়নারায়ণের রাজার সভাসদ্-এর ছিল না। দিঙ্‌নাগের স্থূল-হস্তাবলেপের তাড়নায় শেখর জীবনের মায়া কাটাইল।

তারপর যখন নূপুর বাজিল, দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে কেশগুচ্ছের একটা সুগন্ধ ঘরে প্রবেশ করিল এবং মৃত্যু-সমাচ্ছন্ন বাষ্পাকুল নেত্রে মরণোন্মুখ কবি দেখিলেন, তাঁহার "অন্তরের সেই ছায়াময়ী প্রতিমা অন্তর হইতে বাহির হইয়া" নিজ কণ্ঠের স্বহস্তে-রচিত পুষ্পমাল্য তাঁহাকে পরাইয়া দিতে আসিয়াছেন—তখন যেন সত্যই মনে হয় স্বয়ং শ্বেতভুজা বীণাপাণি "কমলবন শূন্য করিয়া" "চরণাসক্ত অমৃতপিপাসী"কে জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন। রোমান্টিজম্-এর শুভ জয়বার্ত্তা ঘোষিত হইল। নিচুল রবীন্দ্রনাথ আপনার কাব্যাদর্শকে কাব্যসরস্বতীর হস্তে জয়টীকা পরাইয়া লইলেন।

এখন রবীন্দ্র-কাব্যের রোমান্টিজম্-এর স্বরূপ বিচার করিতে হইবে। তাঁহার রোমান্টিক্ কাব্য-শরীরে বিচিত্রতার স্রোতোধারা উৎসারিত হইয়াছে। কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের প্রবাহ নতোন্নত তরঙ্গধারার মত; তাহার যে-অংশই পৃথক করিয়া দেখি তাহারই একটা সমগ্রতার, একটা সুসংহত ঐক্যের এবং সামঞ্জস্যের ছন্দ ও রূপ বর্ত্তমান। কাব্যপাঠকালে সেই ছন্দের উন্মাদনা আমাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া দেয়। কিন্তু সেই ভাবের উত্তরসীমায় আরোহণ করিয়া আমরা একটি ঐক্যসূত্রের অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিশ্লেষণ করিলে ইংরেজী রোমান্টিক্ কবিদের রোমান্টিজমের সকল রূপই পাইব। শেলীর স্বাধীনচিত্তবৃত্তি এবং অতীন্দ্রিয়তা, কীট্‌সের ভোগসর্ব্বস্ব সৌন্দর্য্য-চেতনা, বায়রনের চিরন্তন চঞ্চল মদালস, কোল্‌রিজ-এর অপ্রাকৃতিক অনৈহিকতা এবং হ্বার্ডস্‌হ্বার্থ-এর অতি-সাধারণ বস্তু-গুণে সূক্ষ্ম-আনন্দোপলব্ধি—ইহাদের কোনটিরই অভাব নাই তাঁহার কাব্যে। ইহাদের সকলের অভাবনীয় সমাবেশে রবীন্দ্রনাথের

কাব্যের রোমান্টিক্ রূপটি এক মরতুল্লভ রসস্ফূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সুবিশাল কাব্যভাণ্ডার হইতে ইহাদের সুপ্রচুর উপাদান সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু এখন তাহার প্রয়োজন নাই। শুধু এ'কথা বলিলেই চলিবে—রোমান্টিক্ কবিদের এইসকল বিচিত্র ভাবসম্পদ্‌কে রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের কাব্যশালা ইহাদের অফুরন্ত ভাণ্ডার। শুধু পরিমাণে নহে—গুণমানেও রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিজম্ সুসমৃদ্ধতর। সে যাহাই হোক্, শাশ্বত নিরবধি কালের নিকট এ-বিচার-ভার অর্পণ করিয়া আমরা এখন অন্য প্রশ্ন মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিজম্ এবং য়ুরোপীয় রোমান্টিজমের মধ্যে এক গভীর স্বাতন্ত্র্য আছে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিজম্ মিষ্টসিজম্-এর আলোকে অনুরঞ্জিত। রবীন্দ্রনাথের সকল কাব্যেই একটা বিশিষ্ট সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়—যাহাকে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় তাঁহার New Essays in Criticism গ্রন্থে বলিয়াছেন—"inter-penetrative power." এ' শক্তি রবীন্দ্রনাথ কোথা হইতে পাইলেন, তাহা সঠিক নিরূপণ করা দুরূহ। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে অথবা ফরাসী কাব্য-জগৎ-এর Parnassiens সম্প্রদায়ের কাব্যশাস্ত্রে কোথায় যে তিনি ইহার অনুপ্রেরণা পাইয়াছেন—তাহার সূক্ষ্মবিচার করা সহজ নহে। তবে আমাদের মনে হয়, ইহাকে তিনি ভারতীয় দর্শনেই পাইয়াছেন। ভারতের আকাশে, বাতাসে, ভূমিতে, জলে সর্ব্বত্রই যেন এক অতীন্দ্রিয়তার ছাপ রহিয়াছে। ভারতীয় প্রাণ-ধর্ম্মের সহিত ইহা অবিচ্ছিন্নরূপে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। উপনিষদ্ তাই একাধারে কাব্য এবং দর্শন। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত। সুতরাং তাঁহার এইসকল কাব্যস্থিত interpenetrative power-কে তিনি উপনিষদের মন্ত্র-বলে পাইয়াছেন বলিলে অতিশয় ভুল করা হইবে না। সে কথা এখন থাক্। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া রবীন্দ্রনাথের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

শেলী, কীট্‌স্, বার্ণস্ প্রভৃতি রোমান্টিক্ কবিগণ প্রকৃতিকে প্রাণবান্ মনে করিয়াছেন। অন্ততঃ মানব-মনের উপর প্রকৃতির একটা নিগূঢ় প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু আপনার অন্তরের সকল

চেতনা ও সকল বেদনার সহিত একাঙ্গ করিয়া লইতে পারেন নাই; প্রকৃতিকে একটা বাহিরের অশরীরী অস্তিত্ব স্বরূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন বটে। কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার যে চিরন্তন যোগধারা, যে অচ্ছেদ্য নাড়ীর বন্ধন—তাহাকে কেহই রবীন্দ্রনাথের মত নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য, সাহিত্য ও জীবনে কিন্তু এই সত্যটাই পরিস্ফুট হইয়াছে।

শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার সহিত তাঁহার যে গূঢ় পরিচয় ও অভিন্নতা আছে—তাহাকে কবি সকল সময়েই নিবিড়ভাবে অনুভব করিয়াছেন—

"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হ'য়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠ্‌ত, শরৎ-এর আলো পড়্‌ত, সূর্য্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক লোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হ'তে থাক্‌ত—আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জলস্থল-পর্ব্বত ব্যাপ্ত ক'রে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে প'ড়ে থাকৃতুম, তখন শরৎ-সূর্য্যালোকে আমার বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গে একটি আনন্দ-রস, একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্দ্ধ-চেতন ও অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হ'তে থাক্‌ত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ-যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত, মুকুলিত, পুলকিত, সূর্য্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব! যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায়, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌চে এবং নারকেল-গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর ক'রে কাঁপ্‌চে।"

কত লক্ষ শত বর্ষ পূর্ব্বে এই ধরণীর ধূলির সহিত, সুদূর গগনের সন্ধ্যাতারার সহিত তাঁহার আত্মীয়তা! বিশ্ব-প্রকৃতির যে অলৌকিক প্রদেশে "শতেক সহস্ররূপে" "অঙ্কুরিছে, মুকুলিছে, গুঞ্জরিছে প্রাণ," শত-লক্ষ সুরে যেখানে গান গুঞ্জরিয়া উঠিতেছে—নৃত্য অসংখ্য ভঙ্গীতে উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছে—যেখানে সুন্দরী বসুন্ধরাকে বেষ্টন করিয়া—

সহস্র দিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরাণী যত, আনন্দের রস
কতরূপে হ'তেছে বর্ষণ, দিক্ দশ
ধ্বনিছে কল্লোল-গীতে—

—নিখিলের সেই বিচিত্র আনন্দ-লোক হইতে তিনি "প্রবাসী" হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। তাই কবি এখনও বুঝিতে পারেন—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে ল'য়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি', আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র ফুল ফল গন্ধ রেণু।"

কবি আজও উপলব্ধি করিতে পারেন—ধরণীর অন্তরে কী জীবন-রসধারা অহর্নিশি সঞ্চারিত হইতেছে,—কী অন্ধ আনন্দভরে কুসুমমুকুল সুন্দর বৃন্তের মুখে ফুটিয়া আকুল—কী মূঢ় প্রমোদরসে, কী গূঢ় পুলকে তরুলতাতৃণগুল্ম প্রথম প্রভাতালোকে হরষিয়া উঠে। জলে, স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে, আকাশের নীলিমায় আজও তাই কবি আপনার সর্ব্বব্যাপীত্ব অনুভব করিতে পারেন। প্রকৃতির সেই সুন্দর বিচিত্র প্রেক্ষাগৃহ হইতে আজও কবি শুনিতে পান—"চিরদিনকার সঙ্গীতের লক্ষবিধ আনন্দখেলার পরিচিত রব"। এই সুচিরপরিচিত ধরণীর গোপন আহ্বানের ইঙ্গিত কবির কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে,
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে ক'ব তা' কেমনে ?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে ;
সে দুয়ার খুলি' কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে॥

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে।
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে।"

"নিশার আকাশে"র সহিত, "লক্ষ লক্ষ যোজন দূরের তারকা"র সহিত লক্ষ-লক্ষ যুগ ভরিয়া কবির পরিচয়। যে-ভাষায় তাহাদের সহিত কবির আলাপ—সে-ভাষা বিস্মৃতির অতল-তলে।

"যে-ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি—
চিরদিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে!
অনাদি উষার বন্ধু আমার
তাকায় আমার পানে সে॥"

বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত এই নিগূঢ় পরিচয়, এই নিবিড় আত্মীয়তা রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিজম্‌কে এক বিশিষ্ট স্বতন্ত্রতার রূপ দান করিয়াছে। প্রকৃতির সহিত আপন অন্তরের এই অখণ্ড যোগসূত্রের অস্তিত্বজ্ঞানের মধ্যে এক সূক্ষ্ম আনন্দরস আছে—সেই আনন্দের সন্ধানেই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রাণ এই অতীন্দ্রিয়লোকে স্বপ্নপ্রয়াণ করিয়াছে। এ' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কালিদাস ঋতুপুরুষকে "সখা," "ভ্রাতা" যাহাই বলুন—তিনি কখনই ভুলিতে পারেন নাই যে, ইহার কোন অর্থসঙ্গতি নাই। প্রকৃতিকে চেতনাময়ী বলিয়াই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কারণ "কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।" কামার্ত্তের ন্যায় ভাবার্ত্তগণও চেতনাচেতনে প্রভেদ দেখেন না।

সে যাহাই হোক্, প্রকৃতির সহিত নিখিল বিশ্বের সহিত এ' আত্মীয়তা-বোধ—এই যে "অংশের মধ্যে সম্পূর্ণতাকে, সীমার মধ্যে অসীমকে" নিবিড় উপলব্ধি, তাহাই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ও কাব্যের সাধনা। এই অনুভূতিকেই, এই অদ্বৈতবাদকে বিদগ্ধ সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"বিশ্বাত্মবোধ" ও রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"সর্ব্বানুভূতি।"

এই অদ্বৈতবাদের জন্যই, পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বজগৎ-এর নিত্যপ্রত্যক্ষ শত-প্রকার বাস্তব খণ্ডতা এবং বিচ্ছেদের মধ্যেও তিনি এক গভীর ঐক্য সন্ধান করিয়াছেন। মানুষের জীবনের সকলপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি, দ্বন্দ্ব-অনৈক্যের মধ্যে এক শাশ্বত আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন। এই অদ্বৈতবাদ ও আনন্দোপাসনাও রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক্ আদর্শটিকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। জীবনকে বিচ্ছিন্ন এবং বিশ্লেষণ করিয়া তাহার শত গ্লানি, শত অসঙ্গতিকে প্রকাশ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইয়াছেন। জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন অখণ্ড, একক অদ্বৈতরূপে।

> "শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
> সরমের ডালি,
> নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিতদীপের
> ধূমাঙ্কিত কালি,
> লাভ-ক্ষতি টানাটানি, অতিসূক্ষ্ম ভগ্নঅংশভাগ
> কলহ সংশয়—
> সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি'
> দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।"

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জগৎ-এর প্রতি-পর্য্যায়ে তাঁহার এই বিশিষ্ট রোমান্টিক্ আদর্শই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মানুষের জীবনে শ্রাবণের ঘনধারার মত দুঃখের পর দুঃখ ঘনাইয়া আসে—নিয়তির অদৃশ্য এবং অধৃষ্য নিপীড়নে জীবন বিষময় হইয়া উঠে। দুঃখ-বেদনার প্রাচুর্য্যে আমাদের নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠে (Sunt Lacrimœ rerum et mentem mortalia tangunt: Virgil)। জীবনের এই দুঃখকে জগৎ-এর অনেক সাহিত্যিক তাঁহাদের সাহিত্যের উপকরণ করিয়া লইয়াছেন। ইউরিপিডেস্, সফোকলা, থ্যাইস্‌কিলাস্ প্রভৃতি গ্রীক্ নাট্যকারগণ মানুষের উপর নিয়তির নিষ্ঠুর অত্যাচারকে আশ্রয় করিয়া ট্র্যাজেডি লিখিয়াছেন। আর আধুনিক সাহিত্যে হুগো, ফ্লোবের হইতে আরম্ভ করিয়া গর্কী, বোয়ার, হার্ডি পর্য্যন্ত অনেক সাহিত্যিকই জীবনের দুঃখ-বেদনা, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ক্লেদকে (les

miserables) তাঁহাদের সাহিত্যের সামগ্রী করিয়া লইয়াছেন। অদ্বৈতানন্দের উপাসক রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই ক্লেদকে সহ্য করিতে পারেন নাই—তিনি সর্ব্বত্রই দেখিয়াছেন আনন্দ-সুন্দরের বিচিত্র লীলাখেলা। গ্রীক্ ট্র্যাজেডিয়ান্ এবং আধুনিক যথাস্থিতবাদীগণ পৃথিবীতে সুন্দর-এর স্থান যেরূপ দিয়াছেন অ-সুন্দরের স্থানও সে-রকম নির্দ্ধারণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পৃথিবীকে সুন্দরের আলোকে দেখিয়াছেন। তিনি অসুন্দরের মধ্যে আনন্দের সন্ধান করেন আর নিরানন্দের মধ্যে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করেন। বাস্তবের সকল খণ্ডতা, সকল দ্বৈধতার মধ্যে এই অখণ্ডভাবে বিরাজমান 'আনন্দম্' এবং 'অদ্বৈতম্'-এর লীলা দেখিয়াই তিনি এমন তন্ময়ভাবে বাণীর আরাধনা করিয়াছেন।

শুধু ও চরণ হৃদয়ে বিরাজে,
শুধু ওই বীণা চিরদিন বাজে,
স্নেহসুরে ডাকে অন্তর-মাঝে—
আয় রে বৎস আয়,—
ফেলে রেখে আয় হাসি-ক্রন্দন,
ছেড়ে আয় যত মিছে বন্ধন,
হেথা ছায়া আছে চির-নন্দন
চির-বসন্ত-বায়।"

প্রকৃতপক্ষে "সংসার-ধূলিজালের আবরণ" রবীন্দ্রনাথের তুরীয় দৃষ্টিকে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। সকল-কিছুর অন্তরালে তিনি 'চির-নন্দন'-এর সন্ধান পাইয়াছেন, পঙ্কের মধ্যে তিনি পঙ্কজের সন্ধান পাইয়াছেন; আর মননের দ্বারা বেদনার মধ্যে অসঙ্গতির আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই মনোভাবকে শাতোব্রিয়াঁ অতিসুন্দর ব্যাখা দিয়াছেন—

"On nest point un grand ecrivain parcequ'on met l'ame a la torture. Les Muses sont des femmes celestes quine defigurent point burs traits par des grimaces: Quand elles pleurent c'est avec a secret dessein de S'embellir."

অর্থাৎ—"নিজের আত্মাকে ধরিয়া নির্য্যাতন করিলেই কেহ বড় সাহিত্যিক হইয়া পড়েন না। কলালক্ষ্মীরা স্বর্গের অধিবাসী, তাঁহারা মুখ

বিকৃত করিয়া নিজকে কুৎসিত করিয়া তোলেন না। তাঁহারা যখন কাঁদেন—তখনও গোপনে লক্ষ্য রাখেন যে, মুখ-ভঙ্গীটি সুন্দর হইতেছে কি-না।”

এই যে সর্ব্বচৈতন্যের ঊর্দ্ধে এক নিরঙ্কুশ সৌন্দর্য্য-চেতনা, তাহাই হইল রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্ব্বোত্তম বিশিষ্টতা। আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিমগ্ন করিবার জন্য এত বড় সাধনার পরিচয়—আমরা কাহার সাহিত্যে পাই? সত্যই যেন রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর মালাকর। যে-আদিম বসন্তপ্রাতে মন্থিতসাগর হইতে কুন্দশুভ্র, নগ্নকান্তি, সুরেন্দ্রবন্দিতা, অনিন্দিতা সুন্দরী রূপসী কলালক্ষ্মী আপনার স্বর্ণঝাঁপি লইয়া পৃথিবীতে উদিতা হইয়াছিলেন আর যত অমর দেব-দেবীগণ বরদালক্ষ্মীর নিকট বর প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলেন—সেই শুভ-উৎসব-দিনে যেন রবীন্দ্রনাথ “আমি তব মালঞ্চের হ'ব মালাকর” বলিয়া তাঁহার আসঙ্গ মাগিয়া লইয়াছিলেন।

সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর দেব-বাঞ্ছিত নিত্যকল্যাণময় সাহচর্য্য রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছেন। সহস্ররূপে বিচিত্রিতা কলালক্ষ্মীকে আপনার অন্তরে শাশ্বত-রূপে অধিষ্ঠিত করিবার সৌভাগ্য এক রবীন্দ্রনাথেরই হইয়াছে। সৌন্দর্য্য, শ্রী, সুষমার যিনি অধিষ্ঠাত্রী তাঁহাকে এত নিবিড়ভাবে পাইবার পুলক-রোমাঞ্চ রবীন্দ্রনাথকে ভাব-বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার বিচিত্র প্রকাশ-মহিমার সকল অভিব্যক্তিকে তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন বলিয়াই মুগ্ধবিস্ময়ে গাহিয়াছেন—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্র-রূপিনী!
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চল-গামিনী।
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলক-গন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল-চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল-রাগিণী।

কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত
তব অসংখ্য কাহিনী !
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্র-রূপিনী !

এই বিচিত্রতার লীলার যিনি রঙ্গিনী তাঁহাকে আপনার নিভৃত অন্তরে অধিষ্ঠিতা দেখিয়া আবার বলিতেছেন—

অন্তর-মাঝে তুমি শুধু একা একাকী,
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী !
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম জীবন-গগনে,
চারিদিকে চির যামিনী !
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী ।
ধীর-গম্ভীর গভীর মৌন-মহিমা,
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ন-নীলিমা,
স্থির হাসিখানি উষালোক সম অসীমা,
অয়ি প্রশান্ত-হাসিনী !
অন্তর-মাঝে তুমি শুধু একা একাকী,
তুমি অন্তরবাসিনী !

এই অন্তরবাসিনী নিত্যভাস্বরদীপ্যমানা সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্ত আজন্ম-সহচরীরূপে পাইয়াছে। জীবনের এই প্রথম প্রেয়সী, "ভাগ্য-গগনের সৌন্দর্য্যের শশী"র সহিত কবে কোন্ ফুল্ল-যূথীবনে, বহু-বাল্যকালে কবির আধ-চেনাশোনা হইয়াছিল। কোন্ অরুণ-প্রভাতে শুভ্র-বস্ত্র-পরিহিতা ঊষা-কিরণ-ধারে সদ্যঃ-স্নাতা নবীনা বালিকা-মূর্ত্তি এই মানস-সুন্দরী "বিকচ কুসুমসম ফুল্ল মুখ-খানি"সহ নিদ্রাভঙ্গে অস্থির কবি-বালকের

সহিত শেফালিচয়নে যাইত ! তারপরে একদিন জীবনের বনে যখন যৌবন বসন্তের প্রথম মলয়-বায়ুর স্নিগ্ধ নিঃশ্বাসে নব নব আশা মুকুলিত হইয়া উঠিতেছিল—সহসা সচকিত কবি দেখিলেন, ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে কখন্ তাঁহার মানস-সুন্দরী অন্তরের অন্তর-লক্ষ্মী হইয়া গিয়াছে। যে ছিল খেলার সঙ্গিনী সে হইয়া গেল "মর্ম্মের গেহিণী"—"জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী"। কোথায় আজ সেই "মানসী-রূপিণী,"—"বাসনা-বাসিনী," "আলোক-বসনা," "অনিন্দ্য-সুন্দরী" লীলাসঙ্গিনী ? আজ তাঁহার সমগ্র সৌন্দর্য্য বিশ্ব-সৌন্দর্য্যে বিথারিয়া গিয়াছে—প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। নিখিলের শত-বিচিত্র সৌন্দর্য্যের লীলায় তাই কবি দেখিতে পান তাঁহারি রঙ্গিমা !—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হ'তে মর্ত্তভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিত-স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার ; তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি ; বসন্ত বাতাসে
চঞ্চল বাসনা-ব্যথা ; সুগন্ধ নিঃশ্বাসে
করিছ প্রকাশ ; নিষুপ্ত পূর্ণিমা-রাতে
নির্জ্জন গগনে একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহ-শয়ন ; ......

আজ তাই সকল ব্যক্তি-সম্পর্কের সুদূর অতীতে সমগ্র অসীমতার সৌন্দর্য্যে তাঁহার বিকাশ। উর্ব্বশীর রূপও তাই আপনাতে আপনি সুন্দর। সমস্ত প্রয়োজনের বাহিরে, সমস্ত ব্যক্তি-সম্পর্কের বাহিরে, "সে আপনাতে আপনি একটি সত্তা"। রবীন্দ্রনাথের নিখিল-বিশ্বব্যাপিনী উর্ব্বশী কিন্তু এই মানস-সুন্দরীরই একটি বিশেষ মূর্ত্তি। কবি তো আগেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

সেই তুমি
মূর্ত্তিতে কি দিবে ধরা ? এই মর্ত্তভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে

সর্ব্ব ঠাঁই হ'তে সর্ব্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মূরতি ?

উর্ব্বশী হইল সেই 'একখানি মধুর মূরতি'! উর্ব্বশীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সৌন্দর্য্য-আরাধনার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় আদর্শের এক অপরূপ যোগাযোগ হইয়াছে। এই উর্ব্বশীর রূপটিকে বিশ্লেষণ করিলেই উপলব্ধি করা যাইবে, কি করিয়া রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় রূপ-সাধনার সহিত ভারতের সূক্ষ্ম ভাবতন্ত্রকে সমধর্ম্মে যুক্ত করিয়াছেন।

মানুষের সহজ ইন্দ্রিয়োপলব্ধির ঊর্দ্ধে এক রূপাতীত সৌন্দর্য্য-কল্পনা তাঁহার অন্তরের রস-চেতনাকে মথিত করিয়াছে। উর্ব্বশী তাঁহার নিকট মাতাও নহে, কন্যাও নহে, বধূও নহে—সহজ নিঃসম্পর্কের গৌরবে অনবগুণ্ঠিতা অকুণ্ঠিতা রূপসী। বিহারীলালের দেবী যোগেশ্বরীর সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে। ইহার পরেই কিন্তু কবি য়ুরোপীয় ইন্দ্রিয়-চেতনা ও ভোগ-কল্পনার চত্বরে উত্তীর্ণ হইলেন। দেহ-চেতনা ভাব-সাধনাকে ছাপাইয়া উঠিল—

যুগযুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী,
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশী!
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্যার ফল ;
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল ;
তোমার মদির-গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে ;
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধচিতে
উদ্দাম সঙ্গীতে ;
নূপুর গুঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা,
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।

সুর-সভা-তলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশী!
ছন্দে ছন্দে নাচি' উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,

শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি 'পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে,
অয়ি অসম্বৃতে!

এখানেই কিন্তু শেষ নহে। ইন্দ্রিয়-চৈতন্যকে ইহার পরেই আবার সূক্ষ্ম ভাব-বিলাসে অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। গ্রীক্ লক্ষ্মী আফ্রোদিতেকে ইন্দ্রের সপ্ত-স্বর্গে অধিষ্ঠিতা করিয়াছেন। এই ভাব হইতে রূপে, রূপ হইতে ভাবে অবিরাম যাওয়া-আসা শুধু আমাদিগকে সন্ত্রস্ত করে না। ইহা কবিকেও বিস্ময়-ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। কবি নিজেও এই বিচিত্র লীলা-রূপ দেখিয়া ভাব-বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন। ইহার এক রূপ দেখিয়া তাঁহাকে হয়ত অন্তরে গাঁথিয়া রাখিতে গিয়াছেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অন্য রূপ দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। হৃদয়ের মধ্যে নিবিড়ভাবে পাইয়াও সংশয় হইয়াছে, ক্ষণিক মোহবিলাস কি-না। এই সন্দেহ-সংশয়ই আপনার সঙ্গীতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—

তোমায় চিনি ব'লে আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে;
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।
কতজন এসে মোরে ডেকে কয়—
"কে গো সে?"—শুধায় তব পরিচয়,
"কে গো সে?"—
তখন কি কই নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, "কি জানি, কি জানি!"
তুমি শুনে হাস, তারা দুষে মোরে
কি দোষে!

এই সন্দেহ-সংশয়ের দোলায় কবির মনকে বিভ্রান্ত যিনি করিতেছেন তিনিই জীবন-দেবতা। কবির সহিত তাঁহার চিরন্তনী লীলা-খেলা

চলিয়াছে। এই কৌতুকময়ী জীবন-দেবতা কবির নিজের কথার সহিত "আপনার নিত্যবাণীর সুর" মিশাইয়া দেন। কবি বিস্মিত হইয়া যান্—নিজের কণ্ঠের ভাষাকে নিজে প্রকাশ করিতে পারেন না।—

"একি কৌতুক নিত্য নূতন,
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?
অন্তর-মাঝে বসি' অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে! * * *
যে-কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে-ব্যথা বুঝিনি জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে!"

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-সাধনার মূল মন্ত্রই হইল—এই কৌতুকময়ী জীবন-দেবতার আরাধনা। এই লীলা-সঙ্গিনীর বন্দনা-গীতই তাঁহার সুরসপ্তকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই জীবন-দেবতাই সহস্র বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া লীলায়িত, বিভক্ত জীবনকে এক অখণ্ড তাৎপর্য্যে আনিয়া পরিণত করিয়া দিয়াছেন। ধরণীর সকল লীলা, মানবের সকল বেদনা, সকল চেতনা, প্রকৃতির সকল অভিব্যক্তি তাঁহার বাঁশীতে অপরূপ সুর গাঁথিয়া দিয়াছে। তিনি নিজেও সকল-কিছুর অর্থ বুঝিতে পারেন নাই—শুধু জীবন-দেবতার নিঃশব্দ ইঙ্গিত-এ সেই "বিচিত্রের নর্ম্ম্য বাঁশীখানি" বাজাইয়া চলিয়াছেন।

পুষ্পোদ্‌গম-কালে ফাল্গুনে তরুর মর্ম্মে বেদনার যে-স্পন্দন জাগে তাহাকে উৎকণ্ঠা-কম্পিত মূর্চ্ছনায় নিজ রাগিণীতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়াছেন। ছিন্নপত্র তাঁ'র গীতে—ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস।

ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে

যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, তারে দিনু উৎসারিয়া
এ বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ; যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোক-বন্দনা মন্ত্র জপে—আমার বাঁশীরে রাখি'
আপন বক্ষের 'পরে, তা'রে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয়কম্পনে মম ; যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোর-কোরক মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি'
পূজার নৈবেদ্য-ডালি, সংশয়িত তাহার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশরী কলস্বনা।
চেতনা-সিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ-গর্জ্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্য সনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কলকলরোলে
উঠিতেছে রণি' রণি', ছায়া রৌদ্র সে-দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি তীরে বসি' তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অন্তরের আনন্দ-বেদনা।

এই নিখিলের অনুভূতি, শতেক অসংখ্য আকুতি—এই বিচিত্র বেদনার সুরগুলি রবীন্দ্রনাথ আপন বীণার তন্তুজালে গ্রথিত করিয়াছেন। আজিও রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সুরধ্বনি শুনিয়া পূরবীর রাগকে প্রভাতীর রাগ বলিয়া মনে হয়। আজিও দিক্‌চক্রবালে অস্তরবির বর্ণচ্ছটা দেখিয়া উষারুণ-রাগ বলিয়া ভ্রম হয়। বাংলা সাহিত্যে এই গৌরব-রবি যে দীপ্ত আলোক উৎসারিত করিয়া দিয়াছিলেন—সে-আলোক এখনও অনির্ব্বাণ রহিয়াছে। "আজি হ'তে শত বর্ষ পরে"ও এই গৌরব-রবি আপনার দিব্য-আলোকচ্ছটায় ভাস্বর-দীপ্তিতে বিরাজ করিবে। সেদিন বিশ্ব-কবি-সভায়—মর্লি'র assemblage of classics-এ—কালিদাস, বাল্মীকি, হোমার, শেক্স্‌পিয়রের নামের সহিত রবীন্দ্রনাথের নামও দিগন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিবে। বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি আজ সেই শুভদিনের অভিমুখে।

রবীন্দ্র-সংস্পর্শে

—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

১৯১২ সালের কথা—১৯ বৎসর পূর্ব্বে। তখন আমি মেয়ো হস্পিটালের রেসিডেন্ট সার্জ্জন। গঙ্গার ধারেই হাঁসপাতাল; তার বিশাল ভবনের বিরাট ছাদের উপর কবির সঙ্গে মাঝে মাঝে গান, আবৃত্তি ও আলোচনার সঙ্গত্ খুব জম্‌ত; অনেকে আস্‌তেন। একদিন ছাদের কোণে বেদীতে ব'সে কবির সঙ্গে কথা হচ্ছিল—কি ক'রে দেশকে গ'ড়ে তোলা যায়। কথায় কথায় সমবায়-পদ্ধতির কথা উঠ্‌ল। সেই প্রসঙ্গে তিনি ডেনমার্কের অপূর্ব্ব সমবায়-বিজ্ঞানমূলক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির কথা পাড়্‌লেন। হঠাৎ বোধহয় আমিই ব'লে উঠ্‌লাম—একবার গিয়ে সাক্ষাৎভাবে দেখে আস্‌লে হয় না; আর সেই যাত্রায় য়ুরোপের অধুনাতন অস্ত্র-চিকিৎসা-প্রণালীর একটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ ক'রে আসি। কবি তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠ্‌লেন, "বেশ ত! চলোনা, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।" তারপরদিনই ছুটী পাবার সম্ভাবনা বুঝে নিয়ে City of Paris জাহাজে পাড়ি দেওয়া স্থির কর্‌লাম। ১৯শে মার্চ্চ ভোরে কল্‌কেতা থেকে জাহাজ ছাড়্‌বে। আমি জাহাজে উঠ্‌লাম; কবির বাক্স-পেট্‌রাও কিছু কিছু আমাদের ক্যাবিনে উঠ্‌ল; সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়! কিন্তু কবি কই? বহুলোক তাঁকে বিদায়ের নমস্কার জানাতে ফুল ও মালা নিয়ে উপস্থিত; তাঁদের মুখ বিষণ্ণ হ'ল। খবর এলো যে, কবি অসুস্থ; আস্‌তে পার্‌বেন না। ঐ গরমে উপর্য্যুপরি নিমন্ত্রণ-অভ্যর্থনাদির আদর-অত্যাচারে রওনা হ'বার দিন ভোরে প্রস্তুত হ'তে গিয়ে, মাথা ঘুরে তিনি প্রায় প'ড়ে যান। ডাক্তাররা বল্লেন, তাঁর এ-যাত্রা কোনোমতেই সমীচীন হ'তে পারে না। রইলেন তিনি; আর গোটা ক্যাবিনে একা রাজত্ব ক'রে, তাঁর বাক্স-পেট্‌রা নিয়ে চল্লুম আমি একলা।

ডেন্‌মার্ক ও সমবায়ের প্ল্যান উড়ে গেল। তার পরিবর্ত্তে গেলুম আমি এডিন্‌বরায়। সেখান থেকে যখন তাঁকে স্কট্‌ল্যাণ্ডে একবার

বেড়াতে আসবার নিমন্ত্রণ জানালাম তখন তিনি যা' লিখ্লেন—তার ভাব এই যে, তিনি এক নূতন রকম রচনার খেলায় জমে' বা মজে' আছেন—সে-খেলা সাজপোষাকের খেলা। ডাক্তাররা তাঁর মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিতে কড়া হুকুম দিয়েছেন—তিনি নূতন কিছু লিখ্তে পারবেন না। তাই তিনি তাঁর পুরানো লেখাগুলিকে মনের এক খেয়ালে নূতন পোষাকে সাজাতে লেগে' গেছেন অর্থাৎ ইংরাজীতে তর্জ্জমা ; আর তাতে বেশ এক আনন্দ পাচ্ছেন।

কয়েক মাস পরে যখন তিনি সপুত্র-পুত্রবধূ লণ্ডনে এলেন তখন বোধ হয় পরলোকগত পিয়ার্সন বা মিঃ এণ্ডরুজ্, বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সমালোচক মিঃ রোথেন্‌ষ্টাইনকে কবির ঐ তর্জ্জমা কিছু কিছু প'ড়ে শোনান। তার পরেই আমি লণ্ডনে আসি। তখন দেখ্তাম Mr. Rothenstien, বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ Mr. Fox Strangways, প্রসিদ্ধ আইরিশ কবি Mr. W. B Yeats (ইনি পরে নোবেল প্রাইজ পান), Mr. Pearson, দুয়েকটি সুশিক্ষিতা মহিলা ও আরো যেন কে কে এই সকলে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর ঐ তর্জ্জমাগুলি শুন্তেন। কবি অনেক সময়ই নিজে শ্রোতা হ'য়েই শুন্তেন। তাঁরা কবির ইংরাজী রচনায় বিস্মিত হ'তেন। আমি তাঁদের প্রায় বল্তে শুন্তাম যে, ঐ রচনার উপর আর কারুরি কোনও কলম চলে না। এমনি অনিন্দ্য ইংরাজী! অথচ পূর্ব্বে কবি কখনো কোনও প্রকার ইংরাজী লেখায় হস্তক্ষেপ করেননি; এক বোধ হয় দুই-চার জন ইংরাজের সহিত পত্র-ব্যবহার ছাড়া। এ যেন তাঁর বর্ত্তমান চিত্র-শিল্পের ফোয়ারা হঠাৎ খুলে-যাওয়ার মতন ;—যা'র সমঝ্দারী ভূয়সী প্রশংসা এবার রাশিয়া, জার্ম্মানী প্রভৃতি স্থানে শুনে এলাম। কবি Yeats রবীন্দ্রনাথের কথা ভাল ক'রে একটু জান্বার জন্য আমাকে একদিন ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। রাত্রি প্রায় দেড়টা পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হ'ল। তখন আদৌ বুঝ্তে পারিনি যে, তার থেকে আমার কিছু কিছু কথা ইংরাজী গীতাঞ্জলির ভূমিকায় উদ্ধৃত করবেন। Yeats-ই সাগ্রহে ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে ঐ পুস্তকের Introduction বা পরিচয়পত্র লেখেন।

এই কয়েকজন এবং আরো অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ রসগ্রাহী ইংরাজ, কবিকে ধর্‌লেন যে, ঐ তর্জ্জমা প্রকাশ কর্‌তেই হ'বে ; য়ুরোপের ভাবজগতে সেটা হ'বে এক অমূল্যদান। কবি তাঁদের কথায় পরে রাজী হ'লেন। এই সময়ে আমরা আমেরিকা চলে' যাই। সেখানে তিনি Illinois-এ তাঁর পুত্রের এক বন্ধুগৃহে কিছুকাল বিশ্রাম করেন ; আর আমি আমেরিকা ও পুনরায় য়ুরোপের নানাস্থান ঘুরে' দেশে ফিরি। কবিও কিছুদিন পরে ফির্‌লেন। তারপর হঠাৎ খবর এলো—তিনি পেয়েছেন 'নোবেল প্রাইজ !'

চৈত্র মাসের সেই গরমে তাঁর হঠাৎ ও-রকম মাথা না ঘুর্‌লে, তিনি তাঁর স্বরচিত অপূর্ব্ব ইংরাজী তর্জ্জমার ভিতর দিয়ে, পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে এমন পরিচয় ও সমগ্র পৃথিবীর সুশিক্ষিত ও সাধারণ লোকের হৃদয়াসনে এমন স্থানাধিকার এত শীঘ্র ও সহজে ঘটে উঠ্‌ত কি না কে বল্‌তে পারে !

দারুণ গ্রীষ্ম। কোন্ বৎসর তা' ঠিক্ মনে নেই। বোধ হয় ১৪।১৫ বৎসর আগেই হ'বে। শান্তি-নিকেতনের তখন ছুটী। সকলে চলে' গেছেন। কবি আছেন একেলা ; আর আছেন মিঃ এণ্ডরুজ্ কলেরায় আক্রান্ত। বোলপুর যেতে রেলপথে পিপাসা নিবৃত্তি কর্‌তে গিয়ে, কাটা তরমুজ খাওয়াতেই নাকি কলেরার বীজ প্রবেশ করে।

তখনো আমি মেয়ো হাঁসপাতালের রেসিডেণ্ট সার্জ্জন। কবি আমাকে তার কর্‌লেন—এণ্ডরুজ্ সাহেবের চিকিৎসার জন্যে। এরকম ক্ষেত্রে ছুটী আমার প্রাপ্য ছিল বা আর কেউ হ'লে দিতেন কি-না জানি না, কিন্তু কবির গুণগ্রাহী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল থেলার্ড সাহেব জান্‌বামাত্র ছুটী মঞ্জুর কর্‌লেন। কবি নিজেই তাঁর হোমিওপ্যাথিক বিদ্যার চিকিৎসা আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলেন ; শিউড়ীর সিভিলসার্জ্জনও একবার এসেছিলেন মাত্র ; যাই হোক্, গিয়ে দেখি রোগের বাঁক ফিরেছে ; ভয় প্রায় কেটেছে। আমাকে বিশেষ আর কিছু করতে হ'ল না ; কিন্তু আমার

বেলা এই এক পরমলাভ যে, কবিকে একান্তভাবে দু-দিন ধরে' ভোর থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত পেলুম—কত কথা, কত আলোচনা, কত শিক্ষা।...দ্বিতীয় দিন বিকালবেলা কবি বল্‌লেন, "চল, সুরুল দেখে আস্‌বে?" গেলাম এক ঘোড়ার গাড়ীতে; ফিরলাম রাত্রে গরুর গাড়ী চড়ে'। সুরুলের প্রান্তেই তৃণমাত্রহীন, লাল কাঁকরের ঢেউখেলানো উঁচুনীচু সুবিস্তৃত মাঠ। তার নাম রাখা হয়েছে 'লোহিত সাগর'। সেখানে দু'জনে বহুদূর বেড়িয়ে যখন ফিরছি তখন সায়ংসন্ধ্যা। দুয়েকটি ক'রে তারা আকাশে দেখা দিচ্ছে; অবারিত দক্ষিণ-হাওয়ার ছোঁয়ায় দেহমন পুলকিত হ'চ্ছে। শান্ত সন্ধ্যার স্তব্ধতায় দুজনে চুপ্‌ ক'রে চলেছি; কথা আপনা হ'তেই থেমে গেছে। কবির কণ্ঠ থেকে সেই স্তব্ধসাগরে আস্তে আস্তে গুন্‌গুনানির এক মৃদু ঢেউ উঠ্‌তে লাগ্‌ল। চারিদিককার প্রাকৃতিক সংস্পর্শ সে-সুরকে এক স্পষ্ট রূপ দিলে। সুরটি পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। তখন ঐ আকাশের গায়ে তারার ফোটার মত সেই সুরের মধ্যে কথা ফুটতে আরম্ভ হ'ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কথায় সুর ভরে' গেল—সে এক কি মধুর ও গভীর সঙ্গীত! কবি তখন মন খুলে গাইতে গাইতে বল্‌লেন—সমগ্র প্রকৃতির সন্ধ্যা-সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর রচিত সঙ্গীতের ভাব ও স্বর মিলিয়ে। কবিতে ও প্রকৃতিতে তখন আর কোন ভেদ নাই। হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে সুরুলের বাড়ী এসে পড়্‌ল। তারপর গরুর গাড়ীতে ধীরে ধীরে যাওয়াটা কি সময়োপযোগীই হয়েছিল! সেই সময়ে তাঁর কাছে যে-সব কথা শুন্‌লাম তা' জীবনে ভোলবার নয়।

এবার শান্তিনিকেতনের কাঁকরমাটীর 'লোহিত সাগর' নয়—অ্যাট্‌লান্টিকের অশান্ত মহাসাগর। আমরা একসঙ্গে আমেরিকা যাচ্ছি। নভেম্বর মাস। কবি ও আমি এক ক্যাবিনে। জীবনে তাঁর সংসর্গলাভের এই এক মহা সুযোগ ঘট্‌ল—যে-সংসর্গ মনকে কত উন্নত, পবিত্র ও উদার করে, সত্যকে কত সুস্পষ্ট করে। তখন ইংরাজী গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়নি; কবি য়ুরোপ ও আমেরিকায় একরকম অজ্ঞাত বল্‌লেও হয়। যাত্রীদের মধ্যে তেমন কেউ ছিলেন না, কারুরি সঙ্গে আলাপ তেমন

জমেওনি। আমারই এক সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর হৃদয়মনের উৎসমুখ হ'তে উচ্ছ্বসিত বাক্যের অমৃতধারায় আত্মার ও মনের নিত্যস্নান। কবির Conversation বা আলাপের রস ও জ্ঞান-প্রাচুর্য্য অতুলনীয়। তা সকলেই জানেন। ইচ্ছা হয় সর্ব্বদা কোন Dictaphone জাতীয় যন্ত্রে তা' যদি কেউ ধরে' রাখে, সে এক অপূর্ব্ব সাহিত্য সৃষ্টি হয়। যাক্, যে-কথা বল্‌তে যাচ্ছিলুম।···রাত্রি তখন অনেক—ভোরের কাছাকাছি—পৌনে ৪টা। অশান্ত মহাসাগরের দোলানির চোটে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি ঘরের অপর দিকে, Porthole বা গোল্ল জানলার দিকে সমুদ্রের ধারেই, কৌচের উপর বসে' কবি গুন্‌গুন্ ক'রে গাইছেন। যে-দৃশ্য দেখ্‌লাম জীবনে তা' চিরস্মরণীয়। তাঁর সে অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর জানলা থেকে আলোর আভা এসে পড়েছে; তিনি উপাসনার আসনে আসীন। গাইছেন, "এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়-হরণ!" গান শেষ হ'লে কতক্ষণ রইলেন স্তব্ধ, নীরব। আবার গুন্‌গুন্ কর্‌তে কর্‌তে আর-এক সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। আর শুয়ে থাক্‌তে পার্‌লুম না। আস্তে আস্তে নিঃশব্দে তাঁর অজ্ঞাতসারে উঠে বসে' তাঁর সেই গভীর আধ্যাত্মিক সঙ্গ লাভ করলুম, তার আনন্দ অনির্ব্বচনীয়।

বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান

(প্রেমের নূতন রূপ)

শ্রীরাধারাণী দেবী

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উৎস রবীন্দ্রনাথ অজস্র ধারায় কাব্যে, সঙ্গীতে, নাট্যে, গাথায়, উপন্যাসে, গল্পে, প্রবন্ধে, কথিকায়, ধর্ম্মতত্ত্বে, সমাজতত্ত্বে, দর্শনে, আর্টে—এক কথায় সকল দিক দিয়েই বাংলা-সাহিত্যকে নবজীবন ও নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও অভিনবত্ব যে রবীন্দ্রনাথেরই দান, সাহিত্যরসিক মাত্রেই এ-কথা স্বীকার করবেন। অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরে' তিনি বঙ্গবাণীর বরাঙ্গ অমূল্য রত্নালঙ্কারে ও অপূর্ব্ব রূপ-রাগে শোভিত সুন্দর ক'রে তুলে আজ নগণ্য বাংলা-সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে স্থান দিতে পেরেছেন। তাঁর কবিতা শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, বিশ্ব-সাহিত্যের চিরন্তন সামগ্রীরূপে সমাদৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু পৃথিবীর সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম মাত্রই ন'ন্,—তিনি একজন গভীর দার্শনিক, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সুকুমার কলা-বিশারদ শিল্পী। তিনি শুধু প্রতিভাশালী নাট্যকারই ন'ন্, কলাকুশল নটও। শুধু শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রচয়িতাই ন'ন্, উচ্চশ্রেণীর গায়কও। শুধু সুরবিদ্ই ন'ন্, সুরস্রষ্টাও। দেবী ভারতীর অর্চ্চনায় তিনি কেবলমাত্র 'বাণীর' অর্ঘ্য দিয়েই ক্ষান্ত হননি,—'বর্ণে'রও অঞ্জলি এনে দিয়েছেন। তাঁর অসামান্য প্রতিভা শুধু সাহিত্যকেই নবীনের পথে নিয়ে গিয়ে ধন্য করেনি, চিত্রশিল্পকেও নবীনের পথে এগিয়ে দিয়ে ধন্য করেছে।

রবীন্দ্রনাথ চিরসুন্দরের মানসপুত্র, তাঁর সবই সুন্দর। তাঁর মূর্ত্তি সুন্দর, কান্তি সুন্দর, বাক্য সুন্দর, প্রকৃতি সুন্দর, চরিত্র সুন্দর, হৃদয় সুন্দর। তাঁর রচনা সুন্দর, সঙ্গীত সুন্দর, সুর সুন্দর, অভিনয় সুন্দর, চিত্রাঙ্কণ সুন্দর,—তাঁর অদ্বিতীয় প্রতিভার সকল সৃষ্টিই অনুপম সুন্দর। তিনি রূপলক্ষ্মীর একনিষ্ঠ পূজারী, সৌন্দর্য্যকলায় তাঁর অসাধারণ অনুরাগ। এই অসামান্য

শিল্পী তাঁর স্বদেশ ও বিশ্বজগৎকে যা' দান করেছেন, তার পরিমাপ ও মূল্য নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। তাঁর অমূল্য ও অপরিমিত দানের মধ্য হ'তে আমি কোনও একটি মাত্র বিষয় আজ এখানে উল্লেখ করতে চাই,—যা' তাঁর অপূর্ব্ব ও অজস্র দানরাশির তুলনায় এমন কিছুই নয়, কিন্তু বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবির সেই দানের যে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং মূল্য আছে, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

বাংলা-সাহিত্যে নরনারীর প্রেমকে রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম এক নূতন দৃষ্টিতে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। সংস্কার-নির্মুক্ত সত্যের মধ্য দিয়ে অগ্নিশুদ্ধ উজ্জ্বলরূপে প্রেমকে সহজ সম্বন্ধের মধ্যে সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করার পথ নির্দ্দেশ করেছেন।

সামাজিক-মানুষ, হৃদয়ের ধর্ম্ম প্রেমকে ক্রমশঃ অবশ্য-পালনীয় সমাজবিধি ও নীতিধর্ম্মে পরিণত ক'রে তা'র সত্যরূপকে যখন একান্ত আবৃত ও বিকৃত ক'রে তুলেছিল,—সামাজিক বিবাহবদ্ধ নর-নারীর মধ্যে প্রেম যখন তা'র সহজাত রূপ হারিয়ে বাধ্যকরী হ'য়ে নীতিধর্ম্মেরই পর্য্যায়ে দাঁড়িয়ে, মানুষকে চোখরাঙিয়ে একটা খুব বড় দাম আদায় করছিল, মানুষের সংস্কার-বিমূঢ় নৈতিকবুদ্ধির কাছ থেকে,—তখন হৃদয়-ধর্ম্মের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির দিক থেকে এবং সংস্কার-নির্মুক্ত সত্য প্রেমের (true and sincere love) দিক্ থেকে বাংলা-সাহিত্যে প্রথম সাড়া জাগে, প্রথম প্রশ্ন ওঠে ও সমস্যা উত্থাপিত হয় রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" উপন্যাসখানির ভিতর দিয়ে। তারপর আবার সেই প্রশ্ন ও সেই সমস্যাকেই আমরা আরও তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠতে দেখেছি, কবির "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসের মধ্যে।

"ঘরে-বাইরে"-তে পুরুষের অন্তর নারীর অনাবিষ্ট সহজ সুন্দর সত্য প্রেমের কামনা করেচে। নৈতিক বুদ্ধিজাত প্রেম বা আবাল্যের ধারণাজাত সংস্কারে গড়া যে-প্রেম,—যা' মানুষের চেয়ে নির্ব্বিচারে সম্পর্ককেই স্বীকার করতে অভ্যস্ত, সেই সমাজবিধির ঢালাই-করা যান্ত্রিক-মনের প্রেমে সে তৃপ্ত হয়নি। সহজসত্য-প্রেম, স্বামীত্ব-বুদ্ধি

বা নৈতিক ধর্ম্মবুদ্ধি-নিরপেক্ষ সহজ হৃদয়ধর্ম্মে বাহিরের মুক্ত আলোয় একাধিকের মধ্যে নির্ব্বাচিত 'একে'র কণ্ঠে মাল্য দান করে—সেই স্বতোৎসার-সত্য ভালবাসা তার কাম্য ছিল।

নর-নারীর সমাজ-নিয়ন্ত্রিত নৈতিক প্রেম, সত্যকার মানুষটির চেয়ে তা'র সামাজিক সম্বন্ধটিকেই বা উপাধিটিকেই সবচেয়ে বেশী স্বাকার ক'রে অন্ধভাবে আঁকড়ে চলে। হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা, বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সে-মন্ত্রোচ্চারণ যে-কোনও প্রকৃতির, যে-কোনও প্রবৃত্তির, যে-কোনও রকমের মানুষই করুকনা কেন,—তাদের পরস্পরকে ভালোবাসতেই হ'বে এমনিতর একটা ধারণা ও বিশ্বাস তাদের মধ্যে নির্ব্বিচারে সঞ্চারিত হ'য়ে থাকে। সে-প্রেমকে জীবনযাত্রার প্রয়োজনের দিক্ থেকে যতো বড়ো মূল্যই দেওয়া হোক্না কেন্, সেটা তার সামাজিক মূল্য মাত্র। চিরন্তন-মানব-হৃদয়ের দিক্ থেকে সে-প্রেম শ্রেষ্ঠ মূল্য পেতে পারে না। এই বাধ্যকরী প্রেমের ও সহজ সুন্দর প্রেমের সমস্যাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর "চোখের বালি" "নৌকা-ডুবি" ও "ঘরে-বাইরে"-র মধ্য দিয়ে বাংলা-সাহিত্যে প্রথম আনেন।

এ-দেশে মন্ত্রশক্তি ও পাতিব্রত্য এই দুটো ব্যাপারকে এতবেশী অধিকতর মাত্রায় ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে রং ফলিয়ে বড়ো ক'রে তোলা হয়েছিল, যে, তার ফলে বাংলা-সাহিত্যে ঐ কৃত্রিম প্রেমেরই জয়-জয়কার প'ড়ে গিয়েছিল এবং একাধিপত্যও অতিবিস্তৃত হ'য়ে পড়েছিল। ফুল-পাতার স্তূপে দেবতা কোথায় পড়লেন ঢাকা, পূজা হ'তে লাগল শুধু মন্দিরে আর তার আসবাব-ঠাটের। আগেই বলেছি, প্রয়োজনের দিক থেকে এ-জিনিষটার যতো বৃহৎ মূল্যই থাক্না কেন, জগতের চিরন্তন সত্যের দিক থেকে দেখতে গেলে, এটা যে মস্ত বড় কৃত্রিম-ব্যাপারই চলছিল এবং এতে ক'রে মানুষের হৃদয়-মনের সত্য স্বাধীন ও সহজ সুন্দর বিকাশের যে যথেষ্ট হানি ঘটছিল তা'তে সন্দেহ করবার নেই।

বাংলা-সাহিত্যে এতবড় একটা একটানা ক্ষতি ও কৃত্রিমতার জয়যাত্রায় প্রথম বাধা দেন রবীন্দ্রনাথ। এর জন্য তাঁকে অনেক দুঃখ, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক কঠিন আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু, সত্য

যা,' তা' সত্য হ'য়েই উঠছে এবং মিথ্যা যা'—বহুকালের পুরাতনত্ব সত্ত্বেও তা' সত্যের উজ্জ্বল রশ্মি সম্পাতে মিথ্যা হ'য়ে গেছে।

নিখিলেশ তাঁর বিবাহ-বন্ধনজাত বাধ্যকর-প্রেমকে বাইরের সহজ আলোয় সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়ে যাচাই ক'রে নিয়েছেন। এই কঠিন-অগ্নিপরীক্ষায় শেষ পর্য্যন্ত তিনি ও বিমলা উভয়েই উত্তীর্ণ হয়েছেন পরমতর দুঃখের মধ্য দিয়ে। কিন্তু, দুঃখের সীমান্তে পৌঁছে তাঁরা অমৃত লাভ করেছেন। বুঝতে পেরেছেন, তাঁদের প্রেমের গভীরতা কতো বেশী, সত্যরূপ কী এবং অকৃত্রিমতা কতো সুন্দর।

জীবনের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, সর্ব্ব-প্রকার স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে, মুক্তির মধ্য দিয়ে যে-প্রেম স্বেচ্ছায় বহুর মধ্য হ'তে একের কণ্ঠে মালা দেয়, সে-প্রেমের মূল্য যে বাধ্যকর বিবাহের অবশ্য-পালনীয় প্রেমের চেয়ে অনেক বড়ো এবং বিশ্বের বাতায়ন রুদ্ধ ক'রে আঁধারকক্ষ-কোণে কাউকে পাওয়াটা যে তাকে অখণ্ডভাবে পাওয়া নয়, এ-কথা বাংলা-সাহিত্যে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা রবীন্দ্রনাথই প্রথম করেছেন।

তারপর প্রেমের আর-এক অপূর্ব্ব রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি তাঁর আধুনিক উপন্যাস "শেষের কবিতা"য়।

যে-প্রেম অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নিবিড়তর শ্রদ্ধায় গভীর ও সুন্দর হ'য়ে ওঠে, তাকে স্বামী-স্ত্রীর সামাজিক বিবাহ-বন্ধনে শৃঙ্খলিত ক'রে, জীবনের ও সংসারের দৈনন্দিন তুচ্ছতার মধ্যে টেনে না এনে, তাকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে মরমের মর্ম্মকোষে প্রবেষ্টিত ক'রে রাখতে,—বিরহের গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে তাকে অনুভব করতে, স্মরণের বিচিত্র বর্ণরাগ-জালে, কল্পনার সুদূরবিস্তীর্ণ চক্রবালরেখায় তাকে অফুরন্ত চির-সুন্দর ক'রে তুলতে, অতৃপ্ত-তৃষার চিরদিনের তীব্র-আকর্ষণের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখে মানুষী প্রেমকে নিত্য ও সত্যবস্তু ক'রে তোলার যে অজ্ঞাত রহস্যময় দিব্য-পথের সন্ধান দিয়েছেন—বাংলা-সাহিত্যে কেন, বিশ্ব-সাহিত্যেও তা' চিরদিনের জন্য তাঁর অতুলনীয় দুর্ল্লভ দান ব'লে গণ্য হবে নিশ্চিত।

"পূজা দিব বলি' গিয়াছিনু রাজপুরে"

—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হে রাজা, তোমারে পূজা দিব বলি' গিয়াছিনু রাজপুরে
একদা সে এক মাধবী নিশায় মুগ্ধ বাঁশীর সুরে।
অচেনা বিদেশী গিয়াছিনু মিশি' বিপুল জনস্রোতে;
কত না অর্ঘ্য এনেছিল সবে দূর দূরান্ত হ'তে!
যে যা' দিল পূজা তুমি দিলে ত'ারে তা'র শতগুণ দান;
কতনা কুসুম, কত কাঞ্চন, কত হাসি, কত গান!
কত জনে পেল কিরণ-কিরীট, কত জন মণিহার!
রিক্তপথিক দূর হ'তে শুধু জানানু নমস্কার।
আমার দিবার কিছু ছিল নাকো, তাই সঙ্কোচে সরি'
সবার পিছনে দাঁড়ায়ে দেখিনু তোমারে নয়ন ভরি'।
ধরণীতে যেথা যা কিছু উদার, যা কিছু মহত্তম,
তাই লয়ে তুমি উদিলে প্রথম নবীন জীবনে মম।
পূজার মন্ত্র মুখে আসিল না, ফেলিলাম ভালোবেসে;
প্রার্থনাবাণী লাজে ম'রে গেল কণ্ঠের কাছে এসে।
সভাশেষে সবে ফিরিল যখন ল'য়ে সুর,—ল'য়ে কথা—
আমি এনু ফিরি' দুই চোখে ভরি' দৃষ্টির বিশালতা।

আজি বলে সবে, এসেছে আদেশ—শুভদিন-উৎসবে,
সেদিন নিশীথে কে কি লয়েছিনু, হিসাব দেখাতে হবে।
হিসাবের কথা কিছু মনে নাই—সব হ'য়ে গেছে ভুল।
বৈশাখী প্রাতে কাঁটা হ'ল কত চৈত্ররাতের ফুল!
তবুও হিসাব না দেখালে নয়,—সুকঠিন পরোয়ানা!
পাতিপাতি ক'রে খুঁজিতেছি তাই সারা অন্তরখানা।

অনেক কিছুই এসেছে গিয়েছে বাহিরের দরজায় ;
ভিতরে যে' আছে—মেলার মানুষে কেমনে দেখা'ব তায় ?
তোমার দানের শত সম্ভার শিরে বহি' দলে দলে
ধরার জনতা দাঁড়াইবে যবে উৎসব-সভাতলে,—
কে কি পেল তারি কথা লয়ে সবে মাতিবে বাদানুবাদে,
ফাটিবে আকাশ কোটি কণ্ঠের সুবিপুল জয়নাদে ;—
সেদিন সেথায় কেমনে দেখা'ব রিক্ত আমার হাত ?
কেমনে বলিব "চাহি নাই,—শুধু করিয়াছি প্রণিপাত" !
সেদিন কেমনে কাহারে বুঝাব ভাগ্যবানের ভিড়ে—
আমি যা' পেয়েছি, গহনে গোপনে, আছে তা' বক্ষোনীড়ে !
মোর পানে আজ যে চাহিবে চাহ' কুঞ্চিত করি' ভুরু !
সবাই লভেছে রাজার প্রসাদ, আমি লভিয়াছি গুরু ।

কবি ও শিল্পীর খেয়াল

—শ্রীঅসিতকুমার হালদার

কল্পনার মুক্তি যেখানে, সেখানেই খেয়াল অবাধে খেলে। এই খেয়ালের খেলা নিয়ে যিনি থাকেন, তিনিই কবি বা শিল্পী আখ্যা নিয়ে লোকসমাজের একটি বিশেষ পংক্তিতে গিয়ে বসেন। খেয়াল কেবল মানুষেরই একচেটে ব্যবসা নয়; এই সৃষ্টির ভিতর খেয়াল-লীলা যে কত রঙে কত গন্ধে কত আকারে ছড়িয়ে আছে, তার তুলনায় কটি মানুষ আছে যে, সেই বিরাট খেয়ালীর খেয়ালের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে চলতে পারে? খেয়ালের নাচের ছন্দ ধরবার কারবার করার ভার তাই মানুষের ভিতর কবি ও শিল্পীই নেন্। নিজের মনে রঙ ধরানো এবং জগৎকে রঙিন ক'রে তোলাই তাঁদের কাজ। মানুষ দুনিয়ায় আসে, তারপর আসার পথ ভুলে যায়, তাই তার নেশা লাগে এখানে এসে এখানকার নিজস্ব পুঁজি বাড়াবার—ভাবে অনন্তকাল ধ'রে সে এসেছে এবং চিরকাল তা'র ধন-ঘড়াটিকে এঁটে ধ'রে কেটে যাবে। এদিকে আপন-ভোলা খেয়াল-ভোলা কবি-শিল্পী এই দুনিয়ার ভিতরকার খেয়ালের সুরটিকে প্রত্যহ বোধের দ্বারা পরখ ক'রে আপনার আনন্দ-রচনায় গা ঢেলে দিয়ে চলেন। আনন্দের বন্যায় রাত দিন বছর বয়স সব কোথায় ভেসে যায়—জীবন-মরণ তা'র কাছে তখন কথা কয় খেয়ালের সুরে, তাকে ধ'রে রাখে এমন কেউ নেই। তাকে হিসাবের খাতা লিখ্‌তে দিলে তা'র পাতায় গান বের হয়। গুরুমশাইগিরি করতে গেলে তার কলমের খোঁচায় কারীগরী বেরিয়ে পড়ে। দুনিয়ার সবাই তাকে ধামাচাপা দিতে চাইলেও তার জয়ঢাক দূর-দেশান্তরে বেজে উঠ্‌বে। তাই আজও প্রাচীন যুগের ভারত, চীন, মিশর ও রোমের খেয়ালীদের রচনা জগৎকে মুগ্ধ করছে। এই হ'ল শিল্পীর পরিচয় এবং এইখানেই হ'ল তার জয়। দেখা যায়, মানুষ বাঁচে না, কিন্তু মানুষের খেয়ালটাই বেঁচে থাকে চিরকাল। ঘুমোয় তো সকলেই, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় ঘুমের স্বপন-লোকের সৃষ্টি কে করতে পারে? মায়ের মত জগতের সবাইকে সদাজাগ্রত আহরণ-নেশার হাত থেকে বাঁচিয়ে সৃষ্টির স্বপনতন্দ্রা বপন ক'রে ভোলান্ শিল্পী ও কবি।

দেখা যায়, প্রতিনিয়ত সৃষ্টির ভিতর পর্ব্বতকন্দরে, গাছের শাখাপ্রশাখার ভিতর, নদী, নদ, তটের ভাঙনের মধ্যে, মেঘের মধ্যে কত খেয়ালী রূপ-লোকের সৃষ্টি হচ্চে এবং তার আলো-আঁধারের তারতম্যে তা' নব নব রূপ ধারণ করছে। যদি এই সৃষ্টি জ্যামিতিক নিয়মে ঠিক্ এক-একটি বিশেষ রূপ নিয়েই চিরকাল ব'সে থাকত তো আমরা দেখতুম পাহাড়-পর্ব্বতগুলি কতকগুলো প্যাকবাক্সের সমষ্টি এবং গাছ-পালা, জীব-মনুষ্য সব এক ছাঁচে ফ্যাকটারীর ঢালা ঢিবি বিশেষ। তাহ'লে আর কবি-শিল্পীর বিচিত্র কলার প্রয়োজন থাকত না। বেশ সব কুচকাওয়াজের বাঁধা নিয়মে সোজাসুজি চ'লে যেতো। কিন্তু আঁকা-বাঁকা গতিই হ'ল ছন্দ-গতি। তার পরিচয় বলাকার সারে, গাছপালার সহজ ভঙ্গীতে আমরা পাই বটে, কিন্তু তা' দেখেও দেখি না। তাই কবি সেটা তাঁর খেয়ালী চষমা চোখে দেখতে পান এবং সবাইকে তার রস পরিবেষণ করেন।

নদীর সচঞ্চল গতির ভিতর, আগুনের শিখার ভিতর, গাছপালার ফুল ও পত্রসজ্জার ভিতর যে প্রতিচ্ছন্দ খুঁজে বার করেচেন, প্রাচীন প্রাচ্য শিল্পীরা, তার ভিতরও ঐ বিরাট খেয়ালীর ছন্দ খেয়ালী-শিল্পীরাই ধরতে পেরেচেন। ক্যামেরার কলের সাধ্য নেই সেই কলাকৌশলের রূপ ধ'রে দেয়। আলো-ছায়ায় জড়ানো একটি ছাপ যা' ক্যামেরা ধ'রে দেয়, তার ভিতর সে লীলাচ্ছন্দ কখনো ধরা পড়ে না। এইখানে শিল্পীর সাধনা চিরকাল কলকব্জাকে জব্দ করেচে।

যেখানে জড়তা সেইখানেই ভয়, সেখানেই দাসত্ব রাজত্ব করে। যেখানে চিত্তের মুক্তি সেইখানেই সৃষ্টি এবং তা' শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। কবির চিত্তের ভিতর জড়তার বাসা বাঁধলেই কাব্যসরস্বতী তখনি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেন। উৎস থেকে উৎসারিত সলিল যেমন সতেজ স্বচ্ছ মূর্ত্তি ধারণ করে, কল্পনার মধ্যেও সেই প্রীতিউজ্জ্বল স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহজ-সাবলীল ভাব যদি না থাকে তবে ভয়ে ভয়ে রঙ চাপিয়ে আঁকা ছবির মত আড়ষ্ট ও নির্জ্জীব অনাসৃষ্টি হ'য়ে উঠে। সাধারণতঃ সব কবি-শিল্পীর ভিতর সহজ এই রসানুভূতির পরিচয় বড় পাওয়া যায় না, তাই আমরা আজ

কবির খেয়ালের ভিতর সুস্পষ্ট রসের সন্ধান যখন পাই তখন মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে যাই। কবি নিজের কথা সোজাসুজি গেয়েছেন—

"লাগল ভাল, মন ভোলালো—
এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই ;
দিনে রাতে সময় কোথা,
কাজের কথা তাইত এড়াই।
মজেছে মন, মজলো আঁখি,
মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি—
ওদের আছে অনেক আশা,
ওরা করুক আরো জড়ো ;
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই
চাই না হ'তে আরো বড়।"

আজ এই বাঙলার ও জগতের শ্রেষ্ঠ কবির উল্লিখিত কয়েকটি কথা ব'লে তাঁর খেয়াল-রচনার ভিতর যা' রূপরসের সন্ধান আমরা পাই, তার বিষয় মনে ক'রে ঈশ্বরের নিকট তাঁর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা ক'রে আজ তাঁর জয়ন্তী-উৎসবের পালা আমরা শেষ করি।

অসীম ও সসীম

—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথের যত বাণী যত রূপে আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে, তার মধ্যে অসীম ও সসীম সম্বন্ধে তাঁর যে-বাণী, তা'র প্রভাবই সব-চেয়ে বেশী।

সসীমের সঙ্গে অসীমের যে আনন্দময় নিত্যলীলা চলেছে, তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে মানুষ এক সময়ে অসীমকে ক্ষুদ্র ক'রে ফেল্‌ত; বল্‌ত, অসীম যতক্ষণ অসীম থাকেন, ততক্ষণ তিনি কোনো রকমে আমাদের চিন্তার দর্পণে নিজ সত্তার আভাসটুকু প্রতিবিম্বিত করতে পারেন মাত্র। কিন্তু তিনি আমাদের কাছে আমাদের মতন ছোট হ'য়ে না এলে, আমাদের প্রেম আকর্ষণ কর্‌বেন কি ক'রে? নয়ন মুগ্ধ কর্‌বেন কি ক'রে?

এ-যুগে ভারতের কাছে ও পশ্চিমের কাছে রবীন্দ্রনাথের বাণী এ-কথাটি উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে যে, অসীম যিনি তিনি অসীমই, কিন্তু তবু তিনি আমাদের চান, তবু তিনি আমাদের সঙ্গে মিলনের জন্য নিত্য উৎসুক, তবু তিনি আমাদের মন ভুলাতে নয়ন ভুলাতে নিত্য উৎসুক।

অসীমের কাছে মানব-জ্ঞানের সভয় প্রশ্ন এই,—তুমি কেমন? তুমি কেমন ক'রে এ বিশ্ব সৃষ্টি কর্‌লে? মানুষের জ্ঞান তাঁর কাছ থেকে এইসব বিষয়ে এক-এক বার একটি একটি ইঙ্গিত নিয়ে আসে, আর দর্শন ও বিজ্ঞান হাজার বছর ধ'রে সে-ইঙ্গিতের অর্থ আবিষ্কার করতে থাকে।

হৃদয়ের কুতূহল ও জ্ঞানের কুতূহল একরূপ নয়। জ্ঞান, personality-তে না পৌঁছেও সন্তুষ্ট হয়। অসীমের 'স্বরূপ' নিয়েই তা'র বেশ চ'লে যায়। "অসীম কি এ জগতের নিমিত্ত-কারণ?" অথবা "তিনি কি উপাদান-কারণ?"—এ সব প্রশ্নের আলোচনা ক'রেই জ্ঞান তৃপ্ত। হৃদয় কিন্তু পূরো-পূরো person রূপে তাঁকে না পেলে তৃপ্ত হয় না। হৃদয় অসীমকে জিজ্ঞাসা করতে চায়, "তুমি আমার কে হও? তুমি কেন বিশ্ব সৃষ্টি কর্‌লে? কেনই বা আমায় জন্ম দিলে?

জ্ঞান প্রেমকে বল্‌তে চায়, তিনি যে কেমন, তাই একটু একটু বুঝে নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। তিনি তোমার কেউ হবেন, এ স্পর্দ্ধা ক'রো না। বিশ্বটা কেমন ক'রে চল্‌চে, তাই একটু একটু বুঝে নিয়ে সন্তুষ্ট থাক'। তিনি কেন বিশ্ব সৃষ্টি কর্‌লেন, তা' জিজ্ঞাসা কর্‌বার স্পর্দ্ধা ক'রো না।

কিন্তু প্রেমের কুতূহলেরও সীমা নেই, স্পর্দ্ধারও সীমা নেই। সে বলে, আমার এসব জান্‌তে হবেই। সে বলে, আমি জেনেছি, তুমি আমার পিতা, আমার মাতা, আমার বন্ধু। সে বলে, আমি জেনেছি, তুমি আমাকে চাও, তুমি আমাকে খুঁজ্‌ছ। সে বলে, তুমি কেন যে আমাকে জন্ম দিলে, কেন যে বিশ্ব সৃষ্টি ক'র্‌লে, তা-ও আমি বুঝতে পেরেছি। "আমি ভালবাস্‌ব কাকে? আমি 'তুমি' ব'লে ডাক্‌ব কাকে,"—এই ব্যাকুলতাটি তোমার মধ্যে ছিল ব'লেই তুমি আর একা থাক্‌তে পার্‌লে না, তুমি আর আপনাতে আপনি লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না, পূর্ণ হ'য়েও তোমাতে যেন অভাবের উদয় হ'ল। "আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে!" ভালবাস্‌বার জন্যই তুমি আমাকে জন্ম দিলে; তখন হ'তে আমি হ'লাম তোমার 'তুমি', তুমি হ'লে আমার 'তুমি'। প্রেম বলে, আমি বুঝেছি, আমাকে তোমার ভালবাসাটা জানানো দরকার, আমার নয়ন মন হরণ করা দরকার, তাই তুমি এই বিশ্ব রচনা ক'র্‌ছ; তাই তাকে সোনালি রূপালি সবুজ সুনীল রঙে সাজাচ্ছ; তাই মানব-সংসারে প্রেমের সহস্র ফুল ফোটাচ্ছ।

জ্ঞান যখন প্রেমকে কঠিন তিরস্কারের স্বরে ব'ল্‌তে থাকে, "পথ দিয়ে তুই আসিস্ নি যে, ফিরে যা, ফিরে যা," প্রেম ততক্ষণ অসীমের বাহুবেষ্টনের মধ্যে বাঁধা প'ড়ে যায়।

জ্ঞানের আলোর চেয়েও প্রেমের আলো অসীমকে ভাল ক'রে দেখিয়ে দেয়, রবীন্দ্রনাথের এই বাণীটি আমার অন্তরে বড় গভীর তৃপ্তিদান করে। আমাদের প্রেমের জন্ম ক্ষুদ্র এ সংসারে। কিন্তু তাই ব'লে তা শুধু সংসারের কাজে লাগাবার ছোট একটি সামগ্রী নয়; তা দিয়েই অসীমের পূজা ভাল হয়। প্রেম একটি ছোট বাতি নয় যা দিয়ে শুধু

ঘরের মানুষ ক'টিকে চিন্‌ব ; প্রেম এমন এক দূরগামী সন্ধানী আলো, যাকে অসীমের মুখে ফেলে তার রূপটি ঠিক দেখ্‌তে পারা যায়।

একসময়ে ভারতের জ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, অসীমের সম্বন্ধে তিনি "আছেন" এটুকু ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। তিনি কিছু করেন না, কিছু ভাবেন না, কিছু ইচ্ছা করেন না ; তিনি কেবল "আছেন"। রবীন্দ্রনাথ ব'ল্‌ছেন, তিনি যে অনন্ত কাল ধ'রে আমার অন্বেষণে নিযুক্ত, সেই অন্বেষণের নামই সৃষ্টি। তিনি যে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবেন, তার সূচনার জন্যই প্রতি নিশিতে আকাশে এত তারার আলো জ্বলে, প্রতি ঋতুতে পৃথিবী এত ফুলে এত শ্যামল শোভায় সাজে। তিনি কত যুগযুগান্তর ধ'রে আমায় খুঁজ্‌ছেন ; তাই যে-তারার আলোটি আজ এসে আমার চোখে লাগল, সেটি হাজার বছর আগে বেরিয়েছিল,—"আমার মিলন লাগি' তুমি আস্‌ছ কবে থেকে !" অসীমের এই যে আমার পানে আসা, তাঁর এই যে আমার দিকে চরণ বাড়ানো, তার একটি বড় তাল যুগে যুগে বেজে উঠ্‌ছে, একটি ছোট তাল পলে পলে বেজে উঠ্‌ছে। তাঁর পা-ফেলার বড় তালটি বিশ্ব জানে, ছোট তালটি সুখে-দুঃখে আন্দোলিত আমার প্রাণ জানে।—রবীন্দ্রনাথের বাণী মানব-মনকে অসীমের বিষয়ে "তিনি আছেন" এই উপলব্ধি থেকে "তিনি আসেন" এই উপলব্ধি পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়েছেন।

(২)

ছোট শিশুটি মার কাছে শুয়ে মার মুখ থেকে মার ছোটবেলাকার গল্প শুন্‌চে। শুন্‌তে শুন্‌তে সে ব'লে ওঠে, "আচ্ছা, মা, তুমি যখন্‌কার কথা বল্‌ছ, তখন আমি কোথায় ছিলাম ?" মা বলেন, "তুমি তো তখন হওনি, বাছা !" শিশুর মন তা শুনে তৃপ্ত নয়। সে অধীর আবেগে মাকে আবার জিজ্ঞাসা করে, "কেন হইনি ?" সে অবুঝ, এ কথা বুঝতে রাজী নয় যে, 'আমার মা না হ'য়েও মা কোনো দিন ছিলেন ; মা ছিলেন, অথচ আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম না ;' এ কথা ভাব্‌তে তার মন অসুখী হ'য়ে

ওঠে। আমি মার সঙ্গে চিরকাল আছি, এই অনুভূতির দাবী সে করে।

মার মনে-মনে যে-উত্তরটি জাগে, তা হয়তো এই যে, তুমি তখন আমার সর্ব্বাঙ্গের অণু-পরমাণুতে মিশে ছিলে; আমার চেতনার সকল অনুভূতিতে, আমার মনের সকল আকুল কামনায় লুকিয়ে ছিলে।

মানব-প্রাণ থেকে অসীমের দিকে এইরূপ একটি আকুল প্রশ্ন উত্থিত হয়। আমার জন্মের এত আগে থেকে তুমি র'য়েছ; আমি কি সে-সময়ে তোমার কাছে ছিলাম না? মানব-প্রাণ এই প্রশ্নের একটি মনের-মতন উত্তর পেতে চায়। তোমার কাছেই আমি ছিলাম, এই অনুভূতিটি কোন রকমে সে নিজ চেতনার মধ্যে লাভ ক'র্‌তে চায়। পূর্ব্বজন্ম মেনেও সে সুখী হয় না; আবার, অতীতের যুগযুগান্তরে তুমি ছিলে অথচ আমি ছিলাম না, এ কথা ভেবেও সে সুখী হয় না।

মানব-প্রাণের এই গূঢ় বেদনাটি এই অবুঝ দাবীটি রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে বেজে উঠেছে। কবি বল্‌ছেন, আমি এই আকারে এই দেহে এই পূর্ণ আমিত্ব-বোধের অবস্থায় তোমার সঙ্গে আগে ছিলাম না বটে; কিন্তু তবু আমি আদি কাল হ'তে তোমার সঙ্গেই ছিলাম। যে অণু-পরমাণু আজ আমার এই দেহ রচনা ক'রে আমাকে আমার চেতনাখানি দিয়েছে, কত যুগযুগান্তর ধ'রে তারা কত জলের ধারার স্পর্শ পেয়েছে, কত সাগরের তরঙ্গঘাতে আন্দোলিত হ'য়েছে, কত চন্দ্র-সূর্য্যের কত শুকতারার আলোতে দীপ্ত হয়েছে, কত বসন্তের বায়ুতে স্নিগ্ধ হ'য়েছে। সে-সব তো তোমারি স্পর্শ, তোমারি করাঘাত, তোমারি দৃষ্টির আলো, তোমারি আলিঙ্গন। আমার এ দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যে যে চৈতন্য-কণা নিহিত রয়েছে, সে যেন এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, সে অনাদি কাল হ'তে তোমার ঐ আলিঙ্গনে বাঁধা ছিল, যেন স্মরণ করে যে, সে যুগযুগান্তরে তোমার কত স্পর্শ পেয়েছে। এবং আজ আমার যে-পূর্ণ-চৈতন্যটি, যে-আমিত্ববোধটি আমার সমগ্র দেহকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত রয়েছে, সে-ও যেন সেই যুগযুগান্তরের অনুভূতিতে রঞ্জিত।

তাই সাগরের মর্ম্মর, নদীর কলধ্বনি, ফুলের সৌরভ, নক্ষত্রের জ্যোতি, শুভ্র উষা, স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, এদের সকলকেই যেন চির-পরিচিতের মত' লাগে। তাই অন্তরে একটি ভালবাসার উদয় হবা-মাত্র যেন পুরাতন কত ভালবাসার আবেগ দেহ-মনে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। তাই জানি, হে অসীম, অনাদি অনন্ত কালে তুমিও কখনো আমা-হারা নও, আমিও কখনো তোমা-হারা নই!

কবি রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীসন্ন্যাসী সাধুখাঁ

প্রথম যৌবনদিন দিয়াছিল অপরূপ ভুবনের অপূর্ব্ব ইঙ্গিত ;
একদা শুনিনু সেথা কোমল কুমার কণ্ঠে ব্যথাময় সন্ধ্যার সঙ্গীত।
বয়সে তরুণ অতি ; দুটি চোখে স্বপনের মায়া ;
তবু দুই তীর ঘেরি' পড়িয়াছে সকরুণ ছায়া
অন্তহীন মরণের ; পরপারে কিছু নাই, শুধু তার কালো যবনিকা।
'সব চ'লে যায়', হায় ! আঁধার মরণ-কোলে এ জীবন ক্ষণ দীপশিখা !

দুঃখেরে নিবিড় করি' বারে বারে বুকে ধরি' কবি চায় জুড়াইতে জ্বালা।
নিজে কাঁদি' প্রেয়সীরে শিখাইল কাঁদিবারে—গাঁথিবারে নয়নাশ্রু-মালা।
তবু তো মানে না মন ! শান্তি নাই নিরাশার গানে।
ত্রিযামা যামিনী-মাঝে ভ্রমে কবি আলোর সন্ধানে ;
গূঢ় অন্ধকার-তলে সৃষ্টির বিকাশ লাগি' পাতি-পাতি খুঁজে সর্ব্বঠাঁই।
আপনার দীর্ঘশ্বাসে আপনি চমকি' উঠে, প্রতিধ্বনি বলে,—নাই নাই !

সহসা হৃদয়-দল স্পর্শভরে টলমল, কেমনে যে তারা গেল খুলি' !
প্রভাত-আলোকে দেখে সারাটি জগৎ আসি' সেইখানে করে কোলাকুলি !
আছে রে জীবন আছে অন্ধকার মরণের পার ;
এত আলো এত প্রাণ এত যে আনন্দগান তার
কবি সবে চায় বুকে, তাই অকারণ সুখে এঁকে যায় জগতের ছবি।
মধুর আলসভরে প্রদোষে প্রভাতে রাতে নিজ মনে গান গায় কবি।

প্রিয়ারে চাপিয়া বুকে পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালার মতন
কহে কানে,—কাঁদে প্রাণ তোমার দেহের তরে, মুক্ত কর সর্ব্ব আবরণ।
পুড়ে যাই লাজমুক্ত বাসমুক্ত মিলন-শ্মশানে,
অসীম সুন্দর রূপে ফুটে উঠি দুটি নগ্ন প্রাণে।
হায় ভুল, কোথা প্রাণ ! দেহ শুধু হাতে আসে এই ক্ষুদ্র সীমার বন্ধনে।
প্রিয়ার নয়নে চাহি' নিখিল-নির্ভর লাগি' ভরে মন আকুল ক্রন্দনে।

মিলন যে দাবানল! বিরহ মধুর হ'ল, কবি তাই হয়েছে উদাসী।
বিজন দেউলে বসি' দূর বিরহের মাঝে শুনেছে কি মিলনের বাঁশী?
ত্রিভুবন দূরে ফেলি' সৃষ্টিছাড়া একি আরাধনা!
আকাশের চাঁদ লাগি' কাঁদা তাই কভু ফুরাল না।
একদা বিষম ঝড়ে বজ্র আসি' পড়ে ঘরে, দেউল ভাঙিয়া একাকার!
জীবনের খুটিনাটি সৃষ্টির আনন্দগানে কলহাস্যে ভরে চারিধার।

• •

এবার সে বুঝিয়াছে—স্রষ্টা নয় সৃষ্টিছাড়া, তাই এই বসুন্ধরা-বুকে
প্রকাণ্ড উল্লাস-ভরে আপনারে ব্যাপ্ত করি' নৃত্য করি' বেড়াইল সুখে।
রসের সমুদ্র 'পরে সোনার তরীটি চলে ভাসি',—
নব নব রূপলোক দু'নয়নে উঠিল প্রকাশি'।
পরিপূর্ণ শান্তি লয়ে আকণ্ঠ নিমগ্ন করি' এই বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে
অনন্ত সৌন্দর্য্য-সুধা আবেশে করিল পান, তবু মন তৃপ্তি মানে না-যে।

কভু তাই পদ্মাজলে ভাষায়ে তরণীখানি বসি' রয় তীর পানে চাহি'।
কভু শাল-বীথিকায় গ্রামান্তের রাঙা পথে ব্যাকুল বাউল উঠে গাহি'।
সারাটি আকাশ ভরি' একখানি কম্পমান সুর
মধ্যাহ্নের রৌদ্রকেও করি' দেয় উদাস-বিধুর।
অশোক কিংশুক আর পিয়াল পলাশ দল সঙ্গীতের ইঙ্গিতে মুঞ্জরে;
আম্রমঞ্জরীর পাশে মধুর-মদিরা-লোভী মদালস ভ্রমর গুঞ্জরে।

উদ্দাম সঙ্গীতে কভু লুব্ধ চিতে মুগ্ধ কবি অনিন্দিতা উর্ব্বশীর লাগি'
ফিরিছে বিশ্বের পথে; কখনো সন্ধ্যায় স্বপ্নে বারেকের দরশন মাগি'
যায় উজ্জয়িনীপুরে বহুদূরে শিপ্রানদী-পারে,
আলিঙ্গনে বাঁধে পূর্ব্বজনমের প্রথম প্রিয়ারে।
কভু ক্ষণিকের তরে কৌতুকে ফাটিয়া পড়ে উড়াইতে আপনার ব্যথা
কত হাসি গুঞ্জরনে, কত যে আনন্দগানে, তবু তার ফুরায় না কথা।

শেষে উৎসবের দিনে জীবন-দেবতা-পদে যত শোভা, যত গান-প্রাণ
দলিত দ্রাক্ষার মতো নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' বক্ষ হাসিমুখে করে' দিল দান।
স্রষ্টা যে সৃষ্টির বড়, তাই কবি সন্ধ্যাদীপ জ্বালি'
আপনারে পূর্ণ করি' সমর্পিল নৈবেদ্যের থালি।
মুছিল তটের রেখা ; শেষের খেয়ায় যায় মুগ্ধ কবি অরূপের পানে।
বাতাস বাঁধন-হারা উল্লাসে দিল যে সাড়া কলকল কল্লোলের গানে।

কখন ঘুমের ঘোরে তরণী ঠেকিল কূলে অগোচর অতীন্দ্রিয় লোকে।
কে যেন আসিয়াছিল, কে যেন ফিরিয়া গেছে, তারি-ব্যথা আলোকে-আলোকে।
দর্শন মিলে না চোখে, তবু যেন তাঁরি পরশন
সঙ্গীত-ইঙ্গিতময় — সর্ব্ব অঙ্গে তুলে হরষণ।
সীমা মাঝে অসীমের অরূপ মাধুরীখানি গন্ধে-বর্ণে উঠিছে উচ্ছলি' ;
পরম আনন্দে কবি তাহারি উদ্দেশে দিল হৃদয়ের গীত-পুষ্পাঞ্জলি।

এবার হৃদয় মাঝে বিদায়ের বাঁশি বাজে, কবি তাই হয়েছে উতলা।
রূপলোকে ফিরে দেখে সর্ব্বনাশা প্রেমে কা'র দলে দলে অবারণ চলা।
হংস-বলাকার পাখা ছুটিয়াছে দূর হ'তে দূরে ;
নিখিল জগৎ ছুটে তারি পিছে অজানিত পুরে।
তীরের সঞ্চয় ছাড়ি' আজি দিতে হবে পাড়ি সমুদ্রের মহাখরস্রোতে।
ব্যথার বাঁশিতে তাই বাজে ওই —ভেসে যাই অন্ধকারে—অকূল আলোতে।

আজিকে বিদায়ক্ষণে বারম্বার পড়ে মনে স্নেহময়ী বসুন্ধরা মা-কে।
সুনিবিড় বেদনায় শেষবার এ ধরার আলিঙ্গনে বাঁধে আপনাকে।
দোলে নয়নের জলে সেই লীলা-সঙ্গিনীর স্মৃতি,
দু'চোখে ঝলকি' ওঠে রাঙা তার সকরুণ সীঁথি।
ওখানেতে রাত্রিশেষে ঝ'রে-পড়া শেফালিরা বলে, কবি, সাঙ্গ হ'ল দিন।
এখন গগনে তাই রবির পূরবী ছন্দে বাজে শেষ-রাগিণীর বীণ্।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী-চরিত্র

—শ্রীনিরুপমা দেবী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বিশেষ কোন দিকটী আমার চিত্তে বিশেষ কোন্ রূপে প্রতিবিম্বিত তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। তাঁহার সাহিত্য সর্ব্বতোমুখী, এবং তার মাঝে সর্ব্ব-প্রকার ভাবই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে ; তাই ভিন্ন ভিন্ন হৃদয়ে তাহা ভিন্ন ভাবে এবং একই হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত।

তাঁহার সাহিত্যে কলাশিল্প, ভাষা-সম্পদ ও ভাব-প্রকাশের সৌন্দর্য্য যেমন অসামান্য তেমনি মানব-চরিত্রচিত্রণ-কৌশল, মানবহৃদয়ের পূর্ণবিকাশ ও বিশ্বমানবতার দিকটীও সুপরিস্ফুট। তাঁহার সাহিত্যে যে কেবল এসকল দিকের কোনও দিকটীকেই বাদ দেওয়া চলে না তাহা নয়, এ-সব ভাবই কবির কল্পনা ও ব্যঞ্জনার মাধুর্য্যে অতি অপরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তবে বিভিন্নরুচিবিশিষ্ট সাহিত্যিক বিভিন্ন দিক দিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যকে প্রাধান্য দেন।

সাহিত্যের মাঝে দুইটী দিক প্রধান বলিয়া মনে করি,—ভাবের অভিব্যক্তি ও চরিত্র-চিত্রণ। আমি শেষোক্ত দিকটীর মাঝে নারী-চরিত্র বাছিয়া লইলাম। আমি নারী, তাঁহার সাহিত্যের নারী-চরিত্রের মাঝে আমি নিজের সত্য স্বরূপ দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের আহরিত রত্ন-ভাণ্ডারের মাঝে আমাদের দেশের নারীত্ব যে-রূপটী পাইয়াছে তাহা অশ্রুনিটোল মুক্তার-রূপ। তিনি এই মুক্তার যে-মালাটী গাঁথিয়াছেন তাহা ভারতীর বক্ষের মণিহার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে আমরা নারীর বিচিত্র রূপ দেখিতে পাই। নারী-চরিত্রে যতরূপ বিচিত্রতা কল্পনা করা যায়, তাহা সবই তাঁহার গ্রন্থাবলীতে এক-একটী বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। সে-রূপ চিত্রের জড় রূপ নয়, তাহা জীবন্ত রূপ। এই জীবন্ত রূপের মাঝে আমাদের অন্তর-বাসিনী বিকাশহীনা বন্দিনী, প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়াছে, জাগিয়াছে ও প্রকাশ-লাভ করিয়াছে। যে-নারী বাংলার ঘরে ঘরে মাতারূপে, ভগ্নীরূপে,

কন্যারূপে ও পত্নীরূপে অতি দীনভাবে আত্ম-মর্য্যাদা হারাইয়া কালযাপন করিতেছিল, তাহাকে অমরত্ব দিয়া দেবীর আসনে বসাইলেন আমাদের কবিগুরু।

তাঁহার কাব্য-সাহিত্যে নারীর যে বিশেষ দুইটী রূপ দেখিতে পাই তাহা উর্ব্বশীর ও লক্ষ্মীর। তাঁহার কবিতায় তিনি সুন্দর করিয়া একথা বলিয়াছেন,—

"কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র-মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী—
অতলের শয্যাতল ছাড়ি'।
একজনা উর্ব্বশী সুন্দরী—
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী—
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্য জনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী—
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী"।

একজন মোহে-উন্মাদনায় মুগ্ধচিত্তকে মাতাল করিয়া তোলে, আর-একজন শ্রী, হ্রী ও কল্যাণে মানবচিত্তকে সমাহিত করে। এই দুইয়ের পার্থক্য তাঁহারই ভাষায় সুপরিস্ফুট। এককে সম্বোধন করিলেন—

"কোনো কালে ছিলে নাকি মুকুলিকা বালিকা বয়সী,
হে অনন্ত-যৌবনা উর্ব্বশী?"

আর-একজনকে বন্দনা করিলেন—

"পবিত্র তুমি, নির্ম্মল তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী"

তাঁহার কাব্য-সাহিত্যে এই দুইয়ের কি বিচিত্র-লীলা!

যে মানস-সুন্দরীকে বলিলেন,—

"নদী হ'তে, লতা হ'তে আনি' তব গতি
অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া
বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি' গ্রীবায় হেলিয়া
ভাবের বিকাশ-ভরে"।

"সন্ধ্যার কনক-বর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি !"

বলিলেন ,—

"শ্রাবণ-দিগন্তপারে
যে গভীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি ঘন মেঘভারে
দেখা দেয় নবনীল অতি সুকুমার,
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কি বেশ আকার
—নারী-চক্ষে !"

সেই মানস-সুন্দরীকে আবার দেখিলেন কর্ম্মকুশলা, সেবা-পরায়ণা কল্যাণীরূপে,—

"প্রভাত আসে তোমার দ্বারে
পূজার সাজি ভরি' ;
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির
বরণডালা ধরি' ।"

নারীর এই লক্ষ্মীরূপ আরও কত সুস্পষ্ট হইয়াছে "গোরায়" ঃ—"ভারতের গৃহকে পুণ্যে-সৌন্দর্য্যে ও প্রেমে মধুর ও পবিত্র করিবার জন্যই ইঁহার আবির্ভাব। যে-লক্ষ্মী ভারতের শিশুকে মানুষ করেন, তাপীকে সান্ত্বনা দেন, তুচ্ছকেও প্রেমের গৌরবে প্রতিষ্ঠা দান করেন, যিনি দুঃখে, দুর্গতিতেও আমাদের দীনতমকেও ত্যাগ করেন না, অবজ্ঞা করেন না, যিনি আমাদের পূজার্হা হইয়াও আমাদের অযোগ্যতমকেও একমনে পূজা করেন, যাঁহার নিপুণ সুন্দর হাত দু'খানি আমাদের কাজে উৎসর্গ-করা, এবং যাঁহার চিরসহিষ্ণু ক্ষমাপূর্ণ প্রেম আমরা অক্ষয় দানরূপে ঈশ্বরের কাছ হইতে লাভ করিয়াছি।"

আমরা সাধারণতঃ নারীর এই রূপই ঘরে ঘরে দেখিতে পাই, তবে মনে এই প্রশ্ন উদয় হয়—নারীর ঐ মাদকতার রূপ কে গড়িল ? কবি বলিতেছেন,—

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী ;
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি'
আপন অন্তর হ'তে !

"অর্দ্ধেক মানবী তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা।"

নারীর এই রূপের মাঝে 'অর্দ্ধেক-ই যে কল্পনা, তাহা তাঁহার গল্প সাহিত্যের একস্থানে অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। "চোখের বালিতে" মহেন্দ্র বিনোদিনীকে বেষ্টন করিয়া একটী মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছিল ; কিন্তু শেষে একদিন সে বিনোদিনীকে চিনিল, "তাহার (বিনোদিনীর) চারিদিকে সমস্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য্য হইতে, সমস্ত কাব্য হইতে, কাহিনী হইতে যে একটী লাবণ্য-জ্যোতি আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা আজ মায়া-মরীচিকার ন্যায় অন্তর্ধান করিতেই একটী সামান্য নারীমাত্র অবশিষ্ট রহিল, তাহার কোনও অপূর্ব্বত্বই রহিল না।"

তাঁহার কাব্য-সাহিত্যে পুরুষের চক্ষে নারীর যে-মোহের রূপ আমরা দেখিলাম, গল্প-সাহিত্যে সে-রূপের অভাব নাই। এতদ্ভিন্ন তাহাতে পুরুষের চক্ষে নারীর আরও একটী রূপ আছে, যে-রূপ প্রাত্যহিক ঘটনার ভিতর দিয়া নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্ঘাতে প্রতিভাত। ইহার প্রধান কারণ, কাব্য-সাহিত্যে যে-ভাব কেবলমাত্র কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, গল্প-সাহিত্যে সে-সকল ভাব ব্যক্তিগত আধার ও ঘটনার মাঝে ক্ষণে ক্ষণে আহত হইয়াছে। সেখানে নারী মানবী, পুরুষ তাহার সহিত বিবাদ করে, তাহাকে তিরস্কার করে, রূঢ় বাক্য দিয়া বিদ্ধ করে, ক্ষুদ্রতার দৃষ্টি দিয়া দেখে ও চিন্তা করে। "ঘরে-বাইরের" এক স্থানে সন্দীপ বিমলার কথা ভাবিয়া মনে মনে বলিল, "দেখছি, বিমলা জালে-পড়া হরিণীর মত ছট্‌-ফট্‌ করছে, তাহার বড় বড় দুটী চোখে কত ভয়, কত করুণা, জোর ক'রে বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত, ব্যাধ তো এই দেখেই খুসি হয়।" "যোগাযোগে" কুমুকে মধুসূদন একদিন বলিল, "যাও, তাদের কাছেই যাও। যোগ্য নও তুমি এখানকার। অনুগ্রহ করেছিলেম, মর্য্যাদা বুঝলে না। এখন অনুতাপ করতে হবে।" আর-এক জায়গায়

দেখি মধুসূদন কুমুকে বলিতেছে, "জান, পুলিশ ডেকে তোমায় নিয়ে যেতে পারি ঘাড়ে ক'রে? না বল্লেই হ'ল"—কুমু কোনও জবাব না দিয়ে ছাদে যাবার দরজার দিকে চল্‌ল। মধুসূদন গর্জ্জন ক'রে ধমকে উঠল, "যেও না, বলছি।" একদিকে যেমন দেখি এইসকল ছোটখাট কথায়, ব্যবহারে, নারীর প্রতি পুরুষের মনের এত বিষ উদ্গীরণ তেমনি আর-এক দিকে দেখি নারীর জন্য পুরুষের প্রাণে অমৃতের বন্যা বহিয়াছে।

"শেষের কবিতায়" অমিত লাবণ্যকে ভালবাসিবার পর একদিন বলিল, "তুমি আমার তাল বদলিয়ে দিয়েছ বন্যা, সেই তালেই তো তোমার সুরে আমার সুরে গাঁথা পড়ল!" বলিল, "তুমি যে আমাকে তোমার এই হাতখানি দিয়েছ সে কতখানি দেওয়া তা ভেবে শেষ করতে পারিনে। ভালবাসার যত কিছু আদর, যত কিছু সেবা, হৃদয়ের যত দরদ, যত অনির্ব্বচনীয় ভাষা তা যে ঐ হাতে"।

"গোরায়" সুচরিতাকে গোরা একদিন বলিল, "তোমার সঙ্গে একসঙ্গে এক দৃষ্টিতে আমি আমার দেশকে সম্মুখে দেখব, এই একটী আকাঙ্ক্ষা যেন আমাকে জব্দ করছে। আমার ভারতবর্ষের জন্য আমি পুরুষ তো কেবলমাত্র খেটে মরতে পারি, কিন্তু তুমি না হ'লে প্রদীপ জ্বেলে তাঁকে বরণ করবে কে? ভারতবর্ষের সেবা সুন্দর হবে না তুমি যদি তাঁর কাছ থেকে দূরে থাক।"

আর-একস্থানে দেখি গোরা আনন্দময়ীকে বলিতেছে, "মা, তুমি আমার মা। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই, শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা! তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী-চরিত্রের ভিতর আদর্শ, স্নেহভক্তি-প্রেমের চিত্র ভিন্ন আরও কয়েকটী চরিত্র-চিত্র আছে—যাহাদের পদে পদে শত-সহস্র সংস্কার, সঙ্কীর্ণতা ও ক্রটীর বাস্তবতা এত সুন্দর যে, পূর্ব্বোক্ত চরিত্রগুলি অপেক্ষা তাহাকে কোনও অংশে হীন বলা যায় না। আমার বিশ্বাস, এইরূপ চরিত্র আঁকিতে পারেন শুধু প্রকৃত গুণী। অপূর্ব্ব সুন্দর মুখশ্রী অঙ্কন করা কঠিন, সন্দেহ নাই। কিন্তু নিখুঁত কুৎসিৎ মুখ অঙ্কন করা কঠিনতম। উচ্চদরের শিল্পী ভিন্ন এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে আর কেহ পারে না।

সত্য ও কল্পনা দুই মিলাইয়া আদর্শ; অর্থাৎ যাহা ভাল, যাহা হইলে ভাল হয়, যাহা মানবজীবনের উচ্চতর-স্তরের কথা আমাদের মনের মধ্যে বলে। কিন্তু বাস্তব কেবলমাত্র সত্য ছাড়া বাঁচিতে পারে না। তাহাতে কল্পনার স্থান নাই, তাহাতে কুৎসিৎ কার্য্যে, সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র অন্ধতাকেও বাদ দেওয়া চলে না;—সেও আমাদের দোষগুণ-জড়িত মানবজীবনের ক্ষেত্রকে দেখাইয়া দেয়। যেন কেবল মাত্র আদর্শলোকে বাস করিলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না; বাস্তব চাই, মাটির পৃথিবী চাই; তেমনি নিরবচ্ছিন্ন ভালোর মাঝেও আমাদের সাহিত্যপিপাসু প্রাণ আনন্দ পায় না, তাহাতেও realistic চরিত্রের অবতারণা চাই। শিল্পী জানেন, আদর্শের মাঝে কোথায় বিচ্ছেদ আনিতে হইবে।

এই আদর্শ ও বাস্তব যেখানে পাশাপাশি পরস্পরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া প্রকাশলাভ করে, সেখানে সাহিত্য আনন্দের লীলাভূমি হইয়া উঠে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এইরূপ বিপরীত ছবি পাশাপাশি উদ্ধৃত করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা দুইটী বিপরীত দিক দিয়া কত সুন্দর!

"শেষের কবিতায়" তিনি নারীর এক চিত্র আঁকিলেন সিসি, লিসির মধ্যে,—"উঁচু খুরওয়ালা জুতো, লেসওয়ালা বুককাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে-অ্যাম্বারে মেশানো মালা, শাড়ীটা গায়ে তির্য্যগ ভঙ্গীতে আঁট ক'রে ল্যাপ্‌টান। এরা খুট্‌-খুট ক'রে দ্রুত লয়ে চলে, উচ্চৈঃস্বরে বলে, স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি, মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিত-হাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়,—জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি, গোলাপী রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর ক'রে সঞ্চালন করে এবং পুরুষ বন্ধুর চৌকির হাতার উপর ব'সে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্দ্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জ্জন প্রকাশ ক'রে থাকে।"

নারীর আর-এক চিত্র আঁকিলেন গোরার আনন্দময়ীর মাঝে —"ঘর-দুয়ার মাজিয়া-ঘসিয়া, ধুইয়া-মুছিয়া, বাঁধিয়া-বাড়িয়া, সেলাই করিয়া, গুন্তি করিয়া, হিসাব করিয়া, ঝাড়িয়া, রৌদ্রে দিয়া, আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীর খবর লইয়া, তবু তাঁহার সময় যেন ফুরাইতে চাহে না।"

বিচারপরায়ণা নারী হরিমোহিনী সুচরিতাকে পরেশ-বাবুর পরিবারের সকলের সহিত একত্রে বসিয়া খাইবার কথায় স্পষ্ট করিয়া নিষেধ করিলেন না, কিন্তু মনে মনে রাগ করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "মাগো, মানুষের ইহাতে যে কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হইতে পারে তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। ব্রাহ্মণের ঘরে তো জন্ম বটে!" আবার স্নেহময়ী জননী আনন্দময়ী নিষ্ঠার-প্রসঙ্গে গোরাকে বলিতেছেন, "তোকে কোলে নিয়েই আমি আচার ভাসিয়ে দিয়েছি তা জানিস্?.........ছোট ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে, জাত নিয়ে কেউ জন্মায় না। তুই আমার কোল ভ'রে আমার ঘর আলো ক'রে থাক, আমি পৃথিবীর সকল জাতের হাতেই জল খাব।"

কবি আমাদের শুধু এই দুইটী চরম উদাহরণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। এ বিষয়ে আর-একদিক দেখাইয়াছেন, "নৌকাডুবিতে" ক্ষেমঙ্করীর মাঝে। তিনি হেমনলিনীকে বলিতেছেন "কি বলিব, মা,—সংস্কার, উহার ভালমন্দ জানি না, না করিয়া থাকিতে পারি না। ওটা মনের ঘৃণা নয়, ও কেবল একটা অভ্যাস।"

কবি যে শুধু বিভিন্ন নারীর মধ্যে বিপরীত ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই নয়, একই নারীর হৃদয়ে যে এক-এক সময়ে বিপরীত ভাবেরও উদয় হয় এই সত্যকেও অস্বীকার করেন নাই। "গোরায়" কবি দেখাইয়াছেন যে, সুচরিতা একদিন গোরাকে দেখিয়া "অত্যন্ত ইচ্ছা করিতে লাগিল কেহ এই উদ্ধত যুবককে তর্কে একেবারে পরাস্ত, লাঞ্ছিত করিয়া দেয়"। গোরার কপালের তিলক দেখিয়া যাহার মনে হইয়াছিল বড় বড় অক্ষরে সে লিখিয়া রাখিয়াছে তাদের হইতে সে পৃথক, "সেই পার্থক্যের প্রচণ্ড অভিমানকে সুচরিতা যদি ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিত তবে তাহার গায়ের জ্বালা মিটিত;" সেই সুচরিতার আবার একদিন গোরার কথা শুনিয়া মনে হইল "যেন গোরার কথা সম্মুখে দেখিতেছিল, গোরার চক্ষের মধ্যে দূর ভবিষ্যৎ-নিবদ্ধ একটী ধ্যান-দৃষ্টি ছিল; সেই দৃষ্টি এবং বাক্য সুচরিতার কাছে এক হইয়া দেখা দিল। সেই ঘুমের মধ্যে সুচরিতা এমন একটী শক্তি দেখিল যে-শক্তি পৃথিবীতে বড় বড় সঙ্কল্পকে যেন যোগবলে সত্য করিয়া তোলে।"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নারীকে যে-রূপে দেখিলাম তাহা প্রথমত', পুরুষের চক্ষে নারীর রূপ এবং দ্বিতীয়ত', দুই বিপরীত প্রকৃতির নারীকে পাশাপাশি ধরিয়া তুলনা-মূলক ভাবে। নারীর মধ্যে এই দুই রূপের বাহিরের যে-রূপ থাকে তাহা তাহার স্বতন্ত্র রূপ, তাহা বাহিরের দৃষ্টি-সাপেক্ষ নহে। এমন কয়েকটী বিষয় নারীর মধ্যে আছে যাহা তাহার স্বভাবে বিশেষ একটী কোন নমুনার ছাপ দেয় না; ব্যক্তিত্বের প্রাধান্যকেই প্রবল করে। কবি তাঁহার গ্রন্থে যে-সকল নারীর অবতারণা করিয়াছেন তাহাদের নারীত্বের মাঝে এইরূপ অনেক নিজস্ব ভাবের দৃষ্টান্ত পাই।

তাঁহার সাহিত্যে রহস্যময়ী নারীর অন্তরের রহস্য বোঝা গেল না। ‘‘চোখের বালিতে” যে-বিনোদিনী মহেন্দ্রকে বাঁধিবার জন্য প্রেমের-জাল বুনিতেছিল সে-ই আবার মহেন্দ্রকে স্মরণ করিয়া বলিল, “কোনও নারীর কি আমার মত দশা হইয়াছে, আমি মারিতে চাই কি মরিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।” কবি নিজেই বলিতেছেন, ‘‘যে-জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে তাহা হিংসার না প্রেমের না দুইয়েরই মিশ্রণ বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না। দগ্ধ হইতেই হউক বা দগ্ধ করিতেই হউক মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন।”

মহেন্দ্রের কাছেও এ রহস্য গোপন নাই; মহেন্দ্রও ভাবে—‘‘কিছুই বুঝিবার যো নাই! স্ত্রীলোকের মন।”

এই নারী সমস্ত রহস্য ত্যাগ করিয়া সরল বিশ্বাসে ‘‘চোখের বালিতে” আশার মধ্যে প্রকাশ পাইল যখন সে মহেন্দ্রকে বলিল, ‘‘তুমি কোনও অপরাধ কর নাই। সকল দোষ আমার। আমাকে তোমার দাসীর মত শাসন কর। আমাকে তোমার চরণাশ্রয়ের যোগ্য করিয়া লও।”

‘‘গোরার” আর-একস্থানে আমরা এই নারীকে ললিতার মাঝে দেখি, ‘‘বিনয়ের সঙ্গে সম্বন্ধকে সে পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে চায়;—মাঝখানে কোনো কুণ্ঠা কোনো মোহের জড়িমা রাখিয়া সে নিজেকে বিনয়ের কাছে খাটো করিতে চায় না।”

নারী-হৃদয়ের সূক্ষ্ম ভাবগুলি পর্য্যন্ত তাঁহার নিপুণ তুলিকায় কি সুস্পষ্ট-ভাবে ফুটিয়াছে, তাহার মাঝে কোন অকারণ লজ্জা বা জড়তা নাই!

মোহমুগ্ধা নারীর মনের ভাব কি স্পষ্ট করিয়া তাহার মুখের কথা দিয়া ও চিন্তা দিয়া বলাইয়াছেন! —"ঘরে বাইরের" বিমলার কথায়, "সন্দীপের কথার সুর যেন স্পষ্ট হ'য়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়, তাঁর প্রেমের চাউনি যেন ভিক্ষা হ'য়ে আমার পায়ে ধরে। আমি সত্যি কথা বল্‌ব, এই দুর্দ্দান্ত ইচ্ছার প্রলয়-মূর্ত্তি দিন-রাত আমার মনকে টানছে! মনে হ'তে লাগল, বড় মনোহর নিজেকে একেবারে ছারখার ক'রে দেওয়া! তাতে কত লজ্জা, কত ভয়, কিন্তু বড় তীব্র-মধুর সে!"···"আমার রক্ত-মাংসে এই ভাবে ভাবনায় গড়া বীণাটা ওরই হাতে বাজ্‌ল। সেই হাতটাকে আমি ঘৃণা করতে চাই এবং সেই বীণাটাকেও—কিন্তু বীণা ত বাজ্‌ল!"

মোহের এই যে দিক্—অহর্নিশি আকর্ষণ করা অথচ অন্তরের ঘৃণার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া অশ্রদ্ধা করা এই চিত্রটী "চোখের বালিতে" বিনোদিনীর চরিত্রে অত্যন্ত সুপরিস্ফুট! বিনোদিনী প্রথমটা বিলাস-পরিহাসে মহেন্দ্রকে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ করিয়াছিল। যেদিন বিহারীর ঘৃণার ঠেলায় বিনোদিনী হাতে আঘাত পাইল সেদিন মহেন্দ্রের আদরে সে বলিয়াছিল, "আমি কাহাকেও জানি না। যাহারা আঘাত করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়, তাহারাই কি আমার সব, আর যাহারা আমাকে পায়ে ধরিয়া টানিয়া রাখিতে চায়, তাহারা আমার কেহই নহে?" মহেন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করিল, "বিনোদিনী, তবে আমার ভালবাসা পায়ে ঠেলিবে না!" তখন বিনোদিনী কহিল, "মাথায় করিয়া রাখিব। ভালবাসা আমি জন্মাবধি এত বেশি পাই নাই যে, চাই না বলিয়া ফিরাইয়া দিব।" একদিন এমনি ভালবাসার অভিনয় করিয়া আবার বিনোদিনী মহেন্দ্রকেই পরে একটী চিঠিতে লিখিল, "আমি তোমাকে বারংবার বলিতেছি, তুমি আমাকে ত্যাগ কর, আমার পশ্চাতে ফিরিও না, নির্লজ্জ হইয়া আমায় লজ্জা দিও না।" তবু এমন নিষ্ঠুর রূঢ় চিঠি লিখিয়াই বিনোদিনী ক্ষান্ত হইল না, মুখেও একদিন বলিল, "কি করিয়াছ? ভীরু কাপুরুষ! কি করিবার সাধ্য আছে তোমার? না জান ভালবাসিতে, না জান কর্ত্তব্য করিতে! তোমার এই চোরের মত প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার ঘৃণা জন্মিয়া গেছে।" অপরিসীম ঘৃণার সহিত তাহারই মুখের উপর বলিল, "হাঁ, তোমায় ঘৃণা

করি !” মোহমুগ্ধ নারী নিজের কাছে নিজেই স্বীকার করে, যাঁহার স্পর্শ পাইয়া দেহযন্ত্র বীণার মত বাজে “তাঁকে শ্রদ্ধাও করিনে, এমন-কি অশ্রদ্ধাই করি”, তবু মনকে শত-সহস্র যুক্তি দিয়া বুঝাইয়াও পথ ভুল করে।

কৌতুকপ্রিয়া বিদ্রূপপরায়ণা নারীর চিত্র তাঁহার “ঘরে-বাইরের” মেজ-জায়ের মাঝে সুপরিস্ফুট ! তিনি যে-কথা বলেন তাহা ছোট কিন্তু তীব্র, যেন ক্ষুরের মত বুকের ভিতরে গিয়া কাটিয়া বসে। এই মেজ-জায়ের যা বর্ণনা তাহা এই—“তাঁর বয়স অল্প, তিনি সাত্তিকতার ভড়ং করতেন না, বরঞ্চ তাঁর কথাবার্ত্তা হাসি-ঠাট্টায় কিছু রসের বিকার ছিল।”

এই মেজ-জা যখন-তখন বিমলাকে সন্দীপের নিকট যাইতে দেখিয়া ঠাট্টার ছলে যে-সব কথা বলিতেন তাহা হইতে তাঁহার মনের একটী দিকের ছবি আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। সন্দীপের সহিত সাক্ষাৎ-কালে বিমলার বিশেষ সাজ দেখিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন,—“ভাই ঠাকুরপো, তোমাদের এবাড়ীতে এতদিন বরাবর মেয়েরাই কেঁদে এসেছে, এইবার পুরুষদের পালা এল ; এখন থেকে আমরাই কাঁদাব। কি বল ভাই, ছোট রাণী ? রণবেশ তো পরেছ, রণরঙ্গিনী, এবার পুরুষের বুকে কষে হানো শেল !” এত বলিয়াও ফল কিছু হইল না। তখন আর-একস্থানে দেখি “মেজ-জা হেসে বল্লেন, ‘আমাদের ছোট রাণীর গুণ আছে ! অতিথিকে এত যত্ন, যে, সে ঘর ছেড়ে এক তিল নড়তে চায় না। আমাদের সময়েও অতিথি-শালা ছিল, কিন্তু অতিথির এত বেশী আদর ছিল না। তখন একটা দস্তুর ছিল, স্বামীদেরও যত্ন করতে হ’ত ; বেচারা ঠাকুরপো একাল ঘেঁসে জন্মেছে ব’লেই ফাঁকিতে প’ড়ে গেছে। ওর উচিত ছিল অতিথি হ’য়ে এ বাড়ীতে আসা তা হ’লে কিছুকাল টিঁকতে পারত’ !” এ সদুপদেশেও কোনও ফল হইল না। তখন দেখি একদিন সকালেই বিমলাকে সন্দীপের ঘরে যাইতে দেখিয়া মেজ-জা হাসিয়া বলিলেন, “এত সকালে ? গোষ্ঠলীলা বুঝি ?”

এরই পাশে রবীন্দ্রনাথের গড়া এক প্রতিমূর্ত্তি আছে যাহার মাঝে বুদ্ধির প্রাচুর্য্য না থাকিলেও অনাবিল পবিত্র সরলতা অতুলনীয়। “চোখের

বালিতে” যে-বিনোদিনী আশার চোখের উপর তিলে তিলে তাহার স্বামীকে প্রলোভন দেখাইয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে সেই বিনোদিনীকে আশা কাশী যাইবার পূর্ব্বে বলিল, “আমি তো ভাই কাল কাশী যাইব, আমার স্বামীর যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তোমাকে সেইটি বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। এখনকারমত পালাইয়া বেড়াইলে চলিবে না।” বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিল, আশা বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “মাথা খা, ভাই বালি, এই কথাটা আমায় দিতেই হইবে।”

“নৌকাডুবির” প্রথম দিকে কমলা ও রমেশের কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া কমলার বালিকা-সুলভ সরল অন্তঃকরণের চিত্রটি সুন্দর! রমেশ যখন কমলাকে নিজ স্ত্রী নয় জানিয়া দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছে তখন কমলা তাহার সহিত স্কুলে নব-অর্জ্জিত ভূগোল-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানালোচনা করিয়া, ছাপা বই ও ছবি দেখাইয়া পৃথিবী যে গোলাকৃতি তাহাই প্রমাণ করিয়া তাহাকে আনন্দ দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিজ্ঞের ভাবে বলিতেছে, “গোল জিনিষের দুটো পিঠ কি কখনও একসঙ্গে দেখা যায়? সেইজন্য এই ছবিতে পৃথিবীর দুই পিঠ আলাদা করিয়া আঁকিয়াছে।”

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রকৃত শিক্ষিতা নারীর চিত্রও অপূর্ব্ব। তাহার ব্যবহারে গর্ব্ব নাই, সে-ব্যবহার অত্যন্ত সহজ এবং অত্যন্ত সোজা। তাহাদের বাক্য-রচনার মাঝে একটি বিশিষ্টতা ও সৌন্দর্য্য আছে। সে পুরুষের কাছে সমান আসনে বসিয়া ধর্ম্মের ও সমাজের সম্বন্ধে তর্ক করে। সে প্রেমাস্পদের কাছে অসঙ্কোচে বলে, “বিয়েটা তুমি মনে মনে জান, যাকে তুমি সর্ব্বদাই বল ‘ভাল্‌গার’। ওটা বড় ‘রেস্‌পেক্টেবল্’, ওটা শাস্ত্রের দোহাইপাড়া সেই বিষয়ী লোকের পোষা জিনিষ যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্ম্মিণীকেও মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে।” সে বলে, “এ আগুনে-পোড়া প্রেম, এ সুখের দাবী করে না, এ নিজে মুক্ত ব’লেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আসে না, ম্লানতা আসে না, এর চেয়ে আর কিছু কি দেবার আছে?” সে বলে, “আমার ভাল-লাগায় যা পাই সেও আমার, আর তোমার ভাল-লাগায় যা পাব সেও আমার হবে। আমার নেবার অঞ্জলি হবে দুজনের মনকে মিলিয়ে।” সে প্রেমাস্পদকে কাছে

পাইয়া ভাবে, "জীবনের কোনদিন এমন নিবিড় ক'রে অভাবনীয়কে এত কাছে পাওয়া যাবে না।"

রবীন্দ্রনাথের সৃজিতা শিক্ষিতা নারীর পক্ষে এইসকল বাক্য এবং চিন্তা আশ্চর্য্য রকমে অত্যন্ত সহজে সম্ভব হইয়াছে। "নৌকাডুবিতে" ক্ষেমঙ্করীর, "শেষের কবিতায়" যোগমায়ার ও "গোরায়" আনন্দময়ীর যে-বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে ভুলিয়া যাইতে হয় তাঁহারা 'সেকেলে' অল্পশিক্ষিতা নারী। তাঁহাদের মনের সরলতা হৃদয়কে স্পর্শ করে, তাঁহাদের সহজ বুদ্ধি, স্বাভাবিক বিবেচনা, স্থৈর্য্য এবং তাঁহাদের মুখের সপ্রতিভ সুন্দর কথাগুলি আমাদের 'একেলে' শিক্ষিত মনকেও সচকিত করিয়া তোলে।

কিন্তু শুধু শিক্ষা ও বুদ্ধি থাকিলেই চলে না, যুক্তিও থাকা চাই। যদিও তিনি নারীর মুখে নিছক যুক্তির বহু কথা দিয়াছেন, তথাপি তাহাতে নারীসুলভ কমনীয়তা কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। "গোরায়" আনন্দময়ী বলিলেন, "ভগবান অনেক মানুষ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সকলের জন্য কেবল একটী মাত্র পথ খুলে রাখেননি।" ললিতা বলিল, "ঈশ্বর কি বুদ্ধি দিয়েছেন পরের কথা ব্যাখা করবার এবং মুখ দিয়েছেন পরের কথা চমৎকার ক'রে বলবার জন্যে?" ললিতা আর-এক স্থানে বলিতেছে, "তোড়ায় অনেকগুলো বাজে ফুল-পাতার মধ্যে ভাল ফুলকে দেখলে আমার কষ্ট হয়। ও-রকম দড়ি দিয়ে সব জিনিষকে এক শ্রেণীতে বাঁধা বর্ব্বরতা!" "শেষের কবিতায়" লাবণ্য অসিতের সঙ্গে ভালবাসার উল্লেখ করিয়া বলিল, "না হয় গুটি থেকে বের হ'য়ে আসা দু-চারদিনের রঙীন প্রজাপতিই হ'ল, তাতে দোষ কি? জগতে প্রজাপতি আর-কিছুর চেয়ে কম সত্য তা তো নয়।" সে বলিল, "স্বভাবের উপর পীড়ন সয় না। সাহিত্যে ভালবাসার বই যত পড়লেম ততই এই কথাটা বার বার আমার মনে হয়েছে, ভালবাসার ট্রেজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি, নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্যে যেখানে জুলুম, যেখানে মনে করি আপন মনের মত ক'রে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করব।" এই বদলিয়ে পাওয়াকে লাবণ্য বলিতেছে, "হাতকড়া হাতকে যে রাখে পায় সেই আর কি!"

স্বভাবতঃ নারী যুক্তিহীনা। সেই নারীর মুখে এইসব যুক্তির কথা শুনিতে বড় ভাল লাগে। এই যুক্তি সরল-হৃদয়া মূর্খ আশাকেও একদিন অপ্রিয় সত্যের মাঝে অধিষ্ঠিত করিল। "বিনোদিনীতে আসক্ত মহেন্দ্রকে দেখিয়া আশার মনে হইল, এই মহেন্দ্রকে আশা কেমন করিয়া ভক্তি দিবে? কেমন করিয়া একাগ্র মনে বলিবে, 'এস আমার অনন্যপরায়ণ হৃদয়ের মধ্যে এস, আমার অচলনিষ্ঠ সতী প্রেমের শুভ্র শতদলের উপর তোমার চরণ দু'খানি রাখ।' সে তাহার মাসির উপদেশ, পুরাণের কথা, শাস্ত্রের অনুশাসন কিছুতেই মানিতে পারিল না, এই দাম্পত্য-স্বর্গচ্যুত মহেন্দ্রকে সে আর মনের মধ্যে দেবতা বলিয়া অনুভব করিল না।"

নারী-হৃদয়ের উচ্চতার দিক তাঁহার সমস্ত গ্রন্থেই প্রকাশিত হইয়াছে। যেখানে সে উচ্চতা আমরা আশা করি না, সেখানে আশাতীত ভাবে তাহা দেখিলেই আমরা বিস্মিত এবং পুলকিত হই। বিনোদিনী মন্দ, সে জানে সে মন্দ, তথাপি সে সর্ব্বনাশের পথ হইতে নিজেকে কতক জানিয়া, কতক না জানিয়া ফিরাইতে পারে না। সে স্বীকার করে, "আমরা মায়াবিনীর জাত,···আমাদের জাতের ধর্ম্ম এইরূপ, আমরা মায়াবিনী।" সে বিহারীকে স্পষ্টই বলিয়াছিল, "আমার নিজের সুখ-দুঃখ কি কিছুই নাই? তোমার আশার ভাল হউক, মহেন্দ্রের সংসারের ভাল হউক, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল দাবী মুছিয়া ফেলিব, এত ভাল আমি নই, ধর্ম্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই।" সে নিজের স্বার্থ ছাড়িতে চাহে না, বলে, "আমি যা ছাড়িব তাহার বদলে আমি কি পাইব?" আমরা বিস্মিত হই যখন দেখি এই মন্দের ভিতরেও ভালর আলো জ্বলে। পাপের নরকেও স্বর্গের স্বপ্ন জাগে! "বিহারীর দুটি পা বক্ষে চাপিয়া বিনোদিনী বলিল, "একেবারে পাথরের দেবতার মত পবিত্র হইও না। মন্দকে ভালবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও, ঠাকুরপো!" এ কত বড় বেদনার কথা! এমনি করিয়া নারীর চিন্তার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ নারীহৃদয়ের অনুভূতিকে বড় স্পষ্ট ও সুন্দর করিয়া ফুটাইয়াছেন।

নারীর অন্যান্য গুণের মত ভক্তির দিকটিও রবীন্দ্র-সাহিত্যে অতি অপরূপ রূপ ধরিয়াছে। "চোখের বালিতে" অন্নপূর্ণার মাঝে ও

"যোগাযোগে" কুমুর মাঝে এই ভক্তিসুধা ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া তাঁহাদের চরিত্রকে একটি অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। ইঁহারা যতই সংসারের নিদারুণ কঠিন আঘাতে আহত হইয়াছেন ততই ইঁহাদের ভক্তির উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখের অন্ধকারের মাঝে হৃদয়-দেবতার প্রেমদ্যুতি অতি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়াছে। সেইসকল সময়ের গভীর অনুভূতি ও অভিব্যক্তি অন্য কোনও ভাষার অন্য কোনও সাহিত্যে বিরল। তাহা জ্ঞানের বিষয় নয়, তত্ত্বের বিষয় নয়, ভক্তিপ্রণত হৃদয়ের অপার্থিব উপলব্ধি। আশা যখন অন্নপূর্ণাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের ইতিহাস শুনিতেছিল তখন অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আজ দেখিতেছি আমার কিছুই নিষ্ফল হয় নাই। ওরে বাছা, যাঁর সঙ্গে আসল দেনা-পাওনার সম্পর্ক, যিনি এই সংসার-হাটের মূল মহাজন, তিনিই আমার সমস্ত লইতেছিলেন, হৃদয়ে বসিয়া আজ সে-কথা স্বীকার করিয়াছেন। তখন যদি জানিতাম! যদি তাঁর কর্ম্ম বলিয়া সংসারের কর্ম্ম করিতাম, তাঁকে দিলাম বলিয়াই সংসারকে হৃদয় দিতাম, তাহা হইলে কে আমাকে দুঃখ দিতে পারিত?"

যখন অতি বড় দুঃখ, অতি বড় অপমান সহিয়া শ্বশুরালয় হইতে কুমু তাহার দাদার বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন বিপ্রদাসের উদ্বেগের অন্ত রহিল না, কি করিয়া কুমুকে অকল্যাণ হইতে রক্ষা করেন? কুমু বিপ্রদাসের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, 'আমার জন্যে তুমি কিন্তু কিছু ভেবো না, দাদা। আমাকে যিনি রক্ষা করবেন তিনি ভিতরেই আছেন, আমার বিপদ নেই। নির্দ্দয় তিনি দুঃখ দেন নিজেকে দেবেন ব'লেই।' তারপর দেখি কুমু ধীরে ধীরে গান ধরিল—

"পিয় ঘর আয়ে সোই পারী পিয় প্যাররে।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
চরণ-কমল বলিহাররে।

গাইতে গাইতে কুমুর দুই চক্ষু ভ'রে উঠল এক অপরূপ দর্শনে! ভিতরের আকাশ আলো হ'য়ে উঠল! প্রিয়তম ঘরে এসেছেন, চরণ-কমল বুকের মধ্যে ছুঁতে পাচ্ছে। অত্যন্ত সত্য হ'য়ে উঠল অন্তর্লোক, যেখানে মিলন

ঘটে! গান গাইতে গাইতে ও সেখানে পৌঁচেছে। 'চরণ-কমল বলিহাররে' সমস্ত জীবন ভ'রে দিলে সেই চরণ-কমল—অন্ত নেই তার, সংসারে দুঃখ-অপমানের জায়গা রইল কোথায়! 'পিয় ঘর আয়ে' তার বেশী আর কি চাই? এই গান কোনও দিন যদি শেষ না হয় তাহ'লে তো চিরকালের মত রক্ষা পেয়ে গেল কুমু! কি অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি এবং এই অনুভূতি নারীরই! কবি যদিও তাঁহার গ্রন্থে স্থানে স্থানে নারীর মধ্যে ক্ষুদ্রতা আঁকিয়াছেন, তবু বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই নারীকে মহিমান্বিতা করিয়া চিত্রিত করিতেই তাঁহার আনন্দ। ইহা বিচিত্র নয়, করিব মধ্যে ভাবপ্রবণতা প্রবল এবং তাহা কি কাব্যে, কি অন্য গ্রন্থে ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারীর মধ্যে যে বিপরীত ভাব এবং বৈচিত্র্য আছে তাহা আমরা দেখিলাম। স্থানে স্থানে এই দুইটি ভাব পরিণতি লাভ করিয়াছে বিভিন্ন টাইপের ভিতর। মাতার, কন্যার এবং ভগ্নীর, সকলের মাঝেই নানারূপ নমুনার যে-ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই বিচিত্রতা আমাদের মনকে নব নব রসের আস্বাদ দেয়। আদর্শ জননীর চিত্র আমরা "চোখের বালিতে" অন্নপূর্ণা মাসিমার মাঝে, "গোরায়" আনন্দময়ীর মাঝে ও "শেষের কবিতায়" যোগমায়ার মাঝে দেখিতে পাই। তেমনি আবার বরদাসুন্দরী এবং রাজলক্ষ্মীও মাতা। আবার হরিমোহিনীর মাঝেও মাতৃত্বের অভাব নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য পার্থক্য! "গোরায়" একদিকে বরদা-সুন্দরীর সন্তানদের সম্বন্ধে অজ্ঞতা, "চোখের বালিতে" রাজলক্ষ্মীর মহেন্দ্রের প্রতি পক্ষপাত, আর-একদিকে "শেষের কবিতায়" লাবণ্যের প্রতি যোগমায়ার স্নেহময়ী জননীর মত সহৃদয়তা, "নৌকাডুবিতে" ক্ষেমঙ্করীর স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি—এ সবই তাঁহার কল্পিত মায়ের মাঝে সম্ভবপর হইয়াছে। এই হরিমোহিনী আজন্ম-বদ্ধ-সংস্কার-বশে সঙ্কীর্ণ-হৃদয়। সে-দিক দিয়া দেখিলে তাঁহার চিন্তা ও আচরণ সবই সঙ্গত। তাঁহার সমাজের সংস্কার, ধর্ম্মের সংস্কার, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধে সংস্কার সব মিলাইয়া একটি সুসঙ্গত ছবি! আবার তেমনি পাশাপাশি মাতা আনন্দময়ী স্নেহে, ঔদার্য্যে অতুল-নীয় চিত্রখানি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে একটি বিশেষত্ব আমরা লক্ষ্য করি।

যেখানে প্রকৃত রক্তের সম্পর্ক, যেখানে গর্ভধারিণী জননী, যেখানে সহোদরা ভগ্নী, সেখানে অল্পবিস্তর উদারতার অভাব, এমন-কি সঙ্কীর্ণতাই দেখা দিয়াছে। অথচ যেখানে পাতানো সম্পর্ক, সেখানে আদর্শ ভক্তি, প্রীতি ও বাৎসল্যের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে; অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে একেবারে হয় নাই এমন কথাও বলা চলে না।

যে স্নেহপূর্ণ হৃদয় নিন্দার কথা শুনিয়া এমন কথার কল্পনা করে, "আহা, আমার বেহারী যদি এমন কিছু করিয়া থাকে যাহা আমার বেহারীর যোগ্য নয় তবে সে তাহা অনেক দুঃখ পাইয়াই করিয়াছে"—সে-হৃদয় মাসিমার জননীর নয়। আবার দেখি মাতৃহৃদয় পালিত-পুত্রের স্নেহে বিগলিত! "গোরার" কারাবাসে "বিনয়ের পাশে গোরার স্থান শূন্য দেখিয়া আনন্দময়ীর বুকের মধ্যে হাহাকার উঠিল, গোরাকে আজ জেলের অন্ন খাইতে হইতেছে, সে অন্ন নির্ম্মম শাসনের দ্বারা কটু, মায়ের সেবার দ্বারা মধুর নয়; এই কথা মনে করিয়া আনন্দময়ীকেও কোনও ছুতা করিয়া উঠিয়া যাইতে হইল।" এই পুত্রের জন্য যিনি সমাজ, সংস্কার, আত্মীয়-পরিজন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বলিতে পারেন, "ও বেঁচে থাক সেই আমার ঢের। আমার আর কোনও সম্পত্তির দরকার নেই"—এমন মা'ও তাঁহার গ্রন্থে আছে। আবার এমন জননীও বিরল নয় যিনি অন্যায় আদর দিয়া সন্তানের স্বভাব বিগড়াইয়া দেন, সন্তানের দোষ, ত্রুটী, চরিত্র-শৈথিল্য দেখিয়াও চোখ বুজিয়া থাকেন।

এমনি তাঁহার সাহিত্যে ভগ্নী-প্রীতির মাঝেও কত বিচিত্রতা। সুচরিতা ও ললিতার মাঝে যে-প্রীতি, তাহার মাঝেও রক্তের সম্পর্ক নাই, অথচ ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে বিপ্রদাস ও কুমুর অতুলনীয় নির্ম্মল প্রীতির মাঝে। এদিকে আবার আশা-বিনোদিনীর ক্ষেত্রে আশার দিক হইতে আন্তরিক সরল ভালবাসা আর বিনোদিনীর পক্ষ হইতে ভালবাসার অভিনয়।

"গোরায়" একস্থানে ভ্রাতা-ভগ্নীর বাল্যসুলভ প্রীতির একটি সুন্দর চিত্র আছে। "লীলার সঙ্গে সকল বিষয়েই সতীশের একটা প্রতিযোগিতা আছে। কোনও মতে লীলার দর্প চূর্ণ করা, সতীশের জীবনের প্রধান সুখ।......এমন সময়ে লীলা তাহার মুক্ত বেণী দোলাইয়া ঘরে

ঢুকিয়া সুচরিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কানে কানে কিএকটা বলিল। অমনি সতীশ ছুটিয়া তাহার পিছনে আসিয়া বলিল, "আচ্ছা, লীলা, মনোযোগ মানে কি?" লীলা কহিল, "বলব না।" সতীশ "ঈস্! বলব না! জান না তাই বল।" বিনয় সতীশকে কাছে টানিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "তুমি বল দেখি মনোযোগ মানে কি?" সতীশ সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া কহিল, 'মনোযোগ মানে মনোনিবেশ।' সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল, "মনোনিবেশ বল্‌তে কি বোঝায়?" আত্মীয় না হইলে আত্মীয়কে এমন বিপদে কে ফেলিতে পারে?

আবার সুচরিতার ও ললিতার যে ভালবাসা তাহা পরস্পরের হৃদয়কে পরস্পরের কাছে দর্পণের মত পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। একজনের মনের বিন্দুমাত্র ভাবান্তর অন্যের কাছে অগোচর থাকে না।

"চোখের বালিতে" মূর্খ আশা পূর্ণ বিশ্বাসে বিনোদিনীকে নিজের হৃদয় সমর্পণ করিয়াছে, বিনোদিনীর দেশে ফিরিয়া যাওয়ার কথায় বারণ করিয়া বলিয়াছে, "তবে কেন, ভাই, এমন করিয়া আমাদের মন কাড়িয়া লইলে?" আর বিনোদিনী আশার সুখে হিংসা-জর্জ্জরিত হইয়া ভাবে, "আহা তাহাই হইল না কেন? আশার এই বিছানা, এই খাট তো একদিন তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল! বিনোদিনী এই সুসজ্জিত শয়ন-ঘরের দিকে চায় আর সে-কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না!" এই বিনোদিনী বিহারীর নির্দ্দেশানুসারে দেশে গিয়া ভাবিতে লাগিল, "আর কাহারও জন্য এত দুঃখ সহ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া আশার জন্য নয়! এই দৈন্য, এই বনবাস, এই লোকনিন্দা, এই অবজ্ঞা, এই জীবনের সকল প্রকার অপরিতৃপ্তি কেবল আশার জন্য আমায় বহন করিতে হইবে, এত বড় ফাঁকি আমি মাথায় করিয়া কেন লইলাম?"

"যোগাযোগে" কুমু ও বিপ্রদাসের যে-ভালবাসা, তাহার ভিত্তি জ্ঞানের ও ধর্ম্মের উপর। সংস্কারবর্জ্জিত মার্জ্জিত উন্নত হৃদয়ের এমন একনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগ্নী-প্রীতি অন্য কোনও গ্রন্থে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ছোট ছোট কথায়, ব্যবহারে, প্রাণের কি গভীরতা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে! কুমু ফুল-দাদার কাছে স্বীকার করিল, সে বিবাহের পর নিজের

ভুল বুঝিয়াছে, সে কিছুই জানিত না ; তখন "বিপ্রদাস আস্তে কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, খানিক বাদে বল্লে, 'আমি তোকে ঠিক মত শিক্ষা দিতে পারিনি। মা থাক্‌লে তোকে শ্বশুর-বাড়ীর জন্য প্রস্তুত ক'রে দিতে পারতেন।" স্নেহে ব্যথিত দাদার অসহায় মন ইহা ভিন্ন কথা খুঁজিয়া পাইল না। এদিকে কুমুর মনেও ভ্রাতৃ-প্রীতি একটি অত্যুচ্চ আদর্শের বেদনা জাগাইয়া রাখিয়াছে, দাদার বিচ্ছেদ তাহাকে অহর্নিশি কাঁটার মত বিঁধিয়া আছে। দাদা তাহার জীবনে কষ্টিপাথর, জীবনে সে যাহা পায় তাহা সত্য কি-না দেখিতে সে সেই প্রতিমূর্ত্তির পাশে বসিয়া দেখে। মধুসূদনের নিকট হইতে কঠোর ব্যবহার পাইয়া তাহার অভিব্যক্তি হইল কিসে ? "ব'সে থাকতে থাকতে মতির মা হঠাৎ দেখলে কুমু দুই হাতে তার ওড়নার আঁচল মুখে চেপে ধ'রে কেঁদে উঠেছে, ও আর থাক্‌তে পারলে না, কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠল, 'দিদি আমার, লক্ষ্মী আমার, কি হয়েছে বল আমাকে!' কুমু অনেকক্ষণ কথা কইতে পার্‌লে না, একটু সামলে নিয়ে বল্লে, 'আজও দাদার চিঠি পেলুম না, কি হয়েছে তাঁর বুঝতে পারছি না'।......তিনি জানেন খবর পাবার জন্যে আমার মনটা কি রকম কর্‌ছে'।" সমস্ত 'যোগাযোগ' বইখানি ভরিয়া দাদার প্রতি কুমুর অটল বিশ্বাস ও গভীর ভালবাসার ছবিটি কি অপরিসীম বেদনার রঙে চিত্রিত !

এবার দেখি কন্যার ছবি। "গোরায়" পরেশবাবুর দিক হইতে সুচরিতার প্রতি যে একটি গভীর ভাব তাহা কবির ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া দিলে সহজেই বুঝা যাইবে।—"সুচরিতা তাঁহার শিষ্যা, তাঁহার কন্যা, তাঁহার সুহৃদ্‌। সে তাঁহার জীবনের, এমন কি ঈশ্বরোপাসনার সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। যে-দিন সে নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার উপাসনার সহিত যোগ দিত, সে-দিন তাঁহার উপাসনা যেন বিশেষ পূর্ণতা লাভ করিত।......" সুচরিতা যেমন ভক্তি, যেমন একান্ত নম্রতার সহিত তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন করিয়া আর কেহ তাঁহার কাছে আসে নাই। ফুল যেমন করিয়া আকাশের দিকে তাকায়, সে তেমনি করিয়া তাঁহার দিকে তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে উন্মুখ এবং উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। এমন

একাগ্রভাবে কেহ কাছে আসিলে মানুষের দান করিবার শক্তি আপনি বাড়িয়া যায়—অন্তঃকরণ জলভার-নম্র মেঘের মত পরিপূর্ণতার দ্বারা নত হইয়া পড়ে। নিজের যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, তাহা যেন অনুকূল চিত্তের নিকট প্রতিদিন দান করিবার সুযোগের মত এমন শুভযোগ মানুষের কাছে আর কিছু হইতেই পারে না, সেই দুর্লভ সুযোগ সুচরিতা পরেশকে দিয়াছিল।" ইহা হইতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের গভীর মনোভাবের সমস্তটুকুই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ললিতা—সেও পরেশবাবুকে ভক্তি করে, কিন্তু সে যে-কথা মনে অন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা সকলের সাম্‌নে যেমন প্রতিবাদ করে, তাঁহার সাম্‌নেও তেমনি করে। পরেশবাবু জানেন, তাঁহার এই মেয়েটির জিদ্ আছে, রাগ আছে, তিনি সেজন্য তাহাকে অধিকতর স্নেহ করেন। কিন্তু সে তাঁহার কথার বাধ্য। ম্যাজিষ্ট্রেটের অভ্যর্থনার জন্য প্রথমটা অভিনয়ে যোগ দিয়া শেষে ললিতা একেবারে ভঙ্গ দিতে চাহিলে, পরেশবাবু ললিতাকে ডাকিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, 'ললিতা, এখন তুমি ছেড়ে দিলে যে অন্যায় হবে।' ললিতা রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'বাবা, আমি যে পারিনে। আমার হয় না।' পরেশবাবু কহিলেন, 'তুমি ভাল না পারলে তোমার অপরাধ হবে না, কিন্তু না করলে অন্যায় হবে।' ললিতা মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরেশবাবু কহিলেন, 'মা, তুমি যখন ভার নিয়েছ তখন তোমাকে তো সম্পন্ন করতেই হবে। পাছে অহঙ্কারে ঘা লাগে ব'লে আর তো পালাবার সময় নেই। লাগুক্ না ঘা, সেটা অগ্রাহ্য ক'রেও তোমাকে কর্ত্তব্য করতে হবে। পারবে না, মা?' ললিতা পিতার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া কহিল, 'পারব।'

নারীর যে-বর্ণনা সচরাচর সাহিত্যে দেখা যায় তাহা সৌন্দর্য্যের বাহিরের কথা, কিন্তু কবির যে-বর্ণনা তাহা সৌন্দর্য্যের ভিতরের ছবি। নারীর বাহিরের সৌন্দর্য্যকে তিনি অন্তর্লোকের দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া আঁকিয়াছেন। 'গোরায়' সুচরিতার বর্ণনা এইরূপ—"সে কি মুখ! প্রাণের আভা তাহার কপালের কোমলতার মধ্যে কি সুকুমার ভাবে প্রকাশ পাইতেছে! হাসিতে তাহার অন্তঃকরণ কি আশ্চর্য্য আলোর মত ফুটিয়া

পড়ে! ললাটে কি বুদ্ধি! এবং ঘনপল্লবের ছায়াতলে দুই চক্ষুর মধ্যে কি নিবিড় অনির্ব্বচনীয়তা! আর সেই দুটি হাত সেবা ও স্নেহকে সৌন্দর্য্যে সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

'শেষের কবিতায়' লাবণ্যের যে-বর্ণনা তাহাও এইরূপ—"সদ্য মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তাহার পিছনে, তারি উপরে সে যেন ফুটে উঠ্ল একটি বিদ্যুৎরেখার আঁকা সুস্পষ্ট ছবি, চারিদিকের সমস্ত হ'তে স্বতন্ত্র। মন্দার পর্ব্বতের নাড়াখাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী সমস্ত আন্দোলনের উপরে, মহাসাগরের বুক তখনও ফুলে ফুলে কেঁপে উঠ্‌ছে।"

আবার 'যোগাযোগে' কুমুর বর্ণনায় দেখি—"কুমু্ স্বভাবতঃই মনের মধ্যে একলা। পর্ব্বতবাসিনী উমার মতোই ও যেন এক কল্প-তপোবনে বাস করে মানস সরোবরের কূলে।"

শুধু দু-এক স্থানে নয়, তাঁহার সাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়া কত বর্ণনা! "ঘরে-বাইরের" সন্দীপের আত্মকথায় বোঝা যায় বিমলা সুন্দরী নয়, লোকে যাহাকে বলে "ঢ্যাঙা" সে তাই এবং শ্যামবর্ণা, তবু সন্দীপ তাহাকে যে-দৃষ্টিতে দেখিল তাহা এইরূপ, "ওর এই লম্বা গড়নটিই আমাকে মুগ্ধ করে, যেন প্রাণে ফোয়ারার ধারা, সৃষ্টিকর্ত্তার হৃদয়-গুহা থেকে বেগে উপরের দিকে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। ওর রং শ্যামল, কিন্তু সে যে ইস্পাতের তলোয়ারের মত শ্যামল।—কি তেজ আর কি ধার! সেই তেজ সেদিন ওর সমস্ত মুখে-চোখে ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠ্ল!" ইহার পাশাপাশি আর-এক বর্ণনা 'যোগাযোগে', কুমুর "কপালে যে আলোটি পড়লে, কুমুর মনের চেহারটি মুখে প্রকাশ পায় সেই আলোটি পড়েছিল। ললাটে নির্ম্মল বুদ্ধি-দীপ্তি, চোখে গভীর সারল্যের সকরুণতা! দাঁড়ান ছবি!······মনে হয় সাম্‌নেও আপনারই একটা দূর কালের ছায়া দেখতে পেয়ে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়েছে।"

যে-যৌবনকে সচরাচর ভোগের রং-এ চিত্রিত করা হয়, কবির কাব্যে সেই যৌবন সমাগমে নারীর যে-রূপ তাহা বিশ্বের মাঝে ব্যাপ্ত! তাহাতে যে-রং লাগিয়াছে, তাহা মাদকতার রং নয়।

"প্রথম আমার জীবনের এই বাইশ বছর পরে
বসন্ত কাল এসেছে মোর ঘরে !
জান্‌লা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দ আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠ্‌ছে প্রাণে !
আমি নারী, আমি মহিয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রা-বিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যা-তারা ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল-ফোটা !"

এ অনুভূতি আসে কেমন করিয়া ? জীবন-বসন্তের গোপন যাদুকর যে-প্রেম, তাহারই যাদুর স্পর্শ-গুণে সমস্ত ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, মনকে বড় করিয়া, কোমল করিয়া, নূতন করিয়া, এই বিশ্বতন্ত্রীর সহিত একভাবে বাজে। নারী-হৃদয়ে এই প্রেমের আবির্ভাব সে কি অনির্ব্বচনীয় !

"চোখের পাতা কেন
কিসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন !
ভয়ে মরে বিরহিণী
শুন্‌তে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তার বাজে রিণিরিণি ;
পদ্ম-পাতায় শিশির যেন মনখানি তার বুকে
দিবা-রাত্রি টল্‌ছে কেন এমনতর ধরা-পড়ার মুখে !"

"শেষের কবিতায়" দেখি, এই প্রেমের প্রথম আস্বাদ পাইয়া লাবণ্য বলিল,—"মনে হয় এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হ'য়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর-এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ যে কত আশ্চর্য্য, সে আমি কাউকে কেমন ক'রে জানাব ?" "গোরায়" ষ্টিমারে যাত্রাকালে এই অনুভূতি ললিতা প্রথম পাইল। বিনয় তখন নিদ্রিত, "সম্মুখের দিক্-প্রান্তের তারাগুলি যেন বিনয়ের নিদ্রাকে বেষ্টন করিয়া তাহার চোখে পড়িল। একটি অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যে তাহার সমস্ত হৃদয় একেবারে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ললিতার দুই চক্ষু কেন যে জলে ভরিয়া আসিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার পিতার কাছে সে যে-দেবতার উপাসনা করিতে শিখিয়াছে, সেই দেবতা যেন দক্ষিণ

হস্তে আজ তাহাকে স্পর্শ করিলেন এবং এই নদীর উপরে, এই তরুপল্লব-নিবিড় নিদ্রিত তীরে রাত্রির অন্ধকারের সহিত নবীন আলোকের যখন প্রথম নিগূঢ় সম্মিলন ঘটিতেছে, সেই পবিত্র সন্ধিক্ষণে পরিপূর্ণ নক্ষত্র-সভায় কোনো একটি দিব্য-সঙ্গীত অনাহত মহাবীণায় দুঃসহ আনন্দ-বেদনার মত বাজিয়া উঠিল !" এই তো প্রেমের যাদুমন্ত্র, নারী-হৃদয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে চূর্ণ করিয়া এক মুহূর্ত্তে বিশ্বের অণু-পরমাণুর সহিত অভেদভাবে মিশাইয়া দিল !

নারীকে কত দিক দিয়া কবি দেখিয়াছেন তাহা তো আমরা দেখিলাম। তাহাতে যেমন বাস্তব আছে তেমনি কল্পনাও আছে ; তাহাতে কবির স্পর্শ অল্প-বিস্তর সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত ! যে-অবস্থাতেই তিনি নারীকে চিত্রিত করিয়াছেন তাহার মাঝে তাঁহার কল্পনা লীলা করিয়াছে। কিন্তু এ ছাড়াও কবি নারীর বিষয়ে এমন কথা লিখিয়াছেন যাহা সমাজে নিষ্ঠুরভাবে সত্য। কবির আসন সমাজের গণ্ডীর বাহিরে, তথাপি তিনি নারীর অন্তরের বেদনা যেমন করিয়া বুঝিয়াছেন এবং তাহা যেমন করিয়া ব্যথার ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহা পড়িলেই বুঝা যায়, এ-দুঃখ তাঁহার মুখের কথায় নয়, অন্তরের ব্যথায় কত গভীর সুরে বাজিয়াছে। "যোগাযোগে" বিপ্রদাস বলিতেছে—"আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, মেয়েদের যে-অপমান সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোন একজন মেয়ের নয়। সহ্য-করা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোন রাস্তা একেবারে নেই ব'লেই তাদের উপর কেবলই মার এসে পড়্‌ছে। বলবার দিন এসেছে 'সহ্য করব না'।"

কবি নিজেও বলিয়াছেন, "নিজের স্ত্রীকে প্রকাশ্যে অপমান করা এতই সহজ, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করতে বাইরের বাধা এতই কম ! স্ত্রীকে নিরুপায় ভাবে স্বামীর বাধ্য করতে সমাজের হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করা হয়েছে ; অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যে কোন আবশ্যক পন্থা রাখা হয়নি। এরই নিদারুণ দুঃখ ও অসম্মান ঘরে-ঘরে ও যুগে-যুগে কি রকম ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে.......... সতীত্ব-গরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা মারবার চেষ্টা, কিন্তু বেদনাকে অসম্ভব করবার একটুও চেষ্টা নেই। স্ত্রীলোক এত সস্তা এত অকিঞ্চিৎকর !"

বিদায়-আরতি

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

রঙ্গিণী তুমি লীলা-সঙ্গিনী
অপরূপ সুন্দরী,
নয়ন-প্রদীপ ঊর্দ্ধে তুলিয়া
তোমারে বরণ করি।

তোমারে পেয়েছি উৎসব-রাতে,
বিস্মিত চোখে দেখেছি প্রভাতে,
অভিসার করি' শ্রাবণ-নিশায়
আসিয়াছ কত বার ;
নূপুরে জড়ায়ে দলিত কুসুম
ধূলি-বিমলিন প্রেম-কুম্‌কুম্‌,
প্রিয়-আঁখি-লোরে চরণ-লক্ত
ধুইয়াছ আপনার।

ওগো বরাঙ্গি, রহস্যময়ি,
নয়নে বহ্নিশিখা,
তোমার রূপের কত রূপকথা
অন্তর-মাঝে লিখা !

বাজে কঙ্কণ কর-তালে-তালে,
চন্দন-শোভা অনায়ত ভালে,
মধুদৃষ্টির তৃপ্তিতে ভরা
মদালসা দু'টি আঁখি ;
হাসিতে ছুটায়ে অলকনন্দা,
আঁচলে লুটায়ে যোজনগন্ধা,
উতলা বাতাসে মধুর পরশ
পরতে পরতে রাখি'।

আদর করিলে, বাহুবন্ধনে
বাঁধি' মোরে বার বার,
বুকের পরশে চুম্বনসুখে
টুটিল বুকের ভার।

চলে চঞ্চল চরণে রজনী,
সুধার আধার অধরে রমণী,
রমণীয় সুখে তুলিয়া ধরিলে,
হৃদয় উঠিল দুলে';
মন কুড়াইতে বিলাইলে দেহ
দিলে মমতায় প্রেম-অনুলেহ,
বাসর-শয়ন রচি' অনুরাগ-
-করবী-অশোক-ফুলে।

না পোহাতে রাতি, নিবাইলে বাতি,
ছিঁড়িলে মিলন-মালা,
বাহু-উপাধান সরায়ে কখন
বিদায় নিয়েছ, বালা!—

এখনও কেশের সুরভিত হাওয়া,
খোলা দ্বারপথে করে আসা-যাওয়া,
এখনও শ্রবণে পশিছে বুকের
অবিরাম স্পন্দন;
বুকের পরশ বুকে আছে জেগে,
অধরে বিধুর মধুরিমা লেগে,
স্মৃতিসুখময়ী রজনী মথিয়া
উঠে গূঢ় ক্রন্দন!

সুখের ব্যথায় হ'ল কি পাগল
মোরা লীলা-সঙ্গিনী ?
বুকের মাণিক ছুঁড়ে ফেলে দূরে
কোথা চলে উদাসিনী ?—

জীবন-প্রভাতে গোধূলির ছায়া
মলিন করিবে যৌবন-মায়া,
হেন শঙ্কায় ফিরিবারে চায়
অ-মৃত জীবন-তটে ;
উদয়-অচলে অস্ত-রবির
বিদায়-আরতি বাজে গম্ভীর,
অবনতমুখী সন্ধ্যা নামে কি
অরুণ-দীপ্ত পটে ?

ঊষা অকরুণ, নিঠুর অরুণ
ভাবি' আঁখি মেলিব না,
চমকিয়া দেখি,—বিষ-গর্জ্জনে
বহ্নি মেলিছে ফণা !

সিথানে ছিন্ন রাঙা চেলি হ'তে,
তরল-বহ্নি বাহিরায় পথে,
ছেঁড়া ফুলদল স্রোতে ভেসে চলে
দু'হাতে ধরিতে যাই—
দেখি সে তপ্ত বাষ্প-পরশে
মালা হ'তে ফুল পড়ে খসে' খসে'
নয়নের আগে জলে ও কিনারে
ভাসিছে ফুলেরি ছাই ।

নিজ হাতে জ্বালি' রূপের আগুনে
বাসরে শ্মশান-চিতা,
মরণ-গাহনে চির-যৌবনা
হাসিছে শুচিস্মিতা।

জ্বলে ধ্বক্ ধ্বক্ সীঁথির সিঁদুর,
নিশা-অবসান, বিয়োগ-বিধুর
আকাশের তারা মুদিছে নয়ন
দগ্ধ চিতার ধূমে।
কূল ভাঙ্গি' বহে কাল-প্রবাহিণী
ঊর্দ্ধে ফুঁসিছে চপলা-নাগিণী,
মেঘ-কজ্জল আকাশ পাগল
দূর দিগন্ত চুমে।

সৌন্দর্য্যে রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীআশা দেবী

দীপ্তি কহিল, কাল হইতে একটা প্রশ্ন আমাকে নিরতিশয় ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ব্যাকুলতার প্রসঙ্গে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া সমী অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে বর্ষাকালের স্নিগ্ধ মেঘাবৃত গঙ্গাকূলের প্রতি চাহিয়া রহিল। দীপ্তি সাড়া না পাইয়া বলিয়া চলিল, কাল রাত্রিতে তোমাদের ওই ভাঙ্গা মন্দিরের জীর্ণ স্তূপগুলির উপর যখন চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে তখন বাতির আলোকে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' বহিখানির একটি কবিতা পড়িতেছিলাম। পড়া শেষ হইলে মনে হইল, রবীন্দ্র-প্রতিভার কত পরিচয়, কত কাব্য-জিজ্ঞাসাই না বাহির হইয়াছে, অথচ তাহার প্রয়োজন ছিল কি? 'মানসী'র শেষের দিকে এই যে "বিদায়" কবিতাটি পড়িলাম, তাহা এখনও লোকের মুখে মুখে নিঃশব্দতার পটভূমি ছাড়িয়া মূল্যনির্দ্দেশের ক্ষেত্রে নামিয়া আসে নাই। তাহা রবীন্দ্রনাথের কোন্ শ্রেণীর, কী মনোভাবের কবিতার অন্তর্গত এই দুরূহ তত্ত্ব লইয়া এখনও কেহ উৎকন্ঠিত হয় নাই, তাই সেই জ্যোৎস্না রাত্রিতে পড়া শেষ হইলে, গভীর তৃপ্তিতে সমস্ত মন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সমী কহিল, রবীন্দ্রনাথের যে-সকল কবিতা ইতিমধ্যে অবিরত লোকের মুখে মুখে আনাগোনা করিয়াছে, তাহাদের যেন অনাঘ্রাত পুষ্পের মত করিয়া উপভোগ করিতে পারি না। প্রথম অলৌকিক বিস্ময়ের যে-কিরণলেখাটি স্পর্শ করিব তাহার পূর্ব্বেই দেখিতে পাই, অনেকের শোনা-কথা, অনেকের বলা-মত, বহুজনের উদ্ধত চরণ সেখানে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে নিজের দেখাকে, আপনার প্রথম অনাহত পুলককে কি করিয়া একান্তে সমর্পণ করিয়া দিব ভাবিয়া পাই না। দীপ্তি কহিল, তাই কাল রাত্রিতে 'মানসী'র সেই কবিতাখানি পড়িয়া অপরিমিত আনন্দে মন ভরিয়া গিয়াছিল; ভাগ্যে ইহাকে শতভাবে বিশ্লেষ করিয়া মাসিকের পৃষ্ঠায় কোন প্রবন্ধ এখনও বাহির হয় নাই। মনে হয়, কবির কবিতাকে তাহার জগৎ হইতে চ্যুত করিতে নাই। যখনই আমাদের হৃদয়াবেগের

প্রাবল্য উপস্থিত হইবে, তাহাকে লইয়া কাটাছেঁড়া করিব, এখানে এক লাইন ওখানে দু'লাইন উদ্ধৃত করিয়া মনে করিব, হৃদয়ের ভাবরাশিকে আরও ঘনীভূত করিতেছি—তাহাতে অনেকের ভারি অসুবিধা হয়। শেলির Skylark কবিতাটির চারিদিকে আর এতটুকু আকাশের পরিধি রহিল না। তাহাকে নোট-বহিতে, ব্যাখ্যার খাতাতে এবং স্থানে-অস্থানে কেবল উদ্ধৃত করিবার দুর্নিবার প্রলোভনে তাহার চারিদিককার উদার অবকাশের বেষ্টনটি নষ্ট করিয়া দিল। তাহাতে অত্যন্ত-ব্যবহারের একটা ছোপ লাগিয়া গেল। সমী কহিল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা লইয়া তাহার পরিচয়, তাহার ঋতুভাগ, তাহার শ্রেণীবিভাগ এসকল করার চেয়ে যদি এইটুকু বুঝিতে পারি, কবি তাঁহার কবিতাকে যেমন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ঈষৎ অসমাপ্তির চাঞ্চল্য এবং সীমাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা ইহাই তাহার সকলের চেয়ে বেশী পরিচয়—ইহাকে যে যেমন করিয়া বুঝিতে পারে সেই বোঝাই তাহার পক্ষে পরম উপলব্ধি, জোর করিয়া এর কোথায় কোন্ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, কোন্ ইঙ্গিতের তলায় কী গূঢ় তাৎপর্য্য প্রচ্ছন্ন আছে, এসকল বুঝাইতে যাওয়ায় কোন সৌন্দর্য্য নাই, তবে বহুতর উপকার হয়। দীপ্তি কহিল, তবে কি কবিতা তথা সাহিত্য-বিচারে কোন ফল নাই ?

সমী কহিল, সাহিত্যের ভিতর সৌন্দর্য্যের অংশ লোকে কেন যে বিচার করে, আমি তার অর্থ খুঁজিয়া পাই না এবং সাহিত্যের মতামত বলিয়া যে-বস্তু, সেখানেও নৈর্ব্যক্তিক বিচার চলে না, কারণ সাহিত্যের মতামত যেটুকু, তার পিছনে একজনের অভ্রংলেহী ব্যক্তিত্বের স্পর্শ আছে,—এই কথা মনে থাকে বলিয়াই তাহার দাম। এই ব্যক্তিত্বের আলোক বাদ দিলে নিছক মতামত সেও হাটের জিনিষ। প্রতি নিমিষে ভঙ্গুর, সহস্র পরীক্ষাশালায় সহস্র প্রকার তকমা দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে, সেখানে ভ্রান্তবুদ্ধি কাহাকে রাখিয়া কাহাকে দেখিবে ঠিক করিয়া পায় না। দীপ্তি কহিল, তাই কবিতার আলোচনা-কালে মানুষে যদি এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হয়, আমার চিত্তকে ইহা কি ভাবে বিমথিত এবং আন্দোলিত করিয়াছে, তবেই তাহাতে আমাদের কিছু ঔৎসুক্য থাকিতে পারে। সমী কিয়ৎকাল ভাবিয়া কহিল,

অথচ ইহাকে scientific attitude সম্মত পরীক্ষা কিছুতেই বলা চলে না। দীপ্তি হাসিয়া কহিল, ও সকল বড় বড় কথা আপাততঃ মুলতুবী রাখ। সৌন্দর্য্য-বিচারের একটিমাত্র ইতিহাস আছে, তাহা এই যে, আমার মনে কেমন লাগিয়াছে—এই পরমাশ্চর্য্য ইতিহাসটিকে যদি আমি যথাসাধ্য সুন্দর করিয়া বলিতে পারি, তবেই তাহা সকলের চেয়ে বেশী বলা হইল। না হইলে তোমার মত কেবলই বিলেতী পুস্তক হইতে বচন খুঁজিয়া এবং তত্ত্ব মিলাইয়া কিছুই হইবে না।

সমী কহিল, চিন্তা করা এবং সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করা, এই দুই করার ভিতর কি-একটা আপাতবিরোধ আছে বলিয়া তোমার মনে হয় না? দীপ্তি কহিল, প্রথমে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথাই ভাব। তাঁহার মত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিয়াছে কে? এবং তাঁহার মত এত বিচিত্র বিষয় লইয়া এত প্রভূত চিন্তাই বা করিয়াছে কে? একই মানুষের ভিতর অনেক বিচিত্র ব্যক্তিত্ব থাকে, তাহার একটা যখন আর-সকলকে ছাপাইয়া উঠে তখন সেই পুরোবর্ত্তী ব্যক্তিত্বকে আমরা সাধারণভাবে গ্রহণ করি এবং একটা রেখা টানিয়া বলি—এই লোকটা কর্ম্মবীর, এই লোকটা চিন্তাবীর, কিন্তু আর যাহারা জীবনের প্রকাশ্য পটভূমিকার একটু আড়ালে রহিল তাহাদের কি একেবারে বাদ দেওয়া যায়? তাই বার্ট্রাণ্ড রাসেলের জটিল অঙ্ক এবং জটিল দর্শন লইয়া প্রবন্ধের মাঝে "A Free Man's Worship"-এর গুটিকতক কথা যখন পড়িলাম তখন মনে হইল, ইহার সৌন্দর্য্য এবং সুকুমার ভাষা কবিতাতেও দুর্ল্লভ। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই পরিচিত এবং প্রচলিত ব্যক্তিত্বের মাঝে এমনই সকল আকস্মিক টুক্‌রা চোখে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে এইটা একেবারে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সৃষ্টিতে এত দিকে এত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ চোখে পড়ে যে, নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত মনে হয়—এ কী করিয়া সম্ভব হইল। অথচ ইহাদের মধ্যে একটি মূল ঐক্য কি নাই? রবীন্দ্রনাথের সেই ঐক্যকে আমার বলিতে ইচ্ছা করে 'সৌন্দর্য্যকার'। তাঁহার পুরোধা পরিচয় তিনি কবি। এই কবির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশের ক্ষমতা তাঁহার জটিল চিন্তাকে কেমন করিয়া অতি সুকুমার আকার দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নানা

বিষয়ের প্রবন্ধ পড়িলে মনে হয়, এ যেন তর্ক তুলিবার বিষয়-বস্তুকে সুনির্দ্দেশ-রেখায় ফুটাইয়া তুলিবার এক নূতন পথ। নীরস যুক্তির ক্রম-বিকাশে যে-বস্তুকে বোঝান গেলেও যাইতে পারিত, তাহাকে একটি অখণ্ড সুসম্পূর্ণ উপমা দিয়া সরল করিয়া তুলিবার কি অভিনব পন্থা! এমন ফুল ফুটাইয়া তর্ক করিতে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যে-সকল বিষয় লইয়া আলাপ-আলোচনা করিতে গেলে স্বভাবতঃই যুক্তির ধূলি এবং তর্কের ঝড় উপেক্ষা করা যায় না, সেখানেও তাঁহার কবি-চিত্তের প্রভাব, সৌন্দর্য্যের অখণ্ডতা এবং প্রশান্তি আনিয়াছে, অথচ তাহাতে উচ্চ চিন্তার প্রকাশকে এতটুকু পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইতে হয় নাই। চিন্তা প্রকাশের ভাষা যে উপমায় প্রাঞ্জল এবং সৌন্দর্য্যের ছন্দে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়, ইহা তাঁহার লেখা পড়িলেই বোঝা যায়। দীপ্তি কহিল, এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমার বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। আজকাল প্রায় সকলেই বলিতে সুরু করিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ—ইহা intellectualism-এর যুগ; অতএব এ-যুগের সাহিত্যে বিবিধ চিন্তার এমনই ঢেউ তুলিতে হইবে, যাহাতে পাঠকে প্রত্যেক পৃষ্ঠা পড়িতে পড়িতে ভাবিবে, ভাবিতে ভাবিতে উত্তেজিত হইবে এবং জটিলতার অন্ত নাই দেখিয়া অবিরত মনে মনে তর্ক করিবে। মোটের উপর সুখাসীন হইয়া, আমোদ করিয়া গল্পের বহি পড়িবার দিন চলিয়া গিয়াছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের যে-কোন উপন্যাস পড়, এ-কথাটার বিধিমত প্রতিবাদ তখনই কি খাড়া করিয়া তুলিবে না? সমী কহিল, সাহিত্যের কাজ অনেকটা প্রকৃতির মত। আকাশের নির্লিপ্ত সৌন্দর্য্যের দিকে দেখিলে কখন কি মনে হয় ওখানে অনেকগুলা জটিল নিয়ম আপনার তালে পরস্পরকে অনুবর্ত্তন করিয়া চলিয়াছে? সেদিন যে আমরা গঙ্গার ওপারে বৃষ্টিসিক্ত ঘন অরণ্যের ভিতর বেড়াইতেছিলাম তখন কি একবারও মনে হইয়াছিল, এই আর্দ্র প্রশান্ত আরণ্য প্রকৃতির তলে তলে কি ভীষণ প্রতিযোগিতা, কি নিঃশব্দ আয়োজনের সমারোহ চলিতেছে! সাহিত্যের প্রথম এবং সবচেয়ে বেশী করিয়া তাগিদ, সৌন্দর্য্য সঞ্চার করা। ইহার তলায় যুগধর্ম্মের কোন চিহ্ন যদি সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য নষ্ট না করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকে তবে আসে যায় না, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যকে প্রবলতর করিয়া

তুলিতে গেলেই বাধে। ধর রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' এবং 'গোরা'। ইহাদের চেয়ে বেশী করিয়া বিশ্বসাহিত্যে আর ক'টা বহি মানুষকে ভাবিতে শিখাইয়াছে? কিন্তু 'চতুরঙ্গ' পড়িলে কি মনে হয় না যে, ইহা নিরতিশয় সুন্দর করিয়া বলা নির্লিপ্ত একটি গল্প? ইহা মানুষকে অতিমাত্রায় চিন্তাতৎপর করিবার একটা আধুনিকতম যুক্তিতর্কের শাণিত অস্ত্রের কারখানা নয়। চিন্তাকেও পুষ্পপত্রপল্লব সমেত একটি অখণ্ড সৌন্দর্য্য-ছবির মত করিয়া প্রকাশ করার আনন্দ 'গোরা'র সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়াছে।

দীপ্তি কহিল, এমন-কি রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুচ্ছগুলিকেও গল্পের চেয়ে কবিতা বলিতে বেশী লোভ হয়। এ তাঁহার কবিতার মতই সুর এবং রসে ভরা। এত ছন্দোবদ্ধ গল্প কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কোন একটা বিশেষ আবেগে ভাবোত্তেজিত হইলেই মানুষ স্বভাবতঃই কবিতাকে আশ্রয় করে,—যেমন ধর তাজমহল দেখিয়া "সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে" এই কয়েকটি কথা মনে পড়ে নাই এমন লোক বিরল। কিংবা অকস্মাৎ যেদিন পশ্চিম দিগন্ত অন্ধকার করিয়া ঝড় আসিয়াচে, শেলীর সেই লাইনটি কে না মনে মনে গুঞ্জন করিয়াছে—"Ah, make me thy lyre even as the forest is!"

কবিতার বেলায় এ খুব স্বাভাবিক। কবিতা আপন ছন্দোবন্ধের নিয়মে হৃদয়ের অনেকটা যায়গা জুড়িয়া যে-সকল ভাবাস্তৃত অনুভূতি, তাহাদিগকে সংহত করিয়া আকার দান করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের অনেক, এমন-কি বেশীর ভাগ গল্পে কবিতায় এই বিশেষ গীতরস দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। তাই ইহাকে সহজেই মনে পড়িয়া যায়। ইহারই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্য্য-সুর-খচিত কত টুকরা আমাদের কত রমণীয় অবকাশ-মুহূর্ত্তে কবিতার মত হইয়া মনে পড়ে। সমী কহিল, গল্পগুচ্ছের অনেক লাইন আমাদের মনের অতি সুকোমল দিকটার সহিত নিবিড় হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। সেদিন এক বিখ্যাত স্বরদ যন্ত্রীর বাজনা শুনিতে গিয়াছিলাম। যন্ত্রটার সহিত তাহার একান্ত তন্ময় ভাব দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পের একটি লাইন মনে পড়িয়া গেল, ঠিক যেমন

ঝড়ের সময় শেলীর কবিতার চরণ মনে পড়িয়া যায়, 'পয়লা নম্বরের' সিতাংশুমৌলির কথা—"যন্ত্রটা যেন প্রেয়সী নারীর মত তাকে ভালোবেসেচে"। তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি আমাদের জীবনের মজ্জায় এমনই করিয়া মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহাকে বাদ দিলে আমাদের জীবনের সৌন্দর্য্যাবিষ্ট প্রকৃতির দিক্‌টা প্রায় শূন্য হইয়া পড়ে। দীপ্তি হাসিয়া কহিল, রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় দার্শনিক এবং কবি, অন্তঃপুরশালার সমস্ত আলজ্জ খুঁটিনাটিকে কেমন করিয়া এত প্রকাশগম্য করিয়া তুলিলেন। তাঁহার মত এত বড় সুচতুর কবি কোথায় আছে? 'নষ্টনীড়' গল্পটি পড়িয়াছ ত? চারু যখন অনেক লেখা অভ্যাস এবং অনেক লেখা বিখণ্ড করার পর প্রথম একটি লেখা সাঙ্গ করিয়াছে, অমল অতর্কিতে তাহা পাঠ করিল। অমল পড়া সাঙ্গ করিয়া চারুকে গিয়া কহিল, "চমৎকার হয়েছে!" চারু পানে খয়ের দিতে ভুলিয়া কহিল, "যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না।" মেয়েরা কোন বিশেষ উত্তেজনার চাঞ্চল্যকে দমন করিতে হইলে যে তৎক্ষণাৎ পান সাজিতে বসে এবং তাহারই স্বভাবতঃ প্রতিক্রিয়া স্বরূপে বিশ্ব-সংসারে এত কাজের মাঝে পানে খয়ের দিতে ভুলিয়া যাওয়া যে তথায় একান্ত সুনিশ্চিত, এ গোপন তথ্য তাঁহার অজানা নাই। 'মানভঞ্জন' গল্পে গিরিবালার চুল বাঁধিবার বাক্সের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, এর কোথাও এতটুকু বাদ যায় নাই।

সমী হাসিয়া কহিল, তা বটে, তাঁহার সৌন্দর্য্যের রশ্মি পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ার উপর যেমন পড়িয়াছে, তেমনই অতি ক্ষুদ্রতম ছোটখাট দৃশ্যগুলিও তাহাতে বাদ যায় নাই। কবি-চিত্তের প্রবণতাই তাই। তাই বলিতে-ছিলাম, রবীন্দ্রনাথের কত দিনের কত সহস্রাধিক সাহিত্য-সৃষ্টির মাঝেও এই কথাটা এক নিমিষের জন্যও ভুলিবার যো নাই যে, তিনি কবি। তাঁহার সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, রাজনীতি-অধ্যায় সমস্তই এই সৌন্দর্য্যের এবং সঙ্গতির সুষমায় অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যে কবির রচনা এবং কেবলমাত্র খুব একটা সারগর্ভ নীতি-শিক্ষালয়, তাহা দৃষ্টিপাত মাত্রই বোঝা যায়। আর মনে হয়, তাঁহার proportion-জ্ঞান কী নিবিড়। তিনি কবি বলিয়া কর্ম্মশালা হইতে, রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে, লোকশিক্ষা হইতে আপনাকে

নির্ব্বাসিত করেন নাই, অথচ তাঁহার কবির ব্যক্তিত্বকে ইহারা এতটুকু মাত্র আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। এতগুলি ব্যক্তিত্বের এত সুন্দর সমন্বয়-মণ্ডিত বিকাশ কত শক্ত।

দীপ্তি কহিল, এইজন্য প্রথমে তোমাকে যে-কথাটা বলিতে সুরু করিয়াছিলাম, সৌন্দর্য্যের এই অখণ্ড দানকে কি করিয়া গ্রহণ করিব, সমস্ত আকাশ-বাতাসকে কি করিয়া নিঃশব্দ করিয়া দিলে তবেই ইহাকে জীবনমূলের সর্ব্বশেষ প্রান্ত অবধি আকর্ষণ করিয়া লইতে পারা যায়, তাহা কেন কেহ ভাবে না? কেবল শ্রেণীবিভাগ এবং বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মর্ম্মকোষের সন্ধান কাহাকেও দিতে পারা যায় না। তাই আজ অবধি যত কাব্য-জিজ্ঞাসা পড়িলাম, কোনটাই মনে লাগিল না। ইহাদের কোনখানেই সৌন্দর্য্যোন্মুখ চিত্তের একান্ত সমর্পণের আভাস খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সমী কহিল, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৌন্দর্য্য আমরা এতই সহজে এত ঘরের কাছে অনায়াসে পাইতেছি বলিয়া হয়ত ইহাকে গ্রহণ করিবার সাধনায় স্থির থাকিতে পারিতেছি না।

দীপ্তি কহিল, আমারও তাই মনে হয়, যাহাকে বিনাআয়াসে অবারিত ভাবে পাই, তাহার প্রকৃত দান সম্বন্ধে অনেক সময় অচেতন থাকি। কিন্তু এসকল মীমাংসা এখন থাক্। এই বর্ষার দিনের উচ্ছ্বসিত গঙ্গাকূলের ছবির সহিত মিলিয়া যায় এমনই একটি টুকরা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প হইতে বাছিয়া তোমাকে পড়িয়া শোনাই। যাঁহার সৃষ্টির পরিচয় কেবল ভালো লাগে, এই বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায় না, বিচার করিয়াও পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, তাঁহার কাব্যের আলোচনা কথার অতীত হইয়াই থাক্। কেবল নিঃশব্দে অনুভব কর, তাহা হইলেই যাহা কিছু বলা যায় না, সমস্ত পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চভূত"

—শ্রীকালিদাস রায়

যে পাঁচটি ভূতকে কবি এই গ্রন্থখানিতে আশ্রয় দিয়াছেন, কবি সেই পাঁচটি ভূতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। পাঁচটি ভূতের মধ্যেই যখন কবি নিজেই রহিয়াছেন, তখন তাহাদের চরিত্রের ও মনোবৃত্তির স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য হয়ত নাই বলিয়া মনে হইতে পারে—অন্ততঃ ধারণা হইতে পারে, চরিত্রগুলির মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় অন্তঃসাম্য থাকিয়া গিয়াছে। কবি সেজন্য গোড়া হইতেই এ-বিষয়ে সতর্ক; এ-ক্ষেত্রে মনোভাবের অতিরিক্ত সাম্য থাকিলে অথবা পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে না পারিলে, বিরোধ, বিসংবাদ ও বাদ-প্রতিবাদের সাহায্যে কোন সমস্যারই সামঞ্জস্যগত নিঃশেষ সমালোচনা যে সম্ভব হইবে না, কবি তাহা বুঝিয়াই একটা গৌর-চন্দ্রিকা করিয়া লইয়াছেন। তাহাতে এবং গ্রন্থমধ্যে চরিত্রগুলির মনোবৃত্তি ও চিন্তা-প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য যাহা দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহার একটা আভাস দেওয়া গেল। এই আভাস বর্ণে বর্ণে যে মিলিবে এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না,—তবে এইটুকু বলিতে পারি, পাঁচটি ভূতের মধ্যে চরিত্রগত স্বতন্ত্রতা যথেষ্টই থাকিয়া গিয়াছে।

১। ক্ষিতি—জীবনপ্রসূ সরস ক্ষিতিরই ইনি প্রতীক। তিনি জড়-বাদী, প্রত্যক্ষবাদী, স্থূল সত্যের পক্ষপাতী—সত্যকে ব্যবহারিক জগতে নিয়োগ করিতে চাহেন—ব্যবহারিকতা দেখিয়া সত্যের মূল্য-মর্য্যাদা নির্ণয় করেন। তাঁহার মতে সভ্যতার অর্থ, অপ্রয়োজনীয়কে ক্রমবর্জ্জন আর উন্নতির অর্থ, আবশ্যকের সঞ্চয়।

২। অপ্—(স্রোতস্বিনী) জল যাহাতে জীবনময় হইয়া উঠিয়াছে—সেই নদীরই প্রতীক ইনি। কাকলীময় কণ্ঠস্বরে, লীলায়িত ভঙ্গিতে, চরিত্রের তারল্যে ইনি যেমন স্রোতস্বিনীর নারীরূপ—একশ্রেণীর মধুর-প্রকৃতি নারীরও তেমনি প্রতিনিধি। ইনি ভাবপ্রবণা, অপূর্ব্বতার পক্ষ-পাতিনী, চঞ্চলা, তরলা, কোমলহৃদয়া, মর্ম্মে মর্ম্মে সুন্দরের পূজারিণী।

শিল্পীদের মনোভাব যাহা ইঁহারও মনোভাব তাহাই। (মনুষ্যনামক-নিবন্ধে ইঁহার চরিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে।)

৩। তেজ—'দীপ্তি' ইহার প্রতীক। ইনিও নারী, তাই অন্যতরা নারী স্রোতস্বিনীর সহিত ইঁহার সৌকুমার্য্য ও মাধুর্য্যের দিক হইতে কিছু মিল আছে। তবু ইঁহার চরিত্রে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যও আছে। স্রোতস্বিনীর চরিত্রে রসের প্রাবল্য,—তেজস্বিনী দীপ্তি-চরিত্রে বোধশক্তির প্রখরতা প্রচুর। স্রোতস্বিনী যুক্তি দিতে জানেন না। তিনি ভাল-লাগাটাকেই সিদ্ধান্তের খুব পাকা ভিত্তি বলিয়া মনে করেন। কাহাকেও কিছু বুঝাইয়া বলিতে হইলে, যুক্তির বদলে আনুরূপ্য analogy-র ব্যবহার করেন। অনাবশ্যককে তিনি ভালবাসেন—ভাল লাগে বলিয়া। তিনি সত্যবিচারে intuition-এর উপরই নির্ভর করেন। দীপ্তি প্রজ্ঞাবতী—তাঁহার সকল সিদ্ধান্তের ভিত্তি যুক্তি। অনাবশ্যককে তিনি ভালবাসেন, অনাবশ্যকও আবশ্যক বলিয়া। ব্যবহারিকতার পক্ষপাতীরা অসম্যক্ ও আত্মকেন্দ্রী দৃষ্টিতে দেখে বলিয়া বহু জিনিসকে তাহাদের অনাবশ্যক মনে হয়—ইহাই তাঁহার ধারণা। তাঁহার বিশ্বাস অসম্যক্ দৃষ্টিতে দেখার জন্যই পুরুষ নারীর প্রতি এত অবিচার করিয়া আসিতেছে। ব্যবহারিক সার্থকতা ও মাধুর্য্যের মধ্যে তিনি একটা সামঞ্জস্য সাধন করিয়া লইয়াছেন। Kant ও Hegel-এর মতবাদের সহিত তাঁহার মতের মিল আছে। (নরনারী-নামক-নিবন্ধে দীপ্তির চরিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে।)

৪। মরুৎ—কবি ইহার মানবতাকে নামকরণ করিয়াছেন—'সমীর'। ইনি কল্যাণবাদী।

মানুষের সহিত জড়ের সংসর্গে যে বৈজ্ঞানিক কল্যাণের সৃষ্টি হয়, ক্ষিতি তাহাকেই একমাত্র কল্যাণ বলিয়া মনে করেন—আত্মার কথা তিনি ভাবেন না। সমীর আত্মার কল্যাণকেই সবচেয়ে বড় কল্যাণ মনে করেন। তাই মানুষের সহিত মানুষের সংসর্গে যে-কল্যাণ, সেই কল্যাণই পরম প্রেয়,—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী সত্যের সুন্দর-রূপের উপাসিকা—সমীর সত্যের শিব-রূপের সেবক।

জড়বাদের বিরুদ্ধে দুইটি তন্ত্র আছে। একটি সৌন্দর্য্যতন্ত্র বা aesthetic school আর-একটি জ্ঞানতন্ত্র বা ভাবতন্ত্র—spiritual school। স্রোতস্বিনী রসাত্মক সৌন্দর্য্যতন্ত্রের ও দীপ্তি রূপাত্মক সৌন্দর্য্যতন্ত্রের অনুসারিকা। সমীর এই spiritual school-এর অনুসারক—ভাবতান্ত্রিক। কল্যাণের অঙ্গীভূত বলিয়াই তিনি সৌন্দর্য্যেরও উপাসক। স্রোতস্বিনীর সৌন্দর্য্যবোধ কতকটা আবেগাত্মক, সমীরের সৌন্দর্য্যবোধ ভাবাত্মক। তাই তিনি আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া সমস্ত বাহ্যবস্তুকে পুনর্গঠন করিয়া, জড়ের ও নরের সকল কুশ্রীতাকে অন্তরের শ্রী দিয়া রম্য করিয়া তোলেন—প্রেম, রসমাধুর্য্য ও কবিত্বের সংযোগে তিনি বিশ্বের সমস্তকেই উপভোগ্য করিয়া তোলেন। সমীর একজন optimist বা শুভাশংসী। (সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ নামক নিবন্ধের খাজনা আদায়ের বাজনা সম্বন্ধে তাহার অভিমত উল্লেখযোগ্য।)

৫। ব্যোম—ক্ষিতির মতের সম্পূর্ণ বিরোধী মত্ ব্যোমের। ব্যোম অধ্যাত্মবাদী; আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি বিশ্ববিচার করেন। তাঁহার মতে শুধু সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য কেন,—এই জড়-জগৎ, যাহাকে সকল সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আশ্রয় বলা হয়, তাহাও আত্মারই সৃষ্টি। ঊর্ণনাভের জালের মধ্যবর্ত্তী ঊর্ণনাভের সহিত ব্যোম আত্মাকে উপমিত করিয়াছেন।

এই আধ্যাত্মিকতার জন্য ব্যোম ভারতের প্রাচীন সভ্যতারও পক্ষপাতী এবং জড়-জগৎকে যাহারা অযথা বড় করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের সভ্যতার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ঔদাসীন্য। ব্যোম কখনও mystic, কখনও egoist, কখনও cynic, কখনও pessimist; কিন্তু সকল সময়েই অধ্যাত্মবাদী। যে জড় মায়াজালে আত্মাকে বন্দী করিতে চায়—তাহার প্রতি ব্যোমের দারুণ অশ্রদ্ধা। সেজন্য তিনি জড়-জগৎকে কতকটা ঔদাস্য বা বৈরাগ্যের চোখে দেখেন। সৌন্দর্য্য আত্মারই সৃষ্টি,—সাংসারিক কল্যাণ জীবের চরম কল্যাণ নয়—প্রেম আত্মারই একটা পাতানো সম্বন্ধ। এই ধারণা থাকায় সৌন্দর্য্য, কল্যাণ ও প্রেমের মূল্য ব্যোমের নিকট সমীরের মত নহে।

(অপূর্ব্ব রামায়ণ ও কাব্যের তাৎপর্য্য নামক নিবন্ধদ্বয়ে ব্যোমচরিত্র বিশেষভাবে ফুটিয়াছে।)

ব্যোম জ্ঞানযোগের পক্ষপাতী হইলেও স্বীকার করেন—কর্ম্মযোগ ছাড়া চিত্তশুদ্ধি হয় না বা জ্ঞানযোগের অধিকার জন্মে না। (ভদ্রতার আদর্শ নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য কবি আগাগোড়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোথাও যে একেবারে ব্যত্যয় হয় নাই—একথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। উদাহরণ স্বরূপ—'অদ্ভুত রামায়ণের' উপসংহারের পংক্তি কয়টি আমরা ক্ষিতির মুখে প্রত্যাশা করি নাই—সমীরের মুখে প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। আবার 'সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সন্তোষ' নামক প্রবন্ধে ভারতীয় কবির উপমা সম্বন্ধে সমীর যে কথাগুলি বলিতেছেন, তাহা ক্ষিতির মুখেই শোভা পায়। তাই বোধ হয় ক্ষিতি বিনা-প্রতিবাদেই সমীরের কথাগুলি মানিয়া লইতে পারিল।

চরিত্রগুলির মধ্যে বৈষম্য যতই থাকুক, সাম্যও যথেষ্ট আছে। সাম্য যথেষ্ট না থাকিলে পাঞ্চভৌতিক সভারই সৃষ্টি হইত না—এবং এই সভায় তাহারা পরস্পর মিলিয়া বন্ধুভাবে আলাপ-আলোচনা করিয়া এত আনন্দ লাভ করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া, একই সংস্কার ও শিক্ষাধারার দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার জন্য তাহাদের মধ্যে ভাব-সাম্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। সর্ব্বোপরি মনে রাখিতে হইবে, পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত ও অনুরঞ্জিত একই মনের মনোভাবগুলি পাঁচটি ভূতের মূর্ত্তি ধরিয়াছে। পাঁচটি আঙুল সমান নয়, এই কথা যখন আমরা বলি, তখন আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না, বৈষম্যের তুলনায় তাহাদের মধ্যে সাম্য কত বেশী—একটি বাহুশাখার অগ্রভাগে তাহারা যে একবৃন্তেই ফুটিয়াছে। প্রত্যেক চরিত্রের সাম্যাতিরিক্ত মুখ্য ধর্ম্ম-বিশিষ্টতাকে (predominant trait) অবলম্বন করিয়াই চরিত্রগুলির স্বাতন্ত্র্যের আভাস দেওয়া গেল।

মতামত প্রকাশ, বাদানুবাদ ও সমস্যাবিচারের দ্বারাই চরিত্রগুলির মানবিকতা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পাঁচজনের মধ্যে তত্ত্বগত আলাপ-

আলোচনা পাঁচটি গ্রামোফোনের দ্বারাও নিষ্পন্ন হইতে পারিত। কেবল স্রোতস্বিনী নয়, কবি প্রত্যেক প্রজ্ঞাময় চরিত্রের অন্তরালে এক-একখানি হৃদয়ও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আগাগোড়া পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের সংযোগও দেখাইয়াছেন। বাদ-প্রতিবাদের ফাঁকে ফাঁকে হৃদয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও সমান্তরাল ভাবেই প্রতিফলিত হইয়াছে। কেবল চরিত্রগুলির কথোপ-কথনে চল্‌তি ভাষার প্রয়োগ না থাকায়, মানসিক স্বাভাবিকতার একটু হানি হইয়াছে। বোধ হয়, সমস্যাগুলির গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করিয়া কবি ভাষাকে বরাবর মার্জ্জিতই রাখিয়াছেন।

পঞ্চভূতে পাঁচটি ভূতের সমাবেশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি নিজেই কথা-প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দিয়াছেন,—

"জীবনের গতি স্বভাবতই রহস্যময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্ম-খণ্ডন, অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্ব্বাপরের অসামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু লেখনী স্বভাবতই একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে। সে স্বতো-বিরোধের মীমাংসা করিয়া, সমস্ত অসামঞ্জস্য সমান করিয়া কেবল মোটামুটি রেখা টানিতে পারে।"

প্রবন্ধ রচনায় লেখনী যে আত্ম-খণ্ডন, স্বতোবিরোধ ও অসামঞ্জস্যকে এড়াইয়া চলিতে চায়, পাঞ্চভৌতিক সভার সৃষ্টি করিয়া কবি তাহা না এড়াইয়া রহস্যময় জীবনের গতি ও চিন্তাজগতের সমস্যাগুলির বিশ্লেষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

কবি বলিয়াছেন,—

"একটা মানুষের মধ্যেই সহস্র ভাগ আছে—সব কটাকে সামলাইয়া সংসার চালানো এক বিষম বিপদ।"

এই বিপদ যে কি তাহা বুঝাইবার জন্যই কবি এই পাঞ্চভৌতিক সভার সৃষ্টি করিয়াছেন।

কবি আবার বলিয়াছেন,—

"আমরা যতই ভাবিতেছি, যতই উপভোগ করিতেছি, ততই আপনাকে নানাখানা করিয়া তুলিতেছি।"

এই যে নিজেকে নানাখানা করিতে হয়—তাহাদের মধ্যে মানসিক

বাদ-প্রতিবাদের একটা ধারাবাহিক বিবৃতি প্রবন্ধে সম্ভব হয় না। সেই বিবৃতির জন্য এই পাঁচটি ভূতের সৃষ্টি।

একটা সমস্যার সর্ব্বাঙ্গীন পর্য্যালোচনা করিয়া সমাধানের চেষ্টা করিতে হইলে সমস্যাকে যে নানা দিক হইতে বিভিন্ন দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যে পর্য্যালোকন করা আবশ্যক, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপনার সংকীর্ণ আদর্শ ও সুনির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া সমস্যাবিশেষকে বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষার আনন্দ লাভ করিতে হইলে অথবা সংস্কারশূন্য মনে, আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে কোন সমস্যাকে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া দেখিতে হইলেও নিজত্ব যে একাধিক সত্তায় বিভক্ত হইয়া পড়ে, কবি তাহা অনুভব করিয়াছেন। পঞ্চভূতে গঠিত মানুষের দৈহিকতাকে তাই পাঁচ ভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সত্তার নামকরণ করিয়াছেন। এই পঞ্চভূতবেষ্টিত ষষ্ঠ ভূত হইতেছেন আত্মা—আত্মন্—কবি নিজে। কবি নিজে অর্থাৎ কবির নিজস্ব চিন্তার আদর্শটি এই ভূতচক্রের নেমিস্বরূপ।

দফাওয়ারি পাঁচরকম সৃষ্টির ফলাফল বিবৃত করিলে সরস সাহিত্য হয় না। তাহাতে অসুবিধাও আছে। অভ্রান্ত নৈয়ায়িক যুক্তিপরম্পরা বিন্যাসের ক্লেশ স্বীকার করিয়া সংশ্লেষণে পৌছিতে হয়। সংশ্লেষণের পথে এমন জটিল তত্ত্ব বা নূতন সমস্যার আবির্ভাব হইতে পারে যে, একেবারেই আগানো অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। কবি নিজেই বলিয়াছেন—

"এমন সকল বিষয় আছে যাহাতে প্রতি পদে গভীরতার দিকে তলাইয়া যাইতে হয়। কথোপকথনকালে সেইসকল অনিশ্চিত সন্দেহ-তরল বিষয়ে পদার্পণ না করাই ভাল। যে-সব জমি বায়ুসেবী পর্য্যটনকারীদের উপযোগী নহে—কৃবি যাহাদের ব্যবসায় তাহাদের পক্ষেই ভাল।"

অর্থাৎ একটা সিদ্ধান্ত বা সংশ্লেষণে পৌছান দার্শনিকের লক্ষ্য—সাহিত্যিকের সে-লক্ষ্য নহে।

একাধিক বিভিন্ন প্রকৃতির পাত্রপাত্রীর মুখে মৈত্রীময় কথোপকথন, তর্কবিতণ্ডা বা বাদানুবাদচ্ছলে চিন্তাধারাকে বিবৃত করিলে নৈয়ায়িক ক্লেশকে এড়াইয়া সাহিত্য-সৃষ্টির সহায়তায় সত্যের সন্ধান না হউক—ইঙ্গিত ত' দেওয়া যায়।

যে-সকল ধারণা ও চিন্তা মনে বেশ স্পষ্ট রূপ ধরে নাই অথবা জটিল, সংশয়াচ্ছন্ন ও গ্রন্থিল হইয়া আছে, তাহাদের মূল্য-মর্য্যাদা নির্ণীত হইতে পারে বিশ্লেষণে। পাঁচটি চরিত্রের বাদানুবাদে এ বিশ্লেষণ সম্ভব হইয়াছে। অভ্রান্তভাবে কোন চিন্তার মূল্য-মর্য্যাদা নির্ণীত হউক বা না-হউক তাহাতে আসে যায় না—কারণ বিশ্লেষণের আনন্দটাই হয় পরম লাভ।

এ প্রথায় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা নৈয়ায়িকের যে-দায়িত্ব সে-দায়িত্ব আদৌ নাই—একটা অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার প্রয়োজনই নাই। সত্যানুসন্ধানের ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিয়া দিতে পারিলেই ঐ বিশ্লেষণই সাহিত্য-রূপ ধরিবে। পাঁচটি বিভিন্ন প্রকৃতির 'আত্মজের' দ্বারা কবির এই বিশ্লেষণ সম্ভব হইয়াছে।

তাহা ছাড়া, সত্যের আবিষ্কার বা তত্ত্বের চূড়ান্ত মীমাংসাটাই খুব বড় কথা নহে—সত্যের আনন্দ লাভটাই পরম লাভ। এই আনন্দ লাভ করিতে গিয়া যে মানসিক ব্যায়াম হয় তাহাতে মনের স্বাস্থ্য ও বুদ্ধির স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়া যায়—মন সতেজ হইয়া উঠে। পঞ্চভূতের আলোচনার মত বাদানুবাদ সেই সত্যের আনন্দ ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের জন্য।

কবি নিজে বলিয়াছেন—

"গড়ের মাঠে এক ছটাক শস্য জন্মে না। তবুও অতটা জমি অনাবশ্যক নহে। আমাদের পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাঁচজনের গড়ের মাঠ—এখানে সত্যের শস্য লাভ করিতে আসি না—সত্যের আনন্দ লাভ করিতে মিলি।

সেইজন্য এ-সভায় কোন কথার পুরা মীমাংসা না হইলেও ক্ষতি নাই, সত্যের কিয়দংশ পাইলেও আমাদের চলে। এমন-কি, সভাক্ষেত্র গভীর-রূপে কর্ষণ না করিয়া তাহার উপর দিয়া লঘুপদে চলিয়া যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

* * *

রোগের সময় ডাক্তারের ঔষধ উপকারী, কিন্তু আত্মীয়ের সেবাটা বড় আরামের।

পাঞ্চভৌতিক সভায় আমরা যে-ভাবে সত্যালোচনা করিয়া থাকি তাহাকে রোগের চিকিৎসা বলা না যাক্ তাহাকে রোগীর শুশ্রূষা বলা যাইতে পারে।"

Hegel-এর মতে চিন্তাসূত্রের সকল synthesis-ই thesis ও antithesis-এর সমন্বয়ে ঘটে। একই মন thesis ও antithesis দুই-ই যোগায়—দুই-এর মিলনে যে synthesis তাহা যেন তৃতীয় ব্যক্তির কাজ। তিনটি ব্যক্তিত্বকে পৃথক সত্তা দান করিয়া বাদানুবাদচ্ছলে চিন্তাকে সুশৃঙ্খলিত করা সত্যানুসন্ধানের একটা পদ্ধতি। আধমিশ্র নৈয়ায়িক গোষ্ঠীতে রসিকের স্থান নাই। রসদৃষ্টিতেও যে সত্যের সন্ধান মিলে, কবি তাহা স্বীকার করেন। সেজন্য রসদৃষ্টিকেও তিনি চিন্তার গোষ্ঠীর মধ্যে আনিয়াছেন। তাহাতে জ্ঞানদৃষ্টির সহিত রসদৃষ্টিরও thesis-antithesis সম্বন্ধ ঘটিয়া নূতন synthesis-এর প্রয়োজনের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে এক মনই বহুধা বিভক্ত হইয়া বহু ব্যক্তিত্ব রচনা করিতে পারে। কবি এই ভাবে আপনার চিত্তকে ছয়টি ব্যক্তিত্বে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন।

এই প্রথা অবলম্বন না করিলে অর্থাৎ ছয়টি principal-কে ছয়টি জীবনময় ব্যক্তিত্ব কল্পনা না করিলে পঞ্চভূতের কবির বক্তব্য হয়ত সুসনদ্ধ, সুবিন্যস্ত চিন্তাধারার শৃঙ্খলার একটা আদর্শ মাত্র হইত অর্থাৎ হয়ত ইহার একটা epistemological মূল্য থাকিত—literary মূল্য থাকিত না—সত্যের সন্ধান হয়ত পাওয়া যাইত—সন্ধানের আনন্দটুকু পাওয়া যাইত না। চিন্তাগতির ধারাবাহিকতার প্রবন্ধে বিবৃতির মধ্যে কল্পনা-লীলা বা রসসৃষ্টির অবকাশ নাই। বন্ধুগোষ্ঠীর স্বাধীন মধুর উদার আবহাওয়ায় পরস্পরের খোলা প্রাণের কথাবার্তায় তাহা সম্ভব হইয়াছে।

চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোলোকে যে চিন্তাবৈচিত্র্যের নাট্যাভিনয় চলিতেছে, তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ দান করিবার জন্য মনোলোকের চিন্ময় পাত্র-পাত্রীগুলিকেই কবি পঞ্চভূতের রূপ দান করিয়াছেন। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জীবনের রসানুভূতি, অভিজ্ঞতা, প্রাণের উষ্ণতা ও উদ্দীপনা,

তত্ত্বের মনোবিজ্ঞানগত বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অভিনব বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

যে কবিত্ব, আলঙ্কারিকতা, নাটকীয়তা, কৌতুক-রসিকতা প্রবন্ধের যুক্তিপরম্পরায় ক্রমভঙ্গ ঘটাইয়া দূষণস্বরূপ হইত, এ পদ্ধতিতে সেগুলি ভূষণস্বরূপ হইয়াছে।

এ প্রথাও সম্পূর্ণ নূতন নহে। কবির 'গোরা' ও 'ঘরে-বাইরে' নামক গ্রন্থদ্বয়েও এ-পদ্ধতি প্রকারান্তরে আসিয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি পঞ্চভূতের আলোচনায় সত্যোদ্ধারকেই মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই—সত্যসন্ধানের আনন্দ লাভই তাঁহার লক্ষ্য। বাদানুবাদের দ্বারা সত্যের আবিষ্কার হয়ত হয় নাই—কোন তর্কেরই হয়ত চরম সিদ্ধান্তও হয় নাই। কিন্তু কবি নিজে বহু স্থলে রসাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন—সেই রসাবিষ্ট অবস্থায় তিনি নিজের প্রাণের কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। সেইসকল প্রাণের কথায় অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে সত্যের উদ্বোধন হইয়াছে।

কবির প্রাণের কথা আমি তাহাকেই বলিতেছি—যাহা তাঁহার জীবনব্যাপী সারস্বত সাধনার নানা অঙ্গেই নানা ভাবে রূপ লাভ করিয়াছে। এই প্রাণের কথা তাঁহার নিজের বাণীতেই কেবল ব্যক্ত হইয়াছে—পঞ্চভূতের অন্য কোন ভূতের মুখে ব্যক্ত হয় নাই, এমন নহে।

কবি-মনের ভাব ও অনুভূতির বৈচিত্র্যের সীমা নাই। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি যেমন পরস্পর বিসংবাদী—কতকগুলি তেমনি পরস্পর মৈত্রীভাবাপন্ন। যখন কোন বিসংবাদী ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কোন ভূত বিতর্ক করিতেছে—তখন তাহার মধ্যে কবির প্রাণের কথা পাওয়া যাইবে না সত্য—কিন্তু মৈত্রীরসাবিষ্ট ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ভূতের মুখের কথা কবির প্রাণের কথা কিংবা প্রাণের কথার পরিপোষক সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কবির নিজের জবানী—

"বৈষ্ণব ধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে

ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে—তখন এইসমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে।”

এই কথাগুলি কবির প্রাণের কথা—তাঁহার বহু রচনায় এই সত্য ফুটিয়াছে।

ঠিক এই কথারই জের টানিয়া গেলে ব্যোমের নিম্নোদ্ধৃত জবানীতে পৌঁছান যায় :—

“বিলাতী হিসাবের কৃতজ্ঞতা আমাদের দেবতাদের প্রতিও নাই। ইয়ুরোপীয় ভাষায় যখন বলে, ‘থ্যাঙ্ক গড্’ তখন তাহার অর্থ এই, ঈশ্বর যখন মনোযোগপূর্ব্বক আমার একটা উপকার করিয়া দিলেন তখন সে-উপকারটা স্বীকার না করিয়া বর্ব্বরের মত চলিয়া যাইতে পারি না। আমাদের দেবতাকে আমরা কৃতজ্ঞতা দিতে পারি না ; কারণ, কৃতজ্ঞতা দিলে তাঁহাকে অল্প দেওয়া হয়, তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া হয়। তাঁহাকে বলা হয়, তোমার কাজ তুমি করিলে আমার কর্ত্তব্যও আমি সারিয়া গেলাম। বরঞ্চ স্নেহের এক-প্রকার অকৃতজ্ঞতা আছে, কারণ স্নেহের দাবির অন্ত নাই। এই স্নেহের অকৃতজ্ঞতাও স্বাতন্ত্র্যের কৃতজ্ঞতা অপেক্ষা গভীরতর—মধুরতর। রামপ্রসাদের গানে আছে—

> ‘তোমায় মা মা ব’লে আর ডাকিব না—
> আমায় দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।’

এই উদার অকৃতজ্ঞতা কোন ইয়ুরোপীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইতে পারে না।”

ব্যোমের মুখের এই কথাগুলির মধ্যে যে-সত্য নিহিত আছে তাহা প্রসঙ্গক্রমে কবির অন্তরের অন্তঃস্থল হইতেই উদ্বোধিত হইয়াছে। ইহা

mysticism-এর অতি উচ্চস্তরের কথা। এ-সত্য আমাদের দেশের সকল মিষ্টিকই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও ইহা মুখের কথা মাত্র নহে—তাঁহার সারস্বত সাধনায় ইহা নানা ভাবেই রূপ লাভ করিয়াছে।

'কাব্যের তাৎপর্য্য' নামক প্রসঙ্গে কবি কাব্য-বিচার সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছেন—কাব্য-বিচার সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা পরম সত্য আর কি আছে?

"কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়, তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহবা সৌন্দর্য্য, কেহবা নীতি, কেহবা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতসবাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া। কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতসবাজি। আগুন ধরিবামাত্র কেহবা হাউয়ের মত একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহবা তুবড়ির মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কেহবা বোমার মত আওয়াজ করিতে থাকে।

* * * *

অনেকে বলেন, আঁটিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাঁহার আঁটি ফেলিয়া দেন। তেমনি কাব্যের মধ্যে যদি বা কোন বিশেষ শিক্ষা থাকে—তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না।

* * *

আনন্দ কাহাকেও বলপূর্ব্বক দেওয়া যায় না। কুসুম ফুল হইতে কেহবা তাহার রঙ বাহির করে, কেহবা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে, কেহবা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহবা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহবা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহবা নীতি, কেহবা বিষয়জ্ঞান উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন—আবার কেহবা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারিবেন না। যিনি যাহা

পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন—কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না—বিরোধে ফলও নাই।”

এইভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে—কোন তর্কেরই চরম মীমাংসা হয়ত ইহাতে হয় নাই—কিন্তু সাহিত্যের মাধুর্য্য আস্বাদ করিতে গিয়া আমরা পাঞ্চভৌতিক আলোচনায় বহু সত্যেরই আনন্দময় আভাস লাভ করিয়াছি।

রবীন্দ্র-কাব্যে বৈচিত্র্য

রবীন্দ্র-কাব্যের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের কথা বলিতে গিয়া স্বর্গীয় অজিত-কুমার চক্রবর্ত্তী তাঁর "কাব্যপরিক্রমা"র মধ্যে একস্থলে লিখিয়াছেন—"জীবনের সকল রস, সকল অভিজ্ঞতার এমন অবাধ, এমন আশ্চর্য্য প্রকাশ জগতের অল্প কবির মধ্যে দেখা গিয়াছে।"—একথা খুবই সত্য, এবং আমাদের মনে হয়—অজিতবাবু যদি "জগতের অল্প কবির মধ্যেই দেখা গিয়াছে" স্থলে বলিতেন—"জগতের কোন কবির মধ্যেই বোধ হয় দেখা যায় নাই" তাহা হইলেও হয়ত বাড়াইয়া বলা হইত না। বাস্তবিকই পৃথিবীর আর কোন কবির কাব্যে বোধ হয় এত অসংখ্য বিচিত্র সুরের সমাবেশ দেখা যায় নাই। অতিবড় হাল্কা প্রণয়-সঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া অতিবড় সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ও ভাগবত কবিতা সমান নিপুণতা এবং সমান আন্তরিকতার সহিত পৃথিবীর আর কোন দেশে, কোন যুগে, কোন কবির দ্বারা রচিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

এমন ধারাটা কেমন করিয়া সম্ভব হইল?—ইহার মূলে কবিচিত্তের কোন্ বিশেষ বৃত্তি কাজ করিতেছে? আমার মনে হয়, রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে এই যে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য, ইহার মূলে রহিয়াছে কবির অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক চিন্তাশীলতা।

আমাদের মনের মধ্যে গোটাকতক বাঁধা-ধরা অনুভূতি স্বভাবতঃ আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। এইসকল স্বাভাবিক অনুভূতির মূলে কবিচিত্তের গভীর আন্তরিকতা থাকিলে এইসকল অনুভূতিজাত কবিতায় অনায়াসে প্রথম শ্রেণীর রসসৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে।—সেদিক হইতে কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এইসকল স্বাভাবিক গোনাগুন্তি অনুভূতিকে সম্বল করিয়া কোন কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত এত বিচিত্র, এত বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য সুরের আমদানি করিতে পারেন নাই।

অনুভূতি জিনিষটি স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তনসহিষ্ণু নয়। একটি বিশেষ অনুভূতি মনের মধ্যে একবার জাগিয়া উঠিলে তাহা সহজে ছাড়িয়া যাইতে চায় না। তাই অনুভূতি জিনিষটি যে-সকল কবির একমাত্র সম্বল তাঁহাদের কবিতায় গভীরতা বা আন্তরিকতা অনায়াসেই থাকিতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব নয়। অনুভূতি জিনিষটি আগাইয়া যাইতে জানে না—জানে নিজের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্ত সৃষ্টি করিতে।

এমনি করিয়া এক-একটি অনুভূতি নিজের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিন্ন ভিন্ন আবর্ত্ত সৃষ্টি করিতে থাকে। সুতরাং কেহ কাহারও সহিত মিলিত হইতে পারে না। এই যে এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি নিজের নিজের এলাকার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবর্ত্ত সৃষ্টি করিতেছে—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কি এমন কোন গোপন পথ নাই যাহাকে অবলম্বন করিয়া এক অনুভূতি হইতে অন্য অনুভূতিতে, নির্দ্দিষ্ট একটি অনুভূতি হইতে অসংখ্য বিচিত্র সূক্ষ্ম অনুভূতিতে গিয়া পৌছিতে পারা যায়? এরূপ কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে। এই উপায়টি আর কিছুই নয়—কবির চিন্তাসূত্র। এই যে এক অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়া, ইহার মূলে কবির মনের সূক্ষ্ম চিন্তাধারা অলক্ষ্যে কাজ করিয়া চলিতে থাকে। এক অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির আর-একটি বিচিত্র অনুভূতিতে পৌছিবার মাঝখানের যে-পথ—তাহা চিন্তার পথ। এই পথ যাঁহার কাছে রুদ্ধ, তাঁহার কবিতায় খুব বেশী বৈচিত্র্য আশা করা যাইতে পারে না।

অনেকে হয়ত বলিবেন—একই অনুভূতির মধ্যেই যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। শুধু নর-নারীর প্রেমের কবিতার মধ্যেই বৈচিত্র্য-সৃষ্টি যথেষ্ট করা যাইতে পারে—এবং সেদিক হইতে জগতের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব কোথায়? একথার উত্তরে আমি বলিতে চাই—এ শ্রেণীর বৈচিত্র্যের কথা আমি বলিতেছি না। আমি যে-অর্থে "বৈচিত্র্য" কথাটি এখানে ব্যবহার করিতে চাই—সেদিক হইতে নরনারীর প্রেমানুভূতিতে তাহার অন্তর্গত বিভিন্ন বিচিত্র সুরসমেত একটি মাত্র অনুভূতি হিসাবে ধরিতে হইবে। এবং ইহা হইতে অন্যশ্রেণীর অনুভূতিতে

যাইতে হইলে বিরহ, মিলন, মান, অভিমান প্রভৃতি সমশ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন অবস্থাভেদের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আবর্ত্ত সৃষ্টি করিলে চলিবে না— যাইতে হইবে সম্পূর্ণ ভিন্নশ্রেণীর অনুভূতিতে। এই দিক হইতে বৈচিত্র্য খুঁজিলে পৃথিবীর খুব অল্প কবির মধ্যেই রীতিমত বৈচিত্র্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

এখন পর্য্যন্ত আমরা তাহা হইলে দেখিলাম—অন্তর্নিহিত চিন্তাশীলতা না থাকিলে কোন কবির অনুভূতি বিচিত্র সুরে বাজিয়া উঠিতে পারে না। অনেকে হয়ত বলিবেন—রবীন্দ্রনাথ ছাড়া জগতে আর কোনও কবির মধ্যে কি চিন্তাশীলতা ছিল না? তাহার উত্তরে আমি বলিতে চাই—নিশ্চয়ই ছিল। প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে এইসকল চিন্তাশীল কবিদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মত অত বৈচিত্র্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে—পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর চিন্তাশীল কবি দেখিতে পাওয়া যায়। একশ্রেণীর চিন্তাশীল কবি আছেন যাঁহারা চিন্তা এবং বিচারের দ্বারা জীবনের অনেক প্রশ্নের এবং সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সত্যে আসিয়া পৌছিয়া তাহার পর সেই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কবিতা লিখিতে বসেন। এই শ্রেণীর চিন্তাশীল কবিরা কবিতা লিখিবার পূর্ব্বে যতদিক দিয়া যত বিচিত্র ভাবেই চিন্তা করুন না কেন, কবিতা লিখিবার সময় ইঁহারা যে-অনুভূতিকে আশ্রয় করেন তাহা একাধিক বিভিন্ন চিন্তাপ্রসূত একই সত্য। সুতরাং এই সত্য যখন কবির মনের মধ্যে অনুভূতি হইয়া জাগিয়া উঠে তখন তাহা একটি অখণ্ড নির্দ্দিষ্ট অনুভূতি। কাজেই এইসকল চিন্তাশীল কবি যখন অনুভূতিতে আসিয়া পৌছান তখন তাহার মধ্যে বিচিত্র সুরের সন্ধান পাওয়া যায় না। চিন্তা যত বিচিত্রই হউক না কেন—এইসকল বিচিত্র বিভিন্ন চিন্তাপদ্ধতি পরস্পরের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা যে-অনুভূতিটিকে সৃষ্টি করে, তাহা একটিমাত্র অখণ্ড অনুভূতি। কিন্তু বৈচিত্র্য ত' অনুভূতিতে নয়—বৈচিত্র্য এক অনুভূতি হইতে অপর অনুভূতিতে যাতায়াতের পথের মধ্যে। এই যে এক অনুভূতি হইতে বিভিন্ন অনুভূতিতে যাতায়াতের পথ, ইহা চিন্তার পথ। সুতরাং অনুভূতির সহিত যাহাদের চিন্তা

জড়িত হইয়া না যায় তাঁহাদের অনুভূতির মধ্যে বৈচিত্র্য খুব বেশি পাওয়া যায় না। চিন্তাশীলতা এবং অনুভূতি পৃথক হইয়া থাকিলে চলে না—একটির সহিত অপরটি ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া থাকা চাই।

যে-শ্রেণীর চিন্তাশীল কবিদের কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম, তাঁহাদের চিন্তা যেখানে শেষ হয় সেইখানে অনুভূতির আরম্ভ এবং এই অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই ইঁহাদের কবিতা গড়িয়া উঠে। সুতরাং ইঁহাদের কবিতার মধ্যে অনুভূতি একাই কাজ করিতে থাকে—চিন্তার সহিত এই অনুভূতির কোন সম্পর্ক থাকে না। ফলে, ইঁহাদের কবিতায় অনুভূতি বা আন্তরিকতা যথেষ্ট থাকিতে পারে; কিন্তু বৈচিত্র্য খুব বেশি থাকিতে পারে না।

কিন্তু এছাড়া আর-এক শ্রেণীর চিন্তাশীল কবি আছেন যাঁহাদের চিন্তার পালা কবিতা লেখার বাহিরেই চুকিয়া যায় না—কবিতার ভিতর হইতেও নূতন করিয়া উদ্ভূত হইয়া উঠে। প্রথমোক্ত চিন্তাশীল কবিদের চিন্তাধারা আসে কবিতার বাহির হইতে,—তাই ইঁহাদের কবিতার মধ্যে চিন্তার গতিবেগ নাই। শেষোক্ত কবিদের চিন্তা উদ্ভূত হয় কবিতার বুকের ভিতর হইতে। তাই চিন্তার গতিবেগে এই শ্রেণীর কবিদের কবিতাকে কোনদিন একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেয় না—ক্রমাগত সুমুখের পানে আগাইয়া লইয়া চলে। রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবি। তাঁহার কবিতার মধ্যে চিন্তা এবং অনুভূতি একই সঙ্গে কাজ করিতে থাকে। আমরা দেখিতে পাই, যে-সকল কবির মধ্যে চিন্তাশীলতা খুব বেশী, তাঁহাদের কবিতার মধ্যে অনুভূতির দিকটি তেমন আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। পৃথিবীর অধিকাংশ কবির পক্ষেই এই সত্য খাটিয়া যায়। এবং এইজন্যই আমাদের মধ্যে এই ধারণাটি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, চিন্তাশীলতা কবিত্বের পরিপন্থী। কথাটা আদবেই সত্য নয়। চিন্তাশীলতা কবিত্বের পরিপন্থী তখনই যখন চিন্তা এবং কবিত্ব পৃথক পৃথক ভাবে কবির মনের মধ্যে যাওয়া-আসা করে। কিন্তু কবিত্ব এবং চিন্তা যখন একাকার হইয়া গিয়া একটি অখণ্ড সুরে বাজিয়া উঠে, তখন একটি অপরটিকে বাধা দেয় না—বরং একটি অপরটিকে হাত ধরিয়া

চালাইয়া লইয়া যায়। কবিত্ব বা অনুভূতি সৃষ্টি করে গভীরতা, চিন্তা তাহাতে যোগ করিয়া দেয় সচলতা। গভীরতার মধ্যে মহিমা আছে, কিন্তু বৈচিত্র্য নাই। সচলতা তাহাতে বৈচিত্র্য বলিয়া জিনিষটি যোগ করিয়া দেয়। একস্থানে দাঁড়াইয়া একটি জিনিষ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারে না। কূপ যত ইচ্ছা গভীর হইতে পারে, কিন্তু নদীর মত বৈচিত্র্য সৃষ্টি তাহার দ্বারা অসম্ভব। বৈচিত্র্যের মূলে আছে পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্ত্তনের মূলে আছে সচলতা। তাই যেখানে সচলতা নাই, সেখানে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে না। এই হিসাবে যে-কবির কবিতা যত সচল সেই কবির কবিতায় বৈচিত্র্য তত বেশী।

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সচলতা যতটা পাওয়া যায়—এতটা বোধ হয় পৃথিবীর আর-কোনও কবির কবিতায় পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্নিহিত এই সচলতাই তাঁহার কবিতাবলীকে এত বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। "সন্ধ্যাসঙ্গীত" হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যত-কিছু কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে যে একটি ক্রম-পরিণতির অশ্রান্ত ধারা নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে, ইহার মূলে অলক্ষ্যে কাজ করিতেছে চিন্তার একটি অদৃশ্য গতিবেগ। অনুভূতি জিনিষটি নিজে হইতে চলিতে জানে না—তাহা কেবল একস্থানে দাঁড়াইয়া আবর্ত্ত সৃষ্টি করিতে পারে। তাহাকে চালাইয়া লইবার জন্য চিন্তার গতিবেগের প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক রসানুভূতির অন্তরালে একটি অন্তর্নিহিত গতিবেগ চিরদিনই কাজ করিয়া আসিয়াছে, এবং চিন্তার এই প্রচ্ছন্ন গতিবেগই তাঁর সারস্বত অনুভূতিকে চিরদিনই বিচিত্র ভাবে নানান দিকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছে,—একস্থানে দাঁড়াইয়া আবর্ত্ত সৃষ্টি করিতে দেয় নাই।

তাই রবীন্দ্রনাথের খণ্ড খণ্ড অসংখ্য কবিতা আলাদা আলাদা করিয়া পড়িলে তাহাদের বিচিত্র সুর যেমন একদিকে আমাদিগকে মুগ্ধ করে, তেমনি আবার তাঁহার কবিতাবলী শ্রেণী অনুযায়ী পর পর সাজাইয়া পড়িয়া গেলে একটি অখণ্ড ক্রমবিকাশের মহিমা আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা যদি বাহির হইতে আসিত, তাহা হইলে বিভিন্ন-চিন্তা-প্রসূত অসংখ্য বিচ্ছিন্ন অনুভূতির মূর্ত্তি আমরা তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে পাইতাম। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার চিন্তা কবিতার বাহির হইতে আসে নাই—কবিতার ভিতর হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এক কথায়, রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ মনোবৃত্তি হইতে তাঁহার অনুভূতিগুলি জন্মিয়াছে সেই একই মনোবৃত্তি হইতেই তাঁর চিন্তাশীলতার জন্ম। তাই সহোদর ভায়ের মত একটি অপরটির হাত ধরিয়া ঠিক পথেই চালাইয়া লইয়া গিয়াছে।—তাই চিন্তা এবং অনুভূতির এমন অপূর্ব্বসমাবেশ বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। তাই এত বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোন কবির কাব্যে আছে কি-না সন্দেহ।

প্রশস্তি

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

নহ রাজা, নহ যোদ্ধা, পাণ্ডিত্যের ত্রিপুণ্ড্র-লাঞ্ছন
শুভ্র ভালে করনা ধারণ।
কবি—শুধু কবি তুমি, একাধারে তাই তুমি সব,—
রাজ-অধিরাজ, শৌরী, সুধীদর্পহরণ কেশব ;
তাই তুমি বনমালী,—নিখিলের শ্রেষ্ঠ ফুলহার
ধর কণ্ঠে। বংশীধারী, বিমোহন মুরলী তোমার
বাজে এ ধরার
রন্ধ্রে রন্ধ্রে নক্ষত্রের কিরণ-স্ফুরণে
ঝরে কলস্বনে।

বাণীর মন্দিরে যবে আরতির ভার নিলে তুমি
ধন্য হ'ল তব জন্মভূমি।
পঞ্চপ্রদীপের মুখে কম্প্রশিখা-মুখর কিরণে
কি রাগিণী বিরচিলে সুর-ঘন আলোক-রণনে!
ইন্দ্রিয়ের তারে তারে তুলেছিলে অতীন্দ্রিয় সুর—
এ বাংলার মাটি জল নভস্তল হ'ল সুমধুর,
দশদিগবধূর
পুষ্পাঞ্জলি পেলে তুমি শিরে আপনার
সঙ্গীতে উদার।

বাণীর শৃঙ্খল খুলি' সীমা হ'তে সীমাতীতে তারে
নিলে তুমি সুর-উৎস-ধারে।
আবার আনিলে তুমি সীমানার মাঝে অসীমেরে
তোমার বিশাল-বাহু-বলয়িত বন্ধনীর ঘেরে ;

অঙ্গপারে দিলে দেহ ভুবনমোহিনী উর্ব্বশীর,
রূপসীর তনুলতা পীবরতা হ'ল উষসীর
কুঙ্কুম আবীর,
বাষ্পীভূতা মেঘজালে কিরণ-শোণিমা
আলোক-কণিমা।

বসন্তেরে চিরবন্দী করেছিলে মালঞ্চে তোমার,
তাই তব কুসুম-সম্ভার
ফুরাল না—ফুরাবে না, পুষ্পরাজি রবে চিরদিন
গন্ধমধুপেলবতা সুষমায় অম্লান নবীন।
শাশ্বত যৌবন তব অক্ষুণ্ণ রহিবে আমরণ,
তরুণ তরুণীদল যুগে যুগে করিবে বরণ,
হে জরা-হরণ,
তোমার যৌবন-শ্রীরে, শুভ্র কেশভার
দিব্য কান্তি যার।

চিরসুন্দরেরে তুমি বর্ণে সুরে বাণী-ব্যঞ্জনায়
ফুটায়েছ কি মধুরিমায়।
বৈদর্ভী কবিতা-লক্ষ্মী কণ্ঠে তব দিল বরমালা,
তুমি দিলে গলে তার ত্রিদিবের সুধাগন্ধঢালা
তোমার নন্দন-পুষ্পে বিরচিত মধুক-মালিকা।
এনেছিলে কবিতারে অভিসারে, হ'ল সে বনিতা,
আঁধার বাসর দীপান্বিতা,
করিল সে বধূ-হস্তে জ্বালি' গৃহ-দীপ,
সন্ধ্যা-ভালে টিপ।

নটরাজ, নৃত্যে নৃত্যে দোলে তব আনন্দ-হিন্দোলা,
আপন তাণ্ডবে বিশ্ব-ভোলা।

তোমার নর্ত্তন-ঘূর্ণী আনে প্রাণে দখিণা বাতাসে,
যত ঝরা মরা পাতা ভাসে শূন্যে অধীর উল্লাসে,
পল্লবে পল্লবে তোলে কিশলয় শিহর-হিল্লোল,
বেপথুলা তটিনীর বক্ষে জাগে কলকলরোল।
চাহনি বিলোল
ফোটে নবমঞ্জরীর পুষ্পিত হরষে,
স্পন্দন-রভসে।

তোমার গঙ্গোত্রী হ'তে পুণ্যতোয়া নব ভাগীরথী
ঝরিয়াছে, হে যুগ-সারথি!
শবাস্থি-পঞ্জর-স্তূপে আনিয়াছ জীবন-স্পন্দন,
নিদ্রাতন্দ্রাভয়াতুর মেলিয়াছে আলোকে নয়ন।
ভগ্ন দেবালয়ে আসি', হে ঋত্বিক্, দেশ-মাতৃকার
পূজার বোধন-মন্ত্র উচ্চারিলে সঙ্গীতে উদার;
প্রকোষ্ঠে সবার
দিলে বাঁধি' মৈত্রী-ডোর, সে রাখী-বন্ধন
আজি কি স্বপন?

হে উদ্গাতা, মন্ত্রদ্রষ্টা, একতন্ত্রী তব বাঁধি' নিলে
ঐক্যমন্ত্রে, শোনালে নিখিলে
বিশ্বমানবের গীতি তোমার উদাত্ত মধুরবে,
সুর-সেতু দিলে বাঁধি' গানে গানে পশ্চিমে পূরবে।
ফিরিয়াছ দেশে দেশে গাহি' গান, ওগো দরবেশ,
গৈরিক হয়েছে আজি জ্যোতির্বাস, শুভ্র হ'ল কেশ
তবুও অশেষ
প্রেমিক বৈরাগী-কণ্ঠে বৈষ্ণবের গান
মোহি' বিশ্বপ্রাণ।

হে প্রশান্ত, বিদ্বেষেরে বহিষ্কৃত করেছিলে তুমি ;
যে ভারত তব মাতৃভূমি,
সবাকার পদরজে পূত যার মাটি জলধারা,
হেরিলে বিহ্বল নেত্রে সে স্বদেশ হ'ল যে সাহারা
বিচ্ছেদের দাবানলে। সেথা আসি' দাঁড়াইলে, নবি !
সবারে দেখালে বিশ্বভারতীর স্বপ্নলব্ধ ছবি।
ত্রিকালজ্ঞ কবি,
ভবিষ্যের কোষ্ঠিপত্র লিখিলে গগনে
যুগসন্ধিক্ষণে।

তোমার উদার বাণী আরবার শোনাও সবারে,
উদ্বোধিয়া আত্মপ্রচেষ্টারে।
দাও কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা তরুণের নিশ্চেষ্ট উদ্যমে,
শক্তির অমৃতখনি আছে গুপ্ত যে আত্ম-সংযমে ;
অপ্রমত্ত অমৎসর যে-সাধনা হিংসা নাহি জানে,
সে দুশ্চর তপস্যার উদ্বোধন আনো তব গানে
আজি এ শ্মশানে।
হে চিরনবীন-বৃদ্ধ, তোমার ফাল্গুনে
ফুটাও তরুণে।

মোরা মাতিয়াছি আজি, হে কবি, তোমার জন্মোৎসবে ;
কবে তুমি এসেছিলে ভবে,
সে শুভ দিবস আজি স্মরি' মোরা ভকতি-বিহ্বল।
হে সবিতা, আবিঃপুঞ্জে দীপ্তিমান উদয়-অচল
হয়েছিল কি আলোকে, নরজন্ম লভি' এ ধরায়
এসেছিলে যে লগনে, সে পুণ্যাহে, সে মধু-উষায়
স্মরি গরিমায়।

ভুলে যাই সে তোমার নহে জন্মতিথি,
ধরার অতিথি !

আত্মজন্মা, লভেছিলে যে-জনম কোন্ পুণ্যক্ষণে
ছন্দসুর-মন্দ্রিত স্বপনে,
সেই সৌরকরোজ্জ্বল মাহেন্দ্র-মুহূর্ত্ত দীর্ণ করি'
শুভ্র শতদলখানি ফুটিয়া উঠিল থরথরি',
সে কমল-কর্ণিকায় বীণাপাণি পাতিয়া আসন
তুলিলেন বক্ষে তব স্বর্ণবীণে অমৃত-রণন,
প্রাণের স্পন্দন ;
সেই তব জন্মদিন তোমার ভুবনে
মঙ্গল-লগনে।

তারপরে পলে পলে আপনার তপস্যার বলে
জন্মিয়াছ প্রাণের অতলে।
কাল-সিন্ধু-তরঙ্গের উদ্বেলিত হিল্লোলে হিল্লোলে
কিরণের হিন্দোলায় তোমার জীবন-মালা দোলে।
সেই সান্দ্র-হরষণ-বিস্ফুরিত লহমা গাঁথিয়া
আলোকের অক্ষমালা রচিয়াছে আঁধার মথিয়া
তব দীপ্ত হিয়া।
নিজ রচনার মাঝে আনন্দে সহজ
তুমি অনন্তজ।

তোমার হৃদয়-স্পন্দ আন্দোলিত বলয়-হিল্লোলে
তরঙ্গে তরঙ্গে যেন দোলে
তব নবজন্মদোলা প্রতি ভক্ত হৃদয়-দেউলে ;
ভাস্বর কনকদীপ্তি পুষ্পে পত্রে শিশিরের দুলে

করে যথা ঝলমল অযুত তপন-কণিমায়,
তেমনি লভেছ তুমি অগণিত আত্মায় আত্মায়
অতনু কায়ায়।
জন্মপরম্পরা তব বিশ্বজন মাঝে
বন্ধ হবে না যে!

অস্তাচল-চূড়ালম্বী নিখিল-বরেণ্য সন্ধ্যা-রবি!
তোমার উদয়াচলচ্ছবি
হেরি মোরা স্বপ্ন-নেত্রে। এলে তুমি আমাদের ঘরে,
তোমার সোনার রথ ভাসে চক্ষে সুনীল অম্বরে;
বিধাতার হাত ধরি' এলে নামি' এ দরিদ্র দেশে,
অনন্ত যাত্রার পথে ধরণীর দীর্ঘ যাত্রাশেষে
অস্তাচলে এসে
উত্তরিলে শ্রমশ্রান্ত মন্থর চরণে
গোধূলি-লগনে।

হে কবি, অলোক-পন্থী, রহস্যের কোন্ অন্ধকারে
চলিয়াছ আজি অভিসারে?
কার গলে দিবে মালা? কাহারে শোনাবে তব গান?
ধরণীর পান্থ-বাসে যে-সুরে মোহিলে বিশ্বপ্রাণ
সে-গানে কি মোহিনীরে বাঁধিতে পারিবে বাহুপাশে?
তুমি গানে গানে যারে ডেকেছিলে তিমির-আবাসে
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে,
আলোক-কুলায় মাঝে পাবে কি তাহারে
বৈতরণী-পারে?

রবীন্দ্রনাথ ও রাজনীতি

—শ্রীকুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী

কাব্যক্ষেত্রে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দান বিশ্ববাসী সানন্দে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সমাজতত্ত্বে ও রাজনীতিক্ষেত্রে এই জগদ্বরেণ্য কবির দানও সামান্য নহে। সমাজ ও রাজনীতি কতকাংশে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু আমরা একথা যেন কোনদিনই লক্ষ্যের বিষয় বলিয়াই মনে করি নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "আমরা ঠিক করিয়াছি, সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মুখে চলিব, কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব, আমাদের পা যে-দিকে আমাদের ডানা ঠিক উল্টা দিকে গজাইবে।" সমাজের এই গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ যখনই কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তখনই সে-সম্বন্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বর্ত্তমান শতাব্দীতে আমাদের দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁহারা চিন্তা ও কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার একটা বিশেষ ধারা আছে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় হিন্দুজাতির ধর্ম্মের গৌরব প্রচার করিয়া বক্তৃতা দেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঐ সভায় একদিন সভাপতি ছিলেন। ব্রাহ্ম প্রতাপচন্দ্র হিন্দু বিবেকানন্দের উপরে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ব্রাহ্মযুগের এই প্রতিনিধি, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতির দোষ পাশ্চাত্য জগতের নিকট, হয়ত বা সংস্কার উদ্দেশ্যে, বিবৃত করিয়াছিলেন। অন্যদিকে স্বাজাত্যাভিমানী হিন্দু-প্রতিনিধি বিবেকানন্দ হিন্দুজাতির গুণ-গরিমা দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "মনে পড়িতেছে, কিছুদিন হইল ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের এক পত্রের উত্তরে লণ্ডনের 'স্পেক্টেটর' পত্র বলিয়াছিলেন, নব্য বাঙ্গালীদের অনেকগুলা

ভাল লক্ষণ আছে, কিন্তু একটা দোষ দেখিতেছি, সিম্প্যাথি-লালসাটা তাহাদের বড় বেশি হইয়াছে।”

প্রতাপচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালায় একজন স্মরণীয় শক্তিশালী পুরুষ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে সাধারণের সম্মানভাজন এক সম্প্রদায় লোকের আদর্শ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মতে, “যে-সমস্ত আচার-ব্যবহার এবং দৃশ্য চিরাভ্যাসক্রমে ইংরাজের সহজে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, সেইগুলি দেশে প্রবর্ত্তন করা দেশের পক্ষে হিতজনক। বসন-ভূষণ, ভাবভঙ্গী, এমন-কি, ভাষাটা পর্য্যন্ত ইংরাজী হইয়া গেলে দুই জাতির মধ্যে মিলন-সাধনের একটি প্রধান অন্তরায় চলিয়া যায় এবং আমাদের আত্ম-সম্মান রক্ষার একটি সহজ উপায় অবলম্বন করা হয়।” প্রতাপচন্দ্র ছিলেন এই আদর্শবাদী এবং এই আদর্শবাদের জন্যই তাঁহাকে বিবেকানন্দের বিরোধী হইতে হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “বিবেকানন্দ পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। * * * * তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।”—কিন্তু বসন-ভূষণ, ভাবভঙ্গীতে ইংরাজের নকলের পক্ষপাতী বিবেকানন্দ আদৌ ছিলেন না। প্রতাপচন্দ্র ও বিবেকানন্দ দু-জনেই ছিলেন সংস্কারক। কিন্তু সংস্কারকের আদর্শ ও উপায়ে হিন্দুজাতির স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতীয় অভিমান বিবেকানন্দে এত প্রচুর, প্রখর ও প্রচণ্ড ছিল যে, তাহার তুলনা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতাপচন্দ্রের যুগে বা প্রতাপচন্দ্রের চরিত্রে ছিল না। যখন এমনি একটা পরিবর্ত্তন বাঙ্গালাদেশে ঘটিয়া উঠিতেছিল এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো ধর্ম্মসভায় এই পরিবর্ত্তন বিবেকা-নন্দকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই—১৩০০ সালে—রবীন্দ্রনাথ “ইংরাজ ও ভারতবাসী” প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতীয় রাজনীতির গভীর আলোচনার সূত্রপাত হয়; এবং এই

সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার একটা বিশেষ ধারা লক্ষ্য, অনুভব ও গবেষণা করিবার বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক গবেষণা এই দীর্ঘ বর্ষগুলির মধ্যে সাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেও তাহার মধ্যে এমন অনেক সিদ্ধান্ত আছে, যাহা প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ও মৌলিক; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচায়ক; এবং তৃতীয়তঃ, যাহার গুরুত্ব আজও সম্যক্-রূপে উপলব্ধি করা যায়। ভারতবাসীর স্বাজাত্যাভিমান ও স্বাতন্ত্র্যবোধ হইতেই রবীন্দ্রনাথের গত চল্লিশ বৎসর ব্যাপী রাজনীতি-চিন্তার উদ্ভব। অতি সংক্ষেপে তাহার কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

১। রাষ্ট্রনীতি—আমলাতন্ত্র

ভারতবর্ষে ইংরাজ-আমলাতন্ত্র যে-নীতি অবলম্বন করিয়া এই বিস্তীর্ণ দেশকে শাসন করিতেছে, সেই আমলাতন্ত্রের স্বরূপ এবং রাজ্যশাসনের নীতিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় বহুক্ষেত্রে যে-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেমন বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অনুপম সম্পদ তেমনি রাজনীতিক্ষেত্রে এক অতুলনীয় মৌলিক গবেষণা।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, এই আমলাতন্ত্রের সহিত ভারতবাসীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কোন সম্পর্কই নাই। কেবল বিদেশী বলিয়া নহে, এই আমলাতন্ত্র সর্ব্বতোভাবে ভারতবাসীর স্বাভাবিক ও সামাজিক জীবন হইতে নিজেকে দূরে রক্ষা করিয়া চলে। তিনি লিখিয়াছেন, "আজকাল সাহেব তিনটি মাসের ছুটী পাইলেই তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডে পালাইয়া গিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত ধূলা ধৌত করিয়া আসেন এবং ভারতবর্ষেও তাঁহাদের আত্মীয়সমাজ ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে; এইজন্য যে-দেশ তাঁহারা জয় করিয়াছেন, সে-দেশে থাকিয়াও যথাসম্ভব না-থাকা এবং যে-জাতিকে শাসন করিতেছেন, সে-জাতিকে ভাল না বাসিয়াও কাজ করা সুসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সহস্র ক্রোশ দূর হইতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া একটি সম্পূর্ণ বিদেশী রাজা নিতান্ত আপিসের কাজের ন্যায় দিনের বেলায় শাসন

করিয়া সন্ধ্যাবেলায় পুনশ্চ সমুদ্রে খেয়া দিয়া বাড়ী গিয়া তপ্তভাত খাওয়া ইতিহাসে আর এমন দৃষ্টান্ত কোথায় আছে?"

(ক) সমাজস্বাতন্ত্র্য।—

এখানকার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ আমলাতন্ত্রকে ভারতীয়দিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার অন্যতম কারণ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমাদের রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ ইংরাজের স্বভাবতই অরুচিকর। তাহার উপর আরও এক উপসর্গ আছে।" এই উপসর্গ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ। তিনি লিখিয়াছেন, "যদিও বা কোন ইংরাজ স্বাভাবিক উদারতা ও সহৃদয়তাগুণে বাহ্য বাধা সকল দূর করিয়া আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবার পথ পাইতেন এবং আমাদিগকে অন্তরে আহ্বান করিবার জন্য দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতেন, তিনি এখানে আসিবামাত্র ইংরাজ সমাজের জালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। * * * * পুরাতন বিদেশী নূতন বিদেশীকে আমাদের কাছে আসিতে না দিয়া তাঁহাদের দুর্গম সমাজ-দুর্গের মধ্যে কঠিন পাষাণময় স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখেন।"

(খ) নারীশক্তির নিশ্চেষ্টতা।—

আমলাতন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যের আরও একটি গুরুতর কারণের অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন, "স্ত্রীলোক সমাজের শক্তি-স্বরূপ। রমণী চেষ্টা করিলে বিরোধী পক্ষের মিলন সাধন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় সংস্কারের বশ। আমরা সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রমণীগণের স্নায়ুবিকার ও শিরঃপীড়াজনক। সেজন্য তাঁহাদের কি দোষ দিব, সে আমাদের অদৃষ্টের দোষ। বিধাতা আমাদিগকে সর্ব্বাংশেই তাঁহাদের রুচিকর করিয়া গড়েন নাই।"

মুসলমান আমলের স্মৃতিতে হিন্দুর পক্ষে যবনী-গমনের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অন্যদিকে মুসলমান নবাব ও আমীর ওমরাহ স্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই এক বা একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিত ও মুসলমান ধর্ম্মে

দীক্ষিত করিয়া সাম্যবাদী মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইত। এক্ষণে ইংরাজ আমলাতন্ত্র তাহাদের স্বাজাত্যাভিমানের স্বাতন্ত্র্যবোধে এবং আরও অন্য কারণে এরূপ করিতে পারে না; কাজেই মুসলমান আমলাতন্ত্র অপেক্ষা শ্বেতবর্ণের খৃষ্টান আমলাতন্ত্র ভারতবর্ষের মাটীতে শিকড় গাড়িতে পারে নাই। তাহারা নিজেদের শ্বেতবর্ণের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ডোবার জলের উপরে পুঞ্জীভূত পানার মত ভাসিয়া রহিয়াছে।

(গ) আমলাতন্ত্রের সভ্যতাগর্ব্ব।—

আমলাতন্ত্রের আর-একটা স্বভাব এই যে, ইহারা ভারতবর্ষীয়দিগের হইতে নিজদিগকে অনেক বেশী সভ্য মনে করে এবং ঠিক সেইজন্যই ভারতীয়দিগকে যথেষ্ট অসভ্য ও বর্ব্বর মনে করে। তাহারা জানে যে, একটা বর্ব্বর সাম্রাজ্য শাসন ও শোষণ করিবার জন্যই তাহারা সাময়িকভাবে নিযুক্ত ও প্রেরিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ইংলণ্ড উত্তরোত্তর ভারতবর্ষকে তাহাদেরই রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গরুটির মত দেখিতেছেন। গোয়াল পরিষ্কার রাখিতে এবং খোল-বিচালি যোগাইতে কোন আলস্য নাই; এই অস্থাবর সম্পত্তিটি যাহাতে রক্ষা হয়, সেপক্ষে তাঁহাদের যত্ন আছে, যদি কখনও দৌরাত্ম্য করে সেজন্য শিং দুটা ঘসিয়া দিতে ঔদাসীন্য নাই।" আমলাতন্ত্রের এই মতবাদ পোষণে ও পরিবর্দ্ধনে এদেশীয়দিগের মনোভাবও কম সাহায্য করে না। এই বিষয়ে ভারতীয়দিগের নিজেদের দীনতা ও হীনতা সম্বন্ধেও একটা শোচনীয় সংস্কার আছে। এই সংস্কার বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "যদি রাঙা সাহেব হঠাৎ টম্ টম্ থামাইয়া আমারই দরিদ্র কুটীরে পদার্পণ করিয়া বলে, 'বাবু, তোমার কাছে দেশলাই আছে?' তখন ইচ্ছা করে, দেশের পঞ্চবিংশতি কোটি লোক সারি সারি কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া যায় যে, সাহেব আজ আমারই বাড়ীতে দেশলাই চাহিতে আসিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্চবিংশতি কোটি ভারতবাসীর যে-মনোভাব বর্ণনা করিয়াছেন, এক্ষণকার এই উন্নতযুগের পঁয়ত্রিশ কোটি

পনের লক্ষ ভারতবাসীর মনোভাবের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বিচার-সাপেক্ষ।

(ঘ) বহুরাজকতা।—

এই আমলাতন্ত্রকে রবীন্দ্রনাথ বহুরাজকতা আখ্যা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ইংরেজ জাত জানে, ভারতবর্ষ তাহাদের সকলেরই। একটা রাজপরিবার মাত্র নহে, সমস্ত ইংরেজ জাতটা ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। * * * *

হাতীর পিঠে মাহুত বসিয়া তাহাকে মাঝে মাঝে অঙ্কুশ দিয়া মারে, হাতীর পক্ষে তাহা সুখকর নহে। কিন্তু মাহুতের বদলে যদি আর-একটা গোটা হাতীকে সর্ব্বদা বহন করিতে হইত, তবে বাহকটি অঙ্কুশের অভাবকেই আপনার একমাত্র সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিত না। * * * * ইংলণ্ড সমস্ত ইংরাজকে অন্ন দিতে পারে—ভারতবর্ষে তাহাদের জন্য অন্নসত্র খোলা থাকা আবশ্যক। একটি জাতির অন্নের ভার অনেকটা পরিমাণে আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে; সেই অন্ন নানারকম আকারে নানারকম পাত্রে যোগাইতে হইতেছে।"

ইহার পর তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, আজ প্রত্যেক ইংরেজই ভারতবর্ষকে নিজের রাজ্য বলিয়া জানে। এ-রাজ্যে তাহাদের ভোগের খর্ব্বতা ঘটিতে গেলেই তাহারা সকলে মিলিয়া এমনি কলরব তুলিবে যে, তাহাদের স্বদেশীয় কোন আইনকর্ত্তা এ-সম্বন্ধে কোনো বদল করিতে পারিবেই না। ইহা অত্যন্ত সত্য কথা। গত ১২ই মার্চ্চ তারিখে গান্ধী-আরুইন চুক্তির পর লাঙ্কাশায়ারের বণিক-সম্প্রদায়ের ধমকানি শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের গবেষণার মূল্য উপলব্ধি করিতে আদৌ বিলম্ব হয় না।

কিন্তু এই যে ইংরাজ জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিটির অন্নের গ্রাসের ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতে হইতেছে, এই যে দেশের বড় বড় চাকরী ইংরাজের ভাগেই পড়িতেছে, আর আমরা সেদিকে তাকাইয়া নিষ্ফল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছি,—ইহার প্রতিকার কি? রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "আমরা

মনে করিতেছি বিলাতে গিয়া যদি দ্বারে দ্বারে দুঃখ নিবেদন করিয়া ফিরি, তবে একটা সদ্‌গতি হইতে পারে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে, যাহার বিরুদ্ধে নালিশ, আমরা তাহার কাছেই নালিশ করিতে যাইতেছি। * * * * এই আমাদের প্রকাণ্ড বহু সহস্র মুখবিশিষ্ট রাজার মুখের গ্রাসে ভাগ বসাইবার জন্য তাহারই কাছে দরবারে যাওয়া নিষ্ফল। * * * * একটা আস্তজাত নিজের দেশে বাস করিয়া অন্য দেশকে শাসন করিতেছে, ইতিপূর্ব্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই।"

(৬) প্রতিকার।—

তবে কি ইহার কোন প্রতিকার নাই? রবীন্দ্রনাথ ইহার উপায় নির্দ্দেশকল্পে পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, "কংগ্রেসের যদি কোনো সঙ্গত প্রার্থনা থাকে তাহা এই যে, সম্রাট এডোয়ার্ডের পুত্রই হউন, স্বয়ং লর্ড কার্জ্জন বা কিচেনারই হউন, অথবা ইংলিশম্যান-পাওনিয়রের সম্পাদকই হউন, ভালমন্দ বা মাঝারি যে-কোনো একজন ইংরেজ বাছিয়া, পার্লামেণ্ট আমাদের রাজা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া দিন্। একটা দেশ যতই রসাল হউক না, একজন রাজাকেই পালিতে পারে, দেশশুদ্ধ রাজাকে পারে না।"

তিনি আরও দৃঢ়তার সহিত অন্যস্থলে বলিয়াছেন, "হে ভারতের প্রতি বিমুখ ভগবান্, আমি এইসকল ক্ষুদ্র রাজা, অনেক রাজা আর সহিতে পারি না, আমাকে এক রাজা দাও! এমন রাজা দাও যিনি বলিতে পারিবেন—ভারতবর্ষ আমারই রাজ্য; বণিকের নয়, খনিকের নয়, চা-করের নয়, ল্যাঙ্কাশায়রের নয়;—ভারতবর্ষ যাহাকে অন্তরের সহিত বলিতে পারিবে—আমারই রাজা।"

ইংরাজ জাতির ও রাজবংশীয়গণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই যে প্রীতি ইহার কারণ কি? কি জন্য তাঁহার সিভিলিয়ান-সম্প্রদায়ের প্রতি এই বিরাগ? এ-সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"বনিয়াদি রাজাকে রাজকীয় নেশায় টলাইতে পারে না। হঠাৎ-রাজার পক্ষে এই নেশা একেবারে বিষ। ভারতবর্ষে যাঁহারা কর্তৃত্ব করিতে আসেন, তাঁহারা অধিকাংশই এই মদিরায় অভ্যস্ত নহেন। তাঁহাদের স্বদেশ হইতে এদেশে পরিবর্ত্তন বেশি। যাঁহারা কোনোকালেই বিশেষ কেহ নহেন, এখানে তাঁহারা এক মুহূর্ত্তেই হর্ত্তাকর্ত্তা। এমন অবস্থায় নেশার ঝোঁকে এই নূতন-লব্ধ প্রতাপটাকেই তাঁহারা সকলের চেয়ে প্রিয় এবং শ্রেয় জ্ঞান করেন।"

সেদিন মাত্র রবীন্দ্রনাথ H. G. Wells-কেও এই ধরণের কথাই বলিয়াছেন। H. G. Wells উত্তরে রবীন্দ্রনাথকে বলিয়াছেন যে, প্রথম আপনি চান যে, ইংলণ্ডের একজন রাজপুত্রকে ভারতবর্ষের রাজা করিয়া পাঠান হউক। দ্বিতীয়, আপনি চান না যে, কোন ইংরাজ রমণী ভারতবর্ষে যায়।* H. G. Wells যে-ভাবেই কথাটা গ্রহণ করিয়া থাকুন না কেন, আমলাতন্ত্রের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের মত—বিশেষ এই দুই বিষয়ে—বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

**Tagore*—Let them send a prince to India instead of officers. Let him live in luxury and get everything that a Mogul Emperor got—we will stand him feasts, only in return he must leave us to ourselves.

Wells—In the early days of British rule, the Civil Service people were better than their modern counterparts. They went to India with the idea of living there and incidentally serving the country.

Tagore—Unfortunately that attitude is no longer present and now the advent of your womanfolk in India, instead of helping matters, further complicates the situation. This ruling class segregates itself from the life of our country by impassable racial and official walls.

Wells—The woman brings with her a whole social system, which is not only different from the Indian social life but takes pride in this difference and in perpetuating itself with the help of official autocracy . . . . your suggestions are good: one, an English prince for India, and, two, no Englishwoman for India, because the latter will bring Peckham or Surbiton to Benares and Delhi.

—Liberty, March 16, 1931.

"আমরা রাজশক্তিকে নহে—রাজহৃদয়কে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে ও প্রত্যক্ষ রাজাকে আমাদের হৃদয় অর্পণ করিতে চাই।"

(চ) ব্যয়বাহুল্য।—

বিদেশী আমলাতন্ত্রের আর-একটি অসুবিধা এই যে, ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। আমাদের দেশ দরিদ্র। তথাপি আমাদিগকে বাধ্য হইয়া মোটা মাহিনার বিলাতি চাকরের দল আমাদিগকে শাসন করিবার জন্য এদেশেও পুষিতে হয়; এবং চাকুরী অন্তে বিলাতে ফিরিয়া গেলে সেখানেও বিস্তর পেন্‌সন্‌ যোগাইতে হয়। অথচ "দুঃখী মায়ের ঘরে মোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই।"

আবার এমনি ব্যবস্থার বিড়ম্বনা, হোম-চার্জ ভারতীয় রাজনীতিতে অর্থ-নীতি সম্পর্কিত একটি বৃহৎ ব্যাপার আছে। রামমোহন, র‍্যানাডে, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেকে আপত্তি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও ইঁহাদের দলভুক্ত। এই অত্যধিক ব্যয়ের পেষণে আমরা নিয়তই যে কি করিয়া পিষ্ট হইতেছি রবীন্দ্রনাথ সে-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"পঁচিশ কোটি ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই থাক্‌, মোটা-বেতনের ইংরাজ কর্ম্মচারীকে এক্সচেঞ্জের ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। সেইজন্য রাজকোষে যদি টাকার অনটন পড়ে তবে পণ্য-দ্রব্যে মাশুল বসান আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহাতে যদি ল্যাঙ্কাশায়রের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয় তবে তুলার উপর মাশুল বসান যাইতে পারে। তৎপরিবর্ত্তে বরঞ্চ পাব্‌লিক্‌ ওয়ার্কস্‌ কিছু খাট করিয়া এবং দুর্ভিক্ষ ফণ্ড্‌ বাজেয়াপ্ত করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হইবে।"

আমলাতন্ত্রের বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ যেরূপ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহা একটি যন্ত্র মাত্র। ইহাতে মানুষের প্রাণবস্তু বলিয়া কিছু নাই এবং ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের সহিত ইহার শুধু একটা যান্ত্রিক সম্পর্ক আছে মাত্র,—প্রাণের যোগ নাই। জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ হইতে এই শাসন-পদ্ধতির উদ্ভব হয় নাই; সুতরাং জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে ইহার পরিবর্ত্তন

হওয়াও দুরূহ। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, জাতি কেবল নিজের ইচ্ছায় এই আমলাতন্ত্রের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিতেছে না। এমন কি, এই আমলাতন্ত্রের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ণধার, তিনিও সকল সময়ে ইচ্ছানুরূপ কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন না। এই আমলাতন্ত্রের মুখ চাহিয়া বিলাতি পার্লামেণ্টকেও অনেক সময়ে অনেক কার্য্য করিতে হয়, যাহা স্বেচ্ছায় তাহারা না করিলেও পারিতেন। প্রকৃতপক্ষে এই আমলাতন্ত্রই ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষকে শাসন করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে কেবল "শয়তান" বলিয়াই সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি ইহা রীতিমত বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত এই আমলাতন্ত্রের গতি ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে রবীন্দ্রনাথের গবেষণার গুরুত্ব ও নৈপুণ্য সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

২। মোগল সম্রাট ও ইংরাজ রাজ

ভারতীয় রাজনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মুসলমান আমলের শাসনের সহিত ইংরাজ আমলের শাসনের একটা তুলনামূলক বিচার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে রাজা রামমোহন এই তুলনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"বাদশাহের আমলে আমরা উজীর হইয়াছি, সেনাপতি হইয়াছি, দেশ শাসন করিবার ভার পাইয়াছি, এখন যে তাহা আমাদের আশার অতীত হইয়াছে, ইহার কারণ কি?"

রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান, ইহার কারণ এই যে, এক্ষণে ইংলণ্ডাধিপতি তাঁহার স্বজাতীয়দিগের জন্য ঐ সমস্ত উচ্চ পদ একচেটিয়া করিয়া না রাখিলে ভারতে ইংরাজ রাজত্বের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সার্থক হইত না।

দিল্লীর কার্জ্জনী-দরবারের উদ্যোগকালে রবীন্দ্রনাথ মোগল দরবারের অনুকরণে কার্জ্জনী-দরবারকে তুলনা করিয়া ইহাকে নকল, মেকি ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়াছেন। নানা স্থলে, নানা সম্পর্কে, নানা উপায়ে তিনি এই দুই রাজত্বের তুলনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহা হইতেই রবীন্দ্রনাথের মতবাদ পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে—

"আমাদের দেশের একটি ক্ষুদ্র রাজা সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে তাঁহার প্রজাদিগকে বহুসহস্র টাকা খাজনা মাপ দিয়াছেন। আমাদের মনে হইল, ভারতবর্ষের রাজকীয় উৎসব কি ভাবে চালাইতে হয়, ভারত-বর্ষীয় এই রাজাটি তাহা ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষদিগকে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু যাহারা নকল করে, তাহারা আসল শিক্ষাটুকু গ্রহণ করে না; তাহারা বাহ্য আড়ম্বরটাকেই ধরিতে পারে। তপ্ত বালুকা সূর্য্যের মত তাপ দেয়, কিন্তু আলোক দেয় না। সেইজন্য তপ্ত বালুকার তাপকে আমাদের দেশে অসহ্য আতিশয্যের উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করে। আগামী দিল্লী দরবারও সেইরূপ প্রতাপ বিকিরণ করিবে, কিন্তু আশা ও আনন্দ দিবে না। শুদ্ধমাত্র দম্ভ প্রকাশ সম্রাটকেও শোভা পায় না—ঔদার্য্যের দ্বারা, দয়া-দাক্ষিণ্যের দ্বারা দুঃসহ দম্ভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই যথার্থ রাজোচিত। আগামী দরবারে ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত রাজরাজন্য লইয়া বর্ত্তমান বাদ্‌সাহের নায়েবের কাছে নতিস্বীকার করিতে যাইবে, কিন্তু বাদ্‌সাহ তাহাকে কি সম্মান, কি সম্পদ্, কোন্ অধিকার দান করিবেন? কিছুই নহে। ইহাতে যে কেবল ভারতবর্ষের অবনতি স্বীকার তাহা নহে, এইরূপ শূন্য-গর্ভ আকস্মিক দরবারের বিপুল কার্পণ্যে ইংরাজের রাজমহিমা প্রাচ্য-জাতির নিকট খর্ব্ব না হইয়া থাকিতে পারে না।"

"দিল্‌দরাজ মোগল সম্রাট্‌দের আমলে দিল্লীতে দরবার জমিত। আজ সে দিল্ নাই, সে দিল্লী নাই, তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে।"

"মুসলমান সম্রাটের সময় দেশনায়কতা, সেনানায়কতার অধিকার আমরা হারাই নাই;—মুসলমান সম্রাট্ যখন সভাস্থলে সামন্তরাজগণকে পার্শ্বে লইয়া বসিতেন, তখন তাহা শূন্যগর্ভ প্রহসনমাত্র ছিল না। যথার্থ ই রাজারা সম্রাটের সহায় ছিলেন, রক্ষী ছিলেন, সম্মানভাজন ছিলেন। আজ রাজাদের সম্মান মৌখিক, অথচ তাহাদিগকে পশ্চাতে টানিয়া লইয়া দেশে-বিদেশে রাজভক্তির অভিনয় ও আড়ম্বর তখনকার চেয়ে চারগুণ।"

"এখনকার ভারতসাম্রাজ্য আপিসে এবং আইনে চলে—তাহার রং চং নাই, গীতবাদ্য নাই, তাহাতে প্রত্যক্ষ মানুষ নাই। ইংরেজের খেলাধূলা,

নাচগান, আমোদ-প্রমোদ, সমস্ত নিজেদের মধ্যে বদ্ধ—সে আনন্দ-উৎসবের উদ্‌বৃত্ত খুদকুঁড়াও ভারতবর্ষের জনসাধারণের জন্য প্রমোদশালার বাহিরে আসিয়া পড়ে না। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের সম্বন্ধ আপিসের বাঁধা কাজ এবং হিসাবের খাতা সহির সম্বন্ধ। প্রাচ্য সম্রাটের ও নবাবের সঙ্গে আমাদের অন্ন-বস্ত্র, শিল্প-শোভা, আনন্দ-উৎসবের নানা সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদের প্রাসাদে প্রমোদের দীপ জ্বলিলে তাহার আলোক চারিদিকে প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত—তাঁহাদের তোরণদ্বারে যে নহবৎ বসিত, তাহার আনন্দধ্বনি দীনের কুটীরের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত।”

মোগল ও ইংরেজ রাজত্বের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ আমলাতন্ত্রের বিশ্লেষণে যে-কথা বলিয়াছেন তাহাই পরিস্ফুট করিয়াছেন। কথাটা এই,—মোগল শাসনের দিনে শাসকসম্প্রদায় জাতির জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন একটি যন্ত্র মাত্র ছিল না। কিন্তু ইংরাজ আমলে জাতীয় জীবনের সহিত ইহার শুধু একটা যান্ত্রিক সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন সম্পর্কই নাই।

৩। সাম্রাজ্যবাদ

ভারতের রাজনীতির আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন—

“লর্ড কর্জ্জনও * * বলিতেছেন, জাতীয়তার কথা ভুলিয়া এম্পায়ারের স্বার্থকে তোমাদের নিজের স্বার্থ করিয়া তোল।”

বিলাতি Imperialism-কে রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয়তার প্রতিকূল বলিয়া একদিন ভাবিয়াছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

“কোনো শক্তিমানের কানে একথা বলিলে তাহার ভয় পাইবার কারণ নাই; কেন-না, শুধু কথায় সে ভুলিবে না। বস্তুতই তাহার স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় সপ্রমাণ হওয়া চাই।”

“ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। ইংরেজ ক্রমাগতই তাহাদের কানে মন্ত্র আওড়াইতেছে ‘যদেতৎহৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব’, কিন্তু তাহারা শুধু মন্ত্রে ভুলিবার নয়—পণের টাকা গণিয়া দেখিতেছে।

হতভাগ্য আমাদের বেলায় মন্ত্রেরও কোনো প্রয়োজন নাই, পণের কড়ি ত দূরে থাক্।"

রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় এই যে, ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে। জাতীয়তার বেদীতে ইহার প্রতিষ্ঠা। ইংরাজ ভারতের জাতীয়তা-মূলক ঐক্য চাহে না। ভারতকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখিয়াই আত্মসাৎ করা সুবিধা ও সহজ। সুতরাং Imperialism-এর বড় কথার ফাঁকে ভারতের জাতীয় ঐক্য নষ্ট করাই বিলাতি সাম্রাজ্য-বাদের গূঢ় অভিপ্রায়। তিনি বলিয়াছেন—

"আমাদের বেলায় বিচার্য্য এই যে, বিদেশীয়ের সহিত ভেদবুদ্ধি জাতীয়তার পক্ষে আবশ্যক, কিন্তু ইম্পীরিয়ালিজমের পক্ষে প্রতিকূল: অতএব সেই ভেদবুদ্ধির যে-সকল কারণ আছে, সেগুলাকে উৎপাটন করা কর্ত্তব্য।

"কিন্তু সেটা করিতে গেলে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যে একটা ঐক্য জমিয়া উঠিতেছে, সেটাকে কোনোমতে জমিতে না দেওয়াই শ্রেয়। সে যদি খণ্ড খণ্ড, চূর্ণ চূর্ণ অবস্থাতেই থাকে, তবে তাহাকে আত্মসাৎ করা সহজ।

"ভারতবর্ষের মত এত বড় দেশকে এক করিয়া তোলার মধ্যে একটা গৌরব আছে। ইহাকে চেষ্টা করিয়া বিচ্ছিন্ন রাখা ইংরেজের মত অভিমানী জাতির পক্ষে লজ্জার কথা।

"কিন্তু ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ মন্ত্রে এই লজ্জা দূর হয়। ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে এক হইয়া যাওয়াই ভারতবর্ষের পরমার্থ লাভ, তখন সেই মহদুদ্দেশ্যে জাঁতায় পিষিয়া বিশ্লিষ্ট করাই 'হিয়ুম্যানিটি'!"

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন—"ইংরেজের সাম্রাজ্য জগন্নাথজীর মন্দিরে, যেখানে কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা স্ফীত উদর ও পরিপুষ্ট দেহ লইয়া দিব্য হাঁকডাক্ সহকারে পাণ্ডাগিরি করিয়া বেড়াই-তেছে, সেখানে কৃশজীর্ণতনু ভারতবর্ষের কোথাও প্রবেশাধিকার নাই—ঠাকুরের ভোগও তাহার কপালে অল্পই জোটে—কিন্তু যে-দিন বিশ্বজগতের রাজপথে ঠাকুরের অভ্রভেদী রথ বাহির হয়, সেই একটা দিন রথের দড়া ধরিয়া টানিবার জন্য ভারতবর্ষের ডাক পড়ে।"

রবীন্দ্রনাথের মতে, ভারতের জাতীয়তা ও বিলাতের সাম্রাজ্যবাদ পরস্পর বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক-দিগকে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। আজকাল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যায় যে, তিনি জাতীয়তার বিরোধী না হইলেও অতি মাত্রায় বিভিন্ন জাতির সম্মিলনের পক্ষপাতী। পৃথিবীর বিখণ্ড এবং বিচ্ছিন্ন জাতি-সকল যে-সমস্ত জাতীয় স্বার্থের জন্য পৃথিবীর সকল জাতির সহিত সমান অধিকারে এক হইতে পারে না, সেইসমস্ত সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থ প্রত্যেক জাতিকেই এ-যুগে পরিত্যাগ করিতে হইবে। নেশন্ বা জাতীয়তাবাদ এ-যুগের আদর্শ নয়। তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর আদর্শ পৃথিবীর সকল জাতির সকল মনুষ্যের জন্য, নর-নারী, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনি-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সমান অধিকারে সুযোগ প্রদান। কোন বিশেষ জাতির নয়, সমগ্র মানব জাতির উত্থান ও উৎকর্ষ সাধনই এ-যুগের আদর্শ।

কিন্তু এই আদর্শে পৌঁছিতে হইলে সাম্রাজ্যবাদের আদর্শের মধ্য দিয়া পৌঁছাইবার একটা সম্ভাবনা বিপিনচন্দ্র পাল কল্পনা করিয়াছেন। ইহাও বিপিনবাবুর ঠিক পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কল্পনা এবং রবীন্দ্রনাথের সম-সাময়িক। বিলাত হইতে যে-সাম্রাজ্যবাদের বক্তৃতা বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পরে ভারতে আসিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে জাতীয়তার পরিপন্থী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ভারতে যিনি জাতীয়তার নূতন দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সেই বিপিনচন্দ্র এই সাম্রাজ্যবাদকে একটা নূতন পরিকল্পনার মধ্য দিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। তিনি এই সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়া সমগ্র মানব-জাতির একটা মিলনের সেতু কল্পনা করিয়াছেন; এবং জাতীয়তা-বিরোধী না হইয়াও, সাম্রাজ্যবাদ, আদর্শরূপে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-সকলকে এক মহামিলনের উদার চন্দ্রাতপতলে সমান অধিকারে মিলিত হইবার জন্য সুযোগ দিবে আশা করিয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই যে, মানব-জাতির প্রীতি-বন্ধনে সাম্রাজ্য-বাদের ন্যায় আর কোন বাদই কার্য্যকর নহে। সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য

জাতীয়তা নহে,—ইহার লক্ষ্য উচ্চতর,—ইহার লক্ষ্য মানবতা। জাতি হইতে সামাজ্য, সাম্রাজ্য হইতে বিশ্বপ্রেম-বন্ধন, ইহাই সামাজিক বিবর্ত্তনের বিভিন্ন স্তর।* তাই যদি হয় তবে প্রত্যেক জাতিই ত' আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া পৃথিবীর সমস্ত জাতির সহিত মিলিত হইতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়া একান্তভাবে যাইবার কি প্রয়োজন? মূল কথা, রবীন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র বিলাতে Imperialism-কে বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখিয়াছেন। এই সম্পর্কে ফরাসী ও আমেরিকার যে-দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—"একদিন আমেরিকার একটি সমস্যা এই ছিল যে, ঔপনিবেশিক দল এক যায়গায়, আর তাহাদের চালকশক্তি সমুদ্রপারে,—ঠিক যেন মাথার সঙ্গে ধড়ের বিচ্ছেদ—এরূপ অসামঞ্জস্য কোন জাতির পক্ষে বহন করা অসম্ভব। ভূমিষ্ঠ শিশু যেমন মাতৃগর্ভের সঙ্গে কোন বন্ধনে বাঁধা থাকিতে পারে না—নাড়ি ছেদন করিয়া দিতে হয়—তেমনি আমেরিকার সম্মুখে যেদিন এই নাড়ি-ছেদনের প্রয়োজন উপস্থিত হইল, সেদিন সে ছুরি লইয়া তাহা কাটিল। একদিন ফ্রান্সের সম্মুখে একটি সমস্যা এই ছিল যে, সেখানে শাসয়িতার দল ও শাসিতের দল যদিচ একই জাতিভুক্ত তথাপি তাহাদের পরস্পরের জীবনযাত্রা ও স্বার্থ এতই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, সেই অসামঞ্জস্যের পীড়ন মানুষের পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়াছিল। এই কারণে এই আত্ম-বিচ্ছেদকে দূর করিবার জন্য ফ্রান্সকে রক্তপাত করিতে হইয়াছিল।"

ফরাসী জাতির মধ্যে সেই জাতিরই শাসকশ্রেণী শাসিতকে জাতীয়তার স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দিতেছিল। ফরাসী জাতি—ফরাসী জনসাধারণ

* The greatest fascination of Imperialism is that it makes for the unification of humanity to an extent and upon a measure impossible under any other form of human organisation or association, * * * * Imperialism offers a higher synthesis than nationalism. The Empire idea is larger and broader than nation idea. * * * * From the nation to the Empire, from the Empire to universal federation—this is the complete scheme of social evolution. * * * * It is a federal unity which means the freedom of the parts in the unity of the whole.

—The Soul of India (B. C. Pal).

রক্তাক্ত হস্তে জাতীয়তা-বিরোধী কণ্টককে সমূলে উৎপাটন করিয়া তবে ছাড়িল। আমেরিকা বিলাতী সাম্রাজ্যবাদের দোহাই শুনিল না। নবপ্রসূত জাতি তাহার গর্ভধারিণীর সহিত নাড়ীর সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কেননা, ইংলণ্ডের উপনিবেশ হইয়া থাকিতে গেলে আমেরিকার জাতীয়তা বিকাশে বিঘ্ন দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ ভয় করিয়াছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের অজুহাতে ইংলণ্ডের উপনিবেশ হইয়া থাকিলে ভারতের জাতীয়তা-বিকাশ পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। এই সম্পর্কে প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে রাজা রামমোহনের কল্পনা ছিল—Independent India, Friend of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and Enlightener of Asia. রাজা রামমোহন বলিয়াছিলেন, "Yet, as before observed, if event should occur to effect a separation (which may arise from many accidental causes, about which it is vain to speculate or make predictions) still a friendly and highly advantageous, commercial intercourse may be kept up."

রাজা রামমোহন শতাব্দী পূর্ব্বে ইহাও বলিয়া গিয়াছেন।—

"Supposing that one hundred years hence the Native character becomes elevated from constant intercourse with Europeans and the acquirement of general and political knowledge as well as of Modern Arts and Sciences, is it possible that they will not have the spirit as well as the inclination to resist effectually any unjust and oppressive measures serving to degrade them in the scale of society? It should not be lost sight of that the position of India is very different from that of Ireland, to any quarter of which an English fleet may suddenly convey a body of troops that may force its way in the requisite direction and succeed in supressing every effort of a refractory spirit. Were India to share one-fourth of the knowledge and energy of that country, she would prove from her remote situation, her riches and her vast population either useful and profitable as a willing province and ally of the British Empire or troublesome and annoying as a determined enemy."

ইহা হইতে বুঝা যায়, প্রয়োজন হইলে ইংলণ্ডের সহিত বিছিন্ন হইয়া একটা স্বাধীন ভারত জাতীয়তার বেদীর উপরে দাঁড়াইয়া এসিয়ার আলোক-স্তম্ভ স্বরূপ ও ইংলণ্ডের বন্ধুরূপে পৃথিবীর সমস্ত সুসভ্যজাতির মধ্যে সগৌরবে মাথা উঁচু করিয়া বাস করিতে পারিবে। বিশ্ব-মানবের মহামিলন-মন্দিরে ভারতবর্ষ যদি সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়া পথ না পায় তবু জাতীয়তার মুক্তপথে সে অগ্রসর হইয়া পৌছিতে পারিবে। শতাব্দীপূর্ব্বে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান, সমগ্র মানবের মিলন-পন্থী, বাঙ্গালী রামমোহনের ইহাই ছিল পরিকল্পনা।

রাজা রামমোহনের পক্ষে আর বাঁচিয়া থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়; এবং বর্ত্তমান করাচীর কংগ্রেসের সংবাদাদিও (Goal of Independence—Right to Cessation) তাঁহার নিকট পৌছাইয়া দিবার কোন উপায় করা যায় না। তথাপি আমরা—তাঁহার মানস-সন্তানেরা—একথা ভাবিয়া কি বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে তাঁহার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করিব না,—যে কি করিয়া বর্ত্তমান ভারতের প্রথম ও প্রধান মানব শতাব্দী পরের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কি মনীষার বলে শতাব্দীপূর্ব্বে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন?

রবীন্দ্রনাথের Imperialism সম্পর্কে গবেষণা রামমোহন-পন্থী। ইহা ব্রিটিশ ডিপ্লোমেসীর চতুরতা ও কপটতার উদ্ঘাটনকারী অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণ গবেষণা।

৪। ভারতের স্বাধীনতা

ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। ভারতবাসী পরাধীন জাতি। একটা জাতির পক্ষে পরাধীন থাকা তাহার স্বাভাবিক এবং সুস্থ অবস্থার পরিচয় নহে। কোন জাতি কালস্রোতের বেগে এক অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। জাতির স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনে ক্রমবিকাশ দেখা যায়। পরাধীন অবস্থার মধ্যে কোনো জাতি আবদ্ধ থাকিলে তাহার স্বাভাবিক উন্নতি ও বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। যে-জাতি অপর আর-একটি জাতিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক পরাধীন রাখে, সেই জাতিরও ক্রমে নৈতিক

মেরুদণ্ড ভগ্ন হয় ও অধঃপতন হইয়া থাকে। ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখিয়াছে,—কখনও বলপূর্ব্বক এবং কখনও চতুরতা করিয়া পরাধীন রাখিতেছে;—ইহাতে ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বিকাশ যেমন একদিকে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, তেমনই অন্যদিকে ইংরাজ জাতিরও নৈতিক অধঃপতন ঘটিতেছে। ইহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ।

সুতরাং ভারতবর্ষের রাজনীতি আলোচনার প্রধান কথা, ভারতবাসীর স্বাধীনতালাভ। এই স্বাধীনতার প্রকৃতি কি, ভারতবর্ষ একটা জাতি কি না এবং কি উপায়ে ভারতবাসী এই স্বাধীনতালাভ করিবে, এইসকল বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা ভারতীয় রাজনীতির বড় কথা। রবীন্দ্রনাথ এইসমস্ত বিষয়ে যে-সব চিন্তা জাতীয় সাহিত্যকে দান করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়ার সহিত মিলাইয়া তুলনা করিয়া দেখিলে রবীন্দ্রনাথের গবেষণার মূল্য স্পষ্টই উপলব্ধি করা যাইবে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই ভারতবাসী রাজনৈতিক হিসাবে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করিয়াছেন; এবং যদিও রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতবাসী একটা জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তথাপি এই জাতীয়তার প্রকৃতি কি এবং পাশ্চাত্য দেশের রাজনৈতিক নেশন্‌গুলির সহিত ইহার সাদৃশ্য ও বৈষম্য কোথায়, তিনি তাহারও একটা তুলনামূলক বিচার ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ভারত-সাম্রাজ্যের দ্বারা ইংরেজ বলী হইতেছে, কিন্তু ভারতকে যদি ইংরেজ বলহীন করিতে চেষ্টা করে, তবে এই এক পক্ষের সুবিধা কোনো মতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না, তাহা আপনার বিপর্য্যয় আপনিই ঘটাইবে; নিরস্ত্র, নিঃসত্ত্ব, নিরন্ন ভারতের দুর্ব্বলতাই ইংরেজ সাম্রাজ্যকে বিনাশ করিবে।"

রবীন্দ্রনাথ আরও একটা কথা বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের একচ্ছত্র ইংরেজ রাজত্বে প্রধান কল্যাণ এই যে, তাহা ভারতবর্ষের নানা জাতিকে এক করিয়া তুলিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও এই ঐক্যসাধন প্রক্রিয়া আপনাপনিই কাজ করিতে থাকিবে।"

বৈচিত্র্যের সমন্বয়।—

তিনি আরও বলিয়াছেন,—"পৃথিবীর মধ্যে আর কোনো দেশেই এতবড় বৃহৎ রচনার আয়োজন হয় নাই,—এত জাতি, এত ধর্ম্ম, এত শক্তি কোনো তীর্থস্থলেই একত্র হয় নাই,—একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই।" ভারতবর্ষে ইউরোপের মত রাজনৈতিক ভিত্তির উপর একটা নেশন্ গড়িয়া উঠিবে কি না রবীন্দ্রনাথ তাহা স্পষ্ট বলেন নাই। না বলিলেও, ভারতবর্ষে বর্ত্তমান বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা পরম ঐক্যকে গড়িয়া তুলিতে হইবে,—ইহাই বর্ত্তমান যুগের সাধনা বলিয়া তিনি খুব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করাই ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য,—ইহাও তিনি নিঃসন্দেহে ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা পরম আশার কথা, সন্দেহ নাই। তিনি ইতিহাস হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইংরাজ আমলে রাজা রামমোহন, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ—ইঁহাদের প্রত্যেকেই অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জীবনের সাধনা ভবিষ্যৎ বংশীয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। মুসলমান আমলে চৈতন্য, নানক, দাদু, কবীর ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান প্রবৃত্তির মাঝখানে ধর্ম্মসেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

আমরা দেখিতেছি, এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের বিপুল জনসঙ্ঘ পঁয়ত্রিশ কোটি পনের লক্ষ নরনারী বহু রকমে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

(১) ধর্ম্মে বিচ্ছিন্ন—যেমন হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-জৈন, খৃষ্টান-পার্শী ইত্যাদি। আবার এই প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে একটা (২) প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাও উপেক্ষার বিষয় নয়। পাঞ্জাবের মুসলমান ও পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান—ইহাদের ধর্ম্ম এক, সমাজ এক, কিন্তু ভাষা পৃথক, আকৃতি পৃথক, পোষাক-পরিচ্ছদ পৃথক, খাদ্য পৃথক, রাজনৈতিক ইতিহাসও অনেক ক্ষেত্রে পৃথক। আবার (৩) হিন্দুর মধ্যে বাঙ্গালার বৈষ্ণব ও শাক্তের ঐক্যের মধ্যেও যথেষ্ট বিরোধ। উপাস্য দেবতা, উপাসনা-

প্রণালী, সমাজগত আচার, এমন-কি খাদ্য-বৈষম্যও কম নয়। তারপরে (৪) বাঙ্গালার হিন্দুতে ও মান্দ্রাজের হিন্দুতে পার্থক্য যথেষ্ট। উপাস্য দেবতা, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য ও ভাষা কিছুই এক নহে। এই বহু-পরিস্ফুট বৈচিত্র্য—কেবল বৈচিত্র্য নহে, বিরোধের মধ্যে কেবল এক বিদেশী ইংরাজের শাসনের অধীনে থাকিয়া পলিটিক্যাল্ নেশন্ গড়িবার চেষ্টা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেস করিয়া আসিতেছেন। ইহার চরম সার্থকতা ভবিষ্যৎ বিচার করিবে।

সমগ্র ইউরোপে সাধারণভাবে একটা সভ্যতা আছে,—একটা ঐক্য আছে। ইউরোপের রাজনৈতিক নেশন্গুলির মধ্যে ভাষার পার্থক্য আছে, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যে একটা একতা আছে। এক নেশনের লোকেরা অন্য নেশনের লোকদিগের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারে। ইউরোপে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ হয় এবং ভবিষ্যতেও হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। তথাপি সমগ্র ইউরোপীয় সমাজে বিবাহ ব্যাপারে নরনারীর যে-স্বাধীনতা আছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সমস্ত হিন্দুজাতির মধ্যে সেইরূপ স্বাধীনতা থাকা ত দূরের কথা, এক প্রদেশের, এক জেলার বা এমন-কি এক জাতির হিন্দুর বিবিধ শাখাপ্রশাখার মধ্যেও নরনারীর বিবাহে মিলিত হইবার স্বাধীনতা নাই। অবশ্য মুসলমান সমাজে বিভিন্ন প্রদেশে বিবাহ-সম্পর্কে মিলিত হইবার এই স্বাধীনতা আছে। হিন্দুজাতির মধ্যে এই বহুখণ্ডতা এবং বিচ্ছিন্নতা পলিটিক্যাল্ নেশন্ হইবার পক্ষে বর্ত্তমান যুগে এক প্রবল অন্তরায়।

(৫) ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা যত, হিন্দুসমাজে ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত অস্পৃশ্য হিন্দুর সংখ্যা তাহার সমান। রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ এবং বিবেকানন্দ হইতে মহাত্মা গান্ধী আজ একশত সতের বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়াও যেটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, তাহা একেবারেই আশাপ্রদ নহে। হিন্দুজাতির মধ্যে এই সাত কোটী অস্পৃশ্যকে ইংরাজ আমলে হিন্দুরা স্পৃশ্য করিয়া তুলিতে পারিল না। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে ইহারা স্পৃশ্য হইবে। কি কৌশলে হইবে, তাহা ভারতের ভাগ্যবিধাতাই জানেন।

(ছ) হিন্দুমুসলমান সমস্যা।—

ইহার পরে নেশন্ গড়িতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এক বড় সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানে বহুবার এই সমস্যার উপরে মস্তিষ্কচালনা করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানকে তিনি মিলিত হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক দাঙ্গাহাঙ্গামার মূলে যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে। দোষ কেবল হিন্দু বা কেবল মুসলমানের নহে। ব্রিটিশ ভারতের বাহিরে, তথাকথিত স্বাধীন দেশীয় নৃপতিদের রাজ্যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ অপেক্ষাকৃত কম। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, হিন্দু-মুসলমান-বিরোধে সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়াছে যে, দমনটা অধিকাংশ হিন্দুর উপর দিয়াই চলিতেছে এবং প্রশ্রয়টা অধিকাংশ মুসলমানেরাই লাভ করিতেছেন। এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া যাওয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরও অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে; এবং যেখানে কোনোকালে বিরোধ ঘটে নাই সেখানেও কর্ত্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া এক পক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্য পক্ষের সাহস ও স্পর্দ্ধা বাড়িতেছে এবং চিরবিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে।" রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন, "কংগ্রেসের প্রতি গবর্মেণ্টের সুগভীর প্রীতি না থাকিতে পারে এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া কংগ্রেসকে বলশালী না করুক, এমন ইচ্ছাও তাঁহাদের থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব, তথাপি রাজ্যের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের অনৈক্যকে বিরোধে পরিণত করিয়া তোলা কোন পরিণামদর্শী বিবেচক গবর্মেণ্টের অভিপ্রেত হইতে পারে না। * * * * গবর্মেণ্টের বারুদখানায় বারুদ যেমন শীতল হইয়া আছে অথচ তাহার দাহিকাশক্তি নিবিয়া যায় নাই—হিন্দু-মুসলমানের আভ্যন্তরিক অসদ্ভাব গবর্মেণ্টের রাজনৈতিক শস্ত্রশালায় সেইরূপ সুশীতল-ভাবে রক্ষিত হইবে, এমন অভিপ্রায় গবর্মেণ্টের মনে থাকা অসম্ভব নহে।"

(জ) স্বাধীনতালাভের উপায়।—

এখন কথা হইতেছে যে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে কি উপায়ে?

কংগ্রেসের মামুলী আবেদন-নিবেদন প্রথাকে রবীন্দ্রনাথই প্রথম "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম রাজনীতি-ক্ষেত্রে জাতিকে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার বাণী জাতি অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করিয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই বা তাহার সঙ্গে সঙ্গে হিংসা-মূলক বিপ্লবাত্মক রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা দেখা দিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের উপায়স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ জাতিকে ইহা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়—কোনো সঙ্কীর্ণ রাস্তা ধরিয়া কাজ সংক্ষেপ করিতে গেলে একদিন দিক্ হারাইয়া শেষে পথও পাইব না, কাজও নষ্ট হইবে।" তাই তিনি বারংবার বলিয়াছেন, "শত্রুতা বুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলই বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া ঐ পরের দিক্ হইতে ভ্রূকুটিকুটিল মুখটাকে ফিরাও, আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপশুষ্ক তৃষ্ণাতুর মাটির উপরে নামিয়া আসে তেমনি করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এস, নানাদিগ্‌ভিমুখী মঙ্গল চেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্ব্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেল।"

স্বাধীনতা লাভের উপায়স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ জাতিকে এইরূপে বিপ্লবপন্থা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, ইহার দ্বারা জাতি অভিষ্টলাভ করিতে পারিবে না। এই সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর পূর্ব্বগামী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই বিপ্লবাত্মক দলগুলির উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে যে নিপুণ ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা যেমন একদিকে গভীর সমাজ-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সম্মত তেমনি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। বিপ্লবাত্মক দলগুলির সমাজ ও মনোবিজ্ঞান সম্মত আলোচনা রবীন্দ্রনাথের মত আর কোন ভারতবাসী করেন নাই।

তবে স্বাধীনতা লাভ হইবে কি উপায়ে? এক্ষণে জাতির লক্ষ্য হইয়াছে ত' পূর্ণ স্বরাজ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, কিন্তু এই উভয়ই ত' এককথাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্ততঃ বর্ত্তমান করাচী কংগ্রেসের ভাবগতিক দেখিয়া ইহাই মনে হয়। কেননা, ইচ্ছামাত্রেই যদি ভারতবর্ষের ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ক্ষমতা থাকে এবং এই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সহিত বিচ্ছিন্ন না হয়, ত' সেই যোগ Imperialism-এর যোগ নহে। ইহা দুই স্বাধীন জাতির পরস্পর স্বেচ্ছাকৃত যোগ; ইহা পূর্ণ স্বাধীনতারই নামান্তর। ভারতবর্ষ এই আদর্শের দিকেই বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। বর্ত্তমান করাচী কংগ্রেসই তাহার প্রমাণ। এই করাচী কংগ্রেসের রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে-অহিংসনীতির উপর ভিত্তি করিয়া এবং গত বৎসরের আইন অমান্য আন্দোলনকে গ্রহণ করিয়া যে অদ্ভুত নূতন কৌশলে হিংস্র স্বভাবপূর্ণ পৃথিবীর সশস্ত্র যুধ্যমান জাতিসকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছে, সেই অহিংস নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নিরস্ত্র জাতির পক্ষে এই পরম অদ্ভুত উপায় মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষকে দান করিয়াছেন। বাঙ্গালায় পার্টিশন্ আন্দোলনের পরে Passive Resistance-এর কথা বাঙ্গালীই ভারত-বাসীকে শুনাইয়াছিল। বাঙ্গালার সেই Passive Resistance ভারত-ব্যাপী হইয়া বিশেষ কোন ফললাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ঐ আন্দোলন যে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের পূর্ব্বগামী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি গান্ধী-প্রবর্ত্তিত আন্দোলন সাক্ষাৎভাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা বলিতে সাহস হইতেছে না। কারণ, বড়ই দুঃসাহসের কার্য্য। কিন্তু ইহার আনুষঙ্গিক স্বদেশী বস্ত্র গ্রহণ ও বিলাতী বর্জ্জন প্রভৃতি খণ্ড আন্দোলনগুলির জন্য বাঙ্গালাই প্রথমে ভারতবর্ষকে প্রস্তুত করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল; তাই অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন এত সহজে ও এত দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই স্বদেশী আন্দোলনের চিন্তার ধারায় জাতিকে অভিষিক্ত ও পুরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। যে Passive Resistance-এ স্বদেশী আন্দোলনের কাহিনী একদিন

সমস্ত ভারতকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার দার্শনিক ব্যাখ্যাকার ছিলেন শ্রীবিপিনচন্দ্র, কর্ম্মী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ আর সে-আন্দোলনের কবি ছিলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ।

ভারতের মুক্তিসাধনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন পূর্ব্বে নিউ ইয়র্ক প্রেস এসোশিয়েশনে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে এক বাণী প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভারত স্বাধীনতালাভের উপযুক্ত হইয়াছে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে আমি এই কথা বলিতে পারি যে, দায়িত্ববোধের সূচনা স্বাধীনতালাভের সঙ্গে-সঙ্গেই হইয়া থাকে, কোনো বিষয়ে যোগ্যতালাভ কোনো কৃত্রিম অবস্থার দ্বারা সৃষ্ট হইতে পারে না, উহা প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।" পরে তিনি স্বাধীনতার উপায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যুগাবতার মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আমার দেশবাসীগণ অন্যান্য সামরিক দেশের মত স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য হিংসার পথ বাছিয়া না লইয়া, নৈতিক ঔদার্য্য ও আত্মত্যাগের বল সম্বল করিয়া অহিংস সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমি গৌরব অনুভব করি। আত্মিক শক্তিকে তাঁহাদের প্রধান অস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীগণ, নরহত্যার যে আদিম মনোবৃত্তি আধুনিক জগতের অধিকাংশ দেশে বিদ্যমান, তাহার অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছেন।" অবশেষে তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি ভারতবাসীগণ এই বীরোচিত অহিংসনীতিতে প্রবল উত্তেজনা অগ্রাহ্য করিয়া দৃঢ় থাকিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের স্বাধীনতা অর্জ্জনে কোনই আয়াস পাইতে হইবে না। আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, সমগ্র জগৎ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই আত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে।" *

* 'সংবাদ" নামক সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

প্রণাম

—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

অমানিশা-অন্ধকারে, আকাশের তারায় তারায়,
ঘন দেয়া গরজনে, শাওনের ধারায় ধারায়,
শরতের শেফালিতে, নদীতীরে শুভ্র কাশবনে,
হিমসিক্ত শস্য-ক্ষেতে, হেমন্তের শুভ আবাহনে,
শীতের কুহেলি মাঝে, ফাল্গুনের বন-বীথিকায়,
মধুর মাধবী রাতে, গন্ধ-মাখা দক্ষিণের বায়,
যে-গান ঘুমায়ে 'ছিল, নিদাঘের রৌদ্র দগ্ধ দিনে
যে-ব্যথা লুকায়ে ছিল, তুমি তারে নিয়েছ যে চিনে
কান্না-হাসি-বিজড়িত মানুষের গুপ্ত ইতিহাস,
অজানা অদেখা যত, তুমি তারে করেছ প্রকাশ।

তোমার বীণার তারে যত সুর পড়িয়াছে ধরা—
সঙ্গীতে হয়েছে মূর্ত্ত হৃদয়ের অবসাদ-হরা।
হে আচার্য্য, সিদ্ধ, ঋষি, ভারতের, জগতের রবি,
বিশ্ব-ভারতীর পুত্র, কবিগুরু, বাঙলার কবি,
এ মহাসভার মাঝে ভক্তিভরে তোমারে দিলাম
সমস্ত প্রাণের মোর পরিপূর্ণ একটি প্রণাম।

"সোনার তরী"

অসম্ভবকে সম্ভব করিতে হইবে। কবিবর রবীন্দ্রনাথের জীবনতরণীর যাত্রাকাহিনী "দেখি নাই কভু, শুনি নাই কভু এমন তরণী-বাওয়া," তাহা লিপিবদ্ধ করা এক দুঃসাহসিক উদ্যম। অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়াছে বা শত শত ঘাটে সেই তরী ভিড়িয়াছে বা তিনি নানা দিকে তাঁহার প্রতিভার দান বিলাইয়াছেন, কেবল যদি তাহাই হইত তবে তাহা একজন শ্রমশীল ঐতিহাসিক না হয় কয়েক দিন অধিক পরিশ্রম করিয়া লিখিয়া যাইতে পারেন। ইতিহাস-রচয়িতা আপাতদৃষ্টির সীমার মধ্যে কালসাগরের ভাসমান ঘটনাবলীর সংগ্রহকারক। ইতিহাস সাময়িক মতিগতির বাহ্যিক রূপের বন্ধনীর ভিতর নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার কর্ত্তব্য পালন করে। ইতিহাস দ্বন্দ্বক্ষেত্রের বিজয়ীর একদেশদর্শী পক্ষপাতিত্ব কোনপ্রকারে পরি-বর্জ্জন করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রায় যে-কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা লিখিতে হইলে সেটা ঐতিহাসিকের কাজ হইতে পারে। কিন্তু যদি কাহিনী লিখিতে হয়, কবির অন্তরের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক কোন্ কোন্ দিগ্‌বিদিকে স্পর্শ দিয়া এদেশের নিদ্রিতা রাজকুমারীকে সচেতন করিয়া দিয়া গিয়াছে, সেই গল্প যদি প্রাণবান্ করিতে হয়, তবে সেটা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিশক্তি দিয়া চলিবে না—চলিতে পারে না। গভীর-তম অন্তরের নিভৃত ভাণ্ডার হইতে কবির জীবনে যে যে ভাব, ধারণা ও প্রেরণা আসিয়া কবির জীবনতরণীকে এক এক ঘাটে ভিড়াইয়া এক-একটি রসবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে, তাহার পরিচয় দিতে হইলে যে সমগ্রের অনুভূতির আবশ্যক, আবার সেই অনুভূতির জন্য যে প্রেমের চক্ষু আবশ্যক, তাহা লইয়াই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। কবি এই অন্তরের রঙ্গভূমির একজন সুদক্ষ অভিনেতা; বলিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি অভি-নেতৃকুলগুরু। তাঁহারই শিক্ষায় শিখিয়াছি কত সন্তর্পণে এ-পথে বিচরণ করিতে হয়—

সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়।

সেই ভয় লইয়া, সেই সম্ভ্রম লইয়া, সেই সাধনার অসম্ভবত্বের ধারণা লইয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছি এবং কবির জীবনের যে-কর্ম্মসাধনা বাঙ্গালীর হৃদয় একটা স্থায়ী রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়, সেইটুকু বলিতে চেষ্টা করিতেছি। ইহার ভ্রমপ্রমাদ আমার, ইহার সৌন্দর্য্য ও অবদান সমস্তই কবির।

আমার বয়স তখন বৎসর দশেক হইবে। ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে, এখন যেখানে কবিবরের আবাসগৃহ সেইখানে, একটি হংসডিম্বাকৃতি বেষ্টনী দেওয়া জমি ছিল। ১১ই মাঘের প্রাতঃকালীন উৎসবে গিয়াছিলাম। সেই জমিতে পাল দিয়া ও লতাপাতা-ফুলে সাজাইয়া উৎসব-ক্ষেত্র হইয়াছিল। আমরা জমির উত্তর দিকে চেয়ারে বসিয়া উৎসবের উপাসনা ও সঙ্গীত পরের পর শুনিতেছিলাম, তখনও কবিকে দেখি নাই। বক্তৃতার পর শেষ গান কয়টি হইবার সময় প্রথম গান কবির কণ্ঠে শুনিলাম—"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে"। চেয়ারে দাঁড়াইয়া প্রথম দেখিলাম—কে গায় ঐ! তিন-চারি শত লোক একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ, নিস্তব্ধ। ঐ সুগৌর বর্ণ, কুঞ্চিত কেশ, সৌম্যদর্শন ও দূরপ্রসারী-দৃষ্টি, তাহার উপর যোগিয়া বিভাসের মূর্চ্ছনা—বাহিরে প্রভাত-সূর্য্যের কনক-কিরণ গাঁদাফুলের শিশির-বিন্দুর উপর ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। আমাদের নয়নে শ্রবণে কাহার রূপ, কাহার ধ্বনি—তাহারই চেতনা জাগাইতে যেন কবি ঐ গানে আমাদের এক অননুভূতপূর্ব্ব অনুভূতি দান করিলেন। গান থামিবার পর আমাদের নিকটস্থ একজন বলিলেন, এটা সেই গান! তখন বুঝি নাই। বহু বহু দিন পরে "জীবনস্মৃতি"তে পাইয়াছি—এ কোন গান।

তাহার পর আমাদের বালকের প্রাণে পরশ দিতে আসিল 'বালক' মাসিক পত্রিকা। তখন হইতেই কবির নাম দেখিলেই আমার চক্ষে ভাসিত ঐ প্রথম দৃশ্য—'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে' গানের মজলিস ও তাহার পারিপার্শ্বিক চিত্র। তিনি যাহা-কিছু লিখিতেন তাহাই আগ্রহের সহিত

প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহাই পড়িতাম, তাহাই মুখস্ত করিতাম, তাহাই শুনাইতাম। পরে যখন আমাদের পাড়ায় 'চৈতন্য-লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠা হয় তখন আমরা বৎসরের পর বৎসর তাঁহার প্রবন্ধের জন্য উৎসুক হইয়া থাকিতাম এবং তিনি আমাদের সেই ঔৎসুক্য কতবার পরিতৃপ্ত করিয়াছেন! এসকল কথা আমাদের সৌভাগ্যের কথা।

আমার কেমন একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, কবির পূর্ণাভিব্যক্তি হইল "সোনার তরী"। এই সোনার তরী লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা, জটলা, উদ্ভাবনা হইয়া গিয়াছে। কত দার্শনিক, সমালোচক, কবি কত-না অর্থই করিয়াছেন। আমাদের কাছে তাহাই অবোধ্য ঠেকিয়াছে। ঐ কবিতাটিকে রূপক মনে করিলে মনে হয় যেন উহার রূপটাকে কৌটায় ভরা হইয়া গেল। ঝঙ্কারময় ভাষায়, সরল অভিব্যক্তিতে, প্রকৃতির একখানি যথাযথ প্রতিকৃতি, তাহার মধ্যে গান গাহিয়া একজন চেনা-চেনা লোকের আগমন, তাহাকে শস্যসম্ভার দান ও তাহার চলিয়া যাওয়া, তাহার ভিতর মানুষের যাওয়া-আসা আদান-প্রদানের স্বচ্ছ সরল ভাবের বিকাশ—ইহাই লইয়া হইল 'সোনার তরী'। বাহিরের প্রকৃতির একটা ঘটনা-সন্নিবেশ কবির মনের ক্ষুদ্র রন্ধ্র-পথে ক্ষুদ্র কবিতার বেষ্টনীর ক্যামেরার ভিতর কল্পলোকের এক অপূর্ব্ব ছায়াচিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সমস্ত চিত্রটাই এমন একটা স্থায়ী ভাবের ছাপ দিয়া যায়, এমন একটা শান্ত করুণ রসের সঞ্চার করে যে, তাহা প্রত্যেক পাঠকের মনে চিরদিন জাগিয়া থাকে। আর-এক দিক দিয়া 'সোনার তরী'র একটি সুকুমার কলাসৌন্দর্য্য মানিতে হয়; ছবিখানার ভিতর এমন একটা সর্ব্বোপযোগী সত্যের আভাস পাওয়া যায় যে, এই কবিতার ভিতরের নানা অবস্থার, নানা ঘটনার, নানা বৈচিত্র্যের বর্ণনায় সে-সত্যকে মানাইয়া লওয়া যায়। ভাবে বিভাবে, ভাষায় ছন্দে, প্রাকৃতিকতায় ও অভিব্যক্তিতে, অন্তরের অকৃত্রিমতায় ও বাহিরের রূপে রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী"র একমাত্র তুলনা উহাই। "ভরা ভাদরে" অনুকৃতি-চেষ্টা, কিন্তু স্বতঃপ্রস্ফুট কবিতাকুসুম নহে।

বৈজ্ঞানিক বলেন যে, "কেন" প্রশ্নের উত্তর তাঁহারা দিতে পারেন না। "কি করিয়া" তাহা দেখাইয়াই বৈজ্ঞানিক কারণ-তত্ত্ব শেষ করেন। আমি

'সোনার তরী''র যে-ধারণা করিয়াছি, ইহার কোনও "কেন"ও জানি না, "কি করিয়া"ও বুঝি না। তবে কবিবরের জীবনী ও লেখা আলোচনা করিয়া দেখি যে, আমার ধারণার অনুকূলে অনেক জিনিস পাওয়া যায়।

প্রথম কথা যেটা মনে পড়ে সেটা বলি। কবির জীবনের প্রভাত হইতে দেখি তরী ও তরণীর উপর তাঁহার একটা অতিশয় আসক্তি। সাহিত্যে মানব-জীবন বা মানবদেহ তরী হিসাবে অনেক কবি দেখিয়াছেন। সংস্কৃতে পাই—

> নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
> প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত গান "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে"! লৌকিক গান—"আমার এ প্রেমের তরী"।

কিন্তু এসকলই কবিদিগের বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়াভিনিবেশের কল্পনা-মাত্র। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' তাঁহার সমস্ত জীবনব্যাপী সুখদুঃখ-জড়ানো মনোরাজ্যের রাজপাটের নিত্যসহচর। কবিবর একদিন লিখিয়াছিলেন, "সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ"; তাই মনে হয়, রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাণ স্পর্শ করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতা পাই যেন তাঁহার তরী-জীবনে। তাঁহার সমস্ত রচনার ভিতর এই তরীর পরশ যেন ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছে।

সেই কোন্ কালে তিনি লিখিয়াছিলেন "আমার এ তরীখানি বাহিব না।" তাহার পর কবিতার পর কবিতায় পাইয়াছি:—

> "এই ঘাটে বাঁধ মোর তরণী।"
>
> "বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
> সোনার তরী ?"
>
> "আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে
> বিপুল ভুবন-তরণী।"
>
> "না হয় কিছু ভারী হবে আমার তরীখান।"
>
> "তুমিও গো ক্ষণেক তরে
> বসবে আমার তরী 'পরে।"

"সে বাতাসে তরী ভাসাবো না, যাহা তোমা পানে নাহি বয়।"

"কূল হ'তে মোর গানের তরী দিলেম খুলে" ;

"তোমার পানে খেয়ার তরী-ভাসা।"

"বাঁধা তরী ঢেউএর দোলা লেগে
ঘাটের 'পরে মরবে মাথা কুটে।"

"অশ্রুজলের ঢেউএর পরে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে।"

"উচ্ছল জল করে ছলছল,
কাঁপিয়া উঠিছে কল-কোলাহল,
তরণী-পতাকা চল চঞ্চল, কাঁপিছে অধীর রবে।"

"বাতাস দিল দোল,
ও তোর ঘাটের বাঁধন খোল,
মাঝ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহি রে।"

এইসমস্ত কবিতার ভিতর তরী-জীবনের শতদল-সৌন্দর্য্যের যাহা নানা বিচিত্রতায় ফুটিয়াছে তাহার অনেকটাই পাই কবির জীবনী হইতে।

কবি যখন প্রথম গৃহের বাহিরে কোন্নগরে গঙ্গার ধারে দিন কতক বাস করেন তখনই দেখি—"নদীর উপর কালো ছায়া, সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা, ওপারের তটরেখা চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করে। গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পালতোলা নৌকায় যখন তখন আমার মন বিনা ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত।"

কবি গেলেন বিলাতে। বিলাতের ডায়ারির ভূমিকা হিসাবে এক প্রবন্ধ কবি সম্ভবতঃ বাঙ্গলা ১২৯৮ সালে পাঠ করেন। তাহাতে পাই—"তরী ভাসাবার ইচ্ছা আছে। যখন দেখি মানবস্রোত চলেছে, চতুর্দ্দিকে বিচিত্র কল্লোল, উদ্দাম বেগ, প্রবল গতি, অবিশ্রাম কর্ম্ম, তখনও আমার মন নেচে উঠে। তখন ইচ্ছা করে, বহু বৎসরের গৃহবন্ধন ছিন্ন ক'রে একেবারে বাহির হ'য়ে পড়ি।"

যখন ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার মনের কথা নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন—"দেশের আলোক দেশের আকাশ আমার ভিতরে ডাক দিতেছিল।" এই ডাকের ছবি একখানা আমরা তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে পাই। ছবিখানায় পাই কি? পাই সুবিস্তৃত নদী, ধূ ধূ প্রসারিত সৈকত, আর "কাঁকেতে কলসী তুলি' চ'লে গেল তরুণী।" ছবিখানা তখনই মনে করাইয়া দেয় "এই ঘাটে বাঁধ মোর তরণী।"

দেশে ফিরিয়া আবার যখন তিনি চন্দননগরে দিন কতক বাস করিতে গেলেন, তখন তাঁহার যেন চিরপুরাতনের সহিত প্রিয়মিলন হইল।

"আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্ব্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধশ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনি-করুণ দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্ন পরিবেষণ হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতই অত্যাবশ্যক ছিল।"

ঠিক তাই "ছিন্নপত্রে" কবির জীবন যেন তরী-জীবনের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। "যেন আমি এই আকাশের, এই নদীর, এই পুরাতন শ্যামল পৃথিবীর।"

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা

"সোনার তরী"র প্রত্যেক ছবিখানা কবির নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা। "ছিন্নপত্রে" তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

"চারিদিকে জলরাশি ক্রমাগতই ছল্ ছল্ থল্ থল্ শব্দ করছে। আর বাতাসের হু হু শব্দ শোনা যাচ্ছে * * * আর একপারে সবুজ শস্যক্ষেত্র ও বহুদূরে একটি গ্রাম।"

"এল খুব কালো, গাঢ় আলুথালু রকমের মেঘ, তারি মাঝে চোরা আলো পড়ে' রাঙা হ'য়ে উঠেছে" ("মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ ছিন্ন

মেঘের ফাঁকে”.)। “যারা মাঠে শস্য কাটতে এসেছিল তারা মাথায় এক-এক বোঝা শস্য নিয়ে বাড়ীর দিকে ছুটে চলেছে।”

“দিগন্তের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বালির চর ধূ ধূ করছে * * ওপারে ঘাট * * দূরে পাবনার পারে তরুশ্রেণীর ঘন নীলরেখা।”

এই প্রচ্ছদপটের সমক্ষে কবির জীবনে বর্ষার উদয়কালে তিনি জানেন :—“আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-যোড়া ঐশ্বর্য্য নিয়ে উদয় হয়।” তাঁহার অসংখ্য কবিতায় এই বর্ষামঙ্গলের ছবি আছে।

কূলে একা ব’সে আছি—আমি একেলা

এই একেলা থাকার অভিজ্ঞতাও ‘ছিন্নপত্রে’ পাই :—

“ঐ লোক-নিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জ্জন নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হ’য়ে ওঠে। আমি তার মধ্যে অবগাহন ক’রে মানসলোকে একেলা ব’সে থাকি।”

“নদীতে একটি রেখা মাত্র ছিল না। * * আমার মত এই রকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করেচে * * হে অনির্ব্বচনীয়, এ কি, এ কিসের জন্যে, এ কিসের উদ্বেগ, এই নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম কি, অর্থ কি?”

“সন্ধ্যাবেলা সূর্য্যাস্তের সময় এই চরের উপর আর কিছুই নেই, কেউ—

আমি একেলা।”

সোনার তরীতে সোনার ধান

একলা থাকা ও সোনার তরীতে সোনার ধান বুঝিতে গেলে মনে রাখিতে হইবে যে, কবি আমাদের মত বাঁধাধরা রুটিনে ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়েন নাই। তাঁর মনটার চালনা (ছেলেবেলা থেকেই) সম্ভব হইয়াছিল। “রূপকথা ও ছড়াগুলো ··· তাঁহার মনের মধ্যে ভারি একটা মায়াজগৎ তৈরী করেছিল।”

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে

কত লোকে কত রকমে এই কবির মানসীকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে কৌতুকময়ীকে আবাহন আছে, কাব্যসুন্দরীকে আবাহন আছে। "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র প্রথম লাইনটায় আছে—

"আর কত দূরে লয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরি।"

'ছিন্নপত্রে'ও ইহার পরিচয় পাইয়াছি—

"সুন্দর সকালবেলায় মধুর বাতাসে নদীর মাঝখানে মাথার মধ্যে সেই রকম ঝন্ ঝন্ নুপুর বাজছে—কিন্তু সে কেবল এদিক ওদিক থেকে অন্তরালে—কেউ ধরা দিচ্ছে না।"

"আমার এই অভিমানিনী প্রবাস-সঙ্গিনী আমাকে যেন বলচে, 'আমি যে তোমার চিরদিনের সাধনা, তোমার সহস্র জন্ম পূর্ব্বের প্রিয়তমা, অনন্ত জীবনের অসংখ্য খণ্ড পরিচয়ের মধ্যে তোমার একমাত্র চিরপরিচিতা'।"

কবিতার দিক্ দিয়া ইহা যতই সত্য হউক, কিন্তু কবির জীবনের দিক্ দিয়া "ভাঙা-গড়া, জয়-পরাজয়, সংঘাত-সম্মিলনের" দিক্ দিয়া, এই চেনা-চেনা লোকটি তাঁহার "জীবন-দেবতা", যিনি "এইসমস্ত বাধাবিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন।" "জীবন-দেবতা" কবিতায় এই রূপটি আরও স্পষ্ট হইয়াছে :—

"আজ মনে হয় সকলেরই মাঝে
তোমারেই ভালবেসেছি;
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধ'রে
শুধু তুমি আমি এসেছি।"

"হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া,
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া।"

কবির জীবন-তরী যখন "ভালমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে উত্তীর্ণ" যথায় "কত ভাঙ্গা-গড়া, কত জয়-পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন" তখনই

'সোনার তরীতে' ঐ জীবন-দেবতাকে দর্শন লাভ করিলেন। রাশি রাশি ভারা ভারা সোনার ধান তখন কাটিয়া সংগৃহীত। কবি আহ্বান করিলেন—

"শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।"

সোনার ধান

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "সাধনা" মাসিক পত্রিকা প্রকাশ কবির জীবনের একটা প্রধান কর্ম্মচেষ্টা, বঙ্গসাহিত্যের একটি শোভন সম্পদ। চারি বৎসরে বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজে কয়েকটি প্রতিভা "সাধনা"কে অবলম্বন করিয়া যে-দান দিয়া গিয়াছেন তাহা একটা স্মরণীয় কীর্ত্তি। বাঙ্গলা ১২৯৮ সালে "সাধনা" প্রথম প্রকাশিত হয়। এক দিকে ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্র-নাথের দর্শন-ব্যাখ্যা, বটব্যাল মহাশয়ের সাংখ্যদর্শন-বিবৃতি ও রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানদর্শন-সমন্বয়; অপর দিকে বলেন্দ্র ও রবীন্দ্রের সাহিত্যিক সৃষ্টি লইয়া "সাধনা" সর্ব্বদেবোময় অতিথিরূপে আমাদের ঘরে ঘরে দেখা দিতেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যে-লেখা শিক্ষিত বাঙ্গালীকে চঞ্চল করে তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার অনাদর লইয়া লিখিত। প্রবন্ধটির নাম "শিক্ষার হের-ফের"। তাহার প্রধান বক্তব্য ছিল—"আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না।" আজ এ-অবস্থা ঘুচিয়াছে কি না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু উহা পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাসবাবু ও আনন্দমোহন তিন জনকে পত্র লিখিতে হয়। সেই তিনখানি পত্রের উল্লেখ করিয়া কবি আক্ষেপ করেন, "মুখে যেমনই গর্ব্ব করি, আত্মশক্তি, আত্মভাষা এবং কোন আপনার জিনিষের প্রতিই আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস নাই।"

এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই "সাধনা"র আবির্ভাব হয়। আর যদি সত্য কহিতে হয় তো বলি, আপনার জিনিষের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন' হইতে রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্প আরম্ভ করেন। এইসমস্ত ছোট গল্প বাঙ্গালীর জীবনের সর্ববিধ সুখ দুঃখ বেদনা করুণা হাস্য

ভয় লইয়া রচিত। কেবলমাত্র যৌবনের রঙীন নেশায় চাতুরী-বৈচিত্র্য ও কথা-বৈচিত্র্যের শিল্পকলা নহে।

এই 'সাধনা'তেই 'সোনার তরী' প্রথম বাহির হয়। আর সেই 'সাধনা'তেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নটনারায়ণ আলাপ "ইংরাজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধ" বাহির হয়। ইহাই রবীন্দ্রনাথের 'সোনার ধানে' প্রথম অঞ্জলি। আমার এমন সাধ্য নাই যে, যে ইহা না পড়িয়াছে তাহাকে আমার ভাষায় রসাস্বাদন করাইতে পারি। তবে এই প্রবন্ধের উপসংহার ভাগ আমাদের স্মরণ-পথ হইতে কোনও দিন অপসারিত হইবার নহে। আর আমার বিশ্বাস, কোন বাঙ্গালীরই ইহা ভুলিবার জিনিষ নহে। তাহা এই—

"শিখদিগের শেষ গুরু গুরু গোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতিসাধনপূর্ব্বক নির্জ্জন স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুত্বপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও বহুকাল খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্য্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্য্য বেগে অন্ধভাবে যে-আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে, সেই আকর্ষণ হইতে বহুযত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিত জ্ঞানকে অর্জ্জন ও মার্জ্জন করিতে হইবে। তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হোক্ সহসা চৈতন্য হইবে—এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্ত্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সঙ্কটের পথে চলিতেছিলাম। যেটাকে সম্মানের শৈলশিখর জ্ঞান করিতেছিলাম সেইটাই পতনের উপত্যকা। আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই। তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরাজী কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না। তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে, প্রলোভন হইতে, মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। কোন একটি বিশেষ আইন সংশোধন করিয়া বা বিশেষ সভায়

স্থান পাইয়া আমাদের দেশের কোন যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে, আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন। তিনি আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি চতুর্দ্দিকে যেন উদার বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়া নীরবে শোষণ করিয়া লইতেছেন এবং বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করিয়া দেবতার নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছেন যেন এখনকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথায় তাঁহাকে কখনও লক্ষভ্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীনতায় উদ্দেশ্যসাধন অসাধ্য বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া না দেয়। অসাধ্য বটে, কিন্তু এদেশের যিনি উন্নতি করিবেন অসাধ্য সাধনই তাঁহার ব্রত।”

প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরীর এক অধিবেশনে ১৩০০ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে পঠিত হয়। তাহার অল্পদিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। সেই প্রবন্ধপাঠের পর কবি সভাস্থলে তাঁহার রচিত, “আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না” গান করেন। আমরা উপস্থিত থাকিয়া বাংলার এই দুই সাহিত্যরথীর মিলন দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের পরলোকযাত্রার পর ঐ সনের চৈত্রমাসে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরীর আর-এক অধিবেশনে কবি যে-শ্রদ্ধানিবেদন করেন তাহাতেই তিনি পূর্ব্বাধিবেশনের স্মৃতি লইয়া যে কয়টি কথা বলেন তদপেক্ষা শোভনতর ভাষায় আমরা তাহার বর্ণনা করিতে পারি না। “বঙ্কিমচন্দ্রের” উপসংহার এই :—

“কে জানিত আমার সহিত তাঁহার সেই শেষ ঐহিক সম্বন্ধ। একদিন আমার প্রথম বয়সে কোন নিমন্ত্রণসভায় তিনি নিজ কণ্ঠ হইতে আমাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়াছিলেন। সেই আমার জীবনের সাহিত্যচর্চ্চার প্রথম গৌরবের দিন। তাহার পরে সেদিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদরসহকারে আমার বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন। সে-সৌভাগ্য অন্য লোকের পক্ষে এমন বিরল ছিল এবং সেই সমাদরবাক্য এমন অন্তরের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল যে, আজ তাহা লইয়া সর্ব্বসমক্ষে

গর্ব্ব করিলে ভরসা করি সকলে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। কিন্তু সে পুরস্কার যে তাঁহার হস্ত হইতে শেষ পুরস্কার হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। সেইসকল উৎসাহবাক্য সাহিত্যপথযাত্রার মহামূল্য পাথেয় স্বরূপ আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে সাদরে রক্ষিত হইল। তদপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার আর এ-জীবনে প্রত্যাশা করিতে পারিব না।"

আর বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহাও স্মরণীয় :—

"বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। * * * যত কিছু আশা, আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য্য, প্রেম, মহত্ত্ব, ভক্তি, স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। * * * বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। * * * রচনা ও সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। * * * তিনি আমাদের যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চিরসৌন্দর্য্যের, অক্ষয় আকর উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। * * * তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণা করিয়াছেন এবং সেই পুণ্য স্রোতস্পর্শে জড়ত্ব-শাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ-কথা কোন বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।"

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি গঙ্গার প্রতি কবির শ্রদ্ধা নিবেদন। ১৩০১ সালে উপরোধে পড়িয়া কবিবরকে "রামায়ণ" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়। সেটি একটি সাহিত্যের নৈবেদ্য রচনা। সেই নৈবেদ্যের চূড়ায় যে-সন্দেশ ছিল তাহা এই :—

"ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই

ইতিহাস এই দুই (রামায়ণ ও মহাভারত) বিপুল কাব্যহর্ম্ম্যের মধ্যে চির-কালের সিংহাসনে বিরাজমান।"

ইহার পর হইতে কবি ভারে ভারে শস্যসম্ভার বহন করিয়াছেন। সে-সমস্তই সজাগ প্রাণের অক্লান্ত কর্ম্মচেষ্টার দান। সে-সমস্তই কবির সহিত দেশের যোগসাধন। "দেশের আলোক, দেশের বাতাস" যে তাঁহাকে সত্যসত্যই ডাক দিয়াছিল, তাহার সকল পরিচয় এইসব কর্ম্মচেষ্টার ভিতর পাওয়া যায়। এইসকল কর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অসম্ভব। কবি নিজেই তাহার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। "অতীত" কবিতায় আছে :—

"তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখেছ
মজ্জায় মিশাইয়া।"

আর "স্বদেশ" কবিতায় আছে :—

"হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে
মিলে গেছ ওগো বিশ্ববিধাতা
মোর সনাতন স্বদেশে।"

এইসকল লেখার ভিতর দিয়া আমরা কবিকে পাই—যেন তিনি তাঁহার জীবন-দেবতার হাতে নিজেকে বীণা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। দেশে যখন যে-সুর বাজিতেছে তখনই সেই সুরের আলাপটি তাঁহার হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। কখনো সুখে, কখনো দুঃখে, কখনো নীরবে পড়িয়া থাকিয়া, নানা রাগ-রাগিণীর আলাপে আনন্দের বারতা অনন্তের কূলে পাঠাইতে তাহা যেন বাজিতেছিল। এইরূপে আমরা তাঁহার "মেয়েলি ছড়া"র ভিতর আলাইয়ার শান্তরস উপভোগ করি। ১৩০২ সালে "বিদ্যাসাগর" স্মরণে নটরাগের আলাপ পাই। "আধুনিক সাহিত্যে"র ভিতর সাহানার উল্লাস ও "প্রাচীন সাহিত্যে"র ভিতর পাই দেশ-রাগের উচ্ছ্বাস। তিনি "ইংরাজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধের" উপসংহারে যে-আদর্শের পরিচয় দেন তাঁহার "একলা চল রে" গানে তাহার উদ্বোধন-সঙ্গীত। এই

সমস্ত লেখার ভিতর দিয়া যে "অন্তরতম অভিপ্রায়" বিকাশ হইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহার সহিত সংঘাত ও বিরোধের অবধি ছিল না। কিন্তু কবিবর কখনও তাহাতে পিছাইয়া পড়েন নাই। তাঁহার বীণা যে কেবল কোমল কান্ত সুরই ভৈরবী রাগিণীতে আলাপ করিত তাহা নহে। আবশ্যকমত তাহাতে দীপক রাগের ঝঙ্কারও উঠিয়াছে। যখন জালিয়ান-ওয়ালাবাগের কাহিনী প্রকাশ হইল, কবির হৃদয়-বীণায় যে তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল তাহা দীপকরাগে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। আবার এই সেদিন হিজলীর বন্দীশালার তাণ্ডবলীলায় তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে যে-বেদনার ঝঙ্কার তুলিল তাহাও আর-একবার দীপকরাগ পরিগ্রহ করিল। আমাদের যতদূর মনে পড়ে, আমরা তাঁহার কণ্ঠে এই দীপকরাগের প্রথম পরিচয় পাই ১৩০৯ সালে। তখন সাম্রাজ্য-বৈজয়ন্তীধারী লাট কর্জ্জন দিল্লী সহরে একটা প্রাচ্য-দরবারের আয়োজন করিতেছিলেন। তাহারই শূন্যগর্ভ আস্ফালনটাকে দেখাইবার জন্য কবি কলিকাতায় কর্জ্জন রঙ্গমঞ্চে (যাহা এখন এলফ্রেড থিয়েটার নামে পরিচিত) "অত্যুক্তি" নাম দিয়া এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। "অত্যুক্তি"র যথোক্তিকে খণ্ড করিয়া দেখাইলে যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয় না। তবে প্রসঙ্গটার পরিচয় যৎকিঞ্চিৎ দেওয়া যায় :—

"পূর্ব্বেকার দরবারে সম্রাটেরা যে নিজের প্রতাপ জাহির করিতেন, তাহা নহে, সে-সকল দরবার কাহারো কাছে তারস্বরে কিছু প্রমাণ করিবার জন্য ছিল না—তাহা স্বাভাবিক ; সে-সকল উৎসব বাদশাহ-নবাবদের ঔদার্য্যের উদ্বেলিত প্রবাহস্বরূপ ছিল। সেই প্রবাহ বদান্যতা বহন করিত, তাহাতে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিত, দীনের অভাব দূর হইত, তাহাতে আশা এবং আনন্দ দূর-দূরান্তরে বিকীর্ণ হইয়া যাইত। আগামী দরবার উপলক্ষ্যে কোন্ পীড়িত আশ্বস্ত হইয়াছে, কোন্ দরিদ্র সুখস্বপ্ন দেখিতেছে? সেদিন যদি কোনো দুরাশাগ্রস্ত দুর্ভাগা দরখাস্তহাতে সম্রাটপ্রতিনিধির কাছে অগ্রসর হইতে চায়, তবে কি পুলিশের প্রহার পৃষ্ঠে লইয়া তাহাকে কাঁদিয়া ফিরিতে হইবে না? তাই বলিতেছিলাম আগামী দিল্লীর দরবার পাশ্চাত্য অত্যুক্তি, তাহা মেকি অত্যুক্তি। এদিকে হিসাব-কিতাব এবং দোকান-দারিটুকু আছে—ওদিকে প্রাচ্যসম্রাটের নকলটুকু না করিলে নয়।" * *

"নিজের সেই অন্তরতম শক্তি আবিষ্কার করিবার জন্য বিধাতা যদি ভারতকে সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত হইতে দেন, তাহাতে শাপে বর হইবে। এমন জিনিষ আমাদের চাই যাহা আমাদের সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত, যাহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। সেই জিনিষটি হৃদয়ে রাখিয়া আমরা যদি কৌপীন পরি, যদি সন্ন্যাসী হই, যদি মরি, সেও ভাল। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। আমাদের খুব বেশী ব্যঞ্জনে দরকার নাই, যেটুকু আহার করিব নিজে যেন আহরণ করিতে পারি, খুব বেশী সাজসজ্জা না হইলেও চলে, মোটাকাপড়টা যেন নিজের হয় এবং দেশকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আমরা যতটুকু নিজে করিতে পারি, তাহা যেন সম্পূর্ণ নিজের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এক কথায় যাহা করিব আত্মত্যাগের দ্বারা করিব, যাহা পাইব আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারা পাইব, যাহা দিব আত্মদানের দ্বারাতেই দিব। এই যদি সম্ভব হয় তো হউক, না যদি হয়, পরে চাকরী না দিলেই যদি আমাদের অন্ন না জোটে, পরে বিদ্যালয় বন্ধ করিবামাত্রই যদি আমাদিগকে গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকিতে হয় এবং পরের নিকট উপাধির প্রত্যাশা না থাকিলে দেশের কাজে আমাদের টাকার থলির গ্রন্থি মোচন যদি না হইতে পারে, তবে পৃথিবীতে আর কাহারও উপর দোষারোপ না করিয়া যথাসম্ভব সত্বর যেন নিঃশব্দে এই ধরাতল হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি। ভিক্ষাবৃত্তির তারস্বরে অক্ষম বিলাপের সানুনাসিকতায় রাজপথের মাঝখানে আমরা যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টি নিজেদের প্রতি আকর্ষণ না করি। যদি আমাদের নিজের চেষ্টায় আমাদের দেশের কোন বৃহৎ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে হে মহামারি, তুমি আমাদের বান্ধব, হে দুর্ভিক্ষ, তুমি আমাদের সহায়।"

বাংলার ইতিহাসে তাহার পর আসে স্বদেশী যুগ। তখন স্বদেশের সহিত যোগসাধনের কর্ম্মচেষ্টায় কবিবর যে-সমস্ত প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেন তাহার প্রধান প্রধানগুলি তিনটি বিভাগে তিনখানি পুস্তিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। জাতীয় আত্মশক্তির তত্ত্বগুলি আছে "আত্মশক্তি"তে, ভারতের নিজস্বতার পরিচয় দিয়াছেন "ভারতবর্ষ"তে, আর কবিতা ও গানগুলি আছে "স্বদেশে"। এতদ্ব্যতীত মাসিক পত্রাদিতে আরও কত লেখা বাহির

হইয়াছে। ভারতের অতীতের ধারাকে কি করিয়া বর্ত্তমানের সমস্যা সমাধানের কর্ম্মশক্তিপ্রবাহে পরিণত করা যায়, জাতির প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও সংস্কারকে কি করিয়া বিকশিত, সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ও প্রাণবন্ত করা যায়, তাহার জন্য সুসম্বদ্ধ চিন্তা ও হৃদয়বান্ প্রেরণা লইয়া এইসকল রচনা গঠিত। বাঙ্গলা ১৩১১ সালের ৭ই শ্রাবণ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ও ১৬ই শ্রাবণ কর্জ্জন রঙ্গমঞ্চে "স্বদেশী সমাজ" পঠিত হয়। "সফলতার সদুপায়" ঐ সনের ঐ চিন্তারই ধারা। ১৩১২ সনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তরঙ্গ উত্তাল হয়। কলিকাতার টাউনহলে ৯ই ভাদ্র কবি "অবস্থা ও ব্যবস্থা" পাঠ করেন। ইহারা "আত্মশক্তি"র এক-একটি স্তরের উন্মেষ। ইহাদের যথার্থ পরিচয় ঐ প্রবন্ধগুলিই। উহাদের ভিতর "আত্মশক্তি"র যে-রূপ কবি দিয়াছেন তাহার পিছনে আছে "ভারতবর্ষে"র পরিচয়। ১৩০৮ সালে "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ" কবির চক্ষে পরিস্ফুট হয় এবং ঐ সনের চৈত্র মাসে "বারোয়ারী মঙ্গলে" দেখান হয় কি করিয়া "ভারতবর্ষের মঙ্গল আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে থাকিয়া য়ুরোপের স্বার্থপ্রধান, শক্তিপ্রধান, স্বাতন্ত্র্য-প্রধান আদর্শের সহিত প্রতিদিন যুদ্ধ করিতেছে।" ১৩০৯ সালের ১লা বৈশাখ কবি বোলপুরে নব-বর্ষকে আহ্বান করিলেন এই বলিয়া—"নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমেয় যৌবন-সমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন স্নান করিতে পায়।" তাহার প্রেরণা আসিল—ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—"জয় হইবে, ভারতবর্ষের জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্ব্বাক তাহারই জয় হইবে।" জ্যৈষ্ঠ মাসে আলোচনা সমিতিতে পাঠ করেন "ভারতবর্ষের ইতিহাস"। দেখাইতে চান "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা প্রভেদের মধ্যেই ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা। বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।" "ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজ-কলেবরকে এক এবং বিচিত্র কর্ম্মের উপযোগী করিয়াছিল। নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগত

লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ-বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় নাই।” কবি আষাঢ় মাসে বিদ্যাসাগর কলেজে পাঠ করেন “ব্রাহ্মণ”। দার্শনিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করেন। মূল বক্তব্যটি ছিল “কর্ম্মিদলকে বরাবর ঠিক পথটি দেখাইবার জন্য, কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে বিশুদ্ধ সুরটি বরাবর অবিচলিতভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য এমন এক দলের আবশ্যক যাঁহারা যথাসম্ভব কর্ম্ম ও স্বার্থ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবেন। তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণেরাই যথার্থ স্বাধীন। ইঁহারাই যথার্থ স্বাধীনতার আদর্শকে নিষ্ঠার সহিত, কাঠিন্যের সহিত সমাজে রক্ষা করেন। সমাজ ইঁহাদিগকে সেই অবসর, সেই সামর্থ্য, সেই সম্মান দেয়। ইঁহাদের এই মুক্তি। ইহা সমাজেরই মুক্তি।” ইহারই পরে আসে ১৩০৯ সালের “অত্যুক্তি”।

“আত্মশক্তি”র প্রবন্ধাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় অসম্ভব। ইহাতে ভারতের উদীয়মান জাতীয় জীবনের মৌলিক তথ্যগুলির একত্র সমাবেশ যেন মণি-মালার মত গ্রথিত। তাহার কিছু কিছু পরিচয় না দিলে অন্যায় হইবে। এইসকল চিন্তার দুইটা দিক্ আছে। পর ও আপন সম্বন্ধে যাথার্থ্য-জ্ঞান। পরধর্ম্ম ভয়াবহ সেইটাকে উপলব্ধি করান এক দিক ও জাতির আত্ম-সম্মানকে জাগ্রত্ করিয়া আত্মশক্তি প্রকাশে যে-আনন্দ আছে তাহার ধারণা জন্মান, অপর দিক।

“রাষ্ট্রনৈতিক চেষ্টায় যে কোন ফল নাই তাহা নহে; কিন্তু সে-চেষ্টা আমাদের সামাজিক ঐক্যসাধনে কিয়দ্দূর সহায়তা করিতে পারে, এই তাহার প্রধান গৌরব।”

“আমরা জানি পার্লামেন্টে তর্ক হয়; সেখানে এক পক্ষ আর-এক পক্ষের জবাব দেয়; সেখানে এক পক্ষ আর-এক পক্ষকে পরাস্ত করিতে পারিলে ফললাভ করিতে পারিল বলিয়া খুসী হয়। আমরা কোনো মতেই ভুলিতে পারি না এখানেও ফললাভের উপায় সে একই।”

“কিন্তু উপায় এক হইতেই পারে না। সেখানে দুই পক্ষই যে বামহাত ডানহাতের ন্যায় একই শরীরের অঙ্গ, তাহাদের উভয়ের শক্তির আধার যে একই। আমরাও কি তেমনি একই? গবর্ণমেন্টের শক্তির প্রতিষ্ঠা

যেখানে, আমাদেরও শক্তির প্রতিষ্ঠা কি সেইখানে? তাহারা যে-ডাল নাড়া দিলে যে-ফল পড়ে, আমরা কি সেই ডালটা নাড়িলেই সেই ফল পাইব? উত্তর দিবার সময় পুঁথি খুলিও না; এ-সম্বন্ধে মিল্ কি বলিয়াছেন, স্পেন্সার্ কি বলিয়াছেন, সীলি কি বলিয়াছেন, তাহা জানিয়া আমার সিকি পয়সার লাভ নাই। প্রত্যক্ষ শাস্ত্র সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া খোলা রহিয়াছে।"

অপর দিকে আত্মশক্তি উন্মেষের পথ প্রদর্শন করিতে যে-বোধ দরকার তাহা তিনি দেখাইতেছেন :—

"সমাজের নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণ-বন্ধনে বাঁধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড় চেষ্টার বিষয়।"

"সভ্যতার যে মহৎ গঠনকার্য্য বিচিত্রকে এক করিয়া তোলা, হিন্দু তাহার কি করিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। এই এক করিবার শক্তি ও কার্য্যকে ন্যাশন্যাল নাম দাও বা যে-কোন নাম দাও তাহাতে কিছু আসে যায় না; মানুষ-বাঁধা লইয়াই বিষয়।"

"আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায় অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর মনুষ্যত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আহারে সংযম ও ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহু দুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেহারা সাত টাকা মাহিনার তিন টাকা পেটে খাইয়া চার টাকা বাড়ী পাঠাইতেছে, পনের টাকা বেতনের মুহুরি নিজে আধমরা হইয়া ছোট ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে—সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ-সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড় করিয়া জানায় নাই—সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্ম্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্ব্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতি আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।"

"আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন। সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোন বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে-কর্ম্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে।"

"কোনো কোনো সামাজিক প্রথাকে অনিষ্টকর জ্ঞান করিয়া আমরা ইংরাজের আইনকে ঘাঁটাইয়া তুলিয়াছি, তাহা কাহারও অগোচর নাই। যেদিন কোন পরিবারের সন্তানদিগকে চালনা করিবার জন্য পুলিসম্যান ডাকিতে হয়, সেদিন আর পরিবার রক্ষার চেষ্টা কেন? সেদিন বনবাসই শ্রেয়ঃ।"

"আমরা নিজের মধ্যে যে স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে-সার্থকতা লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্ত্তনশীল প্রসন্নতার উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয় তবে তাহা পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইতে থাকিবে।"

কবি কেবল কি লিখিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন? তাহা নহে। "বঙ্গভঙ্গ" আন্দোলনের ৩০শে আশ্বিনে নগ্নপদে ভ্রমণ, গঙ্গাস্নান, অরন্ধন ব্রতের ব্যবস্থা দিয়া কবি নিজে তাহা সর্ব্বপ্রকারে পালন করেন। "বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়ে"র নামগানের সহিত সমস্ত রাস্তা তিনি ও নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ অগ্রণী হইয়া যান। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্নানের ঘাটে তিনি সকলের সহিত 'বাংলার মাটী, বাংলার জলে'র জন্য প্রার্থনা করেন। এই 'বাংলার মাটী, বাংলার জল' গান বাংলার নরনারীর হৃদয়ের অন্তরতম প্রার্থনা। তৎপূর্ব্বে 'বিজয়া সম্মিলন' উপলক্ষে কবি প্রথম সেই প্রার্থনা করেন। ১৩১২ সালের বিজয়া দশমীর পরদিবস পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের গৃহে এক সাধারণ সম্মিলন-সভা আহুত হয়। সেই সভায় ইহা পঠিত হয়।

"আমাদের বাংলাদেশের বিজয়া-মিলন বহুকাল পরে আজ একটি দেশপ্লাবী ভাবস্রোতের, সুবৃহৎ ভাবস্রোতের সহিত সঙ্গত হইয়া সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল।"

"আজ বুঝিয়াছি যে-মিলন আমাদিগকে বরদান করিবে, জয়দান করিবে, অভয়দান করিবে সে-মহামিলন গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে নহে,—সে-মিলন দেশে। সে-মিলনে কেবল মাধুর্য্যরস নহে, সে-মিলনে উদ্দীপ্ত অগ্নির তেজ আছে—তাহা কেবল তৃপ্তি নহে, তাহা শক্তি দান করে।"

"আজ হইতে আমাদের সমস্ত সমাজ যেন একটি নূতন তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতেছে। আমাদের গার্হস্থ্য, আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম, আমাদের সমাজ-ধর্ম্ম একটি নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে। সেই বর্ণ আমাদের সমস্ত দেশের নব আশাপ্রদীপ্ত হৃদয়ের বর্ণ। ধন্য হইল এই ১৩১২ সাল—বাংলাদেশের এমন শুভক্ষণে আমরা যে আজ জীবন ধারণ করিয়া আছি আমরা ধন্য হইলাম।"

"আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিলাসে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁহারা বিলাস উপকরণের জন্য লজ্জিত হইতেছেন: যাঁহাদিগকে চপলচিত্ত বলিয়া জানিতাম তাঁহারা কঠিন ব্রত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। যাঁহারা বিদেশী আড়ম্বরের অগ্নিশিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সেই সাংঘাতিক প্রলয়দীপ্তি আর প্রলুব্ধ কবিতেছে না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, আমরা সত্যবস্তুর আভাস পাইয়াছি, সেই সত্যের আবির্ভাব মাত্রেই আমরা বৃহৎ হইয়াছি, বলিষ্ঠ হইয়াছি।"

উপসংহারে কবি করজোড় উত্তোলন করিয়া যখন গম্ভীর স্বরে বিশ্ব-ভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাইলেন তখন সেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, চত্বর, একতল, দ্বিতল, সহস্র সহস্র নরনারীর কণ্ঠ একসুরে গাহিয়া উঠিল, কবির সেই সহজ সরল রচনা ও গান—

বাংলার মাটী বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক, হে ভগবান

বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক, হে ভগবান।

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক, হে ভগবান।

এই "বাংলার মাটী, বাংলার জল" গানের রেশ যে কি পর্য্যন্ত অনুরণিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় ভাষায় দেওয়া অসম্ভব। আর এই গানের সহিত কবিবরের 'সোনার ধানের' সম্পর্ক কি তাহার ব্যাখ্যা বাংলার আর-এক শ্রেষ্ঠ মনীষী করিয়াছেন। ১৩১৮ সালের ১৪ই মাঘ তারিখে কবিবরের পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার যে-সম্বর্দ্ধনা হয় তদুপলক্ষে অভিনন্দনপত্রে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর বলেন :—

"কবিবর, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাংলার মাটী ও বাংলার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামিগণের স্নিগ্ধনেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল, অনুগামিগণের মুগ্ধনেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্‌দেবতার স্মেরাননের শুভ্রজ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদীর পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতা-ভগিনীকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতা-ভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দ-সুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলিপ্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে-ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণপাত করিয়াছ।"

বাঙ্গলার নব-জাগ্রত "আত্মশক্তি"কে উদ্দীপিত রাখিতে ও ন্যায়পথে পরিচালিত করিতে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই সজাগ ছিলেন। সন ১৩১৩ সালের ১৫ই বৈশাখ তারিখে রায় পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের সৌধ-প্রাঙ্গনে আহুত সভায় কবিবর "দেশনায়ক" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তখন সবেমাত্র বাঙ্গলার প্রাদেশিক সম্মিলনীতে বরিশালে লাঠি ব্যবহার হইয়াছিল। এই সভায় বাঙালার সুরেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলেন :—

"বিধাতার কৃপায় পশ্চিম আকাশ হইতে হঠাৎ একটা বড় রকম ঝড় উঠিল। আমাদের দেশহিতের জাহাজটাকে পূবের মুখে হু হু করিয়া ছুটাইয়া চলিল—অবশেষে যেখানে আসিয়া তীর পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম, চাহিয়া দেখিলাম যে, সে আমাদের ঘরের ঘাট। সেখানে নিশান উড়ে না, ব্যাণ্ড বাজে না, কিন্তু পুরলক্ষ্মীরা যে হুলুধ্বনি দিতেছেন, দেবালয়ে যে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। * * * আমরা আজ সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি সেই পশ্চিম বন্দরের সাদা-পাথরে বাঁধানো সোনার দ্বীপে এমন সুস্নিগ্ধ সার্থকতা একদিনের জন্য লাভ করিয়াছেন? এমন আশা-পরিপূর্ণ অমৃতবাণী স্বপ্নেও শুনিয়াছেন? বিধাতার কৃপাঝড়ে সুরেন্দ্রনাথের সেই জাহাজকে যে-ঘাটে আনিয়া ফেলিয়াছে ইহার নাম আত্মশক্তি। * * *

"আজ অনুনয়সহকারে আমার দেশবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, আপনারা ক্রোধের দ্বারা আত্মবিস্মৃত হইবেন না, কেবল বিরোধ করিয়া ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিবেন না। ভিক্ষা করিতে গেলেও যেমন পরের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, বিরোধ করিতে গেলেও সেইরূপ পরের দিকে সমস্ত মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।"

উপসংহারে বলেন—"আমরা সুস্থ হইব, স্বাভাবিক হইব, সংযত, আত্মসংবৃত হইব এবং নিজের চাপল্যবিহীন মর্য্যাদার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া পরের উপেক্ষাকে অকাতরে উপেক্ষা করিতে পারিব।" ইহার পর "ততঃ কিম্" প্রবন্ধ ওভারটুন্ হলে পঠিত হয়। ভারতের মানবতার সহিত আধুনিকতার বিরোধ আছে, তাহা দেখাইতে তিনি বলেন :—

"আমরা কোনদিন এমনতর হাটের মানুষ ছিলাম না। আজ আমরা হাটের মধ্যে বাহির হইয়া ঠেলাঠেলি ও চীৎকার করিতেছি, ইতর হইয়া উঠিয়াছি। কলহে মাতিয়াছি, পদ ও পদবী লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছি, বড় অক্ষরের ও উচ্চকণ্ঠের বিজ্ঞাপনের দ্বারা নিজেকে আর পাঁচজনের চেয়ে অগ্রসর করিয়া ঘোষণা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। অথচ ইহা একটা নকল। ইহার মধ্যে সত্য অতি অল্পই আছে। ইহার মধ্যে শান্তি নাই, গাম্ভীর্য্য নাই, শিষ্টতার শীলতার সংযম নাই, শ্রী নাই।"

ইতিপূর্ব্বে ১৩১১ সালে কবি "প্রার্থনা" প্রবন্ধে জানান :—"ভারতবর্ষকে এই কথাই কেবল মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য আলোক অমৃতই প্রার্থনার সামগ্রী—বিষয়ানুরাগই হউক আর দেশানুরাগই হউক আপনার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়ে যেখানেই এই সত্য, আলোক ও অমৃতকে অতিক্রম করিতে চাহে সেইখানেই তাহাকে অভিশাপ দিয়া বলিতে হইবে—'বিনিপাত'। বলা কঠিন, প্রলোভন প্রবল, ক্ষমতার মোহ অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য ; তবু ভারতবর্ষ এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

"অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

তাহার পর বয়কট আন্দোলনও সংযত করিয়া রাখিতে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। তিনি নানা স্থানে সংবাদ গ্রহণ করিয়া 'সদুপায়' প্রবন্ধে বলেন—

"* * * * বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। * * * * একটি কথা আমরা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই, অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। * * * * দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্খানে ঠেকাইব ? * * * * প্রশস্ত ধর্ম্মের পথে চলাই নিজের

শক্তির প্রতি সম্মান। * * কিন্তু ধর্ম্মের পথ দুর্গম—দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, ইহার পাথেয় সংগ্রহ করিতেই আমাদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে; ইহার পারিতোষিক অহংকার-তৃপ্তিতে নহে, অহংকার বিসর্জ্জনে; ইহার সফলতা অন্যকে পরাস্ত করিয়া নহে, নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া।"

তৎপরে "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে ইহার আর-একটা দিক দেখান হইয়াছে—"শত্রুতাবুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলি বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া ঐ পরের দিক হইতে ভ্রূকুটি-কুটিল মুখটাকে ফিরাও। আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারা বর্ষণে তাপশুষ্ক তৃষ্ণাতুর মাটির উপরে নামিয়া আসে তেমন করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এস, নানা দিগভিমুখী মঙ্গল চেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্ব্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেল।" এই প্রবন্ধের উপসংহারে কবি জানাইয়া দেন যে, "এই ভারতের মহামানবের মিলনতীরে" এক "অতি বৃহৎ অতি মহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রায়েই" জটিল বৈচিত্র্য, প্রবল বিচ্ছেদ ও বিরোধ-সঙ্কুল বৈপরীত্য-সমাবেশ একত্র "আহরিত হইয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে গেলে নিজেই আহত হইব, তাহার কিছুই করিতে পারিব না"।

১৩১৪ সালে কবিবর পাবনায় বাঙ্গলার প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি হন। সেখানে তিনি দেশের নবজাগ্রত যুবকগণকে যে-আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন তাহা চিরস্মরণীয়:—

"বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশের যে-সকল দৃঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সঙ্কট উপেক্ষা করিয়াও স্বদেশহিতের জন্য স্বেচ্ছাব্রত ধারণ করিতেছেন, অদ্য এই সভাস্থলে তাঁহারা সমস্ত বঙ্গদেশের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। রক্তবর্ণ প্রত্যূষে তোমরাই সর্ব্বাগ্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক দ্বন্দ্বসংঘাত এবং অনেক দুঃখ সহ্য করিলে। * * * হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত ভারত-বিধাতার প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া এই নিবেদন করিতেছি যে, দেশে অর্দ্ধোদয়যোগ কেবল এক দিনের নহে।"

বলা বাহুল্য, ঐ অধিবেশনের কিছু পূর্ব্বেই বাঙ্গলাদেশে অর্দ্ধোদয় স্নান উপলক্ষ্যে প্রথম ব্যাপকভাবে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত হয়।

ঐ অভিভাষণে কবির আর দুইটি উক্তিও স্মরণীয় করিয়া রাখা উচিত। কংগ্রেস সম্বন্ধে তিনি বলেন—

"সমস্ত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা যে মহাসভায় আমাদের ইচ্ছাশক্তির বোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এমন ঔদার্য্য যদি না থাকে যাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণী ও সকল মতের লোকই সেখানে স্থান পাইতে পারেন, তবে তাহাতে আমাদের ক্ষমতার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়।"

"রাষ্ট্রসভাতেও নিয়মের দ্বারা সংযত হইয়া প্রত্যেক মতকেই প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিতে না দিলে এরূপ সভার স্বাস্থ্য নষ্ট, শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ভবিষ্যৎ পরিণতি সঙ্কীর্ণ হইতে থাকিবে। যে-সকল মহাপুরুষ দীর্ঘকালের কঠোরতম সাধনার দ্বারা স্বজাতিকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিব।"

আমি এই "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা"র উপকরণ সাজাইতে যে অনুষ্ঠানে "সোনার ধান" সংগ্রহ করিতেছি, কবিবরের অন্তরের আর-একটি প্রেরণার দিক না দেখাইলে এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে আমাদের জাতীয় জীবনের অনুকূল নহে, তাহার অনুভূতি "সাধনা"র আরম্ভ হইতে রবীন্দ্রনাথ পাইতেছিলেন বহু লেখায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। যখন বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে তাঁহার অনুভূতির সুর সাধারণ বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত দেখিলেন, তখন কবির বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা গতিশীল হইল। ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের প্রথমেই "মফস্বল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ এক ন্যায়বিগর্হিত সুবুদ্ধিবিবর্জ্জিত সার্কুলার জারি করিলেন"। ইহাই বিখ্যাত কার্লাইল সার্কুলার। "প্রবর্ত্তক কারণ নিতান্ত তুচ্ছ ও সাময়িক হইলেও তাহার ফল বৃহৎ ও স্থায়ী হইয়া থাকে"। এই আশায় কবিবর বহুদেশে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য অনেকগুলি সভা-সমিতিতে যোগদান করেন। প্রথম বিরাট সভা হয় বিডন উদ্যানে। দ্বিতীয় সভা

হয় ১৩১২ সালের ১৬ই কার্ত্তিক ফিল্ড এণ্ড একাডেমীতে। তিনি বলেন—"গভর্ণমেন্ট যদি দুই দিন পরে এই পরওয়ানা প্রত্যাহারও করেন, তবু যেন আমরা ইহার শিক্ষাটি কখনো ভুলিয়া না যাই। আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।" ইহার পর ১৯এ কার্ত্তিক "ডন সোসাইটি"তে ছাত্রদিগকে যে সাবধান বাণী কবি শুনাইলেন তাহা ভবিষ্যদ্বাণী—"আজ যে-সকল ছাত্র গবর্ণমেন্টের কৃত অপমানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে যে কুসুমাস্তৃত পথ রহিয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহাদিগকে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া ভবিষ্য বংশীয়দিগের জন্য পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। ছাত্রেরা কি তাহাতে প্রস্তুত আছেন?" অতঃপর আট-দশটি সভার পরিণতিতে ৩০এ কার্ত্তিক ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনে নেতৃগণের মন্ত্রণা-সভায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প স্থির হয়। এই সব ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য ছিল—"আপনারা নিজের আদর্শের কাছে, স্বদেশের কাছে, ঈশ্বরের কাছে সত্য থাকিবেন, তাহা হইলে কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে না।" কবিবর অন্য প্রসঙ্গে যে-কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই ক্ষেত্রে কখনও ভুলেন নাই—"দেশের অন্ধকার পরম দুঃখ-দারিদ্র্যের দিনে যে-কোনো মঙ্গল কর্ম্মের প্রতিষ্ঠান আমরা রচনা করিয়া তুলিতে পারিব, তাহা শুদ্ধমাত্র কাজের আপিস্ হইবে না, তাহা তপস্যার আশ্রম হইয়া উঠিবে—সেখানে আমাদের প্রত্যেকের নিঃস্বার্থ সাধনার দ্বারা সমস্ত দেশের বহুকাল-সঞ্চিত অকৃত কর্ত্তব্যের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইতে থাকিবে।" ভারতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে কবিবর এই আশ্রম-আদর্শকেই প্রাধান্য দেন। ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে "শিক্ষা সমস্যা" প্রবন্ধে কথাটাকে আরও বিশদ করেন—"দস্তুর মত একটা ইস্কুল ফাঁদার চেয়ে জ্ঞানদানের উপযুক্ত আশ্রম স্থাপন কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কঠিনকে সহজ করাই ভারতবর্ষের কাজ হইবে। কারণ, এই আশ্রমের আদর্শ আমাদের কল্পনা হইতে এখনো যায় নাই এবং য়ুরোপের নানাপ্রকার বিদ্যাও আমাদের গোচর হইয়াছে। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের

প্রণালীর মধ্যে আমাদিগকে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে। ইহাই যদি না পারিলাম, তবে কেবলি নকলের দিকে মন রাখিয়া আমরা সর্ব্বপ্রকারে ব্যর্থ হইব। * * * যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয়, সেই-খানেই আমরা শিখিতে পারি; যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্ত সাধনা, সেইখানেই আমরা শক্তি লাভ করি; যেখানে সম্পূর্ণ-ভাবে দান, সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর; যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চ্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত, সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাবিহীন, অন্তরে সেই-খানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত; ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্ম্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক; আর যেখানে কেবল পুঁথি ও মাষ্টার, সেনেট্ ও সিণ্ডিকেট্, ইটের কোঠা ও কাঠের আসবাব, সেখানে আজও আমরা যত বড় হইয়া উঠিয়াছি কালও আমরা তত বড়টা হইয়াই বাহির হইব।" ঐ সনের ১৯এ শ্রাবণ কলিকাতা টাউন্ হলে, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইবার পর, এক বিরাট সভা হয়। তথায় কবি "জাতীয় বিদ্যালয়" প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার এই প্রবন্ধ ভৈঁরো সুরের জাগরণী। অনেকেই তাহা পড়িয়াছেন, তথাপি একটা মৌলিক আলাপ পুনরাবৃত্তি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—"জাতীয় বিদ্যালয় আবৃত্তিগত ভীরু বিদ্যার গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া আমাদের বন্ধন-জর্জ্জর বুদ্ধির মধ্যে উদার সাহস ও স্বাতন্ত্র্যের সঞ্চার করিয়া যেন দেয়। পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে আমাদের যে-কথাটি না মিলিবে, তাহার জন্য আমরা যেন লজ্জিত না হই। এমন কি, আমরা ভুল করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিব না। কারণ, ভুল করিবার অধিকার যাহার নাই, সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধি-কারও সে পায় নাই। পরের শত শত ভুল জড়ভাবে মুখস্থ করিয়া রাখার চেয়ে সচেষ্টভাবে নিজে ভুল করা অনেক ভাল। কারণ, যে-চেষ্টা ভুল করায়, সেই চেষ্টাই ভুলকে লঙ্ঘন করাইয়া লইয়া যায়। যাহাই হউক, যেমন করিয়াই হউক, শিক্ষার দ্বারা পূর্ণ পরিণত আমরাই হইব। আমরা যে ইংরেজি লেক্‌চারের ফনোগ্রাফ, বিলিতি অধ্যাপকের শিকল-বাঁধা দাঁড়ের পাখী হইব না—এই একান্ত আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া

আমি আমাদের নূতন-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যামন্দিরকে আজ প্রণাম করি।"

ইহার পরও কবি শিক্ষা-স্বাতন্ত্র্যের অভীপ্সা বিসর্জ্জন দেন নাই। তাহারও নিদর্শন আছে—

১৩১৮ সালের কার্ত্তিক মাসের মধ্যভাগে (২৯এ অক্টোবর) চৈতন্য লাইব্রেরীর এক বিশেষ অধিবেশনে রিপন কলেজ হলে স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে কবিবর "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার কথাতেই বলি:—

"আপনার পার্থক্য যখন মানুষ যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তখনি সে বড় হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। আপনার পার্থক্যের প্রতি যাহার কোনো মমতা নাই, সেই হাল ছাড়িয়া দিয়া দশের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। নিদ্রিত মানুষের মধ্যে প্রভেদ থাকে না—জাগিয়া উঠিলেই প্রত্যেকের ভিন্নতা নানা প্রকারে আপনাকে ঘোষণা করে। বিকাশের অর্থই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ। বীজের মধ্যে বৈচিত্র্য নাই। কুঁড়ির মধ্যে সমস্ত পাপড়ি ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া এক হইয়া থাকে—যখন তাহাদের ভেদ ঘটে তখনি ফুল বিকশিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক পাপড়ি ভিন্ন ভিন্ন মুখে আপন পথে আপনাকে যখন পূর্ণ করিয়া তোলে তখনি ফুল সার্থক হয়।............

"হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয় তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাতেই বস্তুতঃ স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে।............

"হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কি ভাবে আরম্ভ হইতেছে, কিরূপে দেহ ধারণ করিতেছে, সে-সম্বন্ধে মনে কোনো সংশয় রাখিতে চাই না। সংশয় যদি থাকে তবে সে যেন নিজের সম্বন্ধেই থাকে; সাবধান যদি হইতে হয় তবে নিজের অন্তরের দিকেই হইতে হইবে। কিন্তু আমার মনে কোনো দ্বিধা নাই। কেন-না, আলাদীনের প্রদীপ পাইয়াছি বলিয়া আমি উল্লাস করিতেছি না, রাতারাতি একটা মস্ত ফল লাভ করিব বলিয়াও আশা

করি না। আমি দেখিতেছি, আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়াছে। মানুষের সেই চিত্তকে আমি বিশ্বাস করি, সে ভুল করিলেও নির্ভুল যন্ত্রের চেয়ে আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি।"

কবিবরের জাগ্রত চিত্ত "সাধনা"কে আশ্রয় করিয়া যে-শস্য সংগ্রহে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাকেই আমি তাঁহার জীবন-তরণীর "সোনার ধান" বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় তাহা "দেব-প্রসাদের আনন্দ-সুধা।"

এখন আমারে লহ করুণা ক'রে

আমরা কবির অনেক লেখার ভিতর এই করুণ সুরটি পাই। ইহার তত্ত্বটি আছে "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতাটিতে। স্বর্গ চাহি না—কেন? মর্ত্ত্যের ক্ষুদ্র খণ্ড স্বর্গগুলি তদপেক্ষা প্রিয়তর। কেন-না, মর্ত্ত্যের কুটীর-বাসিনী পল্লী-বালাও—

> রাখিবে সঞ্চয় করি' সুধার ভাণ্ডার
> আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
> নদীকূলে শিবমূর্ত্তি গড়িয়া সকালে
> আমারে মাগিয়া লবে বর।

এই মমত্ব, এই মানবতার সহিত সহজ-সম্পর্ক-রক্ষা, দুঃখ-বেদনা-ব্যথা-ভরা সংসারের করুণ আবেদন, কবির লেখার একটা বিশেষত্ব। সেই করুণ ভাবের সার্থকতাই হইল সর্ব্বদাই করুণতার বিনিময়ে, এবং প্রেমের পারম্পর্য্য-রক্ষায়। প্রথম বয়সে কবি যখন লিখিলেন—আজ আস্‌বে শ্যাম, গোকুলে ফিরে—তখন ভাবনা রহিল—কি গান গাইবো, কি বেশ পর্‌বো, কি মালা গাঁথবো। আবার প্রবীণ বয়সে যখন "ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া, সব পাওয়া" এই আকাঙ্ক্ষা জাগিল, তখনও মন ভাবিল—

> "কোন্ সুরে আজি বাঁধিব যন্ত্র, কি মন্ত্র হবে গাওয়া।"

এইটাকে বৈদেশিক সমালোচক বলেন—হিউম্যানিজ্‌ম্।

শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি

কবি "ছিন্নপত্রে" ইহার একটা সরল ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

"নৌকো ক'রে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে যেন আরো একটু বেশি করুণা আছে। অনেকটা যেন মৃত্যুর মত—তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া—যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। জানি, এই গভীর বেদনাটুকু, যারা রইল এবং যে গেল উভয়েই ভুলে যাবে। বেদনাটুকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী, কিন্তু ভেবে দেখ্‌তে গেলে এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্য—বিস্মৃতি সত্য নয়। এক-একটা বিচ্ছেদ ও এক-একটা মৃত্যুর সময় মানুষ সহসা জান্‌তে পারে, এই ব্যথাটা কি ভয়ঙ্কর সত্য। জান্‌তে পারে যে, মানুষ কেবল ভ্রম-ক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকে। কেউ থাকে না—এবং সেইটে মনে কর্‌লে মানুষ আরো ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। কেবল যে থাক্‌বো না তা' নয়, কারো মনেও থাকবো না। একেবারে আমাদের দেশের করুণ রাগিণী ছাড়া সমস্ত মানুষের পক্ষে আর কোন গান সম্ভবে না।" এইটাই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে ঐ একটি লাইনে। প্রশ্ন ওঠে, কবিতার দিক্ দিয়া এটা সত্য হইলেও কবির দিক্ দিয়া এটা সত্য কি? আমাদের মনে হয়, তাঁহার জীবন-দেবতাকে কাণ্ডারী করিয়া তাঁহার তরণী'পরে তাঁহার 'সোনার ধানের পার্শ্বে তাঁহার স্থান চিরদিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেন-না "করম সঙ্গে চলি যায়।" তিনি দেশের "পথ ও পাথেয়" চিনাইয়াছেন, সে-কর্ম্মে কি তাঁহার পাথেয় সংগ্রহ হয় নাই? "ছিন্নপত্রে" তাঁহার আস্থাপূর্ণ হৃদয় সে "আভাস" পাইয়াছিল—"আমার পক্ষে একটা স্থায়ী নিত্য সম্বল, আমার সমস্ত জীবন-খনিজ-গলানো খাঁটি সোনাটুকু, আমার সমস্ত দুঃখকষ্টের তুষের ভিতরকার অমৃত শস্যকণা; সেটাকে যদি কখনো পরিস্ফুট ক'রে পাই তা' হ'লে সে আমার টাকা-কড়ি, খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি হয়। যদি সম্পূর্ণ নাও পাই তবু সেই দিকে চিত্তের অনিবার্য্য স্বাভাবিক প্রবাহ সেও একটা পরম লাভ।"

তবে "যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী" তাহাই কি হইবে? সে

আক্ষেপ কি আমাদের করিতে হইবে যে, "শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি' ?" কবি নিজেই শিখাইয়াছেন—"অল্প লইয়া থাকি তাই যাহা যায় তাহা যায়।"

যখন "বহিয়া যেতেছে সুসময়" তখনই যদি আমরা "ঘাটে 'আনমনা'"ই বসিয়া থাকি, তবে আমাদের শূন্য নদীর তীর হইতে কেবলই সন্ধ্যার বিদায়-রাগিণী পূরবীতে গাহিতে হইবে :—

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
পার করে নাও, পার করে নাও,
পার করে নাও, খেয়ার নেয়ে।

আমাদিগকে যেন সে আক্ষেপ না করিতে হয়, সেই পড়িয়া থাকার দুঃখ না পাইতে হয় ; তাই কবির পূর্ণ জীবনের ভূমার পূজার উপকরণ সাজাইয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। আমার চক্ষে 'সোনার তরী'র সোনার ধান ফলভারনত কদলী-বৃক্ষের ন্যায় মাঙ্গলিক, ধরণীর মৃত্তিকালিপ্ত দূর্ব্বাদলের মত অমর ও দিগন্ত-বিস্তৃতি-শক্তি সম্পন্ন,—আর ধান্যের মত এক হইতে বহু হইবার প্রাণে প্রাণবান।

কবি রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১)

কোন্ মধু কৌমুদীতে কোন্ শুভক্ষণে
অভিসারিকার বেশে কবিতা-সুন্দরী
বাহিরিয়াছিল বঙ্গে। নূপুর গুঞ্জরি'
পরাইল তব গলে সুহাস্য আননে
পারিজাত-মালা তা'র। তব ছন্দে ছন্দে
ঢালি' দিল, হে রবীন্দ্র, তব প্রণয়িনী
শিঞ্জিনীর তাল তা'র। বিপুল আনন্দে
বহাইল তব হৃদে কাব্য-মন্দাকিনী।
তব প্রণয়িনী-দেহে যত অলঙ্কার
তাই দিয়া সাজাইলে তব চিত্ত-ছবি,
কিঙ্কিণীর কঙ্কণের মধুর ঝঙ্কার
মুখর করিল তব, হে সুন্দর কবি,
মরমের ব্যথা সব। আপনা পাসরি'
তোমারে সেবিল নিজে কবিতা-সুন্দরী।

(২)

তব স্বর্ণতরী মাঝে কে ধরেছে হাল?
চিনি চিনি আমি তারে, হে বরেণ্য কবি,
তব প্রাণ-বঁধু সে যে উষা সন্ধ্যাকাল
তোমারি আঁখির পাতে আঁকিয়াছে ছবি,
তাই তব ক্ষেপণীর তালে তালে তালে
বাজিল এ মধু সুর, তাই হর্ষভরে
বাহি' গেলে তরী তব দিগন্তের ভালে
ক্লান্তিহীন অবিরাম পুলক-অন্তরে।

যবে তুমি খেয়া-নায়ে দিতেছিলে পাড়ি
নিঝুম দুপুরবেলা বাউলের সুরে
তব পাশে কে গো বসি' নিতেছিল কাড়ি'
ক্লান্তি তব। স্বপ্ন ঢালি' তব অন্তঃপুরে
দিতেছিল, জানি আমি দৃষ্টিখানি কার
কবিতা-সুন্দরী সে যে বঁধুয়া তোমার।

(৩)

শারদ গগন তলে শুভ্র কৌমুদীতে
শিশু হ'য়ে কার মুখে কথা-কাহিনীর
শুনেছিলে গাথা কবি। মোহন সঙ্গীতে
কে জাল বুনিয়াছিল শত শতাব্দীর!
জানি আমি সে যে তব জীবন-রঙ্গিণী,
কবিতা-সুন্দরী, সে যে তব পূজাঘরে
নৈবেদ্যের থালিখানি কত হর্ষভরে
দিল সাজাইয়া হ'য়ে তব পূজারিণী।
এ নৈবেদ্য কভু, কবি, হয় না বিফল,
গীতাঞ্জলি তব নাহি হবে সুরহীন,
এ নৈবেদ্য বিশ্বপতি-চরণ-কমল
পরশ করেছে গিয়া, হইয়াছে লীন
তব সঙ্গীতের সুর বহু ঊর্দ্ধলোকে
তাঁরি পাদপদ্মমূলে পুলকে আলোকে।

(৪)

কৃষ্ণ মেঘবুকে যবে বলাকার সারি
উড়ে যায় প্রাবৃটের মেদুর আকাশে
তোমার আঁখির পাতে ফোটে অশ্রুবারি,

সহস্র কল্পনা বুঝি মিশায় বাতাসে।
তাই সত্য হ'য়ে ওঠে তাজের স্বপন
সাজাহান সম্রাটের দুরন্ত দুরাশা,—
নশ্বর মহীরে দিতে অমৃতের ভাষা
কঠিন প্রস্তরে কাটি' অশ্রুর লেখন।
একদিকে সাজাহান অন্যদিকে তুমি
ভারতের ভারতীর যুগল সম্রাট,
ব্যথায় পুলকে ভরি' দিলে চিত্ত-ভূমি
নিখিল বিশ্বের ভেদি' বক্ষের কবাট।
তাজের কবিতা আর কবিতার তাজ
সত্য করি' দিলে দুই রাজ-অধিরাজ।

কবি-সার্ব্বভৌম

—শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথ গদ্যে পদ্যে শিল্পে সঙ্গীতে আপনার যে-পরিচয় দিয়েছেন সাধারণের কাছে তা' অগোচর নেই। কিন্তু তাঁর মানস-প্রকৃতির ঐক্য-তত্ত্বটি উদ্ভাবন ক'রতে যদি চাই তবে অপেক্ষাকৃত অজানা পথে তাঁর জীবনের গতি অনুসরণ ক'রলে ফল পাওয়া যাবে। সেই উদ্দেশেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মানুষের লাইব্রেরিতে তা'র মনের ভাবটি ধরা পড়ে। শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারের অনেক গ্রন্থই রবীন্দ্রনাথের নিজের বই, তাঁর নামাক্ষর-চিহ্নিত, তাঁর নিজের হাতের নোট-সম্বলিত। সেই পুস্তক-লোকে প্রবেশ ক'রে দেখা যাক্ কবির ব্যক্তি-স্বরূপের কোনো নূতন আভাস পাওয়া যায় কি না।

প্রথমেই চোখে পড়ে শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা দেশের গ্রন্থে কবির অনুসন্ধান। যখন তিনি এই আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখনকার কালে ইংরেজি বা ইংরেজিতে অনূদিত নামজাদা যে-কোনো বই বেরিয়েছিল প্রায় তা'র কোনোটাই বাদ পড়েনি। কত নাম করব? বীম্‌স্, বপ্, ব্রুগ্‌মান্, হর্ণ্‌লে; ফ্রাঙ্ক্‌ফুর্টর্-এর বিপুলায়তন পুঁথি তাঁর পঠিত, চিল্‌ডর্সের পালি অভিধান, বেইলির ইউএরিয়ান্ রূট্‌স্, ব্রেইলের সেমান্টিক্‌স্ ছিল তাঁর অবসরের সঙ্গী। আধুনিক কালেও দেখা গেছে মণিয়র্ বিলিয়াম্‌সের সংস্কৃত-ইংরেজি ডিক্সনরি তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ ক'রতে বসেছেন। এও তাঁর ছুটির পড়া অর্থাৎ একাগ্র অধ্যয়নের বস্তু।

কিন্তু ভাব্‌লে পরে এটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। চিরদিন যিনি ভাষার জাদুশক্তিকে ব্যবহারে লাগিয়েছেন তিনি শব্দ-রহস্যে গভীর ঔৎসুক্য অনুভব করবেন, এটা স্বাভাবিক। কেবল মাতৃভাষায় নয়, বিভিন্ন ভাষার শব্দ-রাজ্যে তিনি বিচরণ ক'রেছেন তা'র প্রাণের রূপের ও ধ্বনির পরিচয় খুঁজে'। বাংলা ভাষাতত্ত্ব-ভাণ্ডারের কুলুপ একদা তিনিই প্রথম খুলে-ছিলেন। শব্দতত্ত্বান্বেষী রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ পরিচয় যোগ্যতর লেখনীর অপেক্ষায় রইল।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে শিশুকাল হ'তে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ জেগেছিল তাঁর পিতার উৎসাহে। মহর্ষিদেব হিমালয়-বাসকালে কবি-বালকের বিস্মিত মনে গভীর চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন, "জীবন-স্মৃতিতে" সে-কথা আছে। বোধ হয় তাঁর প্রথম গদ্য লেখা জ্যোতিষ্কদের নিয়ে। জ্যোতিষীরা আকাশে কোনো নূতন গ্রহতারা খুঁজে বের ক'রে তাকে তালিকাভুক্ত ক'রতে পারলে যেমন খুসি হন, কবি থ্যাকারের দোকানে কোনো নূতন জ্যোতিষের গ্রন্থ আবিষ্কার ক'রে শেল্‌ফে তুলতে পারলে তেমনিই খুসি হ'য়ে উঠ্‌তেন। গণিতশাস্ত্র আয়ত্ত না থাকলে সচরাচর এ-বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অভাব ঘটে, কিন্তু কবির সহজাত অন্তর্দৃষ্টি কোন্ পথে পরমাণুতত্ত্ব হ'তে সৌর জগতের মর্ম্ম-পরিচয়ে গিয়ে পৌঁছয়, তা'র সাক্ষ্য দেবে "আমার জগৎ" জাতীয় প্রবন্ধ, এবং অনেক গদ্য রচনা, কবিতা, মন্দিরের উপদেশ। Religion of Man গ্রন্থে কবি এ-বিষয়ে নূতন দিক থেকে আলোচনা ক'রেছেন। জ্যোতির্লোকের আহ্বানে কবির অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধ বিরাট বিশ্বের মধ্যে একটি পরম মানব-সত্তার স্পর্শ সন্ধান ক'রবে এতে আশ্চর্য্য কিছু নেই।

তাঁর গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যে দেখা যায় Huxley-র সমগ্র গ্রন্থাবলী। এগুলিও তাঁর অল্প বয়সের কেনা। শুধু কেনা নয় পড়া। তখন এর সমস্ত তত্ত্বই সম্পূর্ণ বুঝেছিলেন ব'লে আশা করিনে, কিন্তু সাধ্যমতো খুঁজেছিলেন। তাঁর মন তাতে গাঢ় আনন্দের সঙ্গে নিবিষ্ট হয়েছিল, এ-কথা তাঁরই কাছে শুনেছি। প্রাণের আত্মপ্রকাশ, কেবল রূপের রসের মধ্যে দিয়ে নয়, জীববংশের বিচিত্র অভিব্যক্তির ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁর কৌতূহলকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। একই সময়ে বিশ্বের জ্যোতির্লোকে ও প্রাণলোকে তাঁর উৎসুক চিত্ত সঞ্চরণ ক'রেছিল। বোধ করি এই দুইকেই এক ক'রে তিনি অখণ্ড বিশ্বরূপের অভিমুখে চৈতন্যকে প্রসারিত ক'রেছিলেন। প্রাণের আনন্দ কবিকে জীবরাজ্যের আদিতত্ত্ব, তা'র ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্তে আকৃষ্ট করবে, এও বিচিত্র নয়। তিনি বিজ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে জড়ধর্ম্মী জগৎকে যন্ত্রবৎ দেখেননি, সর্ব্বত্র প্রাণের মহিমাকেই জেনেছেন। এই পথ দিয়েই তাঁর পরমবন্ধু আচার্য্য জগদীশের সঙ্গে তাঁর

অন্তরের মিলন ঘটেছিল। কবি এবং বৈজ্ঞানিক সেই ঋষির মন্ত্রে সহজ দীক্ষা পেয়েছিলেন, যিনি ব'লেছেন, "যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।" কবির স্বাভাবিক ব্যগ্রতা ছিল মানব-চৈতন্যের স্বকীয় আদর্শে সমস্ত সৃষ্টিকে আত্মীয় ক'রে জান্‌তে। কবির সমগ্র রচনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তাঁর এই ব্যগ্রতা অবান্তর জিনিষ নয়।

তাঁর ঔৎসুক্যের আর-একটি বিষয় এই গ্রন্থাগার থেকে ধরা পড়ে; সেটি সাধারণের কাছে অজ্ঞাত, এবং শুন্‌তে সেটা সামান্য ও আকস্মিক মনে হ'তে পারে, কিন্তু তা'র মধ্যেও তাঁর চিত্তবৃত্তির একটা গভীর তাৎপর্য্য পাওয়া যায়। সে তাঁর হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসার সাধনা। তাঁর সেই বহুবার পঠিত ব্যবহৃত হোমিয়োপ্যাথির বিবিধ বই লাইব্রেরিতে দেখেছি। যথা, অ্যালেনের এন্‌সাইক্লোপীডিয়া, কেণ্টের রেপার্টরি, ন্যাশের লীডার, কেরির তিন খণ্ড মেটিরিয়া মেডিকা, কৌপরথোয়েটের থেরাপ্যুটিক্‌স্‌, ফ্যারিংটনের মেটিরিয়া মেডিকা, ইত্যাদি। তাঁদের বাড়িতে সে-সময়ে হোমিয়োপ্যাথির প্রথম পরিচয় নিয়ে আসেন মহেন্দ্রলাল সরকার ও রাজেন্দ্র দত্ত। সুদীর্ঘকাল থেকে হোমিয়োপ্যাথি যে বিনা বিরোধেই তাঁর চিত্ত অধিকার ক'রেছিল তা'র গভীরতর কারণটি সহজেই অনুমান করা যায়। হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধের মধ্যে বস্তুর স্থূল ধর্ম্ম নেই, আছে তা'র সূক্ষ্ম বেগ। মনে হয় যেন ওষুধগুলির মধ্যে বস্তুর আত্মা আছে শরীর নয়। বস্তুতত্ত্বের যে নূতন আবিষ্কার হয়েছে তাতে এখন আর এ নিয়ে পরিহাস চলবে না।

শরীরের 'পরে হোমিয়োপ্যাথি ওষুধের আশ্চর্য্য ও আশু ক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি বারবার নিঃসংশয় প্রমাণ পেয়েছেন ব'লে তাঁর বিশ্বাস। তিনি গল্প করেন, একদিন তাঁদের বাড়িতে একজন বিলাত-ফেরৎ এলোপ্যাথ্‌ ডাক্তারকে চিকিৎসার কাজে রাত্রিযাপন ক'রতে হয়েছিল। তাঁকে আরাম ক'রে বিছানায় শুতে বলাতে তিনি ব'ল্‌লেন তাঁর ঘাড়ে একটা ফোড়া হওয়াতে তারি বেদনায় তিনি বালিশে মাথা নামাতে পারছেন না, খাড়া ব'সে থাকতে হ'চ্ছে। কবি তাঁকে প্রশ্ন ক'রলেন, তোমাদের শাস্ত্রে কি এমন কোনো উপায় আছে যাতে এই যন্ত্রণার প্রতিকার করা যায়।

তিনি ব'ল্‌লেন, পাকিয়ে ফাটানো বা অস্ত্র করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই, কিন্তু সে সময়-সাপেক্ষ। বারবার এই কথাটা স্বীকার করিয়ে নিয়ে কবি তাঁকে ওষুধ দিলেন। কখন্ তাঁর মাথা গভীর নিদ্রায় আপনি নুয়ে প'ড়ে আরাম-কেদারায় হেলে পড়ল তিনি টেরও পেলেন না। সকালে জেগে উঠে এত বিস্মিত হলেন যে, হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ ও বই কেনবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। কিনেও ছিলেন, কিন্তু বিশেষ কাজে লাগ্‌ল না। খাঁড়া চালানো অভ্যাস যার, তা'র হাতে তীর চলে না।

হোমিয়োপ্যাথিতে একটি প্রধান চিন্তনীয় বিষয় এই যে, এই শাস্ত্রে প্রাণের সঙ্গে মনের একান্ত যোগ স্বীকৃত হয়েছে। এইজন্যে এ-চিকিৎসায় দেহের রোগের সঙ্গে মনের লক্ষণ মিলিয়ে দেখা হয়। রোগীর স্বভাব, মেজাজ, তা'র ইচ্ছা, রুচি, স্বপ্ন, প্রবৃত্তি সমস্তটা একত্র ক'রে তবে রোগের স্বরূপ নিরূপণ হয়। মানুষের প্রকৃতি যেমন তা'র দেহ-মনকে জড়িয়ে, মানুষের বিকৃতিও তেমনি; রোগ সেই বিকৃতি, তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখ্‌লে তা'র সম্পূর্ণ রূপটি দেখা যায় না। হোমিয়োপ্যাথিতে রোগ ও স্বাস্থ্য দৈহিকেই পর্য্যাপ্ত নয়, তা'র সঙ্গে মনও মিলিত—এই তত্ত্বেই কবি বিশেষ তৃপ্তি পেয়েছেন, সন্দেহ নেই। কারণ, যাঁরা তাঁর লেখা ভালো ক'রে পড়েছেন তাঁরা জানেন সত্যকে খণ্ডিত ক'রে দেখা তাঁর নয়, সমগ্রকে স্বীকার করবার আগ্রহ তাঁর নানা রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। এমন-কি, রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেশাত্মবোধের সঙ্গে মানবাত্মবোধকে গ্রহণ না ক'রে তিনি তৃপ্তি পাননি। বৈজ্ঞানিকভাবে নয়, চিন্তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বশতঃই কবি হোমিয়োপ্যাথিক্ চিকিৎসার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁকে পদবী অনুসারে চিকিৎসক বল্‌লে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে, যদিও হোমিয়োপ্যাথি শাস্ত্রে তিনি ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন এবং অভ্যাস অল্প বয়স হ'তেই ক'রে এসেছেন।

আশ্রম-গ্রন্থালয়ের প্রসাদে কবির মানসিক অভ্যাস সম্বন্ধে এইরূপ বিচিত্র অপ্রত্যাশিত তত্ত্বের সন্ধান যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখায় তাঁর দীপ্তদৃষ্টি প'ড়েছে, দুর্গম জ্ঞানলোকে তিনি অবাধে সঞ্চরণ ক'রেছেন। বাল্যকালেই যিনি বিজ্ঞার

কারাগার হ'তে পলাতক, তিনি সমগ্র জীবন কী কঠিন অধ্যবসায়ে বাণীর মন্দিরে একনিষ্ঠ সেবার ব্রত রক্ষা ক'রেছেন, ভাব্‌লে বিস্মিত হ'তে হয়। তা'র একমাত্র কারণ, তিনি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি ক'রতে চেয়েছেন। বিশ্বসত্তাকে আপনার মধ্যে অখণ্ডিত ক'রে জান্‌বার আগ্রহে জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রকেই তিনি বাদ দেননি, সর্ব্বত্রই আপন চৈতন্যের অধিকার বিস্তার ক'রে চলেছেন। জীবনই তাঁর শিক্ষাসত্র; প্রাণধারিণী বসুন্ধরা অব্যবহিত আনন্দের যোগে তাঁর চিত্তকে মনকে উদ্বোধিত ক'রছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন শুধু আনন্দ উপভোগ নয়, আনন্দের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবার কী অপরিসীম শক্তি নিয়ে তিনি বিশ্বের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ স্থাপন ক'রেছেন। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-দৃষ্টিতে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য তিনি প্রত্যক্ষ ধ'রে নিতে জানেন, তাই সৌন্দর্য্যের রস নিগূঢ়ভাবে আস্বাদন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তন্ন তন্ন ক'রে বৃক্ষের পত্র-সংস্থান, ফুল-ফলের লীলা বিকাশ তিনি অনুসরণ ক'রেছেন প্রাণজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম পরিচয়ের আগ্রহে। 'জীবনস্মৃতি'তে দেখ্‌তে পাই, শিশু কবি প্রত্যূষে উঠেই বাগানের নব রৌদ্ররঞ্জিত চেহারা দেখতে অধীর হ'য়ে থাকতেন। 'কম্পিত নারিকেল-পল্লবের শিশিরবিচ্ছুরিত প্রথম সূর্য্যরশ্মি' তাঁর মনের মধ্যে এসে কথা কইত। ছাতের পাঁচিলে উঠে অনবসান তৃপ্তি ভরে তিনি চেয়ে থাকতেন। মধ্যাহ্ন-আকাশে চিল উড়ে চলেছে, অদূরে পথের কল্লোল, ফেরিওয়ালার ডাক। নিবিড় রহস্যের ইঙ্গিতে তাঁর নয়নমনের বিশ্ব পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ত। তা'র পরে সাধনার যুগে পদ্মাতীরে বিশ্বের সঙ্গে তাঁর যোগ ঘনিষ্ঠতর হ'ল। জল স্থল আকাশের অবারিত বক্ষে তিনি বাস ক'রলেন। লোকালয়ের কেন্দ্রে তিনি পৌঁছলেন, গ্রামবাসীর অন্তরের কথা জানলেন। অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি এবং আত্মীয়জ্ঞানের পরিচয় তাঁর "গল্পগুচ্ছে"র গ্রামচ্ছবিগুলিতে পাওয়া যায়। সংসার এবং সংসারের বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতি উভয় লোকেই তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। প্রাণমনের ভুবনে নিয়ত গমনাগমনের ইতিহাস তাঁর কাব্যে, রূপকর্ম্মে, অনুষ্ঠানে স্থায়ী মূর্ত্তি নিয়েছে।

আজও দেখ্‌ছি, জীবনের বিচিত্র ব্যাপারে তিনি নানা কর্ম্মযোগে সংশ্লিষ্ট। এই যোগসাধন তাঁর পক্ষে সত্যকার জিনিষ। কেন-না, তিনি কেবলমাত্র প্রতিভাবলে ব্যাপকভাবে জীবনকে অধিকার করেননি, জ্ঞানালোকিত চিত্তের অভিজ্ঞতা নিয়ে ধ্যানে কর্ম্মে নিবিষ্ট হয়েছেন। তাঁর কল্পনাশক্তি জীবনব্যাপী কল্যাণ সন্ধানে বিধৃত। গ্রন্থালয়ে এমন কোনো বিষয়ের বই নেই যা তিনি পড়েননি, কিন্তু প্রবল মনন-শক্তির দ্বারা বিদ্যাকে তিনি ভাণ্ডারে জমা করেননি, আপন সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছেন। প্রাত্যহিক কর্ম্মে ইচ্ছায় তিনি আজ শত সূত্রে বিশ্বলোকের সঙ্গে যুক্ত, মানব-সংসারের নিরন্ত দাবী তাঁর উপরে। সর্ব্ব দায়িত্বভার তিনি অনায়াসে বহন করেন। কেন-না, সমগ্র চেতনা দিয়ে বিশ্বকে গ্রহণ করার অভ্যাস প্রাণের শিক্ষালয়ে তিনি আয়ত্ত করেছেন। পুঁথির ভিতর দিয়ে যারা বিশ্বকে জানে তা'রা প্রাণ-জগতে থেকেও পরবাসী; জ্ঞানহীন কল্পনাবিলাসে যারা সংসারকে সৌখীন ক'রে দেখে তাদের ছায়ালোকচারী মরীচিকাবিহারী মন অবাস্তবতার ব্যর্থতায় বিড়ম্বিত। রবীন্দ্রনাথ কবি, অর্থাৎ সমগ্র দ্রষ্টা, উজ্জ্বল চৈতন্যের আলোকে তিনি বিশ্ব-প্রাণমণ্ডলকে অন্তরে ধারণ ক'রছেন। নব দিনাগমে প্রত্যহ তাঁর মন-প্রাণ সৃষ্টির আদি সুরগুলিতে ফিরে আসে, আজও তাঁর এই সাধনায় বিরাম নেই। চলৎশক্তি তাঁর ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে, ক্লান্ত দেহভার নিয়ে দেখ্‌তে পাই অতি প্রত্যূষে উদয়নের পূর্ব্বপ্রান্তে তিনি বাগানের বৃক্ষলতার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। তাদের কুশল জান্‌তে বেরিয়েছেন। এই শিশু বৃক্ষগুলি তাঁর নিজের হাতের করুণ সেবায় বড়ো হ'য়ে উঠল। তাদের বন্দনা শুনেছি **"বনবাণীতে"**। বৃক্ষের প্রাণ-রহস্যে উৎসুক আনন্দ তাঁকে বৃক্ষ-জন্মের জটিল তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত ক'রেছে। আবার এই আনন্দই জ্ঞানের অগম্যলোকে তাঁর প্রবেশ অবারিত ক'রে দিয়েছে।

রবীন্দ্র-মঙ্গল

—শ্রীনরেন্দ্র দেব

(১)

বৈশাখের বজ্রগর্ভ বহ্নিমান্ অট্টহাসি মাঝে
ভৈরবের নৃত্যছন্দ চিত্তে যবে রুদ্রতালে ব্যজে,
নিদাঘ-নিস্তব্ধ-শান্ত ধরণীর মধ্যাহ্ন-বাসরে
তোমারে দেখেছি, কবি, বিষাণ ডমরু ল'য়ে করে
নাচিতেছ নটরাজ আপনার আনন্দ-আবেগে।
তব চিত্ত-উৎসারিত পুলকের শিহরণ লেগে
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
যেন কি হারানো-স্মৃতি জাগে তার ব্যথিত স্মরণে!
আকাশ অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে অপলক-আঁখি,
অরণ্য বিস্ময়-মুগ্ধ, অকস্মাৎ ডেকে ওঠে পাখী;
বাতাস বেতস-বনে মর্ম্মরিয়া হাসে স্নিগ্ধ হাসি,
বিহ্বল ব্যাকুল সুরে বেণু-কুঞ্জে বেজে ওঠে বাঁশী,
দিগ্বধূ গুণ্ঠন খুলি' নতমুখে দেখে কুতুহলে,
স্তব্ধ করি' কলকণ্ঠ নির্ঝরিণী শোনে শিলাতলে।

(২)

আষাঢ়ের পূর্ব্ব-মেঘ ঘনা'য়ে উঠিত যবে ধীরে
আম্রকূট-গিরি-শীর্ষে, অবন্তীর শিপ্রা নদী নীরে
ছায়া তার আন্দোলিয়া খর-স্রোতে খেলিত সুন্দর
চমকি' উঠিত হেরি বিজুরি সে নব জলধর।
বলাকা ব্যাকুল হ'ত; গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
বরষা আসিত নেমে চরণে জড়ায়ে বনফুল,

স্তন-তটে লগ্ন তার জলদের জলদ-ভৃঙ্গার
উঠিত উথলি' ঘন ; অসম্বৃত তনু আপনার
নারিত সে আবরিতে শ্লথ-সিক্ত শ্যামাঞ্চল সাজে।
কেতকী-সুবাস-মত্ত সেই শ্যাম-সমারোহ মাঝে
তোমারে দেখেছি, কবি, নাচিতেছ নিনাদি' মাদল
তোমার সঙ্গীত-তালে উদ্বেলিত শ্রাবণ-হিন্দোল ;
কেকা-কলরবে শিখী তব ছন্দে মেলিছে কলাপ,
তোমার কাজরী গানে বিরহিণী ভুলিছে সন্তাপ।

(৩)

শরতের শুভ্র প্রাতে শেফালী-বিকীর্ণ বন-পথে
উষার রক্তিম হাসি ফুটে যেই তরুণের রথে
শিশির-মুকুতা-বিন্দু ঝলমলে তৃণাঙ্কুর-শিরে ;
সদ্য-স্নাতা ধরণীর সুনির্ম্মল স্বর্ণাঞ্চল ঘিরে
খেলা করে আলো-শিশু ; আশ্বিনের নির্মেঘ গগনে
সহসা মৃদঙ্গ বাজে। সেদিনের উৎসব-লগনে
বোধনের উদ্বোধিত আনন্দের অগ্রদূত হ'য়ে
তোমারে দেখেছি, কবি, আসিয়াছ স্বর্ণবীণা ল'য়ে !
তব স্পর্শ-ইন্দ্রজালে সুর-লক্ষ্মী জাগিত গুঞ্জরি
অভ্র-শুভ্র কাশগুচ্ছ, নবশ্যাম ধানের মঞ্জরী',
নৃত্য-লাস্যে দিকে দিকে দুলিয়া উঠেছে বারে বারে ;
কমল মেলেছে আঁখি, ফুলদল মালঞ্চের দ্বারে
দাঁড়ায়েছে হাসিমুখে ; নীলাকাশ ল'য়ে কল্পতূলি
বিচিত্র বরণে আঁকে মেঘের মেদুর-ছবিগুলি।

(৪)

তুহিন-শীতল শীতে তমসার তমোলিপ্ত তীরে
তোমারে দেখেছি, কবি, তপোমগ্ন তুষার-মন্দিরে

ধ্যান-সমাহিত মূর্ত্তি, আবির্ভাব লাগি' ফাল্গুনীর।
থেকে থেকে শিহরিয়া কেঁপে ওঠে উত্তর সমীর,
ঝ'রে পড়ে শুষ্ক পত্র, সকরুণ অরণ্য-মর্ম্মর
শোনে শুধু মৌন-ম্লান হিম-ক্লান্ত নিস্পন্দ ভূধর।
নিবিড় কুজ্ঝটি-বাসে ঢাকি' তনু শীতার্ত্ত ধরণী
নিঃশব্দে ঘুমায় শুয়ে ; শীর্ণ-তোয়া স্রোতের তরণী
স্থবির শীতেরে ল'য়ে চলে বেয়ে' ধীর মন্দ গতি ;
দুই কূলে ছুঁয়ে যেন তরু তৃণ বল্লরী ব্রততী
উড়ে উড়ে পড়িয়াছে বৃদ্ধের বিলোল শুভ্র কেশ।
তুমি দেখায়েছ, কবি, ছিন্ন করি' সেই ছদ্ম-বেশ
অনন্ত যৌবনবন্ত বসন্তের কান্তি অভিরাম ;—
অমৃত-মৃত্যুর মাঝে—জীবনের নাহিক বিরাম !

(৫)

ফাল্গুনের ফুলবনে এল যেই দক্ষিণ-মলয়
তোমারে দেখেছি, কবি, গাহিতেছ বসন্তের জয়
তোমার বন্দনা-গানে বকুলের আকুল সুরভি,
অশোক পুলকে রাঙা, রাঙা হ'ল কিংশুক করবী ;
চূ্যত-মঞ্জরীর গন্ধে অঞ্জলি ভরিল আম্রবন,
নবোদ্গত কিশলয়ে নিকুঞ্জের নবীন স্পন্দন।
পিককণ্ঠে হুলুধ্বনি, পুষ্পিতা তরুণী বন-বধূ
পল্লব-গুণ্ঠনে ঢাকে লাজ-ভীরু যৌবনের মধু।
মন্মথের মন্ত্র-শিষ্য তুমি, কবি, আনন্দ-বিলাসী,
তন্দ্রাহীন চৈত্র-রাতে চন্দ্রালোকে বাজে তব বাঁশী,
মধু-মাধবীর মিতা। তব দ্বারে জাগে ঋতুরাজ।
উতলা চামেলি চাঁপা, পিয়াল পারুল করে সাজ,
চঞ্চল অঞ্চল মেলে মালতী মল্লিকা অনুরাগে,
তব পীত উত্তরীয় রঞ্জন রঙীন করে ফাগে।

(৬)

তোমারে দেখেছি, কবি, কল্পনার বিচিত্র আলোকে
অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের স্বপ্নাতীত বৈজয়ন্তী-লোকে
বিরচিয়া চলিয়াছ সুবর্ণ-রচিত মায়া-পুরী
কনক-কিরণ-কান্তি-বিহসিত বরণ-মাধুরী
ফুটায়ে তুলেছ এই প্রকৃতির সলজ্জ কপোলে,
কানন-কুন্তলা প্রিয়া প্রেম-মুগ্ধা দোলে তব কোলে !
রুচিরম্য রাগিণীর সুললিত সুর-লয়-তানে
অমৃত উথলি' উঠে অনাহত অনন্তের প্রাণে ;
কোটী মৌন মূক মুখে দিলে তুমি প্রকাশের ভাষা,
সঞ্জীবীত করি' মৃতে জাগায়েছ জীবনের আশা।
বিশ্বের বিস্ময় তুমি ! হে বিরাট ! তব দিব্য জ্যোতি
আনিয়াছে পদপ্রান্তে বসুধার বিমুগ্ধ প্রণতি।
নিখিল-ভুবন-ব্যাপী আসমুদ্র সর্ব্ব ক্ষিতিতলে
তব প্রতিভার পূজা-আরতির দীপ-শিখা জ্বলে।

রবীন্দ্র-কাব্যের একটি প্রধান সুর

—শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখেছেন………"ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যে কেবল মাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই এই সৌন্দর্য্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই।………বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষ-বোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কি করিয়া? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাসদরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রেমের সেতুতে যখন দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দ্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল।………আমার সমস্ত কাব্য-রচনার ইহা একটি ভূমিকা। আমার তো মনে হয় আমার কাব্য-রচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা'।"

রবীন্দ্রনাথ সত্য শিব সুন্দরের উপাসক; প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার; তাই তিনি প্রকৃতির রূপ-মুগ্ধ প্রেমিক। প্রত্যেক বড় কবির

কাব্যে এইটিই প্রধান লক্ষণ যে, তাঁর বর্ণনীয় বিষয়বস্তুকে ছাড়িয়ে তাঁর ভাব উপ্‌চে ছাপিয়ে ওঠে—তাঁর রচনার সীমার মধ্যে তাঁর ভাব বদ্ধ থাকতে চায় না; তদতিরিক্ত, সীমার বহির্ভূত একটু-কিছু প্রকাশ কর্‌বার আকুতি সেই রচনা প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়ে একটি আকুলতার সুর ধ্বনিত হ'তে শোনা যায়। সে-সুর হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের, বিশেষের মধ্যে অবিশেষের, রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধির জন্য অধীরতার সুর; যে-ভাবটিকে তিনি তাঁর পরবর্ত্তীকালে রচিত একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন এবং যে-কবিতাটিকে আমি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য-চয়নিকায় তাঁর সমগ্র কাব্যের মূল সুর-স্বরূপ মুখ-বন্ধ ও ভূমিকারূপে ছেপেছিলাম—

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

এই ভাবটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও প্রধান মর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা বন্ধুবর অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী "ঐকান্তিক ভাব-গতি" নাম দিয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে এই সীমাকে উত্তীর্ণ হ'য়ে, বাধাকে অস্বীকার ক'রে বা বাধাকে কাটিয়ে অগ্রসর হ'য়ে চলবার একটা আগ্রহ ও ব্যগ্র তাগাদা স্পষ্টই অনুভব করা যায়। যা লব্ধ, তাতে সন্তুষ্ট থেকে তৃপ্তি নেই; অনায়ত্তকে আয়ত্ত করতে হবে, অজ্ঞাতকে জান্‌তে হবে,

অদৃষ্টকে দেখে নিতে হবে—এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বাণী, এই হচ্ছে তাঁর প্রধান বক্তব্য।

যেখানে গতি আছে, সেখানে ব্যাপ্তিও আছে। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার আর-একটি বিশেষত্ব হচ্ছে সর্ব্বানুভূতি—জল-স্থল-আকাশে, লোক-লোকান্তরে, সর্ব্বদেশকালে ও সর্ব্ব-মানবসমাজে আপনাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে মেলে দিতে তিনি নিরন্তর উৎসুক। যে-কবি দেশ-কালকে অতিক্রম ক'রে শাশ্বত সত্যকে যত বেশি প্রকাশ করতে পারেন, তিনি তত বড় কবি। রবীন্দ্র এই হিসাবে কবীন্দ্র, তিনি শাশ্বত সত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। সামান্য প্রাণ-কম্পের মাঝে, শিশুর হাস্য-কণিকায়, ফুলের হিল্লোলিত রূপ-সুষমায়, নদী-সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গে যে প্রাণ-শক্তি দীপ্যমান হ'য়ে ওঠে, তাকে তিনি নব নব রূপ, নব নব শ্রী ও অভিনব মহিমা দান করেছেন; তুচ্ছতমও তাঁর কাব্যে মর্য্যাদা লাভ করেছে, কারণ তুচ্ছতম ধূলিকণাকেও তিনি অসীম সৃষ্টি-রহস্যের অন্তরঙ্গ ব'লে জেনেছেন, নাম-গোত্রহীন ফুলের মধ্যে বিশ্ব-সুষমার আভাষ পেয়েছেন, সমাজে ছোট-লোক ব'লে গণ্য অতি সাধারণ লোকের ছেলের মধ্যেও তিনি বিশ্বমানবের মহত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন।

আমাদের দেশের দার্শনিকদের ধারণা ছিল যে, সত্য স্থির। শঙ্করাচার্য্য সত্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ ক'রে গেছেন—"কালত্রয়াবাধিতম্ সত্যম্"—যা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালে সমভাবে অবাধে অবস্থিতি করে, যার কস্মিনকালেও কোনো পরিবর্ত্তন হয় না, তাই সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের ইয়ুরোপীয় দর্শনের বাণী হচ্ছে যে, সত্য গতিতে, সত্য স্থিতিতে নয়; যার গতি নেই, স্ফূর্ত্তি নেই, তা জড়, তা কখনো সত্য হ'তে পারে না। যার জীবনী-শক্তি আছে সে আর-সকল জিনিষকে নিজের ক'রে নিয়ে তবে নিজেকে প্রকাশ করে, তার অস্তিত্ব সমগ্রের মধ্যে, খণ্ডভাবে দেখলে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। কাল অবিভাজ্য, কাল অনন্ত-প্রবাহ, মহাকালের মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নেই; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান একটি বিশেষ খণ্ডকালের সম্পর্ক, একটি বিশেষ ক্ষণের তুলনায় কবি কালিদাসের কাল তাঁর কাছে ছিল বর্ত্তমান, কিন্তু আমাদের কাছে তা

হ'য়ে গেছে ভূত বা অতীত; আবার কবি রবীন্দ্রনাথের কাল আমাদের কাছে বর্ত্তমান, কিন্তু তা "আজি হ'তে শত বর্ষ পরে" "দূর ভাবী শতাব্দীর" লোকদের কাছে ভূত হ'য়ে যাবে। এই অনন্ত কাল ও দেশ ব্যেপে নিজেকে প্রসারিত ক'রে দেওয়ার 'ইচ্ছাই' রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান সুর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবন থেকে এই সত্তর বৎসরের পরিণত যৌবন-কাল পর্য্যন্ত কেবল এই গতির মাহাত্ম্যই প্রচার ক'রে এসেছেন; আমাদের এই নিশ্চল জড়-ভাবাপন্ন পঙ্গু দেশে যে কিশোর-কবি অগ্রগতির জন্য বিশ্ব-বাসীকে আহ্বান করেছিলেন, সেই "চির-যুবা, সেই যে চির জীবী" আজো সেই বাণী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কর্‌ছেন—ভগবান করুন এই চির-নবীন ও চির-যুবা মহাকবির তূর্য্য-কণ্ঠ চিরকাল ধ'রে বিশ্ববাসীর ও বিশেষ ক'রে আমাদের দেশবাসীর কর্ণে নিত্যনিরন্তর ধ্বনিত হ'তে থাক্। আমাদের এই জড়-ধর্ম্মী দেশে আজ-কাল যে একটু নড়বার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তার মূলে আমাদের এই কবির উদ্বোধিনী বাণীর অনুপ্রেরণা অনেকখানি রয়েছে।

আমরা দেখতে পাই, কবি কিশোর বয়সেই গতির মাহাত্ম্য প্রচার করবার জন্য "পথিক"-বেশে যাত্রা করেছেন এবং সকলকে তাঁর যাত্রা-পথের সঙ্গী হবার জন্য আহ্বান ক'রে বলেছেন—

"ছুটে আয় তবে—ছুটে আয় সবে,
অতি দূর—দূর যাব;
কোথায় যাইবে?—কোথায় যাইব!
জানি না আমরা কোথায় যাইব;—
সমুখের পথ যেথা লয়ে যায়,—"

এই শুধু 'অকারণ অবারণ চলার' আবেগ তিনি বরাবর অনুভব করেছেন, তাঁর "চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে" আকৈশোর। এই গতির আহ্বানেই "নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ" হয়েছে। আমাদের কবির "প্রভাত-উৎসব" গতিরই উৎসব :—

"জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি' গাহিছে এ-কি গান।"

প্রভাত-উৎসবের এই গতি অন্তর থেকে বাহিরে এবং বাহির থেকে অন্তরে, গতির এক অপূর্ব্ব গতায়াত; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপন অন্তরে গ্রহণ ক'রে আপন অন্তরকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মেলে দেবার আনন্দ এই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কবির অন্তরের গতি-বেগ "স্রোত" হ'য়ে বয়ে চলেছে, এবং কবি সকলকে আহ্বান ক'রে বলেছেন—

"'জগৎ-স্রোতে ভেসে চল', যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবি শশী চল'রে সেথা যাই।"

কবির কাছে যাত্রার আহ্বানই "মঙ্গল-গীতি"—

"যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া,
উঠেছে সঙ্গীত-কোলাহল,
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা আমরা যাত্রা করি চল্।
যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হ'তে,
যাত্রা করি ছাড়ি' হিংসা দ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি' সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে ল'য়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি' নিজ দুঃখ শোক।"

কবির যৌবন-সুলভ হৃদয়াবেগ যখন তাঁর মনোবীণায় "কড়ি ও কোমল" সুর বাজাচ্ছিল, তখনও সেই সুরের মধ্যে গতির মূর্চ্ছনা ধ্বনিত হয়েছে।— কবি লক্ষ্য করেছেন—

"মানব-হৃদয়ের বাসনা
বিশ্বময় কারে চাহে, করে হায় হায়।"

কবি অনুভব করেছেন—

"লক্ষ হৃদয়ের সাধ শূন্যে উড়ে যায়,
কত দিক হ'তে তারা ধায় কত দিকে।

সমুদ্রের অস্থিরতা দেখে কবি বলেছেন—

"কিসের অশান্তি এই মহা পারাবারে।
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন!"

আমাদের কবি সাগর-পারের অপরিচিতা বিদেশিনীর অভিসারে "সোনার তরীতে" বার বার "নিরুদ্দেশ যাত্রা" করেছেন—

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে,
হে সুন্দরি?"
বল কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।

কবি শুধু যেতেই চান "অকূল-পাড়ির আনন্দ" অনুভব করবার জন্যে—

"সকাল বেলায় ঘাটে যেদিন
ভাসিয়ে দিলেম নৌকা-খানি,
কোথায় আমার যেতে হবে
সে কথা কি কিছুই জানি?"

"দুলুক তরী ঢেউয়ের পরে,
ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ!
গাও রে আজি নিশীথ রাতে
অকূল-পাড়ির আনন্দ গান।
যাক না মুছে তটের রেখা,
নাইবা কিছু গেল দেখা,
অতল বারি দিক না সাড়া
বাঁধন-হারা হাওয়ার ডাকে;
দোসর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে,
লও রে বুকে দু'হাত মেলি'
অন্তবিহীন অজানাকে।"

কবির মনোরাজ্যের "বনের পাখী" এসে "খাঁচার পাখীকে" বাহিরে উড়ে যেতে ডাকাডাকি করেছে; "কন্যা মোর চারি বছরের" "যেতে নাহি দিব" ব'লে কাতর নিষেধ করলেও কবি-চিত্তের যাত্রা স্থগিত হয়নি। কবি-চিত্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে দুর্নিবার গতির আবেগ দেখে দুঃখ ও সান্ত্বনা দুইই অনুভব করেছে—

"এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ-মর্ত্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব।' হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চ'লে যায়।"

কবি "মানস সুন্দরীকে" প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন—

"কোন্ বিশ্ব-পার
আছে তব জন্মভূমি? সঙ্গীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন্-লোকে"—

জীবন-মরণের দোলায় কবি "ঝুলন" খেল্‌তে ব্যগ্র; সমগ্র "বসুন্ধরা" কবি-চিত্তের বিহার-ভূমি—

"ইচ্ছা করে আপনার করি
যেখানে যা কিছু আছে……….;"

বিশ্ব-বিমুখ স্বার্থপর ক্ষুদ্রতার বেদনা কবিকণ্ঠে কাতর ক্রন্দন ক'রে বলেছে "এবার ফিরাও মোরে"—

"দুর্দ্দিনের অশ্রু-জলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি'। তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবন-সর্ব্বস্ব-ধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি'। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি' রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানব-যাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে………"

কবি তাঁর "অন্তর্যামীকে" পথিকের চঞ্চল সঙ্গী-রূপেই উপলব্ধি করতে চেয়েছেন—

"আবার তোমারে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে প্রান্তরে,
পথ হ'তে পথে, ঘর হ'তে ঘরে,
দুরাশার পাছে পাছে।"

তিনি "অতিথি অজানার" সঙ্গে 'অচেনা অসীম আঁধারে' যাত্রা কর্‌বার জন্য উৎসুক; "দিনশেষে" কবির যদি বা কখনও তরণী বাঁধ্‌বার প্রলোভন হয়েছে, কিন্তু সেও "বহু দূর দুরাশার প্রবাসে" "আসা যাওয়া বারবার" করার পর কোন অজানা বিদেশে অচেনা তরুণীর ভরা ঘটের ছল-ছল আহ্বানে! কিন্তু দিনশেষেও কবির ভাগ্যে বিশ্রাম-লাভ ঘটেনি; তখন

"পৌষ প্রখর শীত-জর্জ্জর ঝিল্লি-মুখর রাতি"

এক অবগুণ্ঠিতা তাঁর সুখনিদ্রা ভাঙিয়ে "সিন্ধুপারে" নিয়ে চলেছে—

"অফুরান পথ, অফুরান রাতি, অজানা নূতন ঠাঁই।"

কবির "দুরন্ত আশা" "পোষমানা এ প্রাণ" নিয়ে "বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান" থাক্‌তে পারে না। সন্ধ্যার দুঃসময় এসে উপস্থিত হ'লেও কবি চিত্ত-বিহঙ্গকে পাখা বন্ধ কর্‌তে নিষেধ ক'রে বলেছেন—

"যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে

* * * * *

তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ ক'রো না পাখা।"

কোথাও যদি কোনো আশ্রয় না থাকে তবু নভ-অঙ্গন তো আছে, তার মধ্যেই স্বচ্ছন্দ-বিহার কর্‌তে হবে।

"বর্ষ-শেষের" সঙ্গে-সঙ্গে কবি-চিত্ত বন্ধন-মুক্ত হ'য়ে অনন্তাভিমুখ হ'য়ে উঠেছে—

"চাবো না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গণিব না দিন-ক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

যে-পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথ-প্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখ' মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগ-যুগান্তের।"

রুদ্র বৈশাখের "বিষাণ ভয়াল" তাঁকে ডাক দিলে তিনি বলেছেন—

"ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ,
ভাঙিয়া মধ্যাহ্ন-তন্দ্রা জাগি' উঠি বাহিরিব দ্বারে........"

তিনি অচেনা বহু পথিকের সঙ্গে এক নৌকার "যাত্রী", তিনি গৃহস্থের ঘরে 'অতিথি" মাত্র, তিনি "ছুটির" আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে সকল বন্ধনের প্রতি "উদাসীন", তিনি "সুদূরের পিয়াসী", তিনি "প্রবাসী"। কবি বলেছেন—

"ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব-জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।"

কিন্তু কবির এ "যাত্রাশেষ" তো "বিপুল বিরতি" নয়, এ যাওয়া যে দোলার ফিরে আসার বেগ-সঞ্চয়ের জন্য—

"এই মত চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা!"

এ "খেয়া-নেয়ের" এপার-ওপার যাওয়া আসা।

কবির 'পরাণ-সখা বন্ধু' 'ঝড়ের রাতে অভিসার' করেন কবির কাছে। কবি জানেন, তাঁর বিধাতা তাঁকে কোন্ আদি-কাল হ'তে জীবনের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছেন—

"জানি জানি কোন্ আদিকাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে।"

কবি নিজে অনুভব করেন এবং সকলকে অনুভব করতে বলেন—

"জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ";

সেই আনন্দ-যজ্ঞের নিমন্ত্রণে যাত্রা করে'—

"কবে আমি বাহির হ'লেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।"

যাত্রার খেয়া-ঘাটে এসে কবির আশঙ্কা "ঐ রে তরী দিল খুলে!" কিন্তু তখনি তিনি মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌ছেন—

'আমার নাইবা হ'ল পারে যাওয়া,
যে হাওয়াতে চলতো তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া।"

কিন্তু তিনি যদি বা যাত্রার উদ্যোগ-পর্ব্ব সমাধা ক'রে প্রস্তুত হ'লেন, কাণ্ডারীর তখনো উদ্দেশ নেই—

"কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে;
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থ-গামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।"

তখন তিনি কাণ্ডারীকে দেখে বল্‌ছেন—

"ওরে মাঝি, ওরে আমার
মানব-জন্ম-তরীর মাঝি,
শুন্‌তে কি পাস্ দূরের থেকে
পারের বাঁশী উঠ্‌ছে বাজি' ?"

"কাণ্ডারী গো, যদি এবার পৌঁছে থাক' কূলে,
হাল ছেড়ে দাও, এখন আমার হাত ধ'রে লও তুলে।"

কবি কাণ্ডারীর বিলম্ব দেখে অধীর হ'য়ে উঠেছেন—

"এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে ব'সে যায় যে বেলা মরি গো মরি।"

কবি সদা-প্রস্তুত কাণ্ডারীকে হঠাৎ দেখ্‌তে পেয়ে আনন্দে ব'লে উঠ্‌লেন—

"নাম-হারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলেনি কেউ আমাকে!"

কিন্তু তরী যদি নাই মেলে তা হ'লে কি তবে যাওয়া বন্ধ থাকবে?

"যে দিল ঝাঁপ ভাব-সাগর-মাঝ-খানে
কূলের কথা ভাবে না সে,
চায় না কভু তরীর আশে,
আপন সুখে সাঁতার-কাটা সেই জানে
ভব-সাগর-মাঝ-খানে।"

কিন্তু এত দিন নদীপথে যাত্রার প্রতীক্ষা করার পর কবি দেখ্‌তে পেলেন—

"উড়িয়ে ধ্বজা অভ্র-ভেদী রথে
ঐ যে তিনি, ঐ যে বাহির পথে!"

তখন আনন্দিত কবির উৎফুল্ল কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে—

"যাত্রী আমি ওরে,
পারবে না কেউ রাখ্‌তে আমায় ধ'রে।"

কবির "পথ হ'ল সুন্দর"; তিনি যাত্রা কর্‌তে পেয়েই সন্তুষ্ট, তরীতে না হয় তো রথে তাঁর যাত্রা—সে একই কথা, বাহন তুচ্ছ সাধন মাত্র, যাত্রা কর্‌তে পারাটাই হ'ল তাঁর কাছে প্রধান।

কবি নিজেই জানেন যে, গতির মাঝে মাঝে গতি-বিরতিও আছে,

"যেমন চলায় অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা;"

কিন্তু পা-ফেলেই কবির ভয় হয় বুঝিবা গতি স্থগিত হ'য়ে পড়্‌ল—

"ভেবেছিনু মনে যা হবার তারি শেষে
যাত্রা আমার বুঝি থেমে গেছে এসে।"

* *

কি নিরখি আজি একি অফুরান লীলা
একি নবীনতা বহে অন্তঃশীলা!

* *

পুরাতন পথ শেষ হ'য়ে গেল যেথা
সেথায় আমারে আনিলে নূতন দেশে!"

কিন্তু চির-নবীন কবি-চিত্তের যাত্রা তো স্থগিত হবার নয়—

"আমি পথিক, পথ আমারি সাথী।

বাহির হ'লেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হ'ল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্য-রসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি'।"

মাঝে মাঝে পথ খুঁজ্‌তে গিয়ে পথ হারায়—

"এখানে তো বাঁধা পথের অন্ত না পাই,
চল্‌তে গেলে পথ ভুলি যে কেবলি তাই।"

এবং "খুঁজিতে গিয়ে কাছেরে করি দূর," চলা আরো বেড়ে যায়—তখন হতাশ হ'য়ে কবি বলেন—

"এমনি ক'রে ঘুরিব' দূরে বাহিরে,
আর তো গতি নাহি রে মোর নাহি রে।"

কিন্তু তাতেও লোকসান নেই—

"মিথ্যা আমি কি সন্ধানে যাব' কাহার দ্বার?
পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।"

কবির "চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে" দেখে কবি পরম আনন্দিত—

"ভাগ্যে আমি পথ হারালেম কাজের পথে!
নইলে অভাবিতের দেখা ঘটতো না কোনোমতে।"

সেই অভাবিতের দেখাটি কি?—

"আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়
পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন?"

সেই হারাপথে বিদেশী সাপুড়ের সঙ্গে যাত্রীর সাক্ষাৎ ঘটে—

"কে গো তুমি বিদেশী,
সাপ-খেলানো বাঁশি তোমার বাজালো সুর কি দেশী!

*   *   *   *   *

লুকিয়ে রবে কেগো মিছে,
ছুটেছে ডাক মাটির নীচে
ফুটায়ে ভুঁই-চাঁপারে।"

কবি সেই বাঁশির সুর ধ'রে যাত্রা ক'রে চলেছেন নিরুদ্দেশের পানে—

"শুনেছি সেই একটি বাণী—
পথ দেখাবার মন্ত্রখানি
লেখা আছে সকল আকাশ মাঝে গো।"
"তোমার মাঝে আমার পথ
ভুলিয়ে দাও গো ভুলিয়ে দাও।
বাঁধা পথের বাঁধন হ'তে
টলিয়ে দাও গো টলিয়ে দাও।"
"পথের শেষে মিলবে বাসা
সে কভু নয় আমার আশা,
যা পাব' তা পথেই পাব',
দুয়ার আমার খুলিয়ে দাও।"

কবি "সুদূরের পিয়াসী", তাঁর কাছে দূরের ডাক এসে পৌচেছে—

"এবার আমায় ডাক্‌লে দূরে
সাগর-পারের গোপন পুরে।"

সেই "সাগর-পারের গোপনপুরে" কবি একা পথিক হ'লেও তাঁর সঙ্গী জুটে যায়—

"যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি।
ঝড় এসেছে ওরে এবার ঝড়কে পেলেম সাথী।"

কবির এই যাত্রা তো আজকের নয়, তা অনাদি অনন্ত—

"অনেক কালের যাত্রা আমার,
অনেক দূরের পথে,
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম আলোর রথে।"

তিনি সকল ভার বোঝা ফেলে দিয়ে লঘু হ'য়ে যাত্রা করতে উৎসুক-

"রিক্ত হাতে চল্‌না রাতে
নিরুদ্দেশের অন্বেষণে।"

কবির "পথ চলাতেই আনন্দ", পথের নেশায় তিনি বিভোর —

"পথের নেশা আমায় লেগেছিল',
পথ আমারে দিয়েছিল' ডাক।"

কারণ—

"পান্থ তুমি, পান্থ-জনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রা-পথের আনন্দ-গান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।"
"গতি আমার এসে
ঠেকে যেথায় শেষে
অশেষ সেথা খোলে আপন দ্বার।"

কবি "শিশু ভোলানাথ"-রূপে বল্‌ছেন—

"সাত সমুদ্র তের' নদী
আজকে হব' পার।"

শিশু ভোলানাথ বলেছে—

"আজকে আমি কতদূর যে
গিয়েছিলেম চ'লে।
যত' তুমি ভাব্‌তে পারো
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ কর্‌তে পারব' না তা
তোমায় ব'লে ব'লে।

* * *

অনেক দূর সে, আরো দূর সে,
আরো অনেক দূর।"

ফাল্গুনী নাটকটি আগা-গোড়া চলার মহিমা-কীর্ত্তনে ভরা—তার মধ্যে চলার বাঁশি বেজেছে—

"চলি গো, চলি গো, যাই গো চ'লে,
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন-তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙিন্ বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।
পথিক ভুবন ভালোবাসে
পথিক জনেরে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণ-ঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে।"

চাঞ্চল্য হচ্ছে প্রাণের ধর্ম্ম, শিশু প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে সদা-চঞ্চল, যুবা প্রাণের প্রবল আবেগে উদ্দাম। তাই দেখ্‌তে পাই যে, আমাদের দেশের স্থবির-দের যিনি গতির মুক্তি-বাণী শুনিয়েছেন তিনি কখনো শিশু আর কখনো যুবা, তিনি স্থবির কখনই না—

"সবার আমি সমান-বয়সী যে
চুলে আমার যতই ধরুক পাক।"

চির-যুবা কবি "শুধু অকারণ পুলকে" মেতে তাঁর যুবক সঙ্গীদের ডেকে বলেছেন—

"অশ্লেষাতে যাত্রা ক'রে সুরু
পাঁজি-পুথি করিস্ পরিহাস,
অকারণে অকাজ ল'য়ে ঘাড়ে

অসময়ে অপথ দিয়ে যাস,
হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে
পালের 'পরে লাগাস ঝড়ো হাওয়া,
আমিও ভাই তোদের ব্রত লব—
মাতাল হ'য়ে পাতাল পানে ধাওয়া।"

যৌবন তো সুখে-শান্তিতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকৃতে পারে না, অসাধ্য সাধন করাই যৌবনের ধর্ম্ম, এইটেই যৌবনের মহিমা—

"পার্‌বি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খ'সে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙ্‌বারই আনন্দে রে।

*　　*　　*　　*

লুটে যাবার ছুটে যাবার
চল্‌বারই আনন্দে রে।"

কবি সকল "অচলায়তন" ভেঙে ফেলে চলার নিমন্ত্রণ ঘোষণা করেছেন। মহা-পরিব্রাজক কবি তাঁর "যাত্রী" পুস্তকের মধ্যেও এই একই কথা ব'লেছেন। "বলাকা"-তে এই মহাবাণীই আগাগোড়া উদ্‌ঘোষিত ক'রে চ'লেছে—

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।"

কবির গানে যখন জীবন-সন্ধ্যার "পূরবী" রাগিণী বেজে উঠেছে, তখনও তাঁর বিশ্রাম বা বিরতির কথা মনে হয়নি, কেবলই 'চলো, চলো' বাণী ধ্বনিত হয়েছে—

"আশ্বিনের রাত্রি-শেষে ঝ'রে-পড়া শিউলি-ফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল ; তা'রা মরণ-কূলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে ; শুধু বলে 'চলো, চলো' !"

*　　*　　*　　*

ওরা ডেকে বলে, কবি,
সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে,............?"

*　　*　　*　　*

কবি বলেন,—

'যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে'…।

'মহুয়া' তার যৌবন-প্রেমের মাদকতা বিলিয়ে—

"যাবার দিকের পথিকের পরে
ক্ষণিকের স্নেহ-খানি
শেষ উপহার করুণ অধরে
দিল কানে কানে আনি'।"

তখনও মাদকতা-বিহ্বল কবি নিশ্চল হ'য়ে পড়েননি, তখনও তিনি যাত্রার জন্য সকলকে আহ্বান ক'রে বলেছেন—

"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
তারি রথ নিত্যই উধাও"………

আমাদের কবি অজর অমর, তাঁর বার্দ্ধক্য নেই, তিনি আকৈশোর আজ পর্য্যন্ত চলারই মাহাত্ম্য ঘোষণা ক'রে এসেছেন। কবি বলেছেন—

"না চল্‌তে চাওয়া প্রাণের কৃপণতা, সঞ্চয় কম হ'লে খরচ কর্‌তে সঙ্কোচ হয়…………এই তরুণ একদিন গান গেয়েছিল'—'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।'—সাগর-পারে যে অপরিচিতা আছে তার অবগুণ্ঠন মোচন কর্‌বার জন্যে কি কোনো উৎকণ্ঠা নেই?"

অজানাকে জান্‌বার, অনায়ত্তকে আয়ত্ত কর্‌বার, অদৃষ্টকে দেখ্‌বার যে-আগ্রহ নিয়ে বৈদিক ঋষি আপনাকে মহীপুত্র ব'লে পরিচয় দিয়ে বিশ্ব-বাসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন—"চরৈবেতি, চরৈবেতি," ঠিক সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমাদের কবি সকলকে ডাক দিয়ে পুনঃ পুনঃ বলেছেন—"আগে চল্, আগে চল্, ভাই।"

কবি-চিত্ত সপ্ত-তন্ত্রী বীণার মতো, তাতে কত সুর কত মূর্চ্ছনাই বেজেছে; কিন্তু আমার কানে এই গতির বাণীটিই খুব বেশি ক'রে ধরা পড়েছে। যিনি অগতির গতি তিনিই এই গতি-শক্তি-হারা দেশে এই তূর্য্য-কণ্ঠ কবিকে প্রেরণ করেছিলেন দেশবাসীদের জড়ত্ব থেকে উদ্বোধিত ক'রে তোল্‌বার জন্যে। মহাকবির এই অভ্যুদয় যুগ-যুগান্তর ধ'রে জয়-যুক্ত হোক্, ভগবানের কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

যৌবন-মূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথ

— শ্রীবিনয়কুমার সরকার

সত্তর বৎসরের মুখে মুখে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ ইয়োরামেরিকার খোলা বাজারে নিজ হাতের আঁকা ছবি ছাড়িয়াছেন। লণ্ডন, প্যারিস, মিউনিক, মস্কো, নিউইয়র্কের নরনারী ১৯৩০ সনে দেখিল যে, সত্তর বৎসর বয়সের বুড়া বাঙালী একজন ছোকরার মতন আত্মহারা হইয়া ছবি আঁকিতেছে আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা নয়া শিল্পের আসরে স্রষ্টারূপে দেখা দিতে সাহসী হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ চৌষট্টি বৎসর বয়সে "রক্তকরবী"র লাল রঙে নিজ প্রতিভা রাঙাইয়া তাহার সঙ্গে নবজাগ্রত মজুর-বিশ্বের আত্মীয়তা কায়েম করিবার ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। "ফাল্গুনী"র নাচ-গানে মাতিতে পারিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে।

আর ১৯০৫ সনের ভাবুকতায় যখন যুবক বাঙলার জন্ম হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স গোটা পঁয়তাল্লিশ। সেই বয়সেও তিনি রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া হাজার হাজার ছোক্‌রা ও বুড়াকে গান গাওয়াইয়া ভারতে স্বাধীনতার ফোয়ারা ছুটাইয়াছিলেন।

তাহার আগেকার কথা আজ তুলিব না। রবীন্দ্র-জীবনীর এই তারিখ ও তথ্য কয়টা বাঙালীর জীবনবত্তার ইতিহাসে অমূল্য। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স হইতে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ রোজ রোজ নতুন নতুন আগুন জ্বালিতে পারিয়াছেন। আর সেই আগুন জ্বালিয়া বাঙালীকে, এশিয়াবাসীকে আর বিশ্ববাসীকে নানা আকার-প্রকারে তাতাইতে পারিয়াছেন। বিশেষ কথা, নিজেও সঙ্গে-সঙ্গে আগেই তাতিয়াছেন। জীবন ভরিয়া এইরূপ তাতিবার আর তাতাইবার ক্ষমতা মানবদুর্ল্লভ। দুনিয়ার যৌবনশক্তি যুগে-যুগে রবীন্দ্র-প্রতিভায় তাজা তাজা মূর্ত্তি পাইয়া অমরতা লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্র-শিল্পকে কেহ ভাবে পূরবী, কেহ বা সমঝিয়া রাখিয়াছে পশ্চিমা, আবার কাহারো কাহারো মতে উহা পূরবী-পশ্চিমার খিচুড়ি। রবীন্দ্র-

সংসারে কেহ ঢুঁড়িতেছে সূত্র, কেহ ঢুঁড়িতেছে পঞ্চায়ৎ, বারোয়ারীতলা অথবা জয়েণ্ট ষ্টক্‌ কোম্পানী চালাইবার কর্ম্মকৌশল। কেহ বা পাইতেছে, কেহ বা ঢুঁড়িয়া ঢুঁড়িয়া হয়রাণ হইতেছে মাত্র। রবীন্দ্র-শিল্প কোনো কোনো আড্ডায় স্বদেশসেবার 'পাঁতি জোগাইয়া থাকে। আবার কোনো কোনো মজলিশে উহা বিশ্বসেবার হেঁয়ালিমাত্রে ভরা। আর এইসকল মামলায় যাঁর যখন যেমন মর্জ্জি বা খেয়াল তখন তিনি তেমন রবীন্দ্র-সৃষ্ট দুনিয়ার দর কষিতে প্রবৃত্ত হন।

রবীন্দ্র-সৃষ্টি পূরবী-পশ্চিমা, সূত্র-কর্ম্মকৌশল, স্বদেশ-বিদেশ ইত্যাদি সব কিছুই বটে, অথচ আবার এই সবের কোনো একটার গর্ত্তে পড়িয়া রবীন্দ্র-শিল্প কানার মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে না। জ্যান্ত চোখে দুনিয়া ভাঙিবার ও গড়িবার শক্তি রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বধর্ম্ম। এই সৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেই আমার বারে বারে মনে হয়ঃ—

> সুনীতির কুনীতির তুমি ধর্ম্মাধর্ম্মের পারাবার,
> বিশ্বকোষ ঘাঁটতে বসে' লোকে করছে হাহাকার!

রবীন্দ্রনাথকে কোনো ফর্ম্মুলায়, কোনো বাঁধিগতে আট্‌কাইয়া রাখা চলিবে না। কোনো শাসন-প্রণালীর মারপ্যাচে এই স্বচ্ছন্দ গতিশক্তিকে পাকড়াও করা সম্ভবপর নয়। রবীন্দ্রনাথ জীবন বা যৌবন,—জীবনের ধারা, যৌবনের স্রোত,—সৃষ্টিশক্তির প্রতিমূর্ত্তি। প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছেন,—প্রতিদিনই জগৎকে রূপে-রঙে বাড়াইয়া চলিয়াছেন,—প্রতি-দিনই অনন্ত যৌবনের সৃষ্টিক্ষমতা চাখিয়া ধরাতলকে তাহার স্বাদ পরিবেষণ করিতেছেন। দশকের পর দশক ধরিয়া দেশ-বিদেশের যুবারা আর যৌবনশীল প্রবীণেরা এই মহাযুবার তালে তালে রকমারি উদ্দীপনা লাভ করিতেছে।

এইরূপ বিশালপ্রাণ, অসীমযৌবনসম্পন্ন, বিশ্বগ্রাসী মহাযুবা দুনিয়ার শিল্প-সংসারে বড় বেশী নাই। রবীন্দ্রনাথের জুড়িদার এক ছিল বৈচিত্র্য-শীল জটিলতাপূর্ণ জার্ম্মান্ সন্তান গোটে। এই আসরে আর-একজনের নামও মনে পড়িতেছে। সে ফরাসী সাহিত্য-বীর ভিক্তর হুগো।

"রক্তকরবী"

—শ্রীলীলা রায়

প্রথম পরিচয়ে 'রক্তকরবীর' মর্ম্ম-কথাটি ধর্‌তে যেন একটু সময় লাগে; মনের মধ্যে কেমন একটা আকুলতা জেগে ওঠে, কিন্তু এ চাঞ্চল্য যে কিসের তা সহজে বুঝ্‌তে পারা যায় না।

জালের আবরণের অন্তরালে যক্ষপুরীর রাজা, তা'র বিশাল শক্তি এবং বিশাল নির্ব্বুদ্ধিতা। জালের বাহিরে নন্দিনী, কখনও জোৎস্না-লোকের মতন স্নিগ্ধ মধুর, কখনও বিদ্যুতের মতন তীক্ষ্ণ। তাদের বেষ্টন ক'রে আছে অন্ধকারময়ী যক্ষপুরী, যেখানকার অধিবাসীরা ধরিত্রীর বুক চিরে সোনার তাল খুঁজ্‌তে নিয়ত নিরত। আর কোন্ দুর দেশ থেকে আসছে রঞ্জন, যার মধ্যে যাদু আছে, যে ছুটির খবর নিয়ে আসে, নবোদিত অরুণালোকে নীলকণ্ঠ পাখী যার আগমনী শুনিয়ে যায়।

রঞ্জন যেন গোড়া থেকেই তা'র আস্‌বার আভাস দিচ্ছে। মৃত্যুময়ী যক্ষপুরীর স্তব্ধ আকাশ তা'র প্রতীক্ষা ক'রে আছে; প্রাণময়ী নন্দিনীও তা'র প্রতীক্ষা ক'রে আছে। এল যখন, ধূলায় রক্তরেখায় তা'র মিলনের রক্তরাখী নিয়ে এল। কিন্তু সে আসা সার্থক হ'ল, সেখানে থেকে নন্দিনীর জয়যাত্রা আরম্ভ হ'ল। যে-মুহূর্ত্তে যক্ষপুরীর রাজা তা'র প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে রঞ্জনকে নিঃশেষ ক'রে দিল তখনই তা'র সম্পূর্ণ পরাজয়।

প্রথমেই মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ গল্পের ছল ক'রে আশ্চর্য্য কৌশলে একটা অতি প্রয়োজনীয় কথা ব'লে দিয়েছেন, কিন্তু তা'র প্রয়োজনীয়তাটা সহসা ধরা পড়ে না, রূপকথাটাই চমক্ লাগিয়ে দেয়।

যক্ষপুরীর ঐ বস্তুতন্ত্রটা মনকে বড় পীড়া দেয়। সর্দ্দাররা আর খোদাই-কররা যেন একটা বিষম অন্যায় কর্‌ছে, রাজা যেন একটা নির্ব্বোধ দুষ্ট শক্তি, তা'দের ধর্ম্ম ধ্বংসের ধর্ম্ম, জীবনকে মর্ম্মান্তিক ব্যথা দিচ্ছে, আর নন্দিনী বিশু কিশোর এরা যেন নিতান্ত আপন জন।

নাটকের সুগম্ভীর impersonality-র মধ্যে আমাদের অন্তঃকরণ একটা গভীর personal interest নেয়।

মনটা পক্ষপাতিত্ব করে। গোড়া থেকেই নন্দিনীর জন্যে একটা দৌর্ব্বল্য এসে পড়ে, ও'যে সুন্দর, ও যে তীক্ষ্ণ, ও যে ভালোবাসে, ওর জন্যে যে কোথা থেকে রঞ্জন আস্‌ছে। আর জালের আড়ালের রাজা, তা'র অন্ধতা ও নিদারুণ বুভুক্ষা নিয়ে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। মনটা প্রেমিক হ'য়ে যায়; নন্দিনার মতন সে সোনা জিনিষটাকে তাচ্ছিল্য করে, তা'র গোপন অন্তঃপুরে পৌষ পাকা ফসল নিয়ে সহসা সাড়া দেয়, বিশুর গানে সে ভাবুক হ'য়ে ওঠে, রঞ্জনের প্রতীক্ষায় কোন্ সিংহদ্বারের কালো ছায়ায় দিন কাটিয়ে দেয়।

যক্ষপুরীর মেটিরিয়েলিজম্-এর জোর আছে, জীবন নেই। সে তামসিক; সেখানে কোথাও, কখনও রাজসিকের ছায়ামাত্র দেখা যায় না।

সর্দ্দারণীদের আনন্দোৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র কেউ কেউ পেত না। সেই সকল উৎসবে যক্ষপুরীর কুলবধূদের কোমল অঙ্গে যক্ষপুরীর সুবর্ণ হয়ত শোভা পেত, কিন্তু তা'দের মোহন রূপে কোনো শিল্পীর, কোনো কবির লুব্ধ চিত্ত আকৃষ্ট হ'য়েছিল ব'লে শোনা যায় না; সিন্দুকে তোলা না থেকে সে ঐশ্বর্য্য ওদের অঙ্গের আভরণ হ'য়ে সঞ্চিত থাক্‌ত।

তারা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা নয়। কোনো গহন বিপিনে কোনো বিশাল বিটপী-কাণ্ড তা'দের সুমধুর বেষ্টনে ধন্য হ'য়ে যায়নি। রক্তকরবীগুচ্ছ তা'দের মানায় না, কুঁদ-ফুলের মালাও তা'দের কম্বু-গ্রীবে সাজে না। পৃথিবীর গোপন অন্তরাল থেকে লুণ্ঠিত স্বর্ণাভরণ তা'দেরই জন্যে, তার বর্ণচ্ছটায় শক্তি আছে, প্রাণের সাড়া নেই।

যক্ষপুরীর ভয়ঙ্কর কর্ম্ম-কৌশল (efficiency) দিয়ে রাজা রঞ্জনকে মেরে ফেল্‌ল। কিন্তু রাজার অন্তরে একটা মহাশূন্যতা; সুবর্ণলক্ষ্মীর সিংহাসন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেখানে নন্দিনীর চঞ্চল ছায়া নিত্য দোদুল্যমানা। মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ অভিমান, দুঃসহ তৃষ্ণা গর্জ্জে ওঠে। নন্দিনীর কাছে তা'র পরাজয় হবেই, তাই তা'র ইচ্ছা করে আঙ্গুরের গুচ্ছের মতন নন্দিনীকে পিষে ফেল্‌তে।

কিন্তু সূর্য্যের আলো যেমন ক'রে বাঁচে নন্দিনী তেমন ক'রে বাঁচ্‌তে জানে। কালো মেঘের ধারে ধারে যেমন ক'রে সূর্য্যের আলো লেগে যায় তেমনি ক'রে যক্ষপুরীর লোকদের মনে নন্দিনী সোনার নেশা

ছাড়িয়ে সোনালীর নেশা লাগিয়ে দিল। রাজা ছিল বিশাল কৃষ্ণাচল, তা'র নীল বর্ণে কোথাও সূর্য্যের আলোর রং ধরাবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু বুকের মধ্যে যে চাপা আগুন জ্বলছিল সেও ঐ সূর্য্যেরই আগুন। তাই সহসা একদিন তা'র রাজ-গর্ব্ব ধূলায় লুটাল। আলোর কাছে আগুনের পরাজয়; তারপর আলোতে-আগুনে মহামিলন।

যখন রাজা অন্ধকারে সোনার তাল চূড়া ক'রে সাজাচ্ছিল, তা'র ভয়ঙ্কর শক্তির একটা মোহন সৌন্দর্য্য ছিল, সেটা নন্দিনীর চোখে ভালো লেগেছিল। কিন্তু রাজা রঞ্জনকে হিংসা করে, অচল পাহাড় যেমন সচল নাগাই নদীকে হিংসা করে। রঞ্জনের প্রাণ আছে, তা'র স্পর্শে সুড়ঙ্গ-খোদাই-করদের হাতের কোদাল নেচে চলে। সে কোন-কিছুকে ভয় করে না, রাজাকেও না। আকাশের, বাতাসের ও জলের স্রোতের সঙ্গে তা'র মৈত্রী। তা'কে স্মরণ ক'রে নন্দিনী রক্তকরবীর গুচ্ছ পরে বক্ষে, কালো কেশে, হাতের কঙ্কণে।

রাজার সঙ্গে যেদিন নন্দিনীর মিলন সেদিন রূপকথার রূপ সম্পূর্ণ হ'ল। রঞ্জন ছিল নন্দিনীর নিজের মনের ভাবটি পুরুষত্বের ছাঁচে ঢালাই-করা, কিন্তু রাজা যে পদার্থে সৃষ্ট সে নন্দিনী হ'তে, রঞ্জন হ'তে বিভিন্ন। তা'র সঙ্গেই মিলনের প্রয়োজন, কারণ তা'র সঙ্গেই বিরোধ ছিল। রঞ্জন-নন্দিনী অভিন্নাত্মা, সেখানে মিলনের কথা আসে না। সে নন্দিনীকে প্রাণ দেয়, প্রেম দেয়, জয়যাত্রা সুরু করিয়ে দেয়। আর রাজা দেয় দুর্জ্জয় শক্তি।

নন্দিনীর রক্তকরবীর মৃদু আঘাতে অধ্যাপক একটা সুন্দর কথা বলেছিল 'রক্তকরবীর ঝঙ্কারে'—রাজার হাতের কেতন ধূলায় পড়ল, কিন্তু জয়যাত্রায় রাজা হ'ল সহযাত্রী।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা

—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

(১)

রবীন্দ্রনাথে বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে। এক কথায় যদি বলিতে হয় তবে বলিব, ইহাই রবীন্দ্রনাথের দান এবং এই সূত্রটির মধ্যে কবির সৃষ্টির স্বরূপও সম্যক্ আমরা ধরিতে পারিব। বলা বাহুল্য, আধুনিকতার অবতরণিকা রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেই সুরু হইয়াছে; কিন্তু তাহার যে বিপুল প্রবাহ, যে-বন্যা বাঙ্গালার মনপ্রাণকে চারিদিক হইতে ডুবাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথ হইতে। আধুনিকতার আরম্ভের দুইজন প্রধান শিল্পীকে আমরা স্মরণ করিতে পারি—মধুসূদন ও বঙ্কিম। কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে তবুও আছে একটা অতীতের রেশ, তাঁহাদের ভাবে-ভঙ্গীতে কোথাও রহিয়া গিয়াছে একটা গতকালের, পুরাতনের আভাস। ঈশ্বর গুপ্ত-দীনবন্ধু হইতে বঙ্কিম-মধুসূদনে—কাল হিসাবে নয়, কিন্তু ধর্ম্ম হিসাবে—যে-ব্যবধান, তাহা একটা বিপর্য্যয়ই। এইটুকু অবকাশে বাঙ্গালীর মতিগতির, রসবোধের মুখ সম্পূর্ণ ঘুরিয়া গিয়াছে। আধুনিকতার পাকা-সড়কে বঙ্কিম-মধুই বাঙ্গালাকে তুলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। তবু সে-পথে উঠিয়াও প্রাচীন যুগের ধরণ-ধারণ—কেমন যেন মাঠ-ঘাটের গন্ধ, কাদামাটির স্পর্শ—আমরা একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে আমরা সেখানে গাড়ী-ঘুড়ী—গাড়ী-ঘুড়ী কেন, রেল-মোটর পর্য্যন্ত চালাইয়া দিয়াছি।

আধুনিক অর্থে বর্ত্তমান বটে—কিন্তু জিনিষটি কেবল কালগত নয়, উহার মধ্যে আছে আবার একটা দেশগত গুণ। আধুনিক আধুনিক হইয়াছে বিশ্বজগতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংমিশ্রণের কল্যাণে। জাতিতে-জাতিতে দেশে-দেশে নিবিড়তর আদান-প্রদান প্রত্যেক জাতিকে দেশকে দিয়াছে একটা অভিনব রূপ, অভিনব ধর্ম্ম—এইভাবে যে-অভিনবত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই বোধ হয় আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যের প্রধান অঙ্গ। মধু-

সূদন-বঙ্কিম যে আধুনিক, তাহার অর্থ এই—তাঁহারা বাঙ্গালীর শিল্প-চেতনায় ইউরোপীয় হাবভাব আনিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। ইউরোপই হইল আধুনিক যুগের ধর্ম্মক্ষেত্র, পীঠস্থান। বর্ত্তমান যুগে মানব-জাতির যে মুখ্য লীলাধারা, তাহা ইউরোপেরই উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। সুতরাং ইউরোপের সংস্পর্শে আসা অর্থই আধুনিক হইয়া উঠা—পৃথিবীর রঙ্গক্ষেত্রে সম্মুখের আসন গ্রহণ করা। এসিয়ায় জাপান এইভাবেই আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে—আর ইহার অভাবে চীন এতদিন তাহা পারে নাই। আমরা ভবিষ্য যুগের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি গতকল্যের ও বর্ত্তমানের কথা। ভারতের মধ্যে বাঙ্গালীই সকলের আগে ও সকলের অপেক্ষা বেশি ইউরোপীয় হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই না আজ তাহার কৃতিত্ব অন্যান্যের সাফল্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে? ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু পর্য্যন্তও বাঙ্গালীর চিত্ত একান্ত বা মুখ্যতঃ ছিল বাঙ্গালী-ই। তাহার কল্পনা, তাহার অনুভব, তাহার চেতনা তাহার সঙ্কীর্ণতর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বঙ্কিম-মধুসূদন সেই বৈশিষ্ট্যের, সেই সঙ্কীর্ণতার, সেই বাঙ্গালীত্বের—প্রাদেশিকতার দেউল ভাঙ্গিয়া দিলেন; তাহার মধ্যে আনিয়া মিশাইলেন দেশান্তরের কল্পনা, চেতনা, রীতিনীতি।

রবীন্দ্রনাথও এই কাজই করিয়াছেন, কিন্তু আরও সূক্ষ্মতর, আরও গভীরতর, আরও ব্যাপকতর ভাবে। প্রথমতঃ আধুনিকতার প্রথম যুগে দেশীয় ও বিদেশীয় ধারা দুইটি একসঙ্গে হইলেও, সম্পূর্ণ মিলিয়া-মিশিয়া যাইতে পারে নাই—পাশাপাশি তাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে ছিল একটা ছেদ, একটা বৈসাদৃশ্য ও দ্বন্দ্ব—তেল-জলের মত। মধুসূদনে এই দুই সুর স্পষ্ট পৃথক বাজিয়া চলিয়াছে—বঙ্কিমেই প্রথম সত্যকার সমন্বয় ঘটিতে সুরু করিয়াছে। তবুও সে-যুগের শিল্প-রচনা মোটের উপরে দেখিলে মনে হয় যেন দেখিতেছি নীচের অর্দ্ধে গিলে-কোঁচান, এলায়িত ধুতির লাস্য, আর উপরের অর্দ্ধে কোট, ওয়েষ্ট কোট, নেকটাইর কড়া বন্ধন। নিজের নিজের দিক হইতে দুই-ই সুন্দর সুষ্ঠু—কিন্তু উভয়ের সংযোগে সমন্বয় নাই, ঐক্যতান নাই। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য—এই ঐক্যতান তিনি পূর্ণরূপে দিয়াছেন। বাঙ্গালীর রসসৃষ্টিতে বাহিরের মুক্ত

হাওয়া খেলাইয়া প্রাদেশিকতাকে তিনি দূর করিয়াছেন, অথচ তাহা বৈদেশিকতার কোলে গিয়া পড়ে নাই, কৃত্রিম পরানুকরণ বা প্রতিধ্বনি মাত্র হইয়া উঠে নাই—তাহা হইয়াছে সর্ব্বদেশিক। সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালীর জিনিষই তাহা, অথচ আবার মানব সাধারণের আপনার হইয়া গিয়াছে। বিশ্বভূ পর্য্যটন করিয়া সে-চেতনা ঘরে ফিরিয়াছে, গভীরতর বৃহত্তর ভাবে ঘরেরই জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে। তাই ত' কবি বলিতেছেন—

দেশে দেশে মোর দেশ আছে,
আমি সেই দেশ লব খুঁজিয়া—

এই যেমন সুইনবার্ণ বা মেটেরলিঙ্কে যে ভাবভঙ্গী মতিগতি রূপ পাইয়াছে তাহার একেকটা তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথে কোথাও কোথাও ধরা দিয়াছে বলা যাইতে পারে। তবে পাশ্চাত্যের যাহা নিজস্ব বিশিষ্ট জিনিষ, রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার আগুনে গলিয়া গিয়া, তাহা রবীন্দ্রনাথেরই—বাঙ্গালীরই নিজস্ব সত্তার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, হইয়া উঠিয়াছে তাহার চিরকালের সম্পদ। দেশ হিসাবে, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি এই রকমে তির্য্যকভাবে প্রসারিত হইয়াছে, আলিঙ্গন করিয়াছে বিশ্বকে। কাল হিসাবেও তাহা আবার অন্যদিকে বর্ত্তমান হইতে উঠিয়া গিয়াছে অতীতে। বৈষ্ণব-সাধকের অনুভব, উপনিষদের অনুভবের রাজ্যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন—এই দিক্‌কার অনুভবকে লইয়া নামিয়া আসিয়াছেন আবার সেই তির্য্যক্-প্রসারিত বিশ্ব-অনুভূতির মধ্যে। এই দুইএর মিলনকে সংযোগ করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার কাব্য-জগতের আধুনিকত্ব যাহার প্রধান কথা হইল, প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের, অতীতের ও বর্ত্তমানের একটা সামঞ্জস্য ও মিলন। এইভাবে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের, অতীতের ও বর্ত্তমানের বিশিষ্ট অনুভূতি-উপলব্ধি, ভাব-চিন্তা কবির নিবিড় রসবৈদগ্ধ্যের মধ্যে মিলিয়া-মিশিয়া একটা সমৃদ্ধতর সৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছে—সেখানে একপ্রাণতা একতানতা লইয়া একটি বৃহৎ বৈচিত্র্য তাহার অনবদ্য সৌন্দর্য্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি পাশ্চাত্যের ও আর-একটি ভারতের নিজস্ব ধারা, অথবা একটি অতীতের ও আর-একটি বর্ত্তমানের ধারা কি ভাবে

প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সুন্দর গবেষণার বিষয়। আমার লক্ষ্য তাহা নয়, বিষয়টির দুই-একটি প্রধান সূত্র শুধু ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিব। ইউরোপীয় চেতনার—বিশেষতঃ আধুনিক ইউরোপীয় চেতনার মূল উপলব্ধি হইতেছে এই স্থূল জগতের, এই জাগ্রত পঞ্চেন্দ্রিয়গত আয়তনের, এই যৎকিঞ্চজগত্যাং জগতের একান্ত সত্যতা, অনিবার্য্যতা, জীবন-মৃত্যুর, জীবন হইতে হয়ত বেশি মৃত্যুর, সুখ-দুঃখের, সুখ হইতে বেশি দুঃখের, আলো-ছায়ার, আলো হইতে বেশি ছায়ার, দ্বৈতের, দ্বন্দ্বের, মানবতার সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা। এই ভাবের ভাবুক হইয়াই আমাদের কবি বলিয়াছেন—

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়—

অথবা,

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?·····

কিম্বা,

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো,
বিরহানলে জ্বালো রে তা'রে জ্বালো—

ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতির প্রপঞ্চের পূজা আমাদের দেশে যে কিছু কম তাহা বলি না। কালিদাসে-জয়দেবে ইন্দ্রিয়ালুতার যে ঐশ্বর্য্য পুঞ্জীভূত, তাহার তুলনা জগতের অন্যান্য সাহিত্যে খুব অল্পই মিলে। তবুও পার্থক্য একটা আছে। যে-চেতনা, যে-মনোভাব লইয়া ইউরোপ ইন্দ্রিয়গত জগৎকে বরণ করিয়াছে, আলিঙ্গন দিয়াছে, তাহা হইল profane, Pagan—লৌকিক, বৈষয়িক, স্থূলকে একান্ত স্থূলভাবে ধরিয়া-ছুঁইয়া যে-আনন্দ যে-অন্তরঙ্গতা আমরা অনুভব করি, শরীর শরীরকে জড়াইয়া যে-সরসতা, যে-মার্দ্দব, যে-কারুণ্যে ভিজিয়া উঠে। ইউরোপের কবি ভার্জ্জিলের কথায়, সব মর বস্তুরই অন্তরে অন্তরে জমিয়া আছে যে-অশ্রুর উৎস—Sunt lacrymœ rerum—তাহারই অনুপ্রেরণায় চলিয়াছে ইউরোপের শিল্পী-চিত্ত। ভারতীয় চেতনা পার্থিবকে ধরিয়াও একান্ত পার্থিব সম্বন্ধেরই মধ্যে সকল পরিচয় নিঃশেষ করিতে পারে নাই। উপনিষদ যেমন বলিয়াছে, পতিপ্রিয় যদি হয়, পত্নী বা পুত্র প্রিয় যদি হয় তবে তাহা পতি হিসাবে, পত্নী হিসাবে

বা পুত্র হিসাবে নয়—কিন্তু আত্মার হিসাবে ; জগতে যাহা কিছু প্রিয় তাহা প্রিয় তাহার নিজের জন্য নয়, কিন্তু আত্মার জন্য, "আনন্দে"র জন্য। চেতনার এই যে অধ্যাত্ম বা অতীন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠা তাহা ভারতের সকল মানুষ বা সকল শিল্পীর মধ্যে যে সজ্ঞানে প্রস্ফুট ও সক্রিয় তাহা নয়। কিন্তু ভারতের আকাশে-বাতাসে, জলে-মাটিতে এই ভাব ছড়াইয়া ওত-প্রোত হইয়া আছে ; তাই তাহার এভাব মোটের উপর সকলের চেতনায় —শিল্পীদের শিল্পরীতিতে আনিয়া দিয়াছে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী, একটা নিজস্ব সুর। বৈষ্ণব কবিদের রচনায় পার্থিব রসের প্রাচুর্য্য, আতিশয্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু সেই রসকে অনেক স্থলে কেবল নামমাত্র ভগ-বানের সহিত জুড়িয়া যে দেওয়া হইয়াছে, শুধু সেইজন্যই সেখানে কি দেখা দেয় নাই একটা বৈশিষ্ট্য—যাহাকে ঠিক ইউরোপের পরিচিত ঐহিকতার মানবতার পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি না ? আর কিছু না হোক্, পৃথিবীর বস্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয়, সেখানে তাহাদের নিজস্ব মূল্য আপনারই সত্য লইয়া ফুটিয়া উঠে নাই—তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে ভিন্ন একটা জিনিষের মূল্যের তুলনায়, তাহাদের সত্য যাচাই হইয়াছে, আর কিছু সত্যের প্রতীক অবলম্বনে বা প্রতিবন্ধক হিসাবে। অবশ্য ইউ-রোপেও এমন কবি-শিল্পী যে না আছেন তাহা নয়, যিনি মরের পশ্চাতে অমরের অনুভূতি, জড়ের উপর চৈতন্যের উপলব্ধি পাইয়াছেন, যিনি এই নিভৃততর অনুভূতি-উপলব্ধিটিকেই এত বড় করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহার বাহন নামরূপ, পার্থিব আকার প্রায় গৌণ—ছায়া প্রতিবিম্ব মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দৃষ্টিতে প্রকৃতির সকল সত্য, সকল সৌন্দর্য্য নিহিত প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী যে-শক্তি—যাহার নাম দিয়াছেন তিনি spirit —একান্ত তাহারই মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়কে বিষয় ভাবেই, দেহকে দেহ দিয়াই ধরিতে-ছুঁইতে চাহিয়াছেন। অধ্যাত্মদ্রষ্টার মত বিষয়কে কেবল আত্মার সহায়ে, শরীরকে অশরীরীর সহায়ে আলিঙ্গন করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। মর জীব হিসাবে তিনি মর বস্তুর রস গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন। অথচ আবার এই মরত্বেরই মধ্যে আবার অমরত্বকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেহকে দেহভাবে

ধরিয়াই তাহার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন আত্মিক অদেহী একটা-কিছু। এই দ্বৈতের, বৈপরীত্যের সমন্বয় তাঁহার উপলব্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য। পার্থিব রুচিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাহাকে আরও তীক্ষ্ণ তীব্র করিয়া ধরিয়াছেন—Pagan-এর লোকায়তদেরই মত; অথচ তাহার মধ্যে অপার্থিবের ধারা একটা নামাইয়া আনিয়াছেন। অপার্থিব বস্তুটির জন্য তিনি চলিয়া গিয়াছেন তাঁহার দেশের নিজস্ব সুপ্রাচীন ঔপনিষদিক চেতনার দ্বারে। এই অপার্থিব ও পার্থিবের মধ্যে, আত্মার ও দেহের মধ্যে একান্ত অন্তরের ও একান্ত বাহিরের মধ্যে যে সেতু-সংযোগ সাধন করিয়াছেন তাহা হইল বৈষ্ণবের, ভক্তের, প্রেমিকের, রসিকের হৃদয়ালুতা।

ঔপনিষদিক যে এক অদ্বিতীয়, অনন্ত আনন্দ ব্রহ্ম—যে বৃহৎ যে ভূমা, সকল সীমাকে সকল খণ্ডকে ছাড়াইয়া গিয়া বা ঘিরিয়া ধরিয়া যা অসীম অখণ্ড রবীন্দ্রনাথ তাহাকে প্রধানতঃ উপলব্ধি করিয়াছেন প্রাণরূপে। এই প্রাণের জয়, প্রাণের মাহাত্ম্যই তিনি প্রতিপদে গাহিয়া চলিয়াছেন—উপনিষদের এই মহাবাক্য বার বার উল্লেখ করিয়াছেন—

সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং

নিজেও ঐ ভাবের ভাবুক হইয়া বলিতেছেন—

ডুব দিয়ে এই প্রাণ-সাগরে
নিতেছি প্রাণ বক্ষ ভ'রে—

এই প্রাণের লাস্যই তাঁহার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে সচলতার, গতির প্রাধান্য। আধুনিক চিত্ত-বৃত্তির আর-একটা বৈশিষ্ট্য এই দিক দিয়া আবার তাঁহাতে দেখা দিয়াছে। কিন্তু আধুনিক প্রাণবাদীদের সাথে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এইখানে যে, গতিকে, সচলতাকে বড় করিলেও, তাহাকে একান্ত করিয়া তিনি ধরেন নাই। তাহার মধ্যে বা পিছনে একটা স্থিতির আভাস তিনি রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছেন পরিশেষে একটা মহাশান্তির মধ্যে। দ্বন্দ্বের বহুর বাহিরের উচ্ছল উদ্বেল ধারায় নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াও একটা দৃষ্টি একটা অনুভব তিনি রাখিয়াছেন ভিতরের অন্তঃপুরের দিকে, যেখানে সব শান্ত স্তব্ধ স্তিমিত—একং। তিনি বলিতেছেন বটে—

রাখো রে ধ্যান থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি—

কারণ, তাঁহার আসল পুরাপুরি কথা হইতেছে এই—

বাইরে তখন যাস্ রে ছুটে,
থাক্‌বি শুচি ধূলায় লুটে,
সকল বাঁধন অঙ্গে নিয়ে
বেড়াবি স্বাধীন—
অন্তরেরি অন্তঃপুরে
থাক্‌বে ততদিন।

রবীন্দ্রনাথ যে-প্রাণের পূজা করিতেছেন তাহা হইতেছে প্রাণব্রহ্ম—এই প্রাণব্রহ্মই তাঁহার চেতনায় জগৎকে যেমন জগৎ করিয়া রাখিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি তাহাতে সজীব সজাগ করিয়া ধরিয়াছে জগদাতীতের একটা ইঙ্গিত আভাস।

রবীন্দ্রনাথের এই দিকটির উপর আমরা এতখানি জোর দিতেছি এইজন্য যে, আধুনিকতার—অথবা অব্যবহিত ভবিষ্যতার—একটি, একটি কেন, হয়ত মূল রহস্যই এইখানে। বাস্তবের বাস্তবতা না হারাইয়া তাহার মধ্যে অবাস্তবকে পাওয়া ও প্রতিষ্ঠা করা—বাস্তবকে অবাস্তবের শরীর করিয়া ধরা, অবাস্তবকে, বাস্তবে রূপান্তরিত করা। অবাস্তবের অঞ্জন পরিয়া বাস্তবকে একেবারে ভুলিয়া না গেলেও, বাস্তবের নিজস্ব রূপকে ভাবকে চাপা দিয়া, তাহার উপর অবাস্তবের আলেপ মাখাইয়া বাস্তবকে আমরা নূতন করিয়া, অবাস্তব করিয়াই দেখি—প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার এই ছিল ধারা। কিন্তু আধুনিক চাহিতেছে বাস্তবের স্বরূপ স্বভাবকে জাগ্রত রাখিয়া, তাহার বৈশিষ্ট্যকে অটুট রাখিয়া তাহাতে অবাস্তবকে মূর্ত্ত ও বাস্তব করিয়া ধরিতে। কবির

সীমার মাঝে অসীম তুমি—

দিয়াছে এই প্রয়াসের এই প্রেরণার মন্ত্র।

মানবজাতির সমস্ত ভবিষ্যৎ এই সাধনার উপর, এই সাধনার গভীরতর সিদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে—আমাদের বিশ্বাস। এবং এই

হিসাবে কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে ঋষি রবীন্দ্রনাথ হইয়া উঠিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার একজন অগ্রণী, দিশারী—আধুনিক জীবন-সাধনার যে মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তাহা তাঁহাতে বাণী পাইয়াছে, মন্ত্ররূপ ধরিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্যছাড়া আধুনিক চেতনার গড়ন, ভাবটি ছাড়া তাহার ভঙ্গী রবীন্দ্রনাথে কেমন প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাও এক দেখিবার জিনিষ।

বাংলায় মধুসূদন যেদিন পয়ারের সমতা ভাঙ্গিয়া অমিত্রাক্ষরের বিষমতা সৃষ্টি করিলেন, সেদিন একটা যুগ-পরিবর্ত্তন ঘটিল। ইউরোপেও ভিক্টর হিউগো যেদিন * আলেকজেন্দ্র্যাঁ নামক ক্লাসিকাল ছন্দের কঠোর বাঁধন-ছাদন বিধি-নিষেধ কাটিয়া ফেলিয়া একটা মুক্ততর লঘুতর গতি দিলেন সেদিনও একটা অনুরূপ যুগান্তর আসিয়াছিল। এই যুগান্তরেরই নাম আমি দিতে চাই আধুনিকতা। আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ, বিশিষ্ট ভঙ্গী আমি নির্দ্দেশ করিব কাব্যরচনার একটি প্রক্রিয়াকে ধরিয়া—সে-প্রক্রিয়াটি হইতেছে ফরাসীরা যাহাকে বলে enjambement, আমাদের আলঙ্কারিকেরা কাব্যের দোষ দেখাইতে গিয়া যাহার নাম দিয়াছেন "অর্দ্ধান্তরৈকবাচকত্ব" অর্থাৎ এক পংক্তির বা পদের জের আর-এক পংক্তিতে বা পদে টানিয়া লওয়া; আধুনিকেরা এই জের টানিয়াছেন শুধু কথা হিসাবে নয়, কথা হিসাবে, অর্থ হিসাবে, ছন্দ হিসাবে—সর্ব্বতোভাবে।

বাঙালীর পয়ার, ইংরাজের heroic couplet বা ফরাসীর alexandrin ছিল একটা বিশেষ রুচির, মনোবৃত্তির, চেতনার প্রকাশ। প্রতি পংক্তি প্রতি পদ অর্থের ও ছন্দের যতি লইয়া নিজে নিজে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিত। তাহাদের কেহ নিজের সীমানা ছাড়িয়া অপরের সীমানায় প্রবেশ করিতে চাহিত না—তাহাতে যেন বর্ণসঙ্করের

* মধুসূদনের প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। আমরা তো ইউরোপের প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পিছনে রহিয়াই বরাবর চলিয়াছি।

আশঙ্কা ছিল। তখনকার যুগের শিল্পীর চেতনায় প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক শব্দ এক-একটি সুষীম, পরিচ্ছিন্ন, গোটা-সত্তারূপে আসিয়া দেখা দিত। শিল্পের কারুর কৌশলই তখন ছিল এই পরস্পর হইতে পৃথক বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টি-সকলের মধ্যে সাম্য সমন্বয় সঙ্গতি স্থাপন। সে-যুগের সৌন্দর্য্যের প্রধান কথা ছিল সৌষ্ঠব, অঙ্গে-অঙ্গে সঙ্গতি। সমানানুপাত, একটা জ্যামিতিক ক্রমানুগত্য (symmetry, balance)। আধুনিকের চেতনায় অনুভবে কিন্তু কোন বস্তুই তাহার বিচ্ছিন্ন স্বকীয়তা লইয়া দাঁড়ায় না—যে-সীমানা বস্তুকে বস্তু হইতে এক সময়ে পৃথক করিয়া রাখিত তাহা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, মুছিয়া গিয়াছে—কোন বৃত্তি কোন উপলব্ধি আর ভিন্ন ভিন্ন নাই, একটির মধ্যে আর-একটি জুড়িয়া মিশিয়া গিয়াছে, সকলের সহিত সকলে ওতপ্রোত হইয়া আছে। মানুষ যেমন দেশ হিসাবে, জাতি হিসাবে, বর্ণ হিসাবে, গোষ্ঠী হিসাবে দিন দিন সকল পৃথকত্ব বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিতেছে, সমগ্র মানবসমাজে ঘনিষ্ঠতর আদান-প্রদানে একটা উদার সাম্য (হয়ত একাকারও) স্থাপিত হইতেছে, তেমনি মানুষের চেতনায়, অনুভবে ও শিল্পীর রসবোধের মধ্যেও ঘটিয়াছে এই-রকম মিশ্রণ সমীকরণ। অঙ্গবিন্যাসে যে মিল, যে অনুপাতসাম্য, যে সমতুলতা, যে পরিমিতি আগের যুগের সৌন্দর্য্যের মাপ ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান যুগে সৌন্দর্য্যে আমরা চাহিতেছি একটা জটিলতর ছন্দের দোল, অনিয়মের, ব্যতিক্রমের লীলা।

অতীতে ও আধুনিকে এই যে-পার্থক্য, তাহা আমরা বলিতে পারি, হইতেছে malody ও harmonyর পার্থক্য। প্রাচীনের যেন একতারার একতানের গান, অথবা একতারার একতানের সুরের সমাহার বা সঙ্গত্—তাহার বৈশিষ্ট্য সুরের বিশুদ্ধি। আধুনিক চাহিতেছে বহুতর বিসদৃশ মিশ্রিত সুরের ঝঙ্কার।

এই দিক দিয়া বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী—বাঙ্গালার সাহিত্য বাঙ্গালীর চিত্ত যতখানি আজ আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে তাহার সব না হোক্ বেশির ভাগ যে একা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে ঘটিয়াছে এ-কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মধুসূদন অমিত্রাক্ষরকে আনিলেন, কিন্তু তবু তাহার ছন্দ অক্ষর-

বৃত্ত। মাত্রাবৃত্তকে ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিলেন, চলিত করিয়া দিলেন আধুনিকের একটা বৈশিষ্ট্য। কথায়, ছন্দে, ভাবে তিনি আনিয়াছেন মুক্তির, গতির দোল—একটা সমৃদ্ধতর, জটিলতর, উদারতর, সূক্ষ্মতর সামঞ্জস্য—সৌন্দর্য্য। পুরাতনের কবি যখন বলিতেছেন—

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥

কিম্বা বঙ্কিমের ভূয়সী প্রশংসা পাইয়াছে যে—

চলে যান বিবিজান লবে জান করে—

তাহা হইতে কতদূরে আমরা চলিয়া আসিয়াছি যখন শুনি—

কে এসেছ তুমি, ওগো দয়াময়,
শুধাইল নারী—সন্ন্যাসী কয়,
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়—"

অথবা

ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘু-ভার!

ভাবের প্রেরণায় বুদ্ধিকে শাণিত উন্নীত করিয়া, বুদ্ধির সহায়ে ভাবকে বৃহৎ বিচিত্র করিয়া, বাহ্যেন্দ্রিয়কে অন্তরেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে গভীরতরভাবে রসায়িত করিয়া, বিভিন্ন স্তরের নানা অনুভবকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, সম্মিলিত, সুসম্বদ্ধ করিয়া, সমস্তকে একটা উদার লঘুপক্ষ ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত রূপায়িত করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে-কল্পলোক রচিয়াছেন তাহার মধ্যে আধুনিক জগৎ তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার স্বপ্ন-উপলব্ধি লইয়া দেখিতে পাইয়াছে নিজের গভীর প্রকৃতির একটা প্রতিরূপ।

আজ বাঙ্গলার রসরচনায়—শুধু রসরচনায় কেন, সাধারণভাবে সমস্ত সাহিত্য-রচনাতেই, যে-সামর্থ্য, যে-নৈপুণ্য, যে একটা উদাত্ত সুর—সহজ স্বাভাবিক এমন-কি অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম লেখনী ধরিয়াছিলেন তখন কেবল আদর্শের দূর-লক্ষ্যেরই বিষয়

ছিল। অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া রবীন্দ্রনাথ যে-সম্পদ পুঞ্জীভূত করিয়াছেন, সেই ভাণ্ডার তাঁহার উত্তরাধিকারী আধুনিকেরা আমরা সকলে যথেচ্ছ যথাসামর্থ্য আহরণ করিতেছি, ভোগ করিতেছি—অনেক সময়ে মনে করিতেছি, তাহা বুঝি আমাদেরই নিজস্ব প্রতিভার উপার্জ্জন।

রবীন্দ্রনাথ যে একটা বিপুল উত্তুঙ্গ তরঙ্গ আনিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহাতে ভাসিয়া চলিয়াছি; কিন্তু ঢেউএর মাথায় স্থান পাইয়াছি বলিয়া, অনেক সময়ে অবশ্য বুঝিতে পারি না আমরা কতদূর উঠিয়াছি, আবার অনেক সময়ে ঢেউএর কথা ভুলিয়া গিয়া মনে করি এই উন্নয়ন আমাদের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব। সাবালক সমৃদ্ধ ভাষার একটা লক্ষণই এই যে, তাহাতে যে-কেহ কিছু রচনা করিতে চেষ্টা করে সে হাতের মধ্যে পায় একটা তৈয়ারী যন্ত্র—যন্ত্র তাহাকে গড়িবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না, তাহার পক্ষে প্রয়োজন কেবল যন্ত্রকে খেলাইবার কৌশল। সে-সাহিত্যের জগতে কোন শিল্পীই একটা বিশেষ ধাপের, স্বর-গ্রামের নীচে নামিয়া পড়িতে পারেন না—ভাষার সাহিত্যের এমন একটা শক্তি-সামর্থ্য, এমন কারুগত ধরণ-ধারণ নিজস্ব প্রকৃতিভুক্ত হইয়া যায় যে, তাহাই কারিগরকে চালাইয়া লয়, কারিগর যদিই বা তাহাকে না চালাইতে পারে। অবশ্য বলি না, বাংলা তাহার সমৃদ্ধির পরিপুষ্টির চরমে পঁহুছিয়াছে; কিন্তু যতখানি সমৃদ্ধি-পরিপুষ্টি হইলে বলা যায় পূর্ণযৌবনের আরম্ভ—তাহা আনিয়া দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। আবার এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাতে কার্য্যত যতখানি না করিয়াছেন, তাহার বেশি করিয়াছেন ভাবের দিক দিয়া, অসাক্ষাতে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া।

আমরা আধুনিক কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, 'আধুনিক' অর্থে অতি-আধুনিকও বুঝিব কি-না। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে একটা চির-তারুণ্যের গতি, যৌবনরসে উচ্ছল ছন্দ বহমান, তাহার ধর্ম্মই নিত্যনূতনের দিকে চলা, অভিনবের সাথে পরিচয় স্থাপন করা—সবুজকে সাদরে বরণ করা। সুতরাং আধুনিকতমেরও সহিত তাঁহার একটা সহানুভূতি, একটা সৌহার্দ্দ কোথাও থাকাই স্বাভাবিক। তবুও একটি কথা স্মরণে রাখিতে হইবে—রবীন্দ্রনাথ হইতেছেন সকলের উপরে রূপের—সুরূপের, আকারগত সৌষ্ঠবের পূজারী। রূপের কাঠামকে

ভাঙ্গিয়া বদ্‌লাইয়া যতই তরল, যতই নমনীয় করুন না, তবুও পরিশেষে কাঠাম—একটা সুষীম কাঠামই—তিনি দিয়াছেন। অতি-আধুনিকেরা কাঠাম বলিয়া কোন জিনিষ আদৌ রাখিয়াছেন কি না সন্দেহ—গঠনকে জলীয় নয়, প্রায় বাষ্পীয় করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা। মিলের ত' কথাই নাই, সুনিয়মিত কাল ও যতিকেও তাঁহারা নির্ব্বাসন দিয়াছেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রের উল্লিখিত সকল রকম দোষ তাঁহারা অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য যদি চাই তবে "পূরবীর"

> দেখো চেয়ে কোন্ উতলা পবন-বেগে
> সুরের আঘাত লেগে
> মোর সরোবরে জলতল ছলছলি'
> এ-পারে ও-পারে করে কী যে বলাবলি
> তরঙ্গ উঠে জেগে—

কিম্বা "বলাকা"র

> পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
> তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি',
> মাটির বন্ধন ফেলি'
> ওই শব্দ-রেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশা-হারা
> আকাশের খুঁজিতে কিনারা—

হয়ত বলিতে পারি, দিতেছে আধুনিকতমের একটা ছায়া বা আভাস—একটা মোলায়েম মার্জ্জিত মূর্ত্তি। কিন্তু তবু অতি-আধুনিকে তাহার গতিবিধিতে দিতে চায় যে একটা বিপর্য্যয়ের প্রলয়ের ওলটপালটের সুর তাহা এখানে পাই না। মনে হয় এতখানি নবীন, এতখানি আধুনিক হইয়াও দূর অতীতের অন্তরস্থ সত্তার সাথে তাঁহার একটা নাড়ীর সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি কাটিয়া ফেলিতে চাহেন নাই।

এই একটা নিগূঢ় স্থিতিশীলতাই তাঁহাকে প্রতিমার পূজারী করিয়া রাখিয়াছে—তাঁহাকে একান্ত বিপ্লবী মূর্ত্তিভঙ্গকারী হইতে দেয় নাই। ফলতঃ রবীন্দ্রনাথের কারু-পদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আমরা এখানে আকর্ষণ করিতে পারি—রূপকে কাঠামকে তিনি অনেক সময়ে লীলাচ্ছলে

খুব দৃঢ় বাঁধনেরই মধ্যে রাখিয়া তবে গড়িয়াছেন; অবন্ধনকে মুক্তিকে তারল্যকে অনিশ্চিতকে তিনি খেলাইয়া তুলিয়াছেন কথার চেয়ে বরং ছন্দের মধ্যে, ছন্দের চেয়ে চিন্তার মধ্যে, এবং চিন্তারও চেয়ে বরং ভাবের মধ্যে। রূপগত গঠন দার্ঢ্যতারই মধ্যে এই প্রকারে একটা অপরূপ কমনীয়তা নমনীয়তা লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছেন—শরীরের মধ্যে অশরীরীকে, সীমার মধ্যে অসীমকে স্থাপন করিয়াছেন—অসংখ্য বন্ধনের মাঝে মুক্তির স্বাদ তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন। আরও, সকল নৈকট্য ও অবাধ পরিচয় সত্ত্বেও হাবে-ভাবে চলনে-বলনে তাঁহার কবিত্বে সর্ব্বত্রই আছে একটা আভিজাত্য, একটা গরিমা; ইহাও সম্পূর্ণভাবে অতি-আধুনিক হইবার পক্ষে তাঁহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তুমি আর আমি

—শ্রীমনোজ বসু

তোমার কবিতা পড়িতেছি বসে', আর ভাবি মনে মনে—
তুমি যেন সুগোপনে
হাওয়ার মতন টিপি' টিপি' পা'য় আসিয়াছ মোর পাশ,
চোখ না চাহিয়া বেশ বুঝিতেছি মৃদুতম নিঃশ্বাস।
নয়নেতে যেন আঙুল বুলালে, সব হ'ল সোনামাখা,
ঘর ছেড়ে মন গুঞ্জনি' নীল আকাশে মেলিল পাখা।
ছেঁড়া মাদুরেতে আসিয়া বসিলে ঘেঁসাঘেঁসি গা'য় গা'য়,
চারি পাশ দিয়ে মিনিট-ঘণ্টা পলকে উড়িয়া যায়।
সাম্‌নে কবিতা বই—
তুমি আর আমি গলাগলি হ'য়ে মন খুলে' কথা কই।

* * * *

চোখ তুলে' দেখি, নিখিল ছুটেছে ফুল-চন্দন-হাতে,
মনে মনে হাসি! যাহারে খুঁজিস্ সে যে হেথা মোর সাথে।
আলপনা-আঁকা মাটীর দেয়াল, দোরে ধান-মঞ্জরী,
মোরা দু'জনায় মৌন আলাপ ছোট্ট ঘরটি ভরি',
—নাই কোন কলরব;
ভারী মজা লাগে,—বাহিরের ওরা ডাকিয়া মরুক সব!
এই যে বসেছি গোপনে দু'জনে ছেঁড়া মাদুরের কোণে,
তুমি যাইবে না, যতই ডাকুক,—ঠিক জানি মনে মনে,
—আজি নও আর কারো,
সারা মনে মোর তোমার কবিতা—পলাও, কেমনে পারো!

ধর্ম্মতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র

ধর্ম্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কত জায়গায় কত কথা বলিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। রবীন্দ্রনাথের সকল কাব্য এবং সকল গদ্য রচনাই এক-একটি ধর্ম্মগ্রন্থ। তাঁহার প্রতিভা এইরূপ যে, তিনি কোনো জিনিষকে ভাসা-ভাসা ভাবে, কেবল বাহিরের দিক্ থেকে আলোচনা করিতে পারেন না। যে-বিষয় লইয়া তিনি লেখেন, তাহারই অন্তরতম স্থলে তিনি প্রবেশ করেন। এইজন্য তাঁহার প্রত্যেক রচনাতেই আমরা চরম কথা শুনিতে পাই। সুতরাং ধর্ম্মসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেন তাহা এক কথায় নির্দ্দেশ করা যায় না।

আমার উদ্দেশ্য কিন্তু নয়, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মমতের আলোচনা করা। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন, তাহার দুই-একটি সূত্র লইয়া সংক্ষেপে আমি দুই-একটি কথা এখানে বলিব।

ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠে, ধর্ম্ম বলিতে আমরা কি বুঝি। ধর্ম্মকে অনেকে ইংরাজি religion শব্দ দিয়া অনুবাদ করেন। কবি দেখাইয়াছেন যে, ইহা অপেক্ষা বেশী ভুল আর কিছু হইতে পারে না। ধর্ম্ম আমাদের সমস্ত জীবনকে বেষ্টন করিয়া আছে; উহা religion-এর ন্যায় জীবনের একটা ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই নিশ্চিন্ত নহে। "আমাদের ধর্ম্ম রিলিজন্ নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে—তাহা পলিটিক্‌স্ হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্ব্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্ত্তী নহে।" (১) ধর্ম্ম যখন জীবনের এক সঙ্কীর্ণ কোণে আবদ্ধ থাকে, তখন উহা religion হইয়া পড়ে।

ধর্ম্ম যখন এইরূপে religion-এ রূপান্তরিত হইয়া একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ইহা যত অনাসৃষ্টি সৃষ্টি করে। তখন গণ্ডীরক্ষাই ধর্ম্মরক্ষা বলিয়া গণ্য হয়, এবং এই গণ্ডীরক্ষা করিতে এক সম্প্রদায়ের

(১) ধর্ম্ম, ৭৯ পৃ।

সহিত আর-এক সম্প্রদায়ের বিরোধ উপস্থিত হয়। এইরূপে ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে যতকিছু অধর্ম্ম হইয়া থাকে।

ধর্ম্মের নামে এইরূপে যে-অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাহার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। ধর্ম্মের লক্ষ্য হইতেছে, সকল অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে শান্তি আনয়ন করা। যখন ধর্ম্ম এই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, "তখন মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।"

এই কথাগুলির সার্থকতা আজ আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। আজ যে সাম্প্রদায়িকতা (communalism)-এর তাণ্ডবনৃত্য আমাদের চোখের সাম্‌নে দেখিতেছি, তাহা এই ধর্ম্মের আদর্শ ভুলিয়া যাওয়ারই ফল। দেশের উন্নতির এখন প্রধান অন্তরায় হইয়াছে—এই ধর্ম্মের নামে প্রচলিত প্রচণ্ড অধর্ম্ম, এই ভীষণ সাম্প্রদায়িকতা। ইহাকে যদি আমরা দেশ থেকে দূর করিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকে ধর্ম্মকে পুনরায় তাহার প্রকৃত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

এই ধর্ম্মের আদর্শ অতি সরল। ইহার মধ্যে কোনো কুটিলতা বা জটিলতা নাই, কিন্তু আমরা ধর্ম্মকে অত্যন্ত জটিল করিয়া ফেলিয়াছি। নানা বিধি-নিষেধের ভিতর দিয়া ক্রিয়া-কর্ম্মের চাপে, মন্ত্র-তন্ত্রের প্রভাবে, সরল সহজ ধর্ম্ম ভীষণ কুটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ এই যে, আমরা নিজকে ধর্ম্মের উপযোগী না করিয়া ধর্ম্মকে আমাদের উপযোগী করিয়া ফেলিয়াছি। ধর্ম্ম যখন এইরূপে আমাদের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপার হইয়া পড়ে, তখন ইহা নিজের আবশ্যকতা হারাইয়া ফেলে।

কিন্তু ধর্ম্মকে তো আমাদের ধারণা করিতে হইবে এবং ধারণা করিতে গেলেই তাহাকে কতকটা নিজের মতো করিয়া লইতে হইবে। এইখানেই ধর্ম্মের paradox উপস্থিত হয়। এই paradox-এর সমাধান রবীন্দ্রনাথ একটি উদাহরণের দ্বারা করিয়াছেন, তিনি বলেন, গৃহ যেমন আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও বাসযোগ্য, মুক্ত আকাশ আমাদের পক্ষে তেমনি প্রয়োজনীয় হইলেও বাসযোগ্য নহে। কিন্তু এই মুক্ত আকাশকে আমাদের মুক্তই

রাখিতে হইবে। যদি আমরা ইহাকে গৃহের মতো আমাদের নিজেদের আয়ত্তাধীন করিতে চাহি, যদি ইহাকে প্রাচীরের পর প্রাচীর দিয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের গৃহ ক্রমেই কারাগারে পরিণত হইতে থাকে এবং মুক্ত আকাশ হইতে আমরা ক্রমেই দূরে পড়িয়া যাই। সেইরূপ ধর্ম্মের সহিত আমাদের যোগ সর্ব্বদা রাখিতে হইবে, কিন্তু এই ধর্ম্মকে যদি আমরা ক্রিয়াকর্ম্মের প্রাচীর দিয়া বেষ্টন করিতে থাকি, তাহা হইলে ধর্ম্ম ক্রমশঃই আমাদের নিকট হইতে সরিয়া যায়। ধর্ম্মকে মুক্ত সরল রাখিতে হইবে। এবং এইরূপ রাখিলেই আমরা ইহা হইতে আমাদের জীবনের রস টানিয়া লইতে পারিব।

সুতরাং যথার্থ ধারণা করা মানে, আমাদের হৃদয়ের সমস্ত বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া, বিশ্বের আলোককে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া। এই ধারণাই কবি দেখাইয়াছেন, গায়ত্রীমন্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (২) "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ" ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক এই তিন লোককে, অর্থাৎ বিশ্বজগৎকে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে। হৃদয়ের সমস্ত দরজা খুলিয়া দিয়া বিশ্বের আলোকে হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে যে, আমি বিশ্বের অধিবাসী, আমি যে-গৃহে বাস করি তাহার এক-একটি কক্ষ হইতেছে এক-একটি লোক। এইরূপে বিশ্বের মধ্যে আমার নিজেকে স্থাপন করিতে হইবে। এবং এইরূপে স্থাপন করিয়া কি ধ্যান করিতে হইবে—

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি

"এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি। এই বিশ্বলোকের মধ্যে সেই বিশ্বলোকেশ্বরের যে-শক্তি প্রত্যক্ষ, তাহারই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি—বিপুল বিশ্বজগৎ একসঙ্গে এই মুহূর্ত্তে এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহা হইতে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারি না, জানিয়া অন্ত করিতে পারি না, তাহা সমগ্রভাবে নিয়তই তিনি প্রেরণ করিতেছেন।" (৩) এখন প্রশ্ন উঠে, কি সূত্র

(২) "ধর্ম্মের সরল আদর্শ," ধর্ম্ম, ৪২ পৃ।
(৩) ,, ,, ,, ,, ৪২-৪৩ পৃ।

অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে হইবে? ইহার উত্তরও গায়ত্রীমন্ত্র দিয়াছে: —

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ

যিনি আমাদিগকে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহাকে সেই ধীশক্তির দ্বারাই ধ্যান করিতে হইবে। সূর্য্যকে যেরূপ আমরা জানি সূর্য্যের কিরণের দ্বারা, সেইরূপ বিশ্বপ্রসবিতা দেবতাকে আমরা ধ্যান করিতে পারি তাঁহারই প্রেরিত ধীশক্তি দ্বারা।

এই গায়ত্রীমন্ত্রে আমরা ধর্ম্মের যথার্থ রূপ দেখিতে পাই। ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষ্য হইতেছে; অসীমকে সীমার মধ্যে আনা। বাহিরে যেমন আমরা ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতৃরূপে বিরাটকে উপলব্ধি করি, অন্তরেও তেমনি আমাদের ধীশক্তির প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে ধারণা করিতে হইবে। "বাহিরে জগৎ এবং অন্তরে আমার ধী। এই দুইই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সঙ্কীর্ণতা হইতে, স্বার্থ হইতে, ভয় হইতে, বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করিব।" (৪)

এখানে একটা খট্‌কা বাধে। অসীমকে সীমার মধ্যে আনিলে, সীমা কি তাহার সীমা লোপ করিয়া অসীমের সহিত মিশিয়া যায়? সীমার কি তখন আর নিজস্ব কিছু থাকে না? জর্ম্মান কবি গেটে সীমার সীমা নাশ হইয়া অসীমের ক্রোড়ে আত্মসমর্পণকে সীমার চরম লক্ষ্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন: —

Im Grenzenlosen sich zu finden
Wird gern der Einzelne verschwinden (৫)

আমাদের কবি কিন্তু এক্ষেত্রে রামপ্রসাদের সহিত বলেন, "চিনি খেতে চাই আমি, চিনি হ'তে চাই না।" মানুষের সহিত ভগবানের সম্বন্ধে মানুষ নিজকে লোপ করে না, মানুষ নিজকে পূর্ণভাবে পায়। মানুষকে ভগবান কেবল তাঁহার গ্রামোফোনরূপে নির্ম্মাণ করেন নাই, কেবল

(৪) ধর্ম্ম, পৃ ৪৩।

(৫) ইহার বঙ্গানুবাদ:—অসীমের মধ্যে নিজকে পাইবার জন্য ব্যক্তি সানন্দে নিজকে লোপ করিয়া দিবে।

তাঁহার বুলি আওড়াইবার জন্য তাহাকে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি মানুষের নিকট আরও কিছু চান। এই কথাই "বলাকা"তে কবি আমাদিগকে বলিয়াছেন :—

পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তা'র বেশী করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তা'র বেশী করি দান,
আমি গাই গান।.........
দিয়েছ আমার 'পরে ভার
'তোমার স্বর্গটি রচিবার।'
আর সকলেরে তুমি দাও,
শুধু মোর কাছে তুমি চাও!

এইখানেই মানুষের গৌরব, এইখানেই মানুষের সহিত জীবজন্তুর প্রভেদ। সুতরাং মানুষের পক্ষে কখনই নিজকে অসীমের ভিতর লোপ পাইতে দেওয়া আদর্শ হইতে পারে না।

আর-একটি প্রবন্ধে কবি মানুষের মধ্যে বিরাটের প্রকাশকে জীবজন্তু ও জড়জগতের প্রকাশ হইতে ভিন্ন করিয়াছেন। তাহার কারণ, তিনি এইরূপ দেখাইয়াছেন : "আমরা বিশ্বের অন্য সর্ব্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পারি। জল-স্থল-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের মঙ্গলকর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে-প্রেমে-কর্ম্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতমরূপে জানিয়া তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি।" (৬) কাজে-কাজেই ধর্ম্মের লক্ষ্য বিশেষভাবে মানবের মধ্যে বিরাটের প্রকাশকে উপলব্ধি করা। মানবাত্মার মধ্যে বিরাটকে প্রত্যক্ষ করিলে তবেই আমরা পূর্ণরূপে তৃপ্তিলাভ করি। কবি এ কথাটার উপর এত জোর দিয়াছেন যে, তিনি মানুষ ছাড়া অন্যত্র বিরাটের প্রকাশকে আংশিক প্রকাশ

(৬) ধর্ম্ম, পৃ ৮৪।

বলিয়াছেন—যাহার ধ্যানে তিনি বলেন, ব্রহ্মকে আমরা স্পর্শ করিতে পারি কিন্তু ব্রহ্মলাভ হয় না। (৭)

মানুষের সম্বন্ধে এইরূপ একপেশেপনা যে আমরা কেবল রবীন্দ্রনাথের ভিতরেই দেখিতে পাই, তাহা নহে। প্রায় সকল দার্শনিকের মধ্যেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের বিখ্যাত দার্শনিক লাইব্‌নিটস্ তাঁহার monad বা চিৎপদার্থের উচ্চ ও নিম্ন হিসাবে বহুপ্রকার স্তরের কল্পনা করিয়া মানবপ্রভৃতি উচ্চবিৎপদার্থগুলিকে নিম্নপদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। হেগেল্ যদিও সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বিরাট বা Absolute-এর প্রকাশরূপে কল্পনা করিয়াছেন, তথাপি এই প্রকাশের তিন অবস্থা—অচেতন, সচেতন ও আত্মচেতন (unconscious, conscious and self-conscious) নির্দ্ধারণ করিয়া, তিনি আত্মচেতনসম্পন্ন মানুষকে জড়জগৎ ও জীবজগৎ হইতে ভিন্ন করিয়াছেন এবং মানবের মধ্যে বিরাটের প্রকাশকে অন্য প্রকাশ অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধে স্থান দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তাৎপর্য্যবাদী মিন্‌ষ্টেরবার্গ মানুষের জগৎ ও জড়জগতের মধ্যে এত পার্থক্য করিয়াছেন যে, শেষোক্ত জগৎ তাৎপর্য্যহীন (valueless) বলিয়া একেবারে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

বাস্তবিক, এই একপেশেপনার জন্যই ধর্ম্ম টেঁকিয়া আছে। ইহা যদি না থাকিত, তাহা হইলে মুড়ি-মিছরির একদর হইয়া ধর্ম্মের শ্বাসরোধ হইত। এই অবস্থাকে দর্শনের ভাষায় বলে indifferentism or neutralism। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি (৮) যে, আধুনিক দর্শনের প্রধান সমস্যাই হইতেছে, এই indifferentism বা neutralism-কে জয় করা। দর্শনেরও যে-সমস্যা, ধর্ম্মেরও সেই সমস্যা। এই neutralism-কে সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে।

এই neutralism বর্ত্তমান যুগে নানা আকারে নিজকে প্রকাশ করিতেছে। যন্ত্রবাদ বা mechanism তাহার একটা রূপ মাত্র।

---

(৭) ধর্ম্ম, পৃ ৮৬।

(৮) *Problem of Value,* "Academy of Religion and Philosophy," September, 1931.

এই যন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে কবি তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ "মুক্তধারা" ও "রক্তকরবী"তে জানাইয়াছেন। ইহার সারমর্ম্ম তিনি সম্প্রতি বিলাতের "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডেনে" দিয়াছেন। কবি এই যন্ত্রবাদের সহিত যুদ্ধকে রাক্ষসের সহিত মানুষের যুদ্ধ (fight of Jack with the Giant) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ইউরোপের সভ্যতা এই রাক্ষসের পুষ্টিসাধন করিতেছে। ইহার ফলে মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এইজন্যই কবি ভীত হইয়াছেন এবং এই আশঙ্কাই তিনি "মুক্তধারা" ও "রক্তকরবীতে" ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই যন্ত্রবাদকে খর্ব্ব করিতে হইলে ব্যক্তিত্বকে (personality) ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিত্বের তরফ হইতে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিবাদ নানা বক্তৃতায় ও গ্রন্থে করিয়াছেন। ব্যক্তিত্ব জিনিষটা ন্যায়শাস্ত্রের মাপকাঠিতে ধরা দেয় না বলিয়া ব্যক্তিত্বের উপর যে-দর্শন প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে mysticism এই আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ বিচার করিলে প্রায় সকল দর্শনই mysticism-এর পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া হেগেলের দর্শন পর্য্যন্ত প্রায় সকল দর্শনই mysticism-এর পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ চেতনার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়, এই চারি অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া পরমাত্মজ্ঞানকে তুরীয় অবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়া mysticism-এর সৃষ্টি করিয়াছে। কেননা, তুরীয় অবস্থায় ন্যায়শাস্ত্রের মাপকাঠি পৌছায় না। হেগেল্ও প্রচলিত তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে চরম জ্ঞানে পৌছান অসম্ভব দেখিয়া নূতন তর্কশাস্ত্র সৃষ্টি করেন। এই তর্কশাস্ত্র বিদ্রোহী তর্কশাস্ত্র, ইহা আবহমান-প্রচলিত অ্যারিষ্টটলের তর্কশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এইজন্য তাঁহার দর্শনকে rationalism না বলিয়া অনেক সময় conceptual rationalism বলা হয়। আর আধুনিক দর্শন mysticism-এর বন্যায় প্লাবিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বের্গসঁ-ই বলুন, আর উইলিয়াম্ জেম্স্-ই বলুন, আর ডিল্টাই-ই বলুন, আর ক্রোচে-ই বলুন, বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে একটা mysticism-এর

প্রবাহ খুব জোরে বহিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ যদি এই হিসাবে mystic হন, তাহা হইলে তাহাতে দোষ কি? বাস্তবিক, প্রকৃত দার্শনিক mystic না হইয়া পারেন না। Rationalism-এর আজকাল যে-সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহাতে ইহা হয় যন্ত্রবাদ (mechanism) না হয় গণিতবাদে (mathematicism) গিয়া ঠেকে। কাজে-কাজেই যদি কোনো দর্শনে যন্ত্রবাদ অথবা গণিতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা যায়, তাহা হইলে ইহা একপ্রকার mysticism হইয়া দাঁড়ায়।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, যিনি ধর্ম্মের তত্ত্ব গায়ত্রীমন্ত্রের মধ্যে নিহিত দেখেন, তিনি কি করিয়া mystic হইতে পারেন? "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।" যদি ধীশক্তিই ধর্ম্মের অবলম্বন হয়, তাহা হইলে mysticism কি করিয়া আসিতে পারে? ইহার উত্তর অতি সহজ। গায়ত্রীমন্ত্রে যে-ধীশক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা আন্বীক্ষিকী বুদ্ধি বা logical reason নহে। উহাতে ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রকাশ রহিয়াছে। উহা অন্তঃশক্তির নামান্তর মাত্র। এবং এই অন্তঃশক্তি ও ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের নিকট একই জিনিষ।

আর-একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া আমি এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বিরাটের স্বরূপ কি?

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।

কবি প্রাচীন ভারতের বিরাটের এই কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার স্বরূপনির্দ্দেশে প্রয়াস পাইয়াছেন। কবি বলেন, "এই কর্ম্মজালবেষ্টিত পৃথিবীকে যখন বৃহদ্ভাবে দেখি, তখন দেখি তাহা চিরদিন অক্লান্ত, অক্লিষ্ট, প্রশান্ত, সুন্দর—এত কর্ম্মে, এত চেষ্টায়, এত জন্মমৃত্যুসুখদুঃখের অবিশ্রাম চক্ররেখায় সে চিহ্নিত, কিন্তু ভারাক্রান্ত হয় নাই। ...... এত বৈচিত্র্য এবং প্রয়াসের মধ্যে এই স্থির শান্তি ও সৌন্দর্য্য, এত কলরবের মধ্যে এই পরিপূর্ণ সঙ্গীত কি করিয়া সম্ভবপর হইল? ইহার এক উত্তর এই যে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।" (৯)

(৯) ধর্ম্ম, পৃ ৫৫।

নিরন্তর উদ্দামবেগে ধাবিত এই বিশাল জগৎ যদি একের দ্বারা বিধৃত হইয়া না থাকে, তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ড কি ভীষণ বিভীষিকা হইয়া না দাঁড়ায়!

জগতের চরম সত্য তবে কি স্থিতি? গতি কি তবে চরম নহে? এই প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ যাহা দিয়াছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথেরই উপযুক্ত। "ধর্ম্ম" শীর্ষক গ্রন্থে একের স্তব্ধ শান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখাইয়া কবি নিজে স্তব্ধ হন নাই। তিনি "বলাকা"য় আবার এই স্থিতি ও গতির প্রশ্নে উপস্থিত হইয়াছেন।

আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি (১০) যে, রবীন্দ্রনাথ স্থিতিবাদীদের পথ অনুসরণ করিয়া গতিকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি গতিকে বিশেষভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। "বলাকা"য় তিনি গতির নানা মূর্ত্তি আমাদিগকে দেখাইয়াছেন।—

> ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
> ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
> আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা!

'নবীন', 'কাঁচা', 'সবুজ,' 'অবুঝ' ইত্যাদি নানা আখ্যা তিনি এই গতিকে দিয়াছেন। যাহা সত্য তাহা জীবন্ত, তাহা ঝড়ের ন্যায় সমস্ত তোলপাড় করিয়া দেয়, তাহা বিদ্যুতের ন্যায় হঠাৎ উপস্থিত হইয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া দেয়।—

> এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো!
> বেদনায় যে বান ডেকেচে
> রোদনে যায় ভেসে গো!
> রক্ত-মেঘে ঝিলিক মারে,
> বজ্র বাজে গহন-পারে,
> কোন পাগল ঐ বারে বারে
> উঠ্‌বে অট্ট হেসে গো!
> এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো!

সত্যকে কেবল আরাম, কেবল শান্তি মনে করিলে চলিবে না, সত্যের

(১০) বলাকা ও বের্গস, "বঙ্গবাণী," বৈশাখ, ১৩৩১।

একটা রণমূর্ত্তিও আছে, সেটাকেও আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে।—

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।

এইরূপে কবি নানাভাবে গতির বাস্তবতা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কবির মতে চরম সত্য গতির মধ্যে পাওয়া যায় না। এইখানেই কবির সহিত বের্গসঁর প্রভেদ। বের্গসঁ সত্যে গতি ছাড়া আর কিছুই পান না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সত্যের আর-একটি মূর্ত্তি দেন, যাহা গতির পশ্চাতে এবং গতির ঊর্দ্ধে।

কবি বলেন, গতি বাসনার মত ; ইহা অতৃপ্ত। গতিকে চরম বলিলে, বলিতে হয় যে, বাসনা কেবল বাসনাই থাকিবে, তাহা তৃপ্তিতে কখনও পৌঁছবে না। কিন্তু সংসারে আমরা ঠিক ইহার উল্টাই দেখি। বাসনা তাহার তৃপ্তির জন্য লালায়িত, কামনা তাহার কাম্য বস্তুর দিকে নিরন্তর ধাবিত।—

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
অসংখ্য কামনা,
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি'
তাদের খেলায় হ'তে সাথী।
স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
খুঁজে মরে কূল ;
অস্পষ্টের অতল প্রবাহে পড়ি'
চায় এরা প্রাণপণে ধরণীরে ধরিতে আঁকড়ি'
কাষ্ঠলোষ্ট্র সুদৃঢ় মুষ্টিতে,
ক্ষণকাল মাটিতে তিষ্টিতে।

মানুষের লক্ষ লক্ষ অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্তির দিকে অহরহ ঘুরিতেছে। তাহারা রূপহীন। রূপ পাইবার জন্য তাহারা পাগলের মত ছুটাছুটি করিতেছে। তাহারা কোথায় গিয়া যে রূপ পাইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু রূপ তাহাদের পাইতেই হইবে।—

কি জানি কে তা'রা কবে
কোথা পার হবে
যুগান্তরে,
দূর সৃষ্টি 'পরে
পাবে আপনার রূপ অপূর্ব্ব আলোতে।

অরূপ যতক্ষণ না রূপ পায়, ততক্ষণ ইহার সত্য ইহা উপলব্ধি করে না। বাসনা যখন কেবল বাসনা থাকে, ততক্ষণ ইহার সত্যে ইহা উপনীত হয় না। গতিবাদীরা ইহা ভুলিয়া যান। তাঁহারা পূর্ণ সত্যের রূপ দেখিতে চাহেন না। কেবল তাহার একটা দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহারা সত্যের কেবল কঠোর মূর্ত্তিই দেখিতে পান, ইহার ভিতর যে-শান্তি, যে-তৃপ্তি আছে তাহা তাঁহাদের একেবারেই বোধগম্য হয় না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিত্ত কেবল এই ঘোরাঘুরি, ঠেলাঠেলিতে তৃপ্ত নহে। তিনি চাহেন পথ-হাঁটার পর, পায়ের ধূলা ধুইয়া, পা মেলিয়া বসিতে। তাই তিনি "সব-পেয়েছির দেশ" কবিতায় বলিয়াছেন,—

নাইকো পথে ঠেলাঠেলি,
নাইকো হাটে গোল,
ওরে কবি, এইখানে তোর
কুটীরখানি তোল্।
ফেল্ রে ধুয়ে পায়ের ধূলো,
নামিয়ে দে রে বোঝা,
বেঁধে নে তোর সেতারখানা,
রেখে দে তোর খোঁজা।
পা ছড়িয়ে ব'স্ রে হেথায়
সারাদিনের শেষে
তারায়-ভরা আকাশতলে সব-পেয়েছির দেশে।

রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমি ত' ছিলাম ঘুমে,
তুমি মোর শির চুমে'
গুঞ্জরিলে কী উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে কানে :
চল রে অলস কবি,
ডেকেছে মধ্যাহ্ন-রবি—
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।

চমকি' উঠিনু জাগি' ;
ওগো মৃত্যু-অনুরাগী,
উন্মুক্ত ডানায় কোন্ অভিসারে দূর-পানে ধাও,
আমারো বুকের কাছে
সহসা যে পাখা নাচে—
ঝড়ের ঝাপট লেগে হয়েছে সে উন্মত্ত উধাও।

দেখি চন্দ্র-সূর্য্য-তারা
মত্ত নৃত্য-দিশেহারা,
দামাল যে তৃণশিশু, নীহারিকা হয়েছে বিবাগী
তোমার দূরের সুরে
সকলি চলেছে উড়ে
অনির্ণীত অনিশ্চিত অপ্রমেয় অসীমের লাগি'

আমারে জাগায়ে দিলে,
চেয়ে দেখি এ-নিখিলে
সন্ধ্যা, ঊষা, বিভাবরী, বসুন্ধরা-বধূ বৈরাগিনী ;
জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জলে ;
কূল হ'তে নিল মোরে সর্ব্বনাশা গতির তটিনী ॥

তুমি ছাড়া কে পারিত
নিয়ে যেতে অবারিত—
মরণের মহাকাশে মহেন্দ্রের মন্দির-সন্ধানে ;
তুমি ছাড়া আর কা'র
এ উদাত্ত হাহাকার—
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে

রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য

—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্য-সাহিত্যের একটি বিশেষত্ব সম্বন্ধে সমস্ত সমালোচকেরাই একমত। সেই বিশেষত্বটি এই যে, নাটক ঠিক ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভার উপর নির্ভর করে না; প্রতিবেশ-প্রভাব ইহার পক্ষে প্রায় তুল্যরূপেই প্রয়োজনীয়। নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সকল যুগে ও দেশে নাটকের উৎকর্ষ জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত থাকে। পেরিক্লিসের যুগের গ্রীক্ নাটক, চতুর্দ্দশ লুই-এর যুগের ফরাসী নাটক ও এলিজাবেথ্ যুগের ইংরাজী নাটক সকলেই জাতীয় জীবনের উন্নতি ও উন্মাদনার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নাটক যেন উন্নতিশীল, বীরত্বমণ্ডিত, গৌরবময় জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক সাহিত্যিক অভিব্যক্তি। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, জাতির যৌবনের দৃপ্ত তেজ ও উন্মাদনা কাটিয়া গেলে, চিন্তাশীলতা ও দার্শনিকতত্ত্বানুশীলতা জাতীয় জীবনকে অধিকার করিলে নাট্য-সাহিত্যের উৎস সেখানে শুকাইয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিক্ ও ভিক্টোরিয়া যুগের অনেক প্রতিভা-বান কবি নাটক লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অতুলনীয় কবি-প্রতিভা নাটককে ঠিক জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই, নাটকের মূল রহস্যটি তাঁহাদের নিকট ধরা দেয় নাই। সাহিত্য-রাজ্যে নাটক যেন রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যা; এবং ইহাকে জাগাইবার সোনার কাঠি জাতীয় জীবনের কোন্ গোপন স্তরে লুকান আছে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

অনেকটা এই কারণেই অতি-আধুনিক যুগে নাটকের প্রকৃতি ও আদর্শ সম্বন্ধে একটা গভীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। অনেক চেষ্টার পরেও যখন পুরাতন নাটককে পুনর্জীবিত করা গেল না, তখন লেখক ও সমালোচক ইহার কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে ক্রমশঃ এই সত্য ফুটিয়া উঠিল যে, এলিজাবেথ্ যুগের নাটককে যে বর্ত্তমান কালে পুনর্জীবিত করা যায় না, তাহার প্রধান কারণ, আমাদের

জীবনের ধারা ও সমস্যা এখন সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। যৌবনের স্বপ্ন ও কর্ম্মক্ষমতা প্রৌঢ়জীবনে প্রতিফলিত করা যায় না। শেকস্‌পীয়ারের নিকট জীবনের যে-প্রশ্ন, যে-সমস্যা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, একজন আধুনিক নাট্যকারের নিকট তাহারা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। লিয়ারের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, ম্যাক্‌বেথের মূঢ় রক্ত-পিপাসা, ওথেলোর উন্মত্ত সন্দেহ, হ্যামলেটের অশান্ত আত্ম-জিজ্ঞাসা—সমস্তই যেন একটা সুদূর জগতের ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মতো আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছে। অবশ্য শেকস্‌পীয়ারের নাটকে মানব-হৃদয়ের যে-সমস্ত সমস্যা আলোচিত হইয়াছে তাহারা চিরন্তন, তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু উহাদের সে পুরাতন তীব্রতা, সে উদ্দাম গতিবেগ নাই। অকৃতজ্ঞ সন্ততির এখন অভাব নাই, এবং বোধ হয় কখনই অভাব থাকিবে না; কিন্তু আত্মপ্রতারণা ও মোহের যে উচ্চ শিখর হইতে ভূমিসাৎ হইয়া বৃদ্ধ রাজা লিয়ারের মর্ম্ম-বেদনা এত করুণ ও অভ্রভেদী হইয়াছিল, বর্ত্তমান জীবনের সমতল ভূমিতে সেই মোহ-পর্ব্বতের স্থান কোথায়? সুতরাং বর্ত্তমান যুগের লিয়ারেরা পড়ে ও কাঁদে, কিন্তু তাহাদের ক্রন্দনে সেই বিরাট, সর্ব্বগ্রাসী সুর নাই। ম্যাক্‌বেথের উচ্চাভিলাষ বর্ত্তমান যুগে হত্যার ছুরিকা না ধরিয়া উপায়ান্তরে নিজ উন্নতির পথ পরিষ্কার করে এবং ডাকিনীর সহিত পরামর্শের অপেক্ষা রাখে না—সুতরাং নাট্যকার তাহার মধ্যে আপনার চরম গৌরবের উপাদান খুঁজিয়া পান না। ওথেলোর ঈর্ষ্যা আজকাল সমস্ত পাশ্চাত্য সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়া বিবাহচ্ছেদ বিচারালয়ের কার্য্যবিবরণীর মধ্যে সুলভ সমাধান লাভ করে, এবং ডেস্‌ডেমোনা আত্মবলির পরিবর্ত্তে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে ঈর্ষ্যাপরায়ণ স্বামীর সহায়তাই করে। হ্যামলেটের আত্মজিজ্ঞাসা অবশ্য বিশেষভাবেই আধুনিক কালের ব্যাধি, কিন্তু যে-অবস্থার মধ্যে তাহার চিত্ত-দৌর্ব্বল্য ট্রাজেডির সৃষ্টি করিয়াছিল এখন তাহার পুনরাবৃত্তির অবসর কোথায়? মোটের উপর শেকস্‌পীয়ারের সময়ের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যে উদ্দাম প্রবৃত্তির প্রবলতা, যে উচ্চ সুরে বাঁধা হৃদয়তন্ত্রী ছিল আধুনিক কালে তাহার তীব্রতা অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে; আজ-কাল জীবনের দুঃখ-জ্বালা, জীবন-

সমস্যার সংঘাত অপেক্ষাকৃত মৃদু সুরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন ট্রাজেডির বীরত্বপূর্ণ, অলঙ্কার-বহুল ভাষা আমাদের কর্ণে যেন অনেকটা অর্থহীন কোলাহলের মতই ধ্বনিত হয়—"with little meaning, though the words are strong." বর্ত্তমান জীবনের চরম মুহূর্ত্ত-গুলি (crises) শেকস্‌পীয়ারের যুগের সহিত এক নয়।

সুতরাং এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমতা রাখিয়া নাটকেরও প্রকৃতি ও আদর্শ রূপান্তরিত হইতেছে। ঘটনা-বহুল পঞ্চাঙ্ক নাটক বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র সমস্যার মধ্যে তাহার রাক্ষসী ক্ষুধার যথেষ্ট খাদ্য পাইতেছে না, সেইজন্য খুব স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই তাহার কলেবর সঙ্কুচিত হইয়া তিন-অঙ্ক বা একাঙ্ক নাটকে দাঁড়াইতেছে। ভাষার কবিত্বময় উচ্ছ্বাস ও অলঙ্কার-স্ফীতি সাধারণ জীবনের সম্পর্কে আপনার আতিশয্যে আপনি লজ্জিত হইয়া প্রতিদিনের গদ্যে সঙ্কুচিত হইতেছে। আবার এই আকৃতি-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আধুনিক নাটকের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনও ঘটিতেছে। এই অন্তর্দৃষ্টির যুগে মানুষ বাহিরের বিস্ময় হইতে দৃষ্টি সংহত করিয়া অন্তরের গভীরতর রহস্যের দিকে প্রেরণ করিতেছে। বাহিরের যুদ্ধ-বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা বহিঃপ্রেরণার জন্য অন্তরের বিক্ষোভ যে-পরিমাণে শান্ত হইয়া আসিতেছে, সেই পরিমাণে অন্তরের নীরবতা এক অপূর্ব্ব রহস্যমণ্ডিত হইয়া নূতন অর্থ-গৌরবে ভরিয়া উঠিতেছে। যাহা তুচ্ছ ও সামান্য, তাহার মধ্যেও অনন্ত রহস্যের সঙ্কেত ও ইঙ্গিত স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। বাঁশীর মধ্যে ফুৎকার-বায়ুর ন্যায় পৃথিবীর সমস্ত নীরব, নিশ্চল পদার্থের মধ্যে একটা গোপন শক্তির আনাগোনা, তাহার মৃদু পদক্ষেপ ও অস্পষ্ট গুঞ্জরণ-ধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইতেছে। জীবনের এই অতীন্দ্রিয় রহস্য (mysticism) ও সাঙ্কেতিকতা (symbolism) সর্ব্বপ্রথম গীতি-কবিতার ছন্দে গাঁথা পড়ে। কিন্তু এই লীলাময় বিকাশ যতই সুস্পষ্ট হইতেছে, যতই ইহা ব্যক্তিগত অনুভূতির সীমা ছাড়াইয়া সাধারণ পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করিতেছে, বিশেষতঃ মানব-মন যতই ইহার আনন্দময় ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে একটা সাগ্রহ কৌতূহল অনুভব করিতেছে, ততই ইহা গীতি-কবিতার রাজ্য অতিক্রম করিয়া নাটকের বিষয়ীভূত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে একটা

সম্পূর্ণ নূতন রকমের নাট্য-সাহিত্য আমাদের চোখের সম্মুখে সৃষ্ট হইতেছে। ইহাকে symbolical drama বা রূপক-প্রধান নাটক নামে অভিহিত করা হইতেছে। Maeterlinck, Yeats, Synge প্রভৃতি এই নূতন নাট্য-সাহিত্যের স্রষ্টিকর্ত্তা। এই নূতন নাটকের প্রকৃতি সম্বন্ধে Maeterlinck যাহা বলিতেছেন তাহা হইতেই বোঝা যাইবে যে, পুরাতন নাটকের সহিত ইহার কি গভীর মূলগত প্রভেদ।—

"I have come to believe that an old man seated in his arm-chair, waiting quietly under the lamp-light, listening without knowing it to all the eternal laws which reign about his house . . . . bowing his head a little, without suspecting that all the powers of the earth intervene and stand on guard in the room like attentive servants . . . . .—I have come to believe that this motionless old man liked really a more profound, human, and universal life than the lover who strangles his mistress, the captain who gains a victory, or the husband who 'avenges his honour'."

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ এই সাঙ্কেতিক নাট্য-সাহিত্যের মধ্য দিয়াই নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং এই নূতন নাটকের আদর্শেই তাঁহার নাটকগুলির বিচার করিতে হইবে।

এই সাঙ্কেতিকতা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটকগুলির মধ্যে ততটা সুপরিস্ফুট নহে। তাহাদের প্রধান বিষয় হইতেছে ধর্ম্মঘটিত বিরোধ, ধর্ম্মের প্রাণহীন সংস্কারের সহিত প্রবুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞানের সংঘর্ষ। এই ধর্ম্ম-প্রাণতা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকেরই সাধারণ লক্ষণ; কিন্তু আগেকার নাটকগুলির মধ্যে ধর্ম্মের যে বিচার ও আলোচনা হইয়াছে তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধি ও হৃদয়-ভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; তাহার মধ্যে রূপকের ভাস্বর আবরণ নাই, সাঙ্কেতিকতার বিদ্যুৎ-বিকাশ খেলিয়া যায় না। হয় ত কোথাও কোথাও এই রহস্যময় ইঙ্গিতের একটা অস্পষ্ট ছায়া

লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ছায়াবরণের পশ্চাতে যে গোপন লীলাময় খেলা চলিতেছে তাহার অপরূপ নৃত্য-ভঙ্গীটি আমাদের কানে বাজিয়া উঠে না। মোট কথা, রবীন্দ্রনাথের নাটকের যে আসল রূপ তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী নাটকেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং এই সাঙ্কেতিকতার ক্রম-বিবর্ত্তনের দিক্ দিয়াই তাঁহার নাটকগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) প্রকৃতির প্রতিশোধ; (২) মালিনী; (৩) রাজা ও রাণী; (৪) বিসর্জ্জন—এই কয়েকখানি নাটকেই পূর্ব্ব-সাঙ্কেতিকতা (Pre-symbolism) যুগের বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 'অচলায়তনের' স্থান দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি। ইহাতে যদিও রূপকের স্পর্শ আছে, কিন্তু সেই স্পর্শের মধ্যে রহস্যঘন, লীলা-চঞ্চল সুরটি বেশ নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রকাশ পায় নাই। ইহার প্রধান বিষয় হইতেছে জরাজীর্ণ, কুসংস্কার-কীট-জর্জ্জর হিন্দু ধর্ম্মের উপর আক্রমণ; এবং এই আক্রমণের মাত্রাধিক্যই রহস্যের সুরটির অবাধ ও সাবলীল প্রকাশে বাধা দিয়াছে। সাঙ্কেতিক নাটকের মধ্যে—(১) রাজা; (২) ডাকঘর; (৩) ঋণশোধ বা শারদোৎসব; (৪) মুক্তধারা; (৫) রক্তকরবীকে ফেলা যাইতে পারে। সর্ব্বশেষ নাটক 'নটীর পূজা' অনেকটা সাঙ্কেতিকতা-প্রভাব-মুক্ত ও তাহার মধ্যে সাধারণ নাটকোচিত গুণের অপেক্ষাকৃত অধিক স্ফুরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের আদি-যুগের নাটকগুলি অনেকটা সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত। তাহাদের মধ্যে যে-বিরোধের সংঘাত অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা মূলতঃ অভিন্ন-প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমস্ত নাটকেই একই প্রকার সংঘাতের পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইয়াছেন—প্রকৃত স্বাধীন ধর্ম্মজ্ঞানের সহিত প্রতিষ্ঠান-বদ্ধ, আচার-ভার-ক্লিষ্ট ধর্ম্মমতের সংঘর্ষ। আর এই সংঘর্ষের বাহ্যবিকাশ হইয়াছে রাজশক্তির সহিত ব্রাহ্মণ্য-শক্তির তুমুল প্রাণপণ সংগ্রামে। রবীন্দ্রনাথ মোটের উপর রাজশক্তিকে স্বাধীন ধর্ম্মজ্ঞানের অনুকূল ও ব্রাহ্মণ্যশক্তিকে প্রাণহীন ধর্ম্মান্ধতার দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে দেখাইয়াছেন। আবার নাটকীয় সংঘাতকে ঘনীভূত করিবার জন্য এই দুই প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও ভেদের অব-তারণা করিয়াছেন। 'বিসর্জ্জনে' রাণী ধর্ম্মান্ধ পুরোহিতের দলে যোগ

দিয়া রাজার কর্ত্তব্য-পালনকে দুঃসাধ্যতর ও তাঁহার মনোবেদনাকে গভীর-তর করিয়া দিয়াছেন ; আবার পুরোহিত-পক্ষীয় জয়সিংহ তাহার চিত্ত-সংশয় ও গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা রঘুপতির লৌহমুষ্টিকে কতকটা শিথিল ও তাহার দর্পিত বিজয়-শ্রীকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। রাজকন্যা মালিনীর সুকুমার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সংস্কারগত সনাতন ধর্ম্মমতের যে-বিরোধ তাহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল বটে ; কিন্তু চিরসুহৃৎ ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়ের যে মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটিল তাহাই নাটকখানিকে ট্রাজেডির রক্ত-রাগে অভিষিক্ত করিয়া দিয়া গেল। 'রাজা ও রাণী'তে বিরোধের প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র ; রাজা বিক্রমদেবের অভিমান-ক্ষুব্ধ অতৃপ্ত প্রেম-পিপাসার সাংঘাতিক বিজিগীষায় পরিবর্ত্তনই ইহার মুখ্য ব্যাপার ; কিন্তু বিক্রম ও তাহার প্রতিযোদ্ধা কুমারসেনের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, রাণীর বিরুদ্ধে রাজার মর্ম্মান্তিক অভিমানই তাহার ফিকে রংএর উপর এক গাঢ়তর বিষাদ-কালিমা লেপন করিয়াছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'ও কেন্দ্রস্থ বিরোধ-কাহিনীটি একটু নূতন রকমের—একজন উদাসীন, সংসারের প্রতি জাতক্রোধ, মোহমুক্ত সন্ন্যাসীর সংসারের স্নেহ-মায়া-মমতার নিকট আত্মসমর্পণ। এখানে দ্বন্দ্বটি সম্পূর্ণরূপেই অন্তরের, কোন্ বহিঃশক্তির সহিত সংঘাত ইহার মধ্যে নাই।

এই সমস্ত প্রথম যুগের নাটকের মধ্যে নাটকোচিত গুণের কতখানি বিকাশ হইয়াছে, ইহার আলোচনা করিতে গেলে কোন্ আদর্শে ইহাদের বিচার হওয়া উচিত, তাহাই সর্ব্বপ্রথম নির্দ্ধারণীয়। একদিকে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ কখনই তাঁহার নাটকগুলিকে সাধারণ নাটকের 'কঠোর' নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে চাহেন নাই। উহার সুনির্দ্দিষ্ট অঙ্ক-গর্ভাঙ্ক-সংবলিত 'ঘন-পিনদ্ধ কায়া,' তাঁহার মনের মধ্যে যে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ ডানা মেলিয়া আছে, তাহাকে লৌহপিঞ্জরবৎ পীড়িত করিয়াছে। তাঁহার সমস্ত নাটকেই একটা শিথিল, স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত গঠন আছে। তাঁহার লেখার গীত-ধর্ম্মের অতি-প্রাধান্য যে অন্যান্য গুণকে অনেকটা হ্রস্ব ও সঙ্কুচিত করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং খাঁটি নাটকের চির-প্রথাগত আদর্শ অনুসারে উহাদিগকে বিচার করিতে গেলে উহাদের প্রতি বোধ হয় সুবিচার

করা হইবে না। আবার পক্ষান্তরে নাটকের একটা নিজস্ব ধর্ম্ম আছে, যাহাকে বিসর্জ্জন দিলে নাটকের বাহ্যরূপ অবলম্বন করার কোনই সার্থকতা থাকে না। গীতি-প্রতিভা যতই উজ্জ্বল ও প্রচুর হউক না কেন, তাহা নাটকীয় গুণের অভাব পূরণ করিতে পারে না। নাটকের পাত্র-পাত্রীর নিয়ন্ত্রিত কথোপকথনের দ্বারা এমন একটি তীব্র, ঘন বিরোধের ভাব ফুটাইতে হইবে যাহা গীতিকাব্যের স্বতঃ-উৎসারিত একটানা প্রবাহের মধ্যে মিলে না। সেইজন্য 'কর্ণ ও কুন্তী', ও 'কচ ও দেবযানী' নাটকের বাহ্য-লক্ষণাক্রান্ত হইলেও ইহাদিগকে নাটক বলিয়া ভুল করা যায় না। নাটকের মধ্য দিয়া একটা ঘাত-প্রতিঘাতের ঘনীভূত নির্য্যাস পাঠকের সম্মুখে উপ-স্থাপিত করিতেই হইবে, যেখানে ইহার অভাব, সেখানে নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই বিরোধের প্রকৃতি এখন প্রায় সম্পূর্ণভাবেই রূপান্তরিত হইয়াছে। আধুনিক নাটকে পূর্ব্বের মত সমুদ্র-মন্থন, দেবাসুরের তুমুল সংগ্রাম, দুই বিরুদ্ধ শক্তির প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধের অবসর না থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে একটা নূতন ধরণের খেলা, প্রাণের মধ্যে একটা নূতন শক্তির আনাগোনা, একটা নূতন রহস্যময় অতিথির লঘু পাদসঞ্চার, একটা নব পরিচয়ের নিগূঢ় আবেগ ও উন্মাদনা দেখাইতে হইবে। সাঙ্কেতিক নাটকে পূর্ব্বকালের যুদ্ধের পরিবর্ত্তে এই নূতন খেলার নৃত্যটি ফুটাইয়া তোলা হয় বলিয়া তাহার নাটকরূপে পরিচিত হইবার দাবী স্বীকৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের নাটকগুলির মধ্যে এই কেন্দ্রস্থ ভাবটির—তাহা বিরোধই হউক বা নব-পরিচয়ের প্রাণস্পন্দনই হউক—অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই ভাবটি কিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার উপর উঁহাদের নাটকীয় উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ভর করে। তিনি নাটকের বাহ্য অবয়ব ইচ্ছাপূর্ব্বকই বর্জ্জন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সমালোচককেও ইহাকে গৌণ অঙ্গ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার নিয়ম-লঙ্ঘন ও গীতি-কাব্যসুলভ আতিশয্যের মধ্যে নাটকীয় মূল সূত্রটি পাওয়া যায় কি-না তাহার জন্য সমস্ত দৃষ্টিশক্তি ও বিচারবুদ্ধি জাগ্রত রাখিতে হইবে।

এইবার নাটকগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতে পারে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' কবির প্রথম বয়সের রচনা। যে অস্বাস্থ্যকর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁহার প্রথম কবিতাগুলির মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহা এই নাটকেও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ইহার নাটকোচিত গুণ খুব সামান্য। ইহাতে চরিত্র একটিমাত্র, এবং তাঁহার উক্তিগুলিও সমস্ত একতরফা। প্রকৃতির উপর সন্ন্যাসীর অভিমান ও বালিকার স্নেহ-আকর্ষণের মধ্যে যে-সংঘাত, তাহার মধ্যে নাটকীয় রূপ ও তীব্রতার একান্ত অভাব। অবশ্য সন্ন্যাসীর মনের পরিবর্ত্তন-স্তরগুলি সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও নাটক এক নহে। বাহিরের যে ঘাত-প্রতিঘাতে এই মানসিক পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছিল, তাহার কোন স্পষ্ট লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাস্তব-জীবনের যে-কয়েকটি ছবি সন্ন্যাসীর মনোবিকারের হেতু-স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা অসংলগ্ন ও স্বল্পপরিসর, কোন উচ্চতর ঐক্যসূত্রে বদ্ধ হয় নাই। স্থানে স্থানে আশ্চর্য্য কবিত্বের উচ্ছ্বাস থাকিলেও ভাষা মোটের উপর অপরিপক্ক ও নাটকের অনুপযোগী। সেইজন্য মনে হয় যে, লেখক বিষয়-নির্ব্বাচনে নাটকোচিত সম্ভাবনার সন্ধান করেন নাই, ভাষার উপর অধিকার ও প্রকাশক্ষমতা পরীক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

'মালিনীতে'ও নাটক অপেক্ষা গীতি-কাব্যেরই লক্ষণ অধিক সুপরিস্ফুট। বইখানি আগাগোড়া মিত্রাক্ষর-ছন্দে রচিত বলিয়া মনে হয় যে, কবি ইহাকে নাটকের রূপ দিতে চেষ্টাই করেন নাই—ইহা যেন 'কচ ও দেবযানী' বা 'কর্ণ ও কুন্তীর' বৃহত্তর সংস্করণ। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তি প্রায় পূর্ণবিকশিত হইয়াছে—ভাষার জড়তা ও দৈন্য সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়া একটা পূর্ণ প্রবাহের জোয়ার আসিয়াছে। কিন্তু কোন নাটকীয় প্রতিবেশ রচনা বা নাটকোচিত গুণের বিকাশের দিকে কবি একেবারেই উদাসীন। মালিনী, রাজা, রাণী ইত্যাদি কেহই নাটকের পাত্র-পাত্রী বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় না। তাহাদের নিজ বক্তব্যটি তাহারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে অনবদ্য কবিত্বপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু নাটকের ন্যায় একের উক্তি অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবার কোন লক্ষণই নাই। এক

ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়ের সম্পর্কের মধ্যে সামান্য একটু নাট্যোচিত গ্রন্থিজাল পড়িয়াছে, কিন্তু সে-সমস্যা অতি সামান্য ও তাহার সমাধানও খুব সুলভ। 'মালিনী'তে গীতি-কাব্যেরই সম্পূর্ণ প্রাধান্য, নাটকের বাহ্যরূপ তাহার অত্যন্ত স্বচ্ছ ছদ্মবেশ মাত্র। কবি যেন তাঁহার কাণায়-কাণায়-পূর্ণ গীতি-শক্তির একটা অনাবশ্যক তরঙ্গ নাটকের শুষ্ক শীর্ণ খাত দিয়া প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন—নাটকের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল বলিয়া নয়, একটা নবলব্ধ শক্তির উচ্ছ্বসিত বাধা-বন্ধহীন আনন্দে।

'বিসর্জ্জন' ও 'রাজা রাণী' এই দুইখানি পূর্ণাবয়ব পঞ্চাঙ্ক নাটক এবং ইহাদের মধ্যে নাটকের রীতি-নিয়ম যতদূর সম্ভব নিখুঁতভাবে পালন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই দুইটিতে কবি নাটকের সূক্ষ্ম বিধি-নিয়মের বেড়াজালের মধ্যে নিজ মুক্ত-স্বাধীন কবিপ্রতিভাকে আবদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং ইহাদিগকে নাটকীয় আদর্শে বিচার করা অন্যায় হইবে না। ইহাদের মধ্যে 'বিসর্জ্জন' নাটকটি অনেকটা কবির নিজ অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য জনসমাজে অধিকতর পরিচিত।

রাজশক্তি ও ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিরোধের যে ক্ষীণ আভাষ 'মালিনীতে' পাওয়া যায় তাহা এখানে নাটকোচিত পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করিয়াছে। রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্য পরস্পরের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী; তাহাদের ইচ্ছাশক্তির পরস্পর সংঘাতে যে দাহ ও দীপ্তির উদ্ভব হইয়াছে তাহা নাটকীয় রূপ ধারণের উপযুক্ত—কেবল গীতি-কবিতায় তাহার পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়। ক্ষেমঙ্কর যে-বিদ্রোহ গীতি-কাব্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে, রঘুপতিতে তাহা একেবারে উদ্দাম হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে ও কার্য্যক্ষেত্রে তাহার তীব্র অভিব্যক্তি হইয়াছে। জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্বটি নাটকের পক্ষে যথেষ্ট প্রবল ও ব্যাপক—বাস্তবিকই একটা গভীর অন্তর্বিপ্লবে তাহার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইতেছে, ইহা আমরা অনুভব করি। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সন্ন্যাসীর অনির্দ্দিষ্ট ও অস্পষ্ট ক্ষোভ এখানে কায়া ও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং নাটকীয় উপাদান ও প্রচেষ্টা ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। কিন্তু তথাপি নাটকহিসাবে ইহা খুব উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করে নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর

উক্তিগুলি অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ ও বাহুল্য-দুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নাটকোচিত সংযম ও অর্থপূর্ণতার অভাব। জয়সিংহের স্বগতোক্তিগু'লতে বিশেষভাবে এই দোষ লক্ষিত হয়। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের শান্ত অটল তেজস্বিতা ও স্নেহসিক্ত ন্যায়নিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যেমন, নাটকে ততটা ফুটিয়া উঠে নাই। রাজা ও নক্ষত্ররায়ের মধ্যে তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে যে-কথোপকথন, তাহার মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান ছিল; কিন্তু লেখক সেই উপাদানের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তারপর নাটকের ঘটনা-বিন্যাস মোটের উপর খুব উপযোগী হয় নাই। কোন কোন দৃশ্য অযথা ভারাক্রান্ত হইয়াছে, আবার কোথাও বা শূন্যগর্ভ গীতিকাব্যোচিত দীর্ঘনিঃশ্বাস। অপর্ণা 'প্রকৃতির প্রতিশোধের' অনাথা বালিকার আর-একটু উন্নততর সংস্করণ; কিন্তু তাহা অবিমিশ্র, একটানা খেদবাণী নাটকের প্রকৃতির সহিত খাপ খায় নাই। লেখকের ভাষা গীতি-কাব্যের দিক্ দিয়া বেশ কবিত্বপূর্ণ হইলেও নাটকের দমকা হাওয়ায় ও মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার পক্ষে যেন যথেষ্ট লঘু ও স্বচ্ছন্দগতি নয়। রবীন্দ্রনাথের যে নাটকের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল না, তাহা বুঝিতে গেলে তাঁহার রাজর্ষি উপন্যাসের সহিত 'বিসর্জ্জন' নাটকটির তুলনা করিলেই চলিবে। উপন্যাসে তিনি তাঁহার সমস্ত প্রতিভা, সমস্ত মাধুর্য্য ও কোমলতা ঢালিয়া দিয়াছেন; নাটকের অপরিচিত ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা যেন অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া খণ্ডিত ও প্রতিহত হইয়াছে। রাজার যে অবিকল্প মূর্ত্তিটি উপন্যাসে জ্বলন্ত অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, নাটকে যেন তাহা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ও হীনপ্রভ। উপন্যাসটি তাঁহার ডান হাতের লেখা ও নাটকটি যেন বাঁ হাতের লেখা বলিয়া মনে হয়।

'রাজা ও রাণী' রবীন্দ্রনাথের অ-সাঙ্কেতিক নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া মনে হয়। ইহাতে নাটকীয় অবসরও অনেক; কবি এই সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটা প্রকৃত tragic sense, একটা প্রতিকূল দৈবের ক্ষমাহীন বিরোধের ভাব অনুভব করা যায়। বিক্রমদেবের মানসিক পরিবর্ত্তন বেশ নিপুণভাবে ও যথেষ্ট হেতুবাদের সহিত সাধিত হইয়াছে। সুমিত্রার পতিগৃহ হইতে পলায়ন,

খুব সাধারণ ঘটনা হইলেও, এমন একটা দুশ্ছেদ্য জটিলতাজালের সৃষ্টি করিয়াছে যাহা মোচন করিতে কুমার ও সুমিত্রার শোচনীয় আত্মবলিদানের প্রয়োজন হইয়াছে। অপ্রধান চরিত্রগুলিও বেশ সজীব হইয়া উঠিয়াছে, লেখক যেন দুই-একটি কথাবার্ত্তার দ্বারাই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপটি ফুটাইতে পারিয়াছেন। কুমারের পরিণাম নিয়তি-নিষ্পেষণের একটা শোচনীয় দৃষ্টান্ত। তাহার সবই ছিল—অপরিমেয় প্রেম, প্রজা ও সৈন্যদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ক্ষাত্রশক্তি ও আত্মপ্রত্যয় কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু ভাগ্যের অগ্নিপরীক্ষায় এ সমস্তই দুর্ব্বার বন্যাস্রোতে বালির বাঁধের ন্যায় ভাসিয়া গেল। আর সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার নিজের মহত্ত্বই তাহার নিজের মাথার উপর দুর্ভাগ্যের বজ্রকে ডাকিয়া আনিল। ভগিনীর অনুরোধে ও ভগিনীপতির সাহায্যার্থই তাহার প্রথম কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ; কিন্তু এই উদার স্নেহশীল ব্যবহারের ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। তার পর আমরা ইহাও অনুভব করি যে, যদি কুমার নিজের ধীর প্রবৃত্তির রাশ ছাড়িয়া দিয়া কাশ্মীরের বহির্দ্দেশে বিক্রমদেবের সহিত রণক্ষেত্রে শক্তি পরিক্ষা করিত, তাহা হইলে বোধ হয় বিক্রমের অন্ধ হিংসা ও রোষানল সহজেই নির্ব্বাপিত হইত। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তেই সে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমা ও মৈত্রীর বাণীতে কর্ণপাত করিল, সেই মুহূর্ত্তেই আপন সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। আবার ইলার সহিত বিবাহ অসম্পূর্ণ রাখিয়া যুদ্ধযাত্রা করা তাহার উদার প্রকৃতির আর-একটি সাংঘাতিক ভুল। কেননা বিবাহ তাহার ভাবী শ্বশুর অমরুরাজের দুর্ব্বল, সংশয়সমাকুল চিত্তকে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ করিয়া সর্ব্বনাশের অন্ততঃ একটা ছিদ্রপথও বন্ধ রাখিতে পারিত। সেইজন্য কুমারের অনপরাধের শাস্তি আমাদিগকে কর্ডেলিয়া বা হ্যামলেটের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। উদার হৃদয়ে উদার্য্যজনিত যে-দুঃখ তাহাই ট্রাজেডিরি প্রকৃত উপজীব্য।

অন্যান্য দিক্ দিয়াও নাটকটির অনেক উন্নতি দেখা যায়। ঘটনা-বিন্যাস মোটের উপর প্রশংসার্হ, তবে পঞ্চম অঙ্কটিকে পুঞ্জীভূত ঘটনার চাপে অযথা ভারাক্রান্ত করা হইয়াছে; ইহার কিয়দংশ চতুর্থ অঙ্কে সন্নিবেশ করিলে নাটকের গঠন-সামঞ্জস্য আরও উন্নতিলাভ করিত। গ্রাম্য লোকের

চরিত্র 'বিসর্জ্জনে'ই অধিকতর নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে, কেননা ধর্ম্মমোহ তাহাদের চরিত্রের একটা প্রধান অঙ্গ; 'রাজা ও রাণী'র গ্রাম্য লোকদের সেরূপ কিছু বিশেষত্ব নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উন্নতি দেখা যায় ভাষার দিক্ দিয়া—ভাষার মধ্যে কবিত্ব ও নাটকোপযোগিতা উভয় গুণই একসঙ্গে রক্ষিত হইয়াছে। 'বিসর্জ্জনে'র আতিশয্য ও অনুচিত দৈর্ঘ্য নাটকের প্রয়োজন অনুসারে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহার স্বচ্ছ ওজস্বিতা ও পরিমিতির ভিতর দিয়া নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর অন্তরের আবেগ প্রতিফলিত হইয়াছে। যদিও ইহাতে খুব উচ্চ অঙ্গের নাট্য-প্রতিভার পরিচয় নাই, যে-সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্পর্শের দ্বারা প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার মানব-হৃদয়ের গভীর অন্ধকার তলদেশে আকস্মিক আলোক-রেখা পাত করেন, তাহা বিরল, তথাপি কবিত্বপূর্ণ সুগঠিত নাটকের মধ্যে ইহার স্থান উচ্চে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

৪

রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে 'অচলায়তনে' সাঙ্কেতিকতার প্রথম সূত্রপাত। ইহাতে তিনি চিরপ্রথাগত নাটকের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া সাঙ্কেতিকতার গহন পথে পদক্ষেপ করিয়াছেন। পূর্ব্ব নাটকের সহিত ইহাদের বিষয়গত প্রভেদ যে খুব বেশী তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম-প্রবণ মন প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই উদ্দেশ্যের অনুসরণে আত্মনিয়োগ করিয়াছে—ধর্ম্মের বাহ্য-আচার অনুষ্ঠান হইতে ইহার প্রকৃত রূপটির পৃথকীকরণই তাঁহার জীবনের ব্রত। কিন্তু এখন হইতে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে তাঁহার কবিতায় যেমন, নাটকেও তেমনি একটা নূতন পন্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা লক্ষিত হয়। এখন তিনি ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী তত্ত্বকথায় প্রকাশ না করিয়া হৃদয়ের একটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি, একটি সূক্ষ্ম, অপরূপ স্পর্শের মত দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। রঘুপতি ও রাজা গোবিন্দমাণিক্য, ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয় ধর্ম্মের আদর্শ ও স্বরূপ সম্বন্ধে পরস্পরের মত যুক্তিতর্ক-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু এখন হইতে লেখক যুক্তিতর্কের পথ বর্জ্জন করিয়া ঠাকুরদাদার মত সরল আনন্দময় বৃদ্ধ, অমলের মত স্বচ্ছ অনাবিল-দৃষ্টি বালক, সুরঙ্গমার মত হীন অথচ ভগবৎ-

কুপায় ধন্যা নারী প্রভৃতির অনুভূতির মধ্য দিয়া ভগবানের রহস্যময়, অথচ নিঃসন্দেহ আবির্ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাদের নিকট ভগবান অনধিগম্য, অপ্রাপণীয় নহেন; উপনিষদের 'যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে' ইঁহার প্রতি প্রযোক্তব্য নহে। ইনি ইহাদের একান্ত আত্মীয়, অত্যন্ত নিকট; ইঁহার স্পর্শ বসন্তপবন-হিল্লোলের মত ইহাদের মনের মধ্যে প্রবাহিত হয়; চারিদিকের আকাশ-বাতাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ইঁহার আভাস ও ইঙ্গিতে পূর্ণ; ইঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব ইহাদের সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে নিজ নিঃশব্দ পদসঞ্চারের ছাপ রাখিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই সন্দেহ-সঙ্কুল, অবিশ্বাসী যুগের মধ্যে ব্রজলীলার পুনরভিনয় ঘটাইয়াছেন—অথচ বর্ত্তমান চিন্তা-ধারার সহিত ইহার কোন অসামঞ্জস্য নাই। এখানে পৌরাণিক যুগের অতিপ্রাকৃত বা ভগবানের অত্যন্ত স্থূলদেহ ধারণ আমাদের বিশ্বাসের কণ্ঠরোধ করে না। বিজ্ঞান আমাদের সনাতন মন্দিরগুলি বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে ও পুরাতন বিগ্রহগুলি চূর্ণ করিয়াছে সত্য; কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ইহাদের সহিত সহমরণে যায় নাই। ভগবান তাঁহার পুরাতন আশ্রয়চ্যুত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছেন ও নূতন উপায়ে ভক্ত হৃদয়ের সহিত সম্পর্কস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই নূতন পূজার উপাসক ও এই নূতন মন্ত্রকে বাণী দিয়াছেন—ভগবানের সহিত মানব-মনের মিলনের এই অবিনশ্বর আকাঙ্ক্ষাকে, আনন্দ-উপলব্ধি ও ব্যাকুল প্রতীক্ষার মধ্য দিয়া, নাটকীয় রূপ দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত নাটকের মধ্যে ভগবানের স্বরূপটি, নীরস তত্ত্বকথায় নহে, সরস লীলা-মাধুর্য্যে, মানব-মনের সহিত বিচিত্র, চঞ্চল ঘাত-প্রতিঘাতে, যতই সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়াছে, ততই নাটক হিসাবে তাহাদের সার্থকতা ও উৎকর্ষ এবং এই দিক দিয়াই তাহাদের নাটকীয় গুণ সম্বন্ধে আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

'অচলায়তনে'র রূপক খুব সুস্পষ্ট নহে; বিদ্রূপাত্মক আক্রমণের তলে ইহা চাপা পড়িয়াছে। কবি ভগবানের স্বরূপটি ফোটান'র পরিবর্ত্তে যে জীর্ণ প্রাণহীন আচার-সংস্কারের বোঝা ভগবান্‌কে অধিকাংশ চিত্ত হইতে আড়াল করিয়াছে তাহাদের বর্ণনাতেই অধিক জোর দিয়াছেন। ব্যঙ্গ-

বিদ্রূপ যে সাহিত্যিক অস্ত্রশালার একটা তীক্ষ্ণ অস্ত্র তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু নাটকের ভিত্তি খুঁড়িবার কাজে ইহার যে কতটা উপযোগিতা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। যে-সমস্ত যুক্তিহীন সংস্কার ও প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্র-নাথের তীব্র বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল হইয়াছে, তাহারা নিজ বার্দ্ধক্যের ভারে ও যুগধর্ম্মের স্বাভাবিক প্রভাবে জীর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রবন্ধে ও কবিতায়, উপন্যাসে ও তত্ত্বালোচনায় চারিদিক হইতে তাহাদের উপর যে তীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষিত হইয়াছে, তাহাতে একেবারে অমর না হইলে তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। এরূপ অবস্থায় আবার নাটকের পৃষ্ঠায় তাহাদের বিরুদ্ধে নূতন যুদ্ধক্ষেত্র রচনা অনেকটা বৃথা শক্তি-ব্যয় বলিয়াই মনে হয়। সে যাহা হউক, এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রাধান্য নাটকখানির উৎকর্ষের হানি করিয়াছে। অনেক অংশ caricature বা অতিরঞ্জিত ব্যঙ্গ-চিত্র বলিয়াই ঠেকে। আর যোদ্ধবেশমণ্ডিত দাদাঠাকুরকে ভগবানের সম্পূর্ণ প্রতীক্ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের মন সায় দেয় না। অনার্য্য অন্ত্যজ জাতির নেতৃত্ব ও প্রীতি-সাহচর্য্য ঐশী লীলার একটা দিক্ হইতে পারে; এবং অচলায়তনের বল্মীকাচ্ছন্ন প্রাচীর ধ্বংস ও তাঁহার অন্যতম যোগ্য কীর্ত্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু ইহারা কি ভগবানের রহস্যমণ্ডিত মহৈশ্বর্য্যময় চরিত্রের উপযুক্ত নিদর্শন? দাদাঠাকুরের সরল খেলাধূলার মধ্যে অগ্নিগর্ভ মেঘের ন্যায় কোন গোপন মহিমার বিদ্যুৎ বিকাশ দেখা যায় না। কেবল আচার্য্য অদীনপুণ্যের দ্বিধাজড়িত চিত্তের মধ্যে দীর্ঘ অপরিচয়ের জন্য বিস্মৃত-প্রায় আদি-ধর্ম্ম গুরুর আগমনের যে ক্ষীণ শঙ্কিত পূর্ব্বাভাস রহিয়া রহিয়া জাগিয়া উঠে তাহাই ভগবৎ-প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি বলিয়া আমরা অনুভব করি; কিন্তু এই অভিব্যক্তিটি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা ফুটাইয়া তোলা হয় নাই।

'ডাকঘরের' রূপকটি একটু জটিল। অমলের কৌতুহল ও সরল বিশ্বাস শৈশবের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়াই মনে হয়। প্রত্যেক সুস্থমনা শিশুর মধ্যেই অমলের ন্যায় সুদূর অপরিচিত জগতের প্রতি একটা প্রবল, মোহময় আকর্ষণ আছে—নীল-মায়া-ঘেরা দূর দিগন্ত তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে। আবার শৈশবকালে ভগবানের সহিত আমাদের এমন একটা ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ

যোগ থাকে, যাহাতে ভগবানের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধাত্মক বিচিত্র বাণী আমাদের হৃদয়ের দ্বারে সোজা পৌঁছিয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্তের পক্ষে সেই যোগসূত্র অনেকটা শিথিল ও ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এই বিচিত্র-সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবীটাই একটা প্রকাণ্ড ভগবানের ডাকঘর। এখান হইতে দিকে দিকে অসংখ্য চিঠি প্রেরিত হইতেছে, অধিকাংশই আমাদের স্থূল, অনুভূতিহীন হৃদয় হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, কতিপয় মাত্র ভাগ্যবান সেই চিঠি খুলিয়া পড়িয়া তাহার বাণীটি হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকারী হইতেছে। অমল তাহার শিশু-হৃদয়ের সমস্ত সরলতার সহিত বিশ্বাস করিতেছে যে, ভগবান তাহার নামে চিঠি পাঠাইবেন, এবং এই বিশ্বাস নিজ গভীর আন্তরিকতায় নিজ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। ইহাই হইল রূপকের মোটামুটি ব্যাখ্যা; কিন্তু ইহার অন্তরালে আরও একটি গভীরতর সাঙ্কেতিক অর্থের প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব যেন অনুভব করা যায়। অমলের রোগটা কি, যাহা লইয়া পৃথিবীর কবিরাজ ও রাজ-কবিরাজের ব্যবস্থার এত গভীর অনৈক্য হইয়াছে? এই রোগ বোধ হয় মানবজীবনের স্বাভাবিক বিকার—that disease called life. সংসার এই রোগ-প্রতিকারের জন্য যে-ব্যবস্থা করে তাহার মূলনীতি হইতেছে জীবনের সমস্ত প্রত্যক্ষ, গভীর অনুভূতির পথগুলি বন্ধ করা, যাহাতে অসীমের রাজ্য হইতে আমাদের রুদ্ধদ্বার জীবন-যাত্রার পথে একটিও আলোক-রেখা প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য যতদূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন। যে চঞ্চল হাওয়া আমাদিগকে সাধারণ জীবন যাত্রার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে অনন্তের পথে উধাও করিবার চেষ্টা করে, আমাদের সমস্ত সাংসারিক জ্ঞান ও বিষয়-বুদ্ধি সে মাদক হাওয়াকে প্রাণপণ শক্তিতে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহে। রাজ-কবিরাজ, মৃত্যুর অগ্রদূতরূপে আসিয়া, এই সমস্ত বাধাবন্ধনকে খুলিয়া দেন; এবং এই জীবন-ব্যাধির চরম চিকিৎসা ও আরোগ্য হইতেছে মৃত্যু—যে আমাদের ভগবানের সহিত পরিচয়ের রুদ্ধদ্বারগুলিকে আবার খুলিয়া দেয় ও জগতের সহিত আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্কের পুনরুদ্ধার সাধন করে। সুতরাং 'ডাকঘর' নাটকটি কেবল শিশু-চিত্তের নয়, সমস্ত মানব-জীবনেরই রূপক।

কিন্তু নাটক হিসাবে যে-সুরটি সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তাহা বালক

অমলের অদম্য কৌতূহল, অপরিচিতের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের জন্য ব্যাকুল আগ্রহ ও অধীরতা। তাহার রোগ-ক্লিষ্ট মনে এই আগ্রহটি অত্যন্ত করুণ, অসহায় সুরে ধ্বনিত হইয়াছে। এই সুরের মধ্যে কোন নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত নাই বলিয়া ইহা গীতি-কবিতার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। অমলের রোগ কি তাহা না বুঝিলে ক্ষতি নাই—এমন-কি চিকিৎসকদের ব্যবস্থার অর্থবোধও অবশ্য-প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু শিশুচিত্তের ব্যাকুল, করুণ পিপাসা সমস্ত নাটকটিকে প্লাবিত করিয়া পাঠকের মনকে গভীর-ভাবে স্পর্শ করে। এখানে নাটক নিজ বিশেষত্ব হারাইয়া গীতি-কাব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছে। কিন্তু তবুও মনে হয় যে,ব্যাকুলতার সুরটি নাটকের কথোপকথনের মধ্য দিয়া যেরূপ ফুটিয়াছে গীতি-কবিতায় সেরূপ ফুটিতে পারিত না।

'ঋণ-শোধ' বা 'শারদোৎসব' সেইরূপ বালক-মনের আনন্দোচ্ছল আত্ম-বিহ্বল ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়া শরতের দিগন্ত-বিস্তৃত আনন্দরসের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের চেষ্টা। এই মত্ত আনন্দ-প্লাবনের নিকট নাটকের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভাগীরথী-তরঙ্গে ঐরাবতের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। যে দুই-একটি ক্ষীণ বিদ্রোহের সুর মাথা তুলিতে সাহস করিয়াছে, তাহারাও এই দুর্ব্বার আনন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। লক্ষে-শ্বরের সমস্ত অর্থতৃষ্ণা ও সতর্কতার মর্ম্ম ভেদ করিয়া এই আনন্দ একটা অতৃপ্ত বেদনার কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিয়াছে। বালক উপনন্দের কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উপর শরতের এক ঝলক সোনালি রৌদ্র পড়িয়া তাহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত আনন্দের রং এ রাঙ্গাইয়া দিয়াছে। ঠাকুরদাদা, কবিশেখর, সম্রাট্ বিজয়াদিত্য সকলেই সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর আহ্বানে শরৎ-প্রকৃতির আনন্দ-নির্ঝর হইতে আপন আপন মন ভরিয়া লইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। চারিদিকে কি পুলক-প্লাবন, কি গানের ফোয়ারা, কি আলো-ঝলমল নীল আকাশ! প্রকৃতির যে অদৃশ্য শক্তি হইতে শেফালির শুভ্র হাসি দিকে দিকে পুঞ্জীভূত হয়, পদ্মের অম্লান-শ্রী শ্বেতচ্ছত্রের মত বিস্তারিত হয়, নির্ঝর আনন্দ-নৃত্যে ছুটিতে থাকে, সেই গূঢ় প্রাণরসের কিয়দংশ কবির মনে সঞ্চারিত হইয়া এই নাটকে

অপূর্ব্ব শোভাসম্পদে বিকশিত হইয়াছে—নাটকের এক-একটি গান যেন তাহার এক-একটি পাপড়ি। এই আনন্দ-প্লাবনের আত্মবিস্মৃতিতে নাটক তাহার বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছে—শেলির Prometheus Unbound-এর চতুর্থ অঙ্কের ন্যায় ইহা একটি rhapsody-তে পরিণত হইয়াছে। সৃষ্টি-রহস্যের একটা দিক্ কবির নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে, আনন্দ-কুঠারির চাবিটি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। 'শারদোৎসব' নাটক নহে,—কিন্তু বহির্জগতের আনন্দ মনের গূঢ় প্রতিক্রিয়ার দ্বারা অন্তর-জগতে চোয়াইয়া লওয়ার মধ্যে যদি কোন্ নাটকীয় গুণ থাকে, তবে সে-গুণের ইহা পূর্ণমাত্রায় অধিকারী।

'শারদোৎসবে'র মধ্যে কোন বিশেষ রূপক নাই। যে-হিসাবে মানব-জীবন অনন্ত জীবনের ইঙ্গিত করে, বা প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যের মধ্যে ভগবানের রূপের কিঞ্চিৎ আভাস দেখা যায়, সেই হিসাবে 'শারদোৎসবে'র শরৎ-শ্রীর মধ্যে আনন্দময়ের স্পর্শ অনুভব করা যায়। শরতের সমস্ত আলো, হাসি, গান যে এক অফুরন্ত আনন্দধারার উৎস হইতে উৎসারিত হইতেছে তাহারি সঙ্কেত মিলে বলিয়া নাটকখানিকে সাঙ্কেতিক বলা যাইতে পারে।

সাঙ্কেতিক নাটকের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান 'রাজা' বা রবীন্দ্রনাথের নূতন নামকরণানুসারে 'অরূপ-রতন' নাটকেরই প্রাপ্য; অন্য কোন নাটকেই সাঙ্কেতিকতার রহস্য এত তীব্র, ব্যাপক ও অর্থপূর্ণভাবে প্রকটিত হয় নাই। ভগবানের ভীম-কান্ত রূপ আর কোথাও এরূপ সূক্ষ্ম অনুভূতির সহিত, এরূপ রহস্যময় আভাস-ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া, যাথার্থ্যের এরূপ স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় নাই। এই সাঙ্কেতিকতা প্রতি ছত্র, প্রতি দৃশ্য হইতে একটা অদৃশ্য পুষ্পের গন্ধসারের মত উত্থিত হইতেছে। ভগবানের সহিত মানুষের বোঝাপড়ার যতগুলি বিভিন্ন স্তর আছে, সমস্তগুলিই এই নাটকে আশ্চর্য্য ব্যঞ্জনাশক্তি ও সুসঙ্গতির সহিত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাণী সুদর্শনা অন্ধকার ঘরে রাজার সাক্ষাৎ পান—ভগবানের সহিত ভক্তের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয় না। এক ঘন রহস্যময় যবনিকার অন্তরাল হইতেই ভগবান নিজ আবির্ভাবের আভাস দেন—সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদাদার মত ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরা

নিজ সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও স্বচ্ছ অনুভবশক্তির বলে এই আভাস উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রকৃতির যে অসংখ্য বিচিত্র রূপ আছে তাহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ভগবানকে দেখিবার নিমিত্ত মানব-মনের একটা ব্যাকুল আগ্রহ আছে—এই মূর্ত্তি একদিকে মানুষকে আকর্ষণ করে, অন্যদিকে ইহার ভয়াবহ রহস্য তাহার মনে একটা ভীতির সঞ্চার করে। রাণীর মনে এই দুইটি ভাবের সংঘাতটির প্রতি অতি সুন্দরভাবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ভগবানের আর-একটি গুণ অতি চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে—তাঁহার grand impersonality, তাঁহার মহান্ ব্যক্তিত্ববিলোপ। ভগবান চিরকাল আত্মগোপন করিয়া সকলকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন—কাহারও স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই একটা সন্দেহ জাগে—সময় সময় রাজ্যকে সম্পূর্ণ অরাজক বলিয়া ভ্রম হয়। তার পর তাঁহার অদর্শনের সুযোগ লইয়া অনেক ভণ্ড ভগবানের বেশে বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয়কে প্রতারিত করে। আবার সম্রাটের অনুপস্থিতিতে পৃথিবীর ক্ষুদ্র সামন্ত রাজগণ নিজেদের অধিরাজত্ব তারস্বরে ঘোষণা করিতে ত্রুটি করে না। অপরিণত-বুদ্ধি অনধিকারী ভগবানের নগ্নরূপ দেখিতে গিয়া তাঁহার 'ধূমকেতুমিব কিমপি করালং' রূপ দেখিয়া ভয়ে ও বিতৃষ্ণায় পিছাইয়া আইসে। অভিমান-মেঘ ভক্তিপ্রবণ চিত্তকে আবৃত করিয়া মিলনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করে। এইরূপে ভগবানের গৌরবময় মূর্ত্তিকে অন্তরাল করিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র একটা ঘোরতর চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র চলিতেছে, কিন্তু ক্ষীণ কুহেলিকার মধ্য দিয়া সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় ভগবানের ভাস্বর-রূপ সমস্ত সংশয়-জালের পিছনে আপনাকে অনিবার্য্য তেজে প্রকটিত করে। ঈশ্বরের এই লোকোত্তর, সংশয়-নিরসন-কারী, ভাস্বর মহিমা, যাহা মানুষের সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার, অবস্থা ও বিশৃঙ্খলা-বিদ্রোহের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় দীপ্ততেজে বিচ্ছুরিত হয়—তাহাই সাঙ্কেতিকতার আশ্চর্য্য নিপুণ প্রয়োগে এই নাটকের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রূপকের দিক দিয়া ভগবানের যে-মূর্ত্তি ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে তাহা

আমাদের কল্পনা ও ভক্তির উচ্চতম দাবী মিটাইতে সক্ষম। সাঙ্কেতিকতার দিক্ দিয়া ইহার প্রত্যেক ইঙ্গিতটি গোপন অর্থের আলোকে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে; সাধারণ কথার স্বচ্ছ ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া ভগবানের রহস্যমণ্ডিত মহিমার প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিতেছে। কিন্তু এ সমস্ত বাদ দিয়া কেবলমাত্র নাটক হিসাবেও ইহার স্থান খুব উচ্চে। রাণীর সমস্ত চিত্তক্ষোভ—তাঁহার রাজাকে আলোতে দেখিবার ব্যাকুলতা, অদম্য আগ্রহ, চিনিতে অক্ষমতা ও তজ্জনিত লজ্জা, রাজার ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিবার পর বিমুখতা ও বিতৃষ্ণা, স্বয়ংবরপ্রার্থী রাজগণ কর্ত্তৃক নিপীড়ন ও অবমাননা, রাজার প্রতি ঘোরতর অভিমান, এবং সর্ব্বশেষে অভিমান-গলানো, সর্ব্বত্যাগী, শান্তিময় প্রেম—এ সমস্তই নাটকোচিত উজ্জ্বল বর্ণে ও প্রবল আবেগের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। নাটকের কোন পাত্র-পাত্রীকেই রূপকের ছায়া বলিয়া মনে হয় না—সকলেই সজীব, রক্তমাংসের মানুষ। এমন-কি রাজার মুখে যে-সমস্ত কথা আরোপিত হইয়াছে তাহাও ঐশীমহিমার অনুপযুক্ত মনে হয় না। রাজগণ, নাগরিকগণ, ঠাকুরদাদা প্রভৃতি সকলেই আপন আপন চরিত্রানুরূপ কার্য্য করিয়াও কথা বলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সকলেরই বাক্য ও কার্য্য এক নিগূঢ় শক্তি-নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাহাদের সাধারণ অর্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরাভিমুখী হইয়াছে। ভগবান মানুষকে লইয়া যে-খেলা খেলেন, নাট্যকারও তাঁহার সৃষ্ট-চরিত্রগুলি লইয়া প্রায় তদনুরূপ খেলাই খেলিয়াছেন—জোর করিয়া গতি ফেরান নাই, দূর হইতে অদৃশ্য-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, নাটকের স্বাধীন গতি নষ্ট না করিয়া তাহার মধ্যে ঐশীশক্তির বিকাশ দেখাইয়াছেন। সাঙ্কেতিক নাটকের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কৃতিত্ব আর কি হইতে পারে?

৫

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিকতা পূর্ব্ব-সীমা ছাড়াইয়া এক নূতন রাজ্যে, আধুনিক সমস্যার ছায়াসঙ্কুল প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বনাটকগুলিতে অতীত যুগের প্রতিবেশ-চিহ্ন বিদ্যমান। কিন্তু পরবর্ত্তী নাটকগুলিতে—'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'তে—আধুনিক যুগের সমস্যার

নিঃসন্দিগ্ধ ছায়াপাত হইয়াছে। এই সমসাময়িক যুগের ছাপ তাহাদের আকর্ষণ বাড়াইয়াছে, তাহাদের রহস্যময় সঙ্কেতগুলির প্রতি একটা তীব্র অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল জাগাইয়াছে। আমাদের চোখের সামনে যে-সব প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাদের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি, তাহাদের বাস্তব-অংশ হইতে নিষ্কাশিত মর্ম্মকথা অতীতের ক্ষীণ আবরণের মধ্য দিয়া আমাদের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতেছে। অবশ্য এই সমসাময়িক সমস্যা-সঙ্কুলতার ফলে নাটকীয় উৎকর্ষ বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা বিবেচ্য বিষয়। অতীতের বস্তু-অংশ কালপ্রভাবে এতই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, তাহার মূল গতি-ধারাটি অবান্তর বর্জ্জনের দ্বারা এতই সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, তাহাকে একটি বিশেষ রূপ দেওয়া ও তাহার মধ্যে রূপকের রঙ্গীন আলোক পাত করা কবি-কল্পনার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। তা ছাড়া, যদি অতীতের এতটা সম্পূর্ণ যুগকে এরূপ রূপ-বৈশিষ্ট্য দেওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে এমন একটি খণ্ডাংশ নির্ব্বাচন করা যায়, যাহার উপর কল্পনা-গত ঐক্যের ছাপ মারা কঠিন নহে। ক্ষীণকায় অতীত হইতে কবি এমন একটি অধ্যায় বাছিয়া লইতে পারেন যাহা তাঁহার উদ্দেশ্যের উপযোগী হইবে, যাহা নিজ বস্তু-বাহুল্যের দ্বারা তাঁহার কল্পনার স্বচ্ছ-লীলার পথে অন্তরায় হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমানকে কবি এত সহজে বরখাস্ত করিতে পারেন না—তাহার ইচ্ছানুরূপ বর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন নিতান্ত সহজ-সাধ্য নহে। 'মুক্তধারা'য় বিজেতা-বিজিত জাতির সম্পর্ক বা 'রক্তকরবী'তে আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার সমস্যা একটা প্রবল, জীবন্ত শক্তি—ইহাদের বিরাট দৈত্যদেহকে রূপকের বোতলে প্রবেশ করাইতে যে-পরিমাণ ইন্দ্রজাল-শক্তির প্রয়োজন তাহা নৈসর্গিক জগতে মেলা কঠিন। সুতরাং কবির রূপক-প্রবণতা বর্ত্তমানের বস্তুতন্ত্রতায় পদে পদে প্রতিহত হইয়াছে, এবং এই বিরাট বস্তুপিণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে কবি যে রূপকের জাল বয়ন করিয়াছেন তাহা খুব ঘন-সন্নিবেশ নহে। সেইজন্য রূপকের আধ্যাত্মিকতা ও সাঙ্কেতিকতা ইহাদের মধ্যে সেরূপ প্রবল নহে।

'মুক্তধারা'য় আধুনিক রাজনীতির নির্ম্মম ক্রূরতা, প্রচণ্ড অনুকম্পাহীন শক্তি রূপক সাহায্যে সূচিত হইয়াছে। উত্তরকূটের অধিবাসীরা বিজেতৃ-

জাতির সমস্ত দম্ভ, অহঙ্কার, মদোদ্ধত জাত্যভিমান ও অটল, দ্বিধালেশহীন আত্মপ্রত্যয় অন্তরের মধ্যে অনুভব করে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে যুধ্যমান জাতিদের ন্যায়—My nation, right or wrong—ইহাই তাহাদের রাজনীতির মূলমন্ত্র। প্রাচীন ইহুদী হইতে আধুনিক জার্ম্মান পর্য্যন্ত সমস্ত বিজয়ী জাতির ন্যায় ইহারা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে যে, ইহারা দৈবানুগৃহীত জাতি, দুর্ব্বলতর জাতির উপর নিজ শিক্ষা-দীক্ষা, নিজ সভ্যতা ও আধিপত্য বিস্তার করা উহাদের বিধি-নিয়োজিত পবিত্র ব্রত। সেইজন্য উত্তরকূটের যুদ্ধধাজ যখন শিবতরাইএর মঙ্গলার্থ গিরিসঙ্কটের পথ খুলিয়া দিলেন, তখন তাহা উহাদের চক্ষে অমার্জ্জনীয় স্বদেশদ্রোহিতা বলিয়া গণ্য হইল। মুক্তধারা যন্ত্রসাহায্যে বাঁধিয়া শিবতরাইএর তৃষ্ণার জল বন্ধ করা উহাদের নিকট আন্তর্জাতিক সমরের একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, বৈধ অস্ত্র—বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে বিষ-বাষ্প প্রয়োগের ন্যায়। সেইরূপ যন্ত্ররাজ বিভূতিকে জয়মাল্য অর্পণ যন্ত্রশক্তির দানবতার অন্ধ-স্তাবকতা, নীতিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকার ও বিলোপ। অম্বার অবহেলিত, উপেক্ষিত মাতৃহৃদয়ের ক্রন্দন এই দানবশক্তির নৃশংস হৃদয়হীনতার, ব্যক্তিগত সুখদুঃখের প্রতি নির্ম্মম ঔদাসীন্যের মাপকাঠি। এই সমস্তই আধুনিক সমস্যার অঙ্গ বলিয়া সহজেই চেনা যায়। আবার শিবতরাইএর তরফে যে-সমস্ত প্রচেষ্টা বা আন্দোলন দেখা যায়, তাহারা আরও ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের নিজের দেশের সমসাময়িক অবস্থার সহিত বিজড়িত। লেখকের অস্বীকার সত্ত্বেও ধনঞ্জয় বৈরাগী ও তাহার প্রচারিত বাণীর মধ্য দিয়া মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অহিংস অসহযোগ অত্যন্ত অনিবার্য্যভাবে উঁকি মারে। আবার শিবতরাই-এর জনসাধারণের পক্ষে ধনঞ্জয় বৈরাগীর অন্ধ, বিচারহীন অনুসরণ ভারতীয় আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় মহাত্মার বাণীর নিকট দেশবাসীর স্বাধীন বিচারবুদ্ধির সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কাহিনীই সূচিত করে। অতি-আধুনিক ও অতি-পরিচিতের সহিত এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই 'মুক্ত-ধারা'র ইঙ্গিতগুলিকে এমন সহজ-বোধ্য ও নিকট করিয়া তুলিয়া নাটকের জনপ্রিয়তা বাড়াইয়াছে।

কিন্তু নাটকটিকে সমগ্রভাবে দেখিলে ইহাকে পরিকল্পিত সমস্যার

সন্তোষজনক সমাধানরূপে গ্রহণ করা যায় না। দিগন্তবিস্তৃত অমানিশার অন্ধকারের প্রান্তে ক্ষীণ খদ্যোতালোকের পাড় বুনিয়া দেওয়ার মত ইহা অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে একটুমাত্র কল্পনা-বিকাশের ন্যায় দেখায়। রাজ-কুমার অভিজিৎ যে-মন্ত্রবলে যন্ত্রদানবের ঈর্ষ্যা ব্যর্থ করিয়া মুক্তধারার রুদ্ধ জলপ্রবাহ খুলিয়া দিলেন, সে-মন্ত্রের রহস্য ঝরণার জল-কল্লোলের মধ্যে নীরব হইয়া গিয়াছে, মানব-মন তাহার সূত্র ধরিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। অবশ্য নাট্যকারের কর্ত্তব্য কেবল ইঙ্গিত করা; পূর্ণ সমাধান দিতে তিনি বাধ্য নহেন। তথাপি 'শারদোৎসবে' ও 'রাজাতে' এই ইঙ্গিত আমাদের সমস্ত মনকে যেমন নাড়া দিয়া যায়, ফললাভের সম্ভাবনায় যেমন উদ্বুদ্ধ করে, 'মুক্তধারা'য় সেরূপ কোন ফল ফলে না। শঙ্কর-স্তব ও যন্ত্র-রাক্ষসের দাম্ভিক, গগন-স্পর্দ্ধী শির—এই দুইটিই নাটকের মধ্যে সাঙ্কেতিকতার মুখ্য নিদর্শন। কিন্তু শঙ্কর-স্তোত্র নাটক যেমন আমাদের মনের মধ্যে সেরূপ প্রবলভাবে ধ্বনিত হয় না, এবং বিভূতির যন্ত্রের চূড়াটা অস্তসূর্য্যের রক্ত-মদিরা পানে লাল হইয়া উত্তরকূটের আকাশপটে যেমন ধূমকেতুর মত জ্বলিতে থাকে, আমাদের কল্পনাকাশে সেরূপ দীপ্ত ভয়ঙ্কর রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে না।

'রক্তকরবী' সম্বন্ধে উপরের সমালোচনা আরও অধিকমাত্রায় প্রযোজ্য। বরং 'মুক্তধারা'র যে-বিষয় তাহা বৃহৎ একটা আদর্শবাদের মধ্যে ধরিয়া রাখা যায়, সাঙ্কেতিকতার চকিত আলোকে তাহার পাতাগুলি আদ্যোপান্ত পড়া যাইতে পারে। কিন্তু 'রক্তকরবী'র প্রতিপাদ্য বিষয় সমস্ত আদর্শবাদ ও সাঙ্কেতিকতাকে হারাইয়া নিজ বিশাল দেহ বিস্তার করিতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে রূপকের বৈদ্যুতী বরং সঞ্চার করা যায়, কিন্তু কলকারখানার লৌহযন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত সভ্যতাকে কোন্ চাপরে গলাইয়া তাহার ভিতর অতীন্দ্রিয় জগতের আলোকপাত সম্ভব? এ অতৃপ্ত বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষার উপর কোন্ কুণ্ডের শান্তিজল নিক্ষেপ করা চলিবে? রবীন্দ্রনাথ এই বিরাট বস্তুপুঞ্জসঞ্চয়, জীবনীশক্তির এই শোচনীয় অপব্যবহারের পরিধিতে দুইটি নৈতিক শক্তির অবতারণা করিয়াছেন—এক, নন্দিনীর রক্তকরবী, জীবনের অদম্য প্রাণশক্তি ও আনন্দ-মাদকতার প্রতীক্, এবং দ্বিতীয়, লৌহজালের

অন্তরালস্থিত যন্ত্রসভ্যতার রাজা, যাহার একদিকে অসীম শক্তি, অপর দিকে অসীম অতৃপ্তি ও প্রাণভরা হাহাকার। এই দুইটি শক্তি তাহাদের সমস্ত প্রকাশক দ্যুতি লইয়া যন্ত্র-সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে কিন্তু তাহার কঠিন লৌহবর্ম্ম ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই যন্ত্রসভ্যতার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত খণ্ডদৃশ্যের দ্বারা, কিন্তু এগুলিকে আমরা যথেষ্ট বা চূড়ান্ত পরিচয় বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার মর্ম্মস্থানে যে-শক্তি, যাহাকে যক্ষপুরীর লৌহজালাবগুণ্ঠিত রাজার রূপক সাহায্যে দেখান হইয়াছে, তাহার পরিচয়টিও ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। সুদর্শনার অন্ধকার ঘরের রাজা ও এই ভূগর্ভস্থ অন্ধকারে আত্ম-গোপনশীল লৌহজালে-ঘেরা রাজার মধ্যে স্পষ্টতার দিক্ দিয়া কত প্রভেদ। একটি চিত্র প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম অনুভূতির স্থির আলোকে প্রোদ্ভাসিত, অপরটি কল্পনার চঞ্চল, অনিশ্চিত আলোকে ঈষদ্দৃষ্ট মাত্র। নন্দিনী ও রাজার মধ্যে অনেক বাক্যবিনিময় হইয়াছে ; তাহাতে আমরা বুঝি যে, এই বিরাট শক্তির কেন্দ্রস্থলে এক গোপন, অলক্ষিত দুর্ব্বলতার বীজ নিহিত আছে। নন্দিনীর প্রতি একটা লোলুপ করুণ আসক্তি আছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে অপরি-চয়ের ব্যবধান সম্পূর্ণ ঘুচিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। নন্দিনীর রক্তকরবীর যে, আভা কাহারও কাহারও মধ্যে চিরসুপ্ত প্রাণহিল্লোল জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহা রাজার লৌহময় বক্ষের নীচে, মাত্র একটা অশান্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতি রাজার মনোভাবটি বেশ সুস্পষ্ট করিয়া তোলে নাই। যক্ষরাজ এই চঞ্চল বিদ্যুল্লতার দিকে ব্যগ্র-ব্যাকুল বাহু বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু তাহার পায়ে কিরূপ বেড়ী পরাইবে, কি বাঁধনে তাহার অস্থির গতিকে চিরকালের নিমিত্ত নিশ্চল করিয়া দিবে তাহা স্থির করিতে পারে নাই। নন্দিনীও এই বিশাল অজেয় শক্তির অবিচারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু না পারিয়াছে তাহাকে রক্তকরবীর রঙ্গীন আভায় রাঙ্গাইয়া তুলিতে, না পারিয়াছে তাহার লৌহমুষ্টির তলে আত্মসমর্পণ করিতে। সুতরাং এই বহ্নি-পতঙ্গের খেলাটির পরিণাম-ফল অনিশ্চিত ও অনির্দ্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

এই অনিশ্চয় নন্দিনী ও রঞ্জনের সম্পর্কের উপর ছায়াপাত করিয়াছে

রঞ্জনের প্রভাব ,নাটক-মধ্যে আরও গূঢ় ও অশরীরী, সে নন্দিনী অপেক্ষা আরও অস্থির, চঞ্চল, অবাস্তব। তাহার আগমন-বার্ত্তার বৈদ্যুতী নন্দিনীর প্রাণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, কিন্তু তাহার অন্য কোন পরিচয় আমরা পাই না। নাটকের মধ্যে আমরা জীবিত রঞ্জনের সাক্ষাৎ পাই না, তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাই। সুতরাং রঞ্জনের প্রভাব ও ক্রিয়ার ধারণা আমাদের মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট হয় না। মোটামুটি বুঝিতে পারি যে, সে নন্দিনীর প্রভাবকে সম্পূর্ণ (supplement) করে—নন্দিনী তাহার রক্তকরবীর সমস্ত জ্বলন্ত সৌন্দর্য্য সেই বায়ুপ্রবাহ হইতে আহরণ করিয়াছে। কিন্তু এক দিকে তাহার এই অত্যন্ত অশরীরী, অতীন্দ্রিয় স্পর্শ, অপর দিকে তাহার মৃতদেহ—এই দুইএর মধ্যে একটা বিষম অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে, যাহা আমরা কল্পনা-সাহায্যে পূরণ করিতে পারি না। এই কল্পনা-গত অনৈক্য আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে নিরন্তর পীড়িত করিতে থাকে।

নাটকের অন্যান্য দৃশ্যগুলি বাস্তবানুগামী, কিন্তু রূপক তাহাদের বিশেষ রূপান্তর সাধন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কুলিদের জীবন-যাত্রা ও মনোভাব, সর্দ্দারের অনুক্ষণ খবরদারী ও অত্যাচার, অসাধু ভণ্ড ধর্ম্ম কর্ত্তৃক এই অত্যাচারের সমর্থন ইত্যাদি সমস্তগুলিই যন্ত্র-রাজ্যের খুব সাধারণ ও পরিচিত দৃশ্য; কিন্তু এই ধূমধূলি-ধূসর দৃশ্যগুলির ভিতর রূপকের আলোক নিতান্ত হীনপ্রভ ও নির্ব্বাপিত-প্রায় দেখায় এবং বিষয়ের অনুপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হইয়া উঠে। ফলতঃ রক্ত-করবীর আভা যেমন যক্ষরাজের লৌহবর্ম্ম ভেদ করিতে পারে নাই, তেমনি কবি-প্রতিভার সাঙ্কেতিকতা এই অতিকায়, অতি-বাস্তব শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অবশ্য নন্দিনীর রক্তকরবী যক্ষরাজের প্রাণে একটি গূঢ় ব্যর্থতার বীজ বপন করিয়াছে, এক প্রবল, আত্মঘাতী বিপ্লবের বহ্নিশিখা জ্বালাইয়া দিয়াছে; সেইরূপ যদি কোন দূর ভবিষ্যতে এই অন্তর্ক্ষুব্ধ, রুদ্ধ হাহাকারপূর্ণ যন্ত্রসভ্যতা শতধা বিদীর্ণ হইয়া পড়ে ও রাক্ষসের ন্যায় নিজের অন্ত্র নিজেই ছিঁড়িয়া খায়, তবে কবি নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির দাবী করিতে পারিবেন, কিন্তু সে-দাবী তাঁহার কবিত্বের খাতায় লেখা থাকিবে কি না সন্দেহ।)

রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশেষ নাটক 'নটীর পূজা' তাঁহার অন্যান্য নাটক হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ইহাতে রূপকের কোনো স্পর্শ নাই; এবং ইহার ঘটনা বুদ্ধ-বিষয়ক। বুদ্ধের মহিমময়, ভক্তি-প্লাবিত যুগে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম পদক্ষেপ। বাস্তবিক বৌদ্ধ যুগে ধর্ম্মবিপ্লব, বিপরীত ধর্ম্মের টানে পারিবারিক অশান্তি ও অকৌশল, নব বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত পুরাতন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের সংঘর্ষ, নাটকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী উপাদান। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'নটীর পূজায়' এই জ্বলন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্ম-বিরোধের একটা স্বল্প-পরিসর চিত্র দিয়াছেন। এই বিপ্লব সর্ব্বাপেক্ষা ফুটিয়াছে রাণী লোকেশ্বরীর চরিত্রে; মুখে বুদ্ধকে অস্বীকার করিলেও অন্তরে তাঁহার বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরাগ অনপনেয় আগ্নেয় অক্ষরে মুদ্রিত আছে। একদিকে রাজোচিত, ক্ষত্রিয়োচিত নহে বলিয়া সে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে ধিক্কার দিতেছে; আবার পুত্রকে তাহার মাতৃবক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে বলিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাহার আরও গভীর অভিমান; মহারাজ অজাতশত্রুর বৌদ্ধ-ধর্ম্মদ্বেষে ও বৌদ্ধ-উৎপীড়নে তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি; কিন্তু অন্তরে তাহার ভক্তি অক্ষয় হইয়া আছে—প্রকৃত পরীক্ষার সময় তাহার অন্তরের রুদ্ধ মনোভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকট হইয়া পড়িল। রাণীর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশ নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। রাজকুমারীদের আভিজাত্যাভিমান ও ধর্ম্মনিষ্ঠার মধ্যে বিরোধটিও বেশ নাটকোচিত হইয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্মুখীনতার জন্য বাহ্য-উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যগুলি নাটকের বাহিরে রাখিয়াছেন। বিম্বিসারের হত্যা, জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য, অজাতশত্রুর বৌদ্ধ ধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ ইত্যাদি দৃশ্য, যাহা অন্য নাট্যকার কাজে লাগাইতে ব্যস্ত হইতেন—তাহা রবীন্দ্রনাথ একবারে বর্জ্জন করিয়াছেন; তাহার একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র নাটকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন। নাটকের শেষ দৃশ্যটিতেও নাটকীয় পরিণতির অপেক্ষা করুণ রসের প্রাধান্য অধিক লক্ষিত হয়। মোটের উপর, রবীন্দ্রনাথের শেষ নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভা পুরাতন সুরে ফিরিয়া

আসিয়াছে, এবং তাহার মধ্যে এখনও যথেষ্ট জীবনী-শক্তি অবশিষ্ট আছে, পাঠকের মনে এই ধারণা উৎপাদিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির এক-এক করিয়া বিশ্লেষণ শেষ হইল। এখন নাটকগুলির দুই-একটি সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতে পারে। এই নাটকগুলির পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, প্রায় সমস্ত নাটকগুলির বিষয়গত সামান্য পার্থক্য থাকিলেও মূলগত সুরটি এক। প্রায় সমস্ত নাটকেই একই প্রকারের ঘটনা ও চরিত্রের পুনরুক্তি হইয়াছে। বিশেষতঃ ঠাকুরদাদার চরিত্রটি সমস্ত নাটকগুলিরই একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ—সর্ব্বত্রই তিনি ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখা দেন ও প্রায় একরকম খেলাই খেলেন। একজন স্বচ্ছ-দৃষ্টি, সরল-হৃদয়, আনন্দময় পুরুষ, যিনি হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, যাঁহার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার আনন্দ-উৎসের মুখে পাথর না চাপাইয়া তাহার স্রোতোবেগ আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে, যিনি বালকদের সমপ্রাণ বন্ধু, নায়ক ও ক্রীড়া-সহচর—এই আদর্শেই কবি ঠাকুরদাদার চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল 'অচলায়তনে' কবি তাঁহার আরও পদোন্নতি সাধন করিয়া তাঁহাকে আদি ধর্ম্মগুরু স্বয়ং শ্রীভগবানের সঙ্গে একাসনে বসাইয়াছেন। এই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি, নাটকের দিক্ দিয়া প্রশংসার্হ না হইলেও রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অবিচলিত ঐক্যের সুন্দর পরিচয়-স্থল। বাহিরের জগতে নানা বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে থাকিলেও কবির মনে একই প্রকার খেলা পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে—বাহিরের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে এই অন্তর-লীলার ছায়াপাত হইয়াছে, কবির চক্ষু তাহাই মাত্র লক্ষ্য করিয়াছে। "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"—তাঁহার গানের এই প্রসিদ্ধ চরণখানি অশ্রান্ত সুরে তাঁহার নাটকের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার আধ্যাত্মিক মনোভাবই তাঁহার নাটকে বাহ্য বৈচিত্র্যের অভাবের কারণ। সাধারণ নাটকের যে-লক্ষণ তাহার অনেকগুলিই তাঁহার নাটকে মিলে না—কিন্তু ইহার

ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অসীমের সুর তাঁহার নাটকে যেরূপ মধুর ব্যাপক ও অবিচ্ছিন্নভাবে বাজিয়াছে, অন্য কোথাও তাহার তুলনা মেলে না।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের আর-একটি বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। নাটকীয় চরিত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের ধাপটি তাঁহার নাটকে অব্যাহতভাবে বজায় রাখা হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের রাজ-সভার প্রতিবেশ তাঁহার সমস্ত নাটকেই দেখিতে পাই। সেই চির-পরিচিত রাজা, অমাত্য, বিদূষক, সেনাপতি, রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। সেই প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি ও শাসন-ব্যবস্থা—রাজার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব-মূলক সমাজ-শৃঙ্খলা—সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। এমন-কি, অতি-আধুনিক সমস্যা ও বিশ্লেষণে সেই প্রাচীন প্রথার অবতারণা হইয়াছে। ‘রক্ত-করবী’তে এই প্রাচীনের অবিচ্ছিন্ন মহিমা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কেননা একমাত্র যক্ষরাজ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত চরিত্র কতকটা যান্ত্রিক-যুগের লক্ষণা-ক্রান্ত হইয়াছে। কবি এই প্রাচীনত্বের ছদ্মবেশের কেন এতটা পক্ষপাতী তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। হয়ত এই প্রাচীন প্রতিবেশ রচনার দ্বারা তিনি আধুনিক সমাজের বিশেষ সমস্যাগুলির প্রতি নিজের আত্যন্তিক বিমুখতা জ্ঞাপন করিতে চাহেন। ভ্রাতৃবিরোধ বা সামাজিক দলাদলি যে নাটকের উপজীব্য বিষয়, রবীন্দ্রনাথের তাহার প্রতি কিছুমাত্র প্রবণতা নাই; সুদূর হিন্দু-সভ্যতার যুগে তাঁহার নাটকগুলিকে সন্নিবেশ করিয়া বর্ত্তমানের সমস্ত ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থ-সংঘর্ষ হইতে তিনি যেন আপনাকে উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বোধ হয়, এই কাল-নির্ব্বাচনের সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, তাঁহার মনে ভগবানের যে লীলা-রহস্য, অসীমের যে আনাগোনা ভাস্বর হইয়া আছে, তাহা প্রাচীন কালের রাজসভার প্রতিবেশেই স্ফুটতর হইয়া উঠে। তিনি যে রাজরাজের মহিমা প্রকাশিত করিতে চাহিয়াছেন, প্রাচীনকালের সর্ব্বময় কর্ত্তা রাজাদের সম্পর্কেই তাঁহার সে পরিচয় ফুটে ভাল। এক দিকে অপ্রতিহত-প্রভাব, অসীম-বলমদোদ্ধত নৃপতিরা তাঁহার অদৃশ্য শক্তির নিকট মাথা হেঁট করিয়া নিজেদের গর্ব্ব-অভিমান সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে; অন্য দিকে, কোন কোন ধন্য রাজা ভগবদ্দত্ত রাজ-সম্পদের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার

যে পরম দান—ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি—তাহাও লাভ করিয়া মনুষ্য-মধ্যে দেবপদবাচ্য হইয়াছে। সেইজন্য রাজ-রাজড়ার সঙ্গেই তাঁহার বেশী কারবার—আধুনিক গণতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত হাত-পা-বাঁধা রাজা নয়, সত্যকার রাজা, যাহার ভাল মন্দ দুই দিকেই শক্তি অপরিমিত। এইরূপ 'বাধা-বন্ধ-হীন অতি-মানবদের হৃদয়ই ভগবানের প্রিয় সিংহাসন, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকই একবাক্যে সেই সাক্ষ্য দিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী

তুমি রবি আকাশের, হিরণ্ময় রথ-সমাসীন—
বৈদূর্য্য-মুকুট শিরে, আপিঙ্গল অরুণ-সারথি,
সপ্ত তুরগের রশ্মি দৃঢ় মুষ্টিতলে—তূর্ণগতি
ধায় রথ, ছিন্নমেঘবাষ্পচূর্ণ আবর্ত্তে বিলীন,
জ্যোতিস্রোতে ভেসে যায়—এ উপমা আমাদের নহে !
অথবা যে 'অ্যাপোলো'র স্মিত হাসি ফুটালো ভাস্কর,
সূর্য্যের দেবতা যিনি, সপ্ত অশ্ব যাঁ'র রথ বহে,
সুঠাম, সুন্দর মূর্ত্তি,—'লরেল'-পল্লব শিরোপর,
কল্পনা নমিছে তাঁ'রে ; কিন্তু সে যে কানে কানে কহে,
'কবি যে স্বর্গের নহে, মর্ত্ত্যলোক করে সে ভাস্বর !'

হে মানব, জীবলোকে ক্ষণ-স্বর্গ করেছ সৃজন,
সে তব অমোঘ স্বপ্ন ;—সেথা মোরা লভিনু বিশ্রাম।
রৌদ্রদগ্ধ শ্রান্ত তনু—পল্লবের ছায়া লভিলাম।
শ্যামস্নেহমুগ্ধ দৃষ্টি লভিলাম মর্ম্মর-বীজন।
নেত্র ভরি' এল অশ্রু, কণ্ঠ মোর স্তব্ধ হ'ল গানে,—
গান নয়,—বেন বাজে অপ্সরীর চরণ নূপুর ;
মনে হয় মুখ-স্বর্গ এল বুঝি ধরার বিতানে !
একসাথে উঠে গন্ধ, গাঢ় ধূম ধূপ-অগুরুর,
বহুদূরে বাজে বাঁশী, মাতে প্রাণ অধীর সন্ধানে।
যত তাপ, যত দাহ, মনে হয় সকলি মধুর।

এ স্বপ্ন মিলায়ে যায়, সূক্ষ্ম এই সুর-মূর্ত্তিগুলি
জীবনের রুক্ষ পথে খণ্ডে খণ্ডে ধূলিতে লুটায়—

উচ্চকিত রাজপথে ত্রস্ত ক্ষুব্ধ ঘন জনতায়
মাধুর্য্য হারায়ে প্রাণ নিরন্তর উঠে যে ব্যাকুলি' !
মোরা চেয়েছিনু শুধু প্রাণ ভ'রে লভিতে নিঃশ্বাস
যেথা তুমি আন্দোলিছ নিরন্তর সঙ্গীত-সুরভি
তরলিত কণ্ঠস্বনে, ভাবনার স্বচ্ছ অবকাশ
যেথা তুমি বিস্তারিছ এ বিশ্বের প্রাণ-স্পর্শ লভি'
গম্ভীর নির্ম্মল মন্ত্রে ! আমাদের ধূসর আকাশ
বিষ-নীল হ'য়ে উঠে—ভুলে যাই শান্ত ধ্যানচ্ছবি !

প্রাচীরে পাংশুল রেখা—জনাকীর্ণ বসতির মাঝে
দাসজীবনের গ্লানি বহি' চলে অযুত ধিক্কার,
গোপন অশ্রুর ফল্গু, কঙ্করের মাঝে হাহাকার
জড়তার মহাস্তূপে শুনিতেছি সুগভীর লাজে—
তাই, বড় সংগোপনে তব গান রেখেছি লুকায়ে
নিভৃত মুহূর্ত্ত-মাঝে—যবে অশ্রু উঠিবে উচ্ছলি'
অকারণে চৈত্র-রজনীতে, উদাস বসন্ত-বায়ে
শৃঙ্খল মোচন করি' অন্তরের কানে কানে বলি'
তব উদ্বোধনী বাণী—শ্রান্ত প্রাণ রাখি যে জাগায়ে
নব প্রভাতের লাগি' স্তব্ধ করি' কণ্ঠের কাকলী !

রবীন্দ্র-প্রতিভার ত্রিধারা

—শ্রীগুরুসদয় দত্ত

বিশ্ব-প্রকৃতির যে-সকল চিরন্তন বিশাল সত্যের পরিকল্পনার সুস্পষ্ট অনুভব ও প্রচার ভারতের সংকৃষ্টিকে মানব-সংকৃষ্টির ও বিশ্ব-মানবের জ্ঞান এবং চিন্তাধারার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করিয়া স্থাথিয়াছে, তাহার মধ্যে বিশ্বের অনন্ত আনন্দ-প্রাণতা, অনন্ত প্রেমময়তা ও অনন্ত নৃত্যশীলতা—এই তিনটি পরিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে কোনো যুগে এই তিনটি বিরাট্ সত্যের এত সুস্পষ্ট উপলব্ধি ও প্রচার হয় নাই, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

অতি প্রাচীন ভারতে সুদূর খৃষ্ট-পূর্ব্ব যুগে মানব-সভ্যতার শৈশবে উপনিষদের ঋষিগণ সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিখিল সৃষ্টপদার্থ আনন্দ হইতে জাত হইয়াছে, আনন্দ দ্বারাই তাহারা জীবনধারণ করিয়া থাকে এবং পরিশেষে তাহারা আবার আনন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করে ও আনন্দে বিলীন হইয়া যায়। বিশ্বের মূলীভূত এই যে আনন্দ ইহাকেই তাঁহারা ব্রহ্মের অথবা পরমাত্মার মানব-গ্রাহ্য একমাত্র গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আর তাঁহারা ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্রহ্মের অথবা পরমাত্মার আনন্দকে যে-ব্যক্তি অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারে সে সকল প্রকার ভয় হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ উপনিষদের মতে অন্তরে আনন্দময় ব্রহ্মের অনুভূতি মানবের অধ্যাত্ম-জীবনের পরাকাষ্ঠার ও মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

বিশ্বের প্রেমময়তার পরিকল্পনা ও মানবের দৈনন্দিন জীবনে তাহার বহুল-প্রসারিত অনুভবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল—ভারতের বৈষ্ণবধর্ম্মের ভক্তি-বাদ। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার নিবিড় প্রেমের সম্বন্ধের এই যে অপূর্ব্ব পরিকল্পনা, বিশ্ব-প্রকৃতির আনন্দ-রূপের পরিকল্পনার মত ইহাও ভারতের একটি অতুলনীয় সৃষ্টি। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার এই নিবিড়

প্রেমময় সম্বন্ধের পরিকল্পনার এবং পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্য জীবাত্মার ব্যক্তিগত ব্যাকুল মিলনাকাঙ্ক্ষার বিকাশের পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল —বাংলাদেশে চৈতন্যযুগে ও তাহার পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব-কবিদের জীবনে ও তাহাদের সৃষ্ট সাহিত্যে।

বিশ্বের নৃত্যশীলতার পরিকল্পনার সৃষ্টিও ভারতের সংস্কৃতির অতি প্রাচীন যুগের কথা। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের গভীর গবেষণা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বিজ্ঞানের ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করিয়া জড়-জগতের অণু-পরমাণুর অনন্ত নৃত্যশীলতার যে-সত্য এতদিন পরে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে, সুদূর প্রাচীন যুগে ভারতের মনীষীগণ অন্তঃপ্রকৃতির সুস্পষ্ট প্রেরণার বলে সেই সত্যের অনুভব ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আর কেবল অণু পরমাণু নহে, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধ্য দিয়া যে এক বিরাট নৃত্যে যুগে যুগে অবিরত আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, ইহাও তাঁহারা সুস্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন এবং মহাদেবের নটরাজ রূপের বিরাট পরিকল্পনায় তাঁহারা ইহার প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ ও ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মানুষের জীবনে পরমাত্মার সহজ ও সোজাসুজি উপলব্ধির সহায় স্বরূপ অনন্ত সত্যের এই তিনটি বিরাট পরিকল্পনা বিশ্বের সংস্কৃতিতে ভারতের অতুলনীয় ও অমূল্য দান। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, অনন্ত সত্যের এই তিনটি বিরাট পরিকল্পনার সৃষ্টি হওয়ার পরেও বহু যুগ ব্যাপিয়া ভারতের বাহিরের বিশ্বমানবের কাছে ইহাদের খবর পৌঁছায় নাই। আর কেবল তাহাই নহে,—ইহাদের পরিকল্পনার জন্মভূমি ভারতেও ইহাদের উপলব্ধি প্রায় লোপ হইতে চলিয়াছিল।

ভূমার বিশুদ্ধ আনন্দ-সম্ভূত যে-মানুষ, পাশ্চাত্য জগতে সেই মানুষ ধর্ম্মের ভ্রান্ত আদর্শের ফলে আনন্দের সহিত তাহাদের সেই নিবিড় সম্বন্ধের উপলব্ধি করিতে পারে নাই; তাই তাহারা ধর্ম্মের সঙ্গে আনন্দের বিচ্ছেদ সৃজন করিয়াছিল; এবং তাহার ফলে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন হইতে আনন্দকে বিতাড়িত করিয়া অশ্লীলতার গণ্ডীতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। আর অধ্যাত্ম-জীবনের পরিকল্পনাকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগড়া নরক-ভীতির ও

নানা বিধিবিধানের ও আচার-আচরণের প্রাণহীন বেষ্টনী দ্বারা নীরস, নিরানন্দ ও বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছিল।

আধুনিক ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ্রান্ত আদর্শের ফলে আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসীও আনন্দকে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনের গণ্ডী হইতে বিতাড়িত করিয়া অশ্লীলতার গণ্ডীতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল; এবং নরনারীর ও সমাজের জীবনকে নানা-প্রকার কৃত্রিম বিধিবিধানের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নিরানন্দ ও ভীতিমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল।

আধুনিক শিক্ষার এই বিড়ম্বনার বিচিত্র প্রহেলিকার সবচেয়ে বিসদৃশ উদাহরণ আমরা পাই—বর্ত্তমান বাংলার জীবনে। যে-বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় আজ হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া বিশ্বের উপহাসের পাত্র হইয়া পড়িয়াছে, সেই বাংলা দেশেই মানুষ একদিন জীবনে আনন্দময়তার, প্রেমময়তার ও নৃত্যময়তার দৈনন্দিন উপলব্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বাংলার পল্লীর মত সহজ সরল স্বতঃউচ্ছ্বসিত নৃত্যে গীতে ছন্দে সুরে আনন্দে ভরপুর দৈনন্দিন জীবন ভারতের অন্য কোন প্রদেশে অথবা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। ইহা যে সত্য তাহার সমর্থন আমরা পাইব বাংলার অশিক্ষিত ও নিরক্ষর পল্লীবাসীর জীবনে। নৃত্য গীত ছন্দ সুর ও আনন্দের এত অনির্ব্বচনীয় ছড়াছড়ি এখনও বাংলার দরিদ্র ও নিরক্ষর পল্লীবাসীদের জীবনে, বহু যুগের নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়াও যে কি করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য জগতের মতই, বাংলার ও ভারতের শিক্ষিত ও ভদ্র সম্প্রদায়ের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন হইতে আনন্দকে বিতাড়িত করিয়া অশ্লীলতার গণ্ডীতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে; এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে নীরস গাম্ভীর্য্য ও পাণ্ডিত্যের এবং ধর্ম্মের ক্ষেত্রে অর্থহীন আচারের প্রতিষ্ঠার ও নানাপ্রকার দণ্ড ও বিধি-বিধানের ব্যবস্থার ছড়াছড়ি করিয়া মানুষের জীবনকে নিগড়বদ্ধ করা হইয়াছে।

প্রেমের সহজ সরল ভাবকেও মানুষ ধর্ম্মের অধ্যাত্মক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল; এবং নৃত্যের আদিম বিশুদ্ধ ধারাকে কলুষিত করিয়া দুর্নীতির গহ্বরে নিহিত করিয়াছিল।

যে-আনন্দ হইতে মানুষের উৎপত্তি, এবং যে-আনন্দ পরমার্থ লাভের পক্ষে মানুষের একমাত্র সহায়ক, বিশ্ব-মানবের জীবনে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তাহার সুস্পষ্ট উপলব্ধির পুনঃপ্রতিষ্ঠার কল-কণ্ঠ মুক্তিদূত—বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ। বেদান্তের সুগভীর জ্ঞানগর্ভ অদ্বৈত-অনুভূতি ও আনন্দময় ব্রহ্ম-বাদ, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রেমময় পরমেশ্বরের সহিত মিলনের আত্মহারা আকাঙ্ক্ষার ও পুলকময় অনুভূতির প্রেরণা এবং সহজ সুললিত ছন্দে সুরে তাহার আনন্দময় অভিব্যক্তি ও বাংলার পল্লীর নিভৃত প্রাণের সহজ শুদ্ধ ও অনাবিল নৃত্যগীতে ঝঙ্কৃত সুমধুর আনন্দময় জীবন-প্রবাহ :—আনন্দের এই ত্রিধারার মহিমময় সঙ্গমে রবীন্দ্র-প্রতিভার উদ্ভব ও বৈচিত্র্যময় বিকাশ।

এই ত্রিধারার অবিরল উচ্ছ্বসিত আনন্দের অনির্ব্বচনীয় স্পন্দনে তাঁহার প্রাণ প্রতিনিয়ত স্পন্দিত। তাই বিশ্বের সেই সর্ব্বব্যাপী অধ্যাত্ম আনন্দের উদাত্ত বাণী, প্রাণের সেই নিবিড় আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রশান্ত-বাণী ও ভূমার সেই বিশুদ্ধ পুলকময় নৃত্যের পুলকময়ী বাণী বিশ্ব-মানবের কানে পৌছাইয়া দিবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল। আনন্দ প্রেম ও নৃত্যের এই ত্রিধারার স্পন্দনে তাই কবি গাহিয়াছেন—

"মম চিত্তে নিতি নৃত্যে
কে যে নাচে—
তা তা থৈ থৈ
তা তা থৈ থৈ
তা তা থৈ থৈ।"

তাই তাঁর সমস্ত চিত্ত মথিত করিয়া ছুটিল আনন্দময় সুর, ছন্দ ও ভীতিহীন মুক্তির নৃত্য। তাই তিনি অনুভব করিলেন তাঁহার প্রাণে—

"কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ—
দিবা রাত্রি নাচে মুক্তি'—নাশি' বন্ধ।"

সেই আনন্দের প্লাবনপ্রবাহ তিনি ভাবে ও ভাষায় অতুলনীয় সুরে ছন্দে নৃত্যধারায় বিশ্ববাণীর প্রাণের

"দ্বার ছুটায়ে, বাধা টুটায়ে"

ঢালিয়া দিলেন।

ভারতের গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সেই আনন্দ-সম্পদকে সেই নিবিড় আধ্যাত্মিক প্রেম-সম্পদকে, ও বাংলার পল্লীজীবনের উচ্ছ্বসিত আনন্দপ্রবাহকে আপনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া অপূর্ব্ব অতুলনীয় নৃত্যময় ছন্দে ও সুরে রূপদান করিয়া, রসরূপ পরব্রহ্মের সহজ উপলব্ধির উদ্বেল আনন্দের ও প্রেমরূপ পরব্রহ্মের নিবিড় উপলব্ধির সুগভীর শান্তির গীতাঞ্জলি রচনা করিয়া তিনি সাহিত্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব-মানবকে উপহার দিলেন ও বিশ্ব-মানবের প্রাণ-প্রকৃতিকে সেই ছন্দে সুরে নাচাইয়া মুক্তির আস্বাদ দিলেন।

ধর্ম্মের অধ্যাত্মক্ষেত্রে ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে আনন্দের ও প্রেমের ধারার এই অনির্ব্বচনীয় অমৃতময় অভিসিঞ্চনে বিশ্ব-মানবের প্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া চমকিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল। বিশ্ব-মানব এই দানের মহিমময় গৌরব অনুভব করিয়া অন্তরে অপূর্ব্ব সমৃদ্ধি উপলব্ধি করিল এবং কবির শিরে সানন্দে বিজয়মাল্য পরাইয়া তাঁহাকে সমাদরে বিশ্বকবির উচ্চ আসনে অভিষিক্ত করিয়া ধন্য হইল।

একদিকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-মানবের জীবনে যেমন অধ্যাত্ম আনন্দের ও প্রেমের সহজ উপলব্ধির স্পর্শ জাগাইয়া দিলেন, অপরদিকে আবার বাংলাভাষার "দ্বার ছুটায়ে, বাধা টুটায়ে", সঙ্কীর্ণতার ও আড়ষ্টতার বাধা-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাহাকে ভীতিহীন, আনন্দময়, মুক্তিময়, গতিময়, নৃত্যময়, অবাধলীলাময়, শক্তিময় ও প্রাণময় করিয়া স্বদেশবাসীকে উপহার দিলেন।

বাংলার জীবনে পূর্ণ-মুক্তি ও পূর্ণ-আনন্দের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে-পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। কেবল সাহিত্যের দিক্ দিয়া, সুরে ছন্দে তাঁহার ওজস্বিনী ভাবধারার প্রেরণা

ঢালিয়া দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই ;—বাংলার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের জীবনে বিশুদ্ধ নৃত্যের পুনঃপ্রচলনের জন্য তিনি মোহান্ধের নিন্দা-ভ্রূকুটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আজীবন অক্লান্ত সাধনা করিয়াছেন। বিশুদ্ধ নৃত্য যে একটি অতি মূল্যবান রসকলা এবং ব্যক্তির ও জাতির জীবনের শক্তি, মুক্তি ও আনন্দ লাভের পক্ষে এই রসকলার সাধনা যে অসীম প্রভাববান, তাহার অনুভূতি তিনি স্বতঃই পাইয়াছিলেন ; তাই তিনি স্বদেশবাসীকে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু বাংলার নহে, আধুনিক ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে নৃত্যশিল্প-শিক্ষার পুনঃপ্রবর্ত্তনে তিনিই সর্ব্বপ্রথম নির্ভীক উদ্যোগী।

নৃত্যকলা যে "পৌরুষেরই সহচরী" এবং জাতির পূর্ণ-বিকাশের দিক্ দিয়া নৃত্য-শিল্পের সহায়তা যে অমূল্য ও অপরিহার্য্য, তাহার উপলব্ধি তিনিই প্রথম এদেশে করিয়াছেন এবং বাংলার শিক্ষিতসম্প্রদায় যে-মূঢ়তাবশতঃ বিধাতার মহদ্দান নৃত্যকে অবজ্ঞা করিয়া পেশাদারের ঘরে ঠেলিয়া দিয়াছে তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়া তিনি বলিয়াছেন :—"সকল রকম আনন্দের প্রকাশ মানুষের প্রাণশক্তিকে জাগরূক ক'রে রাখে। মানুষ কেবল অন্নের অভাবে মরে না,—আনন্দের অভাবে তার পৌরুষ শুকিয়ে ম'রে যায়।"

— তাই সম্প্রতি যখন প্রাচীন বাংলার গৌরবময় রায়বেঁশে সৈন্যের পৌরুষ-নৃত্যের পুনরাবিষ্কার হইল, তখন রবীন্দ্রনাথই অগ্রণী হইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার মূল্য উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন ;—"এরকম পুরুষোচিত নাচ দুর্ল ভ ; আমাদের দেশের চিত্ত-দৌর্ব্বল্য দূর করতে পারবে এই নৃত্য।" বাংলার নব-প্রতিষ্ঠিত পল্লী-সম্পদ রক্ষা-সমিতির চেষ্টার ফলে এই রায়বেঁশে নৃত্য বাংলার ভদ্রসমাজে আদৃত হইয়া বিশুদ্ধ নৃত্যকে এদেশে অযথা অখ্যাতি হইতে মুক্ত করিতেছে দেখিয়া তিনি অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

বাংলার ও ভারতের শিক্ষিত সমাজ যদি রবীন্দ্রনাথের এই অমূল্য উপদেশ ও উৎসাহবাণী সমাদরে গ্রহণ করিয়া নৃত্যশিল্পের বিশুদ্ধ ধারাকে পুনরায় জীবনে বরণ করিয়া লয়, তাহা হইলে জাতি আবার তাহার পুরাতন পৌরুষ ফিরিয়া পাইবে, এই বিশ্বাস আমি করি।

বঙ্গগৌরব, ভারত-গৌরব ও বিশ্ব-গৌরব রবীন্দ্রনাথ যেমন একদিকে বিশ্ব-মানবের অন্তরাকাশে অনন্ত ব্রহ্মের সর্ব্বভীতিনাশী আনন্দ-রশ্মি-মণ্ডিত ও ভগবৎ-অনুভূতির সুগভীর শান্তিময় প্রেম-রশ্মি-মণ্ডিত সমুজ্জ্বল 'অংশু-মালী', তেম্নি বাংলার প্রাণের গভীর অন্তস্তলে যে কত বিশুদ্ধ অনাবিল আনন্দের, কত নৃত্য-গীতের অতুল শক্তিসম্পদ নিহিত আছে, তাহারও তিনি মূর্ত্ত প্রতীক ও অভিনির্দ্দেশক। তাই আমরা প্রার্থনা করি, বাংলার প্রাণ-শক্তির আনন্দময়, শক্তিময় ও পৌরুষময় পুনরুজ্জীবনে তাঁহার অমূল্য অবদান ও আশীর্ব্বাদ সফল ও সার্থক হউক।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত

—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রসানুভূতির বাধা-বিপত্তি অনেক। শ্রদ্ধা ও শিক্ষার অভাবে, পূর্ব্ব-পরিচয় ও নূতনত্বের মোহে রসানুভূতি থেকে আমরা অবান্তরের খাদ বাদ দিতে পারি না। সেজন্য নিজেরাই অনেক সময় নিজেদেরকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করি। সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের দান আমাদের আনন্দের একটি শ্রেষ্ঠ উপাদান, তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার চরম বিকাশ। মনকে কি ভাবে বাঁধ্‌লে, সঙ্গীতকে কি ভাবে দেখ্‌লে আনন্দের অনুভূতি গভীর ও প্রশস্ত হয় তারই ইঙ্গিত দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রদ্ধার অর্থ অন্ধ ভক্তি নয়, শিক্ষার অর্থ কৃচ্ছ্র-সাধন নয়। কোন বস্তুকে আত্মগত সংস্কার কিম্বা কামনার বহির্ভূত ক'রে দেখাই হচ্ছে শ্রদ্ধার তাৎপর্য্য। এই বহিষ্করণের প্রক্রিয়ার নাম শিক্ষা ও সাধনা। বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষার অন্য দিকটা—বাহিরকে অন্তরে আনার দিকটা—লোপ পাচ্ছে। এই যুগের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে ঐতিহাসিক, তুলনামূলক ও বৈজ্ঞানিক বিচারেরই প্রামাণ্য রয়েছে। সুর সম্বন্ধে পরীক্ষা সুরু হ'য়েছে, তা'ও ঠিক সুর নিয়ে নয়, স্বর নিয়ে; আমাদের দেশেও নয়, পরের দেশে, যেখানে স্বরের মূল্য সুরের পক্ষে আমাদের মূল্য হ'তে পৃথক। সেজন্য বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্তের কথা তোলা বোধ হয় এ ক্ষেত্রে উচিত নয়—শুধু এই মাত্র বলা যায় যে, ভাল লাগা বা না-লাগা অনেক সময় অভ্যাসের ওপরই নির্ভর করে। সে-অভ্যাসের সুবিধা যখন আমাদের নেই তখন তুলনামূলক বিচারও বেশী দূর করা যায় না। রসানুভূতির পূর্ব্বোক্ত বাধা-বিপত্তির ওপরে এখানে আবার এক নতুন বিপত্তি আশ্রয় করে—তার নাম দেশাত্মবোধ। অতএব ঐতিহাসিক বিচারই প্রকৃষ্ট। যদি কোন ওস্তাদ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে, অর্থাৎ এককালীন দেশী ও দরবারী সঙ্গীতে শিক্ষিত হ'য়ে, সঙ্গীতের ইতিহাসের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতকে দেখেন, তা হ'লে তিনি সে-সঙ্গীতকে খুব উচ্চ স্থানই দেবেন,

কল্পনা করা যায়। শ্রদ্ধার পক্ষে একটি বিশেষ অনুকূল অবস্থা হচ্ছে, ঐতিহাসিক মনোভাব। এই মনোভাবের বশে অনেক সঙ্কীর্ণতা দূরে স'রে যায়, গতির আনন্দে মন উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে, যদি না অবশ্য ইতিহাসের মোহে মন ইতিমধ্যে আচ্ছন্ন না হ'য়ে পড়ে, চলার নেশায় রসের সন্ধান না হারিয়ে যায়।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস আমাদের ভাল ক'রে জানা নেই। যতটুকু জানা আছে তার সার-সংগ্রহ এই।—পাঠান ও তার পরবর্ত্তী যুগ থেকেই মার্গ সঙ্গীত দেশী সঙ্গীতের স্পর্শদোষে দুষ্ট হচ্ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে শুদ্ধির চেষ্টাও হয়েছিল—কিন্তু কোন ফল হয়েছিল ব'লে মনে হয় না। একেই সহর-দরবারের জীবন গ্রাম্য-জীবন থেকে পৃথক, আবার প্রাদেশিক অর্থ-সঙ্গীত কথিত ভাষায় লেখা, তার ওপর ভক্তির বন্যায় দেশ ডুবে যাচ্ছে ; এ ক্ষেত্রে দেশী ও দরবারী সঙ্গীতের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্বন্ধে দেশী-সঙ্গীতের দানই বেশী হওয়া স্বাভাবিক। মার্গ-সঙ্গীতও মুখে মুখে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাচ্ছিল। পণ্ডিতরা শাস্ত্র লিখ্‌তে সুরু করলেন, কিন্তু নানা পণ্ডিতের নানা মত। এই অরাজকতায় আদান-প্রদান ও মিশ্রণের কার্য্য সহজ হ'য়ে ওঠে। তারই ফলে অনেক নতুন ধরণের সুর, তাল ও ভঙ্গীর সৃষ্টি হয়, যেগুলি পরে দরবারী সঙ্গীতে উচ্চ স্থান পায়। যে ধ্রুপদকে আমরা দেবতার স্কন্ধে চাপাই, তার জন্মভূমি গোয়ালিয়র অঞ্চলে—সেটি একটি প্রাদেশিক বা দেশী সুর-পদ্ধতি। আকবর বাদ্‌সাহের দরবারে ধ্রুপদ গাওয়া হয়েছিল ব'লে লোকে আক্ষেপ করেছিল, লেখা আছে। মার্গ-সঙ্গীতের কৌলিন্য এই প্রকারে ভেঙ্গে যায়। দেশী সঙ্গীত থেকে আত্ম-রক্ষা করার উপায় ছিল না। ক্রমে ক্রমে হোরি, টপ্পা, ঠুংরীও এল। এ ছাড়া অনেক প্রাদেশিক সুর আমাদের তথাকথিত উচ্চ সঙ্গীতে গৃহীত হয়েছে মনে হয়, যে-সব সুরের উল্লেখ পর্য্যন্ত শাস্ত্রে পাওয়া যায় না ; মোদ্দা কথা এই যে-মোগলদের আমল থেকেই শাস্ত্রোক্ত মার্গ-সঙ্গীত লোপ পেয়েছে, তার বদলে দরবারী সঙ্গীত এসেছে, এবং সে-সঙ্গীত যবন-স্পৃষ্ট ও অশাস্ত্রীয়। শুধু তাই নয়, শাস্ত্রোক্ত কোন একটি সুরের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক রূপ ও প্রসার-পদ্ধতি দরবারী সঙ্গীতে প্রবেশ লাভ করেছে,

আমরা জানি। বাঙ্গালী ওস্তাদ পঞ্চম বাদ দিয়ে, দুই মধ্যম, ও শুদ্ধ ধৈবত ব্যবহার করে যে-আসরে বসন্তের ধ্রুপদ, ধামার গান, সেই আসরেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ওস্তাদ বসন্তে পঞ্চম জোর ক'রেই লাগান, কোমল ধৈবত ব্যবহার করেন। দরবারী গানে বসন্তের দুই রূপের, দুই ভঙ্গীরই যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। তালের বেলাও তাই—এক দেশের যৎ সাত, অন্য দেশের আট মাত্রার, ঝোঁক বদলে বাংলা দেশের ঢিমে তেতালাকে বাংলার বাইরে তিলুয়াড়া বলা হয়। আবার বড় বড় ওস্তাদের রচিত সুর ও প্রকাশ-ভঙ্গীও অভিনন্দিত হয়েছে, যেমন বিলাসখাঁনি টোড়ি, ধোঁন্দিমল্লার, মিয়াকীমল্লার, হোসেনী কানাড়, হদ্দু খাঁ, তানরাজ খাঁ, জাফরুদ্দিনের ঘরোয়ানা তান ও গমক। যন্ত্রের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই—মসীদখাঁনী, রেজাখাঁনী গতের পার্থক্য থাকিলেও দুটিই ওস্তাদরা সমান ভক্তি-সহকারে বাজিয়ে থাকেন। অতএব ইতিহাসের দিক থেকে বল্‌তে হয় যে, আমাদের সঙ্গীত একটি অচলায়তন নয়; তাতে কোন প্রকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেই, তার ইতিহাস আছে, গতি আছে, অভিব্যক্তি আছে, পরিণতি আছে। এই মূলকথাটি প্রত্যেক সমালোচক, শিক্ষার্থী ও রস-পিপাসুর জানা উচিত, জানলেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের ওপর শ্রদ্ধা আস্‌বে। আমাদের সঙ্গীতের অভিব্যক্তি নেই, কেননা সেটি অপৌরুষেয় ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। অতএব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে কৃতিত্ব কিছু থাকৃতে পারে না মনে করার মতন আমাদের সঙ্গীতকে অপমান করা আর কিছু হ'তে পারে না। সত্যই 'মরার বাড়া গাল নেই'।

এ ত' গেল ইতিহাসের একটা দিক। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্থান এবং ব্যক্তিগত মৌলিকত্ব কোথায় জান্‌তে হ'লে আমাদের দেশের, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশের গত শতাব্দীর মানসিক ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখা উচিত। ইংরেজ-বণিক প্রথমেই পশ্চিমী সভ্যতা এ-দেশে বহন ক'রে আনেনি। ইংরেজ-বণিকের আশ্রয়ে দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতা প্রভৃতি বাণিজ্য-কেন্দ্রে, একদল বিত্তশালী ব্যবসাদারের সৃষ্টি হয়—তাঁরা দেশের অর্থ না বাড়িয়ে নিজেদের ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। দেশের মাটির সঙ্গে, মনের সঙ্গে তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কোন সংশ্রব ছিল না। পরে

তাঁরা জমিদার হন, কিন্তু সেই আদিম অভিশাপ থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে পারেননি। যখন ইংরেজ-বণিক রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত কর্‌লে তখন দেশের কৃষ্টি দেশী রাজ-দরবারে, পুরাতন ও কয়েকজন নতুন জমীদারের বৈঠকখানায় আত্মগোপন করলে। তখনও আমাদের দেশের চারুকলা লোপ পায়নি—তখনও ইংরেজ ব'ল্‌তে রাজার জাতি বোঝাত, তখনও ইংরেজ পশ্চিমী সভ্যতার প্রতিভূ হ'য়ে ওঠেনি। সর্ব্বক্ষণ বন্ধ ঘরে আত্ম-রক্ষায় বদ্ধপরিকর হ'লে যা হয় চারুকলার অবস্থা তাই হ'ল—লীনা, শীর্ণা, শুচিবাইগ্রস্তা বিধবার মতন। এই সময়কে সঙ্গীতের ছুৎমার্গের যুগ বলা যেতে পারে। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করাই জীবনের একমাত্র কাজ হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু এই সময় এক মহাপুরুষ জন্মালেন। রাজা রামমোহনের কৃপায় আমাদের মনের দুয়ার-জানলা খুলে গেল, আমরা মুক্ত হাওয়া পেলাম; আমরা বুঝলাম, বিদেশী গবর্ণমেণ্টের পিছনে আছে এক বড় সভ্যতা, সে-সভ্যতাকে ভিক্টোরিয়ান যুগের শুচিবাইগ্রস্ততা পর্য্যন্ত নষ্ট কর্‌তে পারেনি—সে-সভ্যতা নিতান্তই জীবন্ত, এবং তার মূলকথা হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির গ্রহণ করবার, দান করবার, সৃষ্টি করবার স্বাধীনতা। এই বার্ত্তা জোড়াসাঁকোর এক বাড়ীতে পৌছল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী ইংরেজ-রাজার অভ্যাসকে অনুকরণ করাটাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য কখনও ভাবেননি। দেশী রাজোয়াড়ার দরবার থেকে অনেক গুণী কলকাতায় ঐ সময় জমায়েৎ হন। কলকাতা তখন রাজধানী, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমীদার-সম্প্রদায় কলকাতায় এসে উপস্থিত হ'লেন, সহরের বড়লোকেরাও সৌখীন হ'লেন—মেটেবুরুজে ওয়াজিদআলি সা'র দরবার তখনও সরগরম, মহারাজ সৌরীন্দ্রমোহন সঙ্গীতের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার সুরু করেছেন। কিন্তু তাঁরা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক হ'য়েই রইলেন। তাঁদের কৃপায় অনেক গুণী অন্নাভাবে, অনেক সুর অভ্যাসাভাবে লোপ পেল না। তাঁরা সঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখলেন। কিন্তু মুক্তির বীজ পড়্‌ল, সৃষ্টি সুরু হ'ল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে। ধর্ম্ম, সমাজ, চারুকলার প্রত্যেক বিভাগে এই বীজ অঙ্কুরিত হ'ল। আবহাওয়া নিতান্তই অনুকূল ছিল। এ বাড়ীতে বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ে আসতেন, প্রত্যেক ছেলে-মেয়েকে হাতে নাড়া বেঁধে গান-

বাজনা শিখ্‌তে হ'ত। জ্যোতিবাবু ছিলেন এই দলের অগ্রণী। তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গীত-রচনায় উৎসাহ দেন। তিনিই পিয়ানোতে দেশী, বিদেশী, সব রকমের সুরের মিশ্রণ করতেন, আর ছোট ভাইকে বলতেন গান রচনা কর্‌তে। পশ্চিমী সভ্যতাকে অন্ধ অনুকরণের যুগের পর সেই সভ্যতার বাণীকে মর্ম্মে গ্রহণ করার যুগে, মানসিক স্বাধীনতার ফলে পুরাতন-নূতনের বিবাহের শুভ সন্ধিক্ষণে, সর্ব্বতোমুখী সৃষ্টি-প্রেরণার আবেষ্টনে ও প্রভাবে, রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত রচনা কর্‌তে আরম্ভ করেন।

এ ত' গেল শুধু আবেষ্টনের দিক্। আবেষ্টনকে সৃষ্টির কাজে কি ক'রে লাগান হ'ল বুঝতে গেলে কবির অন্য দিকটা দেখ্‌তে হবে। বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ পথিক—অল্প বয়স থেকেই তিনি নানা কাজ ও অকাজের ছলে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন। বাংলা দেশের বাউল, কীর্ত্তন, ভাটিয়াল প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রাদেশিক অর্থাৎ দেশী সুর-পদ্ধতির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ-ভাবেই পরিচিত হন। বাংলা দেশের মাটির সঙ্গে, শুধু তাই নয় অন্যান্য প্রদেশের গ্রামের সঙ্গেও, দেশের প্রাণের সঙ্গে তাঁর যোগ খুব নিবিড় ছিল। সেজন্য বিদেশী সভ্যতার কল্যাণে পুষ্ট স্বাধীন চিন্তা ও সৃষ্টির ধারা এই দেশের, গ্রামের পলিমাটি কেটেই বইল। মুমূর্ষু হিন্দুস্থানী দরবারী সঙ্গীতকে দেশী সুরের রক্তে সঞ্জীবিত করাতে রবীন্দ্রনাথ জীবন-ধর্ম্মেরই অনুগমন করলেন। সৃষ্টি তখনই সুন্দর হয়, যখন সেটি জীবন-ধর্ম্মের অনুগমন করে। সহর-দরবারের কৃষ্টি দেশের প্রাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লেই ধ্বংসমুখী হয়, এবং তার পুনর্জীবনের জন্য এককালীন ঘর ও বাহির থেকে শক্তি অর্জ্জন কর্‌তে হয়, মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ পুনর্স্থাপিত করতে হয়। এই কথাটি সমালোচকের স্মরণ রাখা উচিত, এবং স্মরণ রাখ্‌লে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা আসবেই আস্‌বে, তাঁর দানের মৌলিকত্বকে মর্য্যাদা দিতে হবে। মাটির সঙ্গে যোগস্থাপন ক'রে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে পুনর্জীবন দান করা তাঁরই

রস উপভোগের আরো দু-একটি অন্তরায় আছে। যা চ'লে আস্‌ছে, যাতে মানুষ অভ্যস্ত, যেটি ঐতিহ্যের ধারা ব'লে গৃহীত হয়েছে, তার একটি দেবার ক্ষমতা আছে ব'লে মনে হওয়া স্বাভাবিক। আদত কথা

কিন্তু এই যে, গতানুগতিকতার ফলে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী একটি বিশেষ আকারে সজ্জিত হয়; তারই ফলে নতুন অভিজ্ঞতাগুলির সেই ধারায় গ্রথিত হবার সেই নক্‌সায় সাজ্‌বার একটা ঝোঁক থাকে। পুরাতন অভ্যাসের নক্‌সা কিন্তু নতুন অভ্যাস অর্জ্জনের পথে বাধা দেয়। নূতন-পুরাতনে বিরোধ বাধে, তাদের মধ্যে নির্ব্বাচন-কার্য্য চলে। নতুন অভিজ্ঞতার কার্য্যকারিতা প্রতিপন্ন হবার পর, তারা দানা বেঁধে প্রিয় ও সুখজনক হ'য়ে ওঠে। মূল্য-বিচারের পিছনে, সাধারণ সমালোচনার অন্তরালে এই বিরোধের অবসানে অভ্যাস-জনিত সুখের স্পৃহা রয়েছে। সেজন্য আমরা পরিচিতকে ভালবাসি ও অপরিচিতকে ডরাই। কিন্তু অপরিচিতটি যখন কোন কারণে, কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার দৌলতে, কোন অভিভাবনের মৃদু তাড়নায়, স্বার্থের জন্য, কিম্বা অন্য কোন কারণে স্থায়ী হ'ল, সাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ কর্‌ল, তখন জনমতের আড়ালে সাধারণ লোক ভয় থেকে মুক্ত হ'ল। স্বাধীনভাবে চিন্তা করার দায়িত্ব জনমতের হাতে সঁপে দিয়ে লোকে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচ্‌ল। গ্রহণ, বর্জ্জন ও নির্ব্বাচনের পিছনে যখন এই স্নায়ুঘটিত, দেহগত সুখের সন্ধান রয়েছে, তখন ভালমন্দ'র বিচারে, বিশেষতঃ চারুকলার সমালোচনায় অভ্যাসের স্থান জনমতের স্থান নিতান্ত নীচুতে। এবং এই জন্যই আজকার রোমান্টিক্ কালকার ক্লাসিসিষ্ট হ'য়ে উঠে, সেইজন্য ঐ দুটি বুলির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের গান ওস্তাদী গানের অপেক্ষা নীচু স্তরের বলার কোন সার্থকতা নেই। মনের পিছনে দেহ থাকলেও, দেহ দিয়ে শ্রেষ্ঠ মানসিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না, অভ্যাস দিয়ে সৃষ্টির মূল্য-বিচার চলে না। পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়াছে যে, অনভ্যস্ত তাল ও স্বর-যোজনা অনবরত কানে এলে ভাল লাগে—ভালমন্দর কথা তখন উঠেই না।

মানুষ যে শুধু অভ্যাসের দাস, স্বীকার কর্‌তে মানুষেরই অহংবুদ্ধিতে আঘাত পড়ে। সেজন্য মানুষের ইচ্ছা হয়, প্রত্যেক অনভ্যস্ত অভিজ্ঞতাকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে বরণ কর্‌তে—তা সেটি পুরাতনের সঙ্গে খাপ খাক্ আর নাই খাক্। বরঞ্চ নতুন অভিজ্ঞতা যতই অস্বাভাবিক, যতই খাপ-ছাড়া, যতই বিসদৃশ হয়, ততই বরেণ্য হ'য়ে উঠে। এটি অভিমান, এবং অনেক সময়

প্রথম অবস্থারই প্রতিক্রিয়া। স্থিতিশীলতা ও চলিষ্ণুতা একই বস্তুর এ পিঠ আর ও পিঠ। প্রথম অবস্থার সুবিধা এই যে, ঐতিহ্যের সাহায্যে রুচির মেরুদণ্ড, বিচারের মাপদণ্ড তৈরী হয়। দ্বিতীয় অবস্থার সুবিধা এই যে, গতিশীল জীবনের পরিবর্ত্তনশীলতার আসরে সৃষ্টির জন্য পরীক্ষা করা চলে, নিজের শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসে। এ দুই অবস্থার অতিরিক্ত অবস্থা প্রতিভা নিজের জন্য সৃষ্টি করেন; সেটি শুধু আদান-প্রদান নয়, হাটবাজারের লেন-দেন নয়। প্রত্যেক সমালোচকের কর্ত্তব্য হচ্ছে, স্নায়ুগত অভ্যাস এবং নূতনত্বের স্নায়বিক সুখ ও মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে ঐ অতিরিক্ত অবস্থার সন্ধান করা। সমালোচকের কান যদি শুধু দরবারী সঙ্গীতে, শুধু দেশী সঙ্গীতে অভ্যস্ত হ'য়ে থাকে, তা হ'লে তাঁর আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধি পাবার কোন আশা নেই। কিন্তু দুই প্রকার হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেরই রসগ্রাহী হ'য়ে, কবিতার রসগ্রহণ করবার ক্ষমতা অর্জ্জন ক'রে, এবং নব নব রূপের সৃষ্টিতত্ত্বের সন্ধানে ব্যগ্র হ'য়ে যদি কোন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে শোনেন তা হ'লে তাঁর আনন্দের মাত্রা বেড়েই যাবে। রসের বিচারে অভ্যাস, অনভ্যাস, অবান্তর কথা; আসল কথা প্রতিভার যোগ-সাধন, সৃষ্টিতত্ত্ব। এই কথাটি ঐতিহাসিকেরও সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সৃষ্টি আমাদের সঙ্গীতে সম্ভব, এবং অভ্যাস-অনভ্যাসের মিশ্রণের ফলে একটি অভিনব রূপ সৃষ্টি হ'তে পারে, স্বীকার করলেই নিজেকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা হয় না, রসোপভোগের যথেষ্ট সুবিধা হয়। তারপর যদি রূপটি সত্যিকারের মোহন হয় তা হ'লে ত কথাই থাকে না, মন আনন্দে ভ'রে উঠে।

মন তৈরীর কথা ছেড়ে দিলে, ভেতরের দিক থেকে বলা যেতে পারে যে, রস-বস্তুর রূপ ও তার প্রকাশ যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই আনন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান তৈরী হ'ল। আনন্দের সাক্ষাৎ উপাদান ও অব্যবহিত কারণ হচ্ছে সম্পূর্ণতা। বস্তু, রূপ, ও প্রকাশপর তাকে সম্পূর্ণতা থেকে পৃথকভাবে দেখ্‌লে আংশিক সুখ হতে পারে, কিন্তু আনন্দ হয় না। আনন্দের জন্য সম্পূর্ণতা চাই। একটি বাদ দিলেই আনন্দ দৈহিক সুখে পরিণত হল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে সৃষ্টির সম্পূর্ণতা যতটা লক্ষ্য করা

যায়, ততটা অন্য কোন রচয়িতার গানে লক্ষ্য করা যায় না। যে-ভাবটি তিনি গানের রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে চান, সেটি সুরের রূপের উপযুক্ত, সেটি মানুষের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান, এবং অতি সুন্দররূপেই ব্যক্ত ব'লে সম্পূর্ণ। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে, বিশেষত ধ্রুপদ খেয়ালে ভাবাত্মক গানে যে নেই তা নয়; কিন্তু সকলেই জানেন যে, সে ভাবগুলির সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য কম এবং বেশীর ভাগ গানেই ভাবের কোন স্থান নেই; থাকলেও ভাবের সঙ্গে রূপের কোন সামঞ্জস্য নেই। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সুরের বিকাশ কোন ব্যক্তিগত ভাবের কী রচয়িতার কী গায়কের ব্যক্তিগত ভাবের ধার ধারে না। কিন্তু এইখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের কৃতিত্ব। ভাবকে হিন্দুস্থানী গানের যা মূল্য দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে তিনি সুরের সম্পূর্ণতাকে ছোট করেননি। অথচ তাঁর গান কেবল কথার তান, কিংবা ভাবের বিলাস নয়। তাঁর গান এক-একটি চিত্তবৃত্তি বা mood-এর বিকাশ। গায়ক যদি সেই mood-টি ধরতে পেরে তাকে রূপ দিতে পারেন তা হ'লে সে-রূপটা হিন্দুস্থানী দরবারী সঙ্গীতের চেয়ে বেশী সহজ এবং পরিষ্কার হ'য়ে ফুটে ওঠে। সাধারণকে ব্যক্তিত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করলে আমার আনন্দের মাত্রা বেড়েই যায়। সম্পূর্ণতাকে রূপ দেবার জন্য এই উপায় নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী। সাধারণ ভাবের পক্ষে স্বর-বিন্যাস বেশী উপযুক্ত হ'লেও সীমাবদ্ধ, বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত ভাবের পক্ষে উপযুক্ত কথা ও ভাবের সম্যক। মিশ্রণ বেশী মূল্যবান। তবে সুরের প্রকাশে স্বরের ব্যত্যয় কোন ক্ষেত্রেই শোভা পায় না। তারপর আসে রূপের কথা। বাক্য, অর্থ, ভাব এবং ঐ তিনের সুসামঞ্জস্য প্রকাশের নামই হচ্ছে রূপ। রূপের সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, রচয়িতার প্রদত্ত রূপকে গায়ক ভিন্ন আকৃতি দিতে পারেন না। রূপটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া রূপ হওয়া চাই। সে রূপকে বিকৃত ক'রে যে-রূপ গায়ক তৈরী করেন তাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সুরের রূপকে বিচার করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া রূপ কথাটা হয়ত ভুল, কেননা যারা তাঁর গান রচনা লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই জানেন যে, তাঁর কাছে সুর ও কথা একত্রে আসে, হরগৌরীর মতন। হরকে গৌরী থেকে বিচ্ছিন্ন করলে হরকে পিশাচ এবং গৌরীকে শীর্ণা কুমারী

ব'লে ভ্রম হয়। সুর ও ভাবার্থক কথার মিলনে রূপ, এবং সে-রূপ তার অন্তরের সত্ত্বায় বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ। যদি কোন গায়ক তাঁর কথাকে নিজের রচিত সুরে বসান, কিম্বা তাঁর সুরকে নিজের কথার উপর চাপিয়ে দেন, তা হ'লে জিনিষটা বীভৎস হ'য়ে উঠে। প্রকাশ-ভঙ্গী সম্বন্ধে এই বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, সেটি সাধারণতঃ গায়কের উপরই নির্ভর করে। গায়ক কতটা গানের ভাবকে নিজস্ব কর্‌তে পেরেছেন, কথাগুলিকে কতটা শ্রদ্ধা দেখাতে সমর্থ হয়েছেন, সুরের বৈশিষ্ট্য কতটা রক্ষা কর্‌তে পারেন, গানের সম্পূর্ণতাকে কতটা অটুট রাখ্‌তে পারেন, এই সবের উপর তাঁর প্রকাশ-মাধুর্য্য নির্ভর করে। এক হিসাবে তাঁর কাজ ওস্তাদের চেয়ে সহজ, অন্য হিসাবে শক্ত। তাঁর স্বাধীনতা কম, কিন্তু তিনি সাহায্য পান বেশী। স্বাধীনতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তাঁকে কৃতিত্ব দেখাতে হবে ব'লেই তাঁর নৈপুণ্যের প্রয়োজনও বেশী মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের গানের সম্বন্ধে এই কয়টি মোটা কথা স্মরণ রাখ্‌লে দেখা যাবে যে, তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-ধারার বিপক্ষে যাওয়া দূরে থাকুক, সেই ধারাকেই দেশী সঙ্গীতের সংস্পর্শে ও ব্যক্তিগত ভাবের সম্পর্কে এনে নতুন জীবন দিয়েছেন। শ্রদ্ধা-সহকারে দেখ্‌লে, ইতিহাসকে খাতির করলে, সঙ্গীতকে ভালবাসলে, রসিক হ'লে, অবান্তরকে বাদ দিলে হয়ত দেখা যাবে যে, কবির স্থান সঙ্গীতের শীর্ষে। নতুনকে অপরিচিত ব'লে অবজ্ঞা না কর্‌লে অনেক সময় দেখা যায় যে, সেটি পুরাতনের রূপান্তর, সনাতনেরই বিকাশ। সনাতনকে পরীক্ষা করলেই দেখা যায় যে, তার মধ্যে অনেক সময় নতুন জীবনের আভাস রয়েছে।

জয়তু

(গান)

—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

জয়তু, জয়তু, জয়তু কবি,
জয়তু পূরব-উজল রবি।

জয় জগত-বিজয়ী কবি,
জয় ভারত-গৌরব-রবি,
বঙ্গ-মাতার দুলাল 'রবি',
জয় হে কবি।

হে কবি! তোমার মোহন তান,
নিখিল জনের মোহিছে প্রাণ,
নানা ভাষা লভি' তোমার দান,
আজি গরবী,
হে বিশ্ব-কবি!

কভু বাজাও ভেরী গভীর সুর,
কভু বাজাও বীণা মৃদু মধুর,
কভু বাজাও বেণু প্রেম-বিধুর,
বিচিত্র কবি!

স্বদেশের শঙ্খ যবে বাজাও,
সুপ্ত দেশবাসী-জনে জাগাও;
নবীন উৎসাহে সবে মাতাও,
হে বীর কবি,
দেশ-প্রেমী কবি!

বিশ্বের উদার সমতলে,
ভারতীর দেউল তুলিলে,
দেশ-কালের ভেদ ভুলিলে,
কি নব ছবি !—
হে কর্ম্মী কবি !

বিশ্বেশ্বরের চরণ-তলে
তব গীত-গঙ্গা সুধা ঢালে,
দুঃখী তাপিত জনে শীতলে,
হে দেব-কবি !

যাত্রা ও থিয়েটার

—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাত্রা এক জিনিষ, থিয়েটার আর-এক জিনিষ, আবার যাত্রা-ভাঙ্গা আধুনিক থিয়েটার-যাত্রা সে আর-এক জিনিষ। প্রথমটা হ'ল খাঁটি ঘরাও মাল, দ্বিতীয়টা হ'ল খাঁটি পরস্ব দ্রব্য, আর থিয়েটার-যাত্রাটা হ'ল তথাকথিত স্বদেশী সিগারেটের মতো নাম মাত্র খাঁটি মাল। অবশ্য খাঁটি যাত্রা দুর্ল্লভ হয়েছে, থিয়াটার-যাত্রাই চল্‌ছে এখন; সেই কারণে খাঁটি যাত্রার ঠিক রূপটা পাওয়া মুস্কিল্ এবং তার পুরো চর্চ্চাও অসম্ভব। যতটুকু নিজে দেখেছি তা দেখে বল্‌তে পারি, যাত্রার পালা-বাঁধার নিয়ম আর থিয়েটারের জন্য নাটক বাঁধার নিয়মে অনেক প্রভেদ।

প্রথমতঃ দেখি যে, থিয়েটার এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে পৌছিবার বেলায় একটা ফাঁক দেওয়া চলে সহজে—এ ফাঁকটা কনসার্ট দিয়ে ভর্ত্তি না কর্‌লেও দর্শকের মনে সহজেই পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সঙ্গে একটা রেস রেখে নতুন ঘটনার অবতারণা করার কাজে আসে। এর উপরে তো আছেই দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন। কিন্তু এই দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন যাতে নেই, যেমন "তপতী"তে, তখন একবার কাশ্মীর একবার জালন্ধর এই স্থান-পরিবর্ত্তনের উপায় হ'ল একমাত্র আলোক এবং সাজ-সজ্জার পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর। সেখানে খুঁৎ থাক্‌লে চলে না—পাত্রপাত্রীদের হাবভাব সাজ সজ্জা-সমস্তই বদলানো চাই; না হলে জিনিষটা এক-লেখার উপর আর-লেখার মতো দর্শকের মনে একটা হিজিবিজি ব্যাপারের সৃষ্টি ক'রে তুল্‌তে পারে। সুতরাং দৃশ্যপট বাদ দিয়ে একটা নাটক সুচারুরূপে নির্ব্বাহ ক'রে তোলা কত কঠিন ব্যাপার তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

খাঁটি যাত্রা দৃশ্যপটের ধার দিয়েও যেত না জানি, তবে যাত্রাটা অবাধে চলতো কেমন ক'রে এ একটা জান্‌বার বিষয়। যাত্রা লিখ্‌তে চেষ্টা করা মাত্রই এইখানে পদে পদে ঠেক্‌তে হয়েছে আমাকে। নজর ক'রে দেখি যে, জুড়ি দোহার এই ক'জনই ছিল যাত্রাওয়ালাদের সিন্ কনসার্ট এবং নানা

তোড়-জোড় দেবার সহায়। ধর, কালিদাসের 'শকুন্তলা' আরম্ভ হ'ল—হরিণ-শিকারে চলেছেন রাজা রথ চালিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে। থিয়েটার-ওয়ালা এখানে ঠেক্‌বে, এটা নিশ্চয়। গতিবেগ নেই রথের হরিণের কিছুরই ; স্থির দৃশ্যপট, স্থির কাঠ-কাগজে-কাদায়-মাটিতে গড়া রথ ঘোড়া সবই—তার উপরে খাড়া সচলাচল রাজা ষ্টেজের উপরে রাজার মৃগয়া-যাত্রার একটা বৈরূপ্য ঘটন ছাড়া কিছুই সম্ভব হয় না। কাজেই থিয়েটারের ষ্টেজে এ অংশ সুযোগ্য লোকে বাদ দিয়ে যান। যাত্রাওয়ালা এখানে নির্ভয়—সে গানের পর জুড়ির গান, বর্ণনা জুড়ে দর্শকের মনোরথ তেজে নিয়ে ফেলে আশ্রমের কাছ। গীতছন্দে স্যন্দন চল্লো, হরিণ দৌড়লো নানা বর্ণের মধ্যে দিয়ে দৃশ্যপরম্পরা ছাড়িয়ে, চ'লে গেল মন অতি সহজ উপায়ে যাত্রাতে,—সচল মনোরথ (স্বচ্ছন্দ গতি পেলে সুর ও ছন্দের সাহায্যে)—এই ছিল যাত্রার বিশেষত্ব। থিয়েটারে যেটা ঘটানো অসম্ভব, সেটা সুসম্ভব হ'ল যাত্রার অধিকারীর কাছে (—দিলে সে হাঁকিয়ে রথের জুড়ি-ঘোড়া আসরের মধ্যে) নির্ভয়ে—ধূলো লাগলো না দর্শকের গায়ে, বালি পড়লো না কারু চোখে, ভুয়ো দিলে না কেউ !

ধর, সমুদ্র আন্‌তে হবে যাত্রার আসরে। যাত্রাওয়ালা গানের ঢেউ বাজনার ঝন্‌ঝনা, এবং নাগ-কন্যার নৃত্য দিলে পাঠিয়ে আসরে ! এ ক্ষেত্রে রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা জলের হৌজ খুলে বসেন, কিন্তু তাতে ক'রে অমুক নং অমুক রাস্তার মোড়ে সমুদ্র আছে এটা বোঝায় যে সে কে? আর বোঝাই বা সে তারা কারা ?

ধর, রাজা আর মন্ত্রী, রাণী আর সহচরী এলেন, কিম্বা মালিনী এলেন ! থিয়েটারওয়ালার নির্ভর প্রধানতঃ সাজ আর দৃশ্য আর কথা। দু'টো পেলে যাত্রাওয়ালা সাজ আর কথা, কিন্তু সেখানেও সে কৌশল খাটালে—সহচরীর গলার সুর বেঁধে ফেল্লে ; রাজা, রাণী, মন্ত্রী, মালিনী সবাই বাঁধা সুরে ব'লে চল্লো কথা ; মালঞ্চের দৃশ্য নেই, রাজসভার দৃশ্য নেই, আছে সাজানো আসর—মাত্র এক সুরেতেই মাৎ। যেমনই আসর হোক, সুর এলো মালিনীর, সুর এলো রাণীর স্বর এলো রাজার, রামের, লক্ষ্মণের, ভীমের, হনুমানের, সবই বাঁধা গানের মতো বাঁধা সুরে বাঁধা। সেখানে

অবনীবাবু যে ভীম সেজে এলেন এ বোঝ্‌বার অবসরই থাকে না স্বরের পরিবর্ত্তনে দ্বারা, তার উপর থাক্‌তো মুখসটা। চেনা মানুষ একেবারে অচেনা হ'য়ে যেতো এই দুই উপায়ে।

থিয়েটারে দেখি চেনা সাহাজাহান চেনা চণ্ডিদাস কখনও বা অলীকবাবু কখনো বা আর-কিছু হ'য়ে আস্‌ছেন রাতের পর রাত। এটা কেবল হয় মুখসের অভাবে। মানুষের এমন সাধ্য নেই যে, আপনাকে সে সম্পূর্ণ গোপন ক'রে ফেলে। একমাত্র পারেন তা প্রতিভাবান নট; তাঁর প্রতিভাই আড়াল করে প্রতিদিনের পরিচিত রূপ।

যাত্রার অর্থই হচ্ছে চলাচল। পুরো পালাটা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের বিশ্রাম দিলে সেখানে কাজ চলে না। পুরো যাত্রা বা পালা-গান তিন চার ভাগে তিন চার দিন ধ'রে চলার নিয়ম ছিল, কাজেই প্রত্যেক ভাগ সুরু থেকে শেষ একটা পুরো জিনিষ ক'রে খাড়া করা হতো। থিয়েটারের বই এ ভাবে ভাগ করা মুস্কিল।

দ্বিমনা

—শ্রীসরলা দেবী

মানুষ দ্বিমনা। তার ভিতর তুটো মন আছে, একটা খেলো মন, একটা ভাল মন। তার একটা মন অবজাত, একটা অভিজাত। তাদের একজন ছোটলোক, একজন ভদ্রলোক।

সচরাচর আমরা খেলো মন দিয়ে কাজ করি। ভাল মনটি চুপচাপ দেখে যায়; তবে ছোট মনের ছোটলোকমির বাড়াবাড়ি হ'লে সে আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না, তখন বড় মন তাকে সংযত করতে চায়, লজ্জা দেয়, তুটো কথা বুঝিয়ে বলে; যদি শুনলে ত' ভাল, না শুনলে নিজেই একদিন বিষম ঠেকে শিখ্‌বে। যে ছোট মন উপযাচক হ'য়ে বড় মনের শরণ নেয়, তার পরামর্শে চলে, তার ভাগ্যি ভাল।

বড় মন হ'ল বিশ্বরাজাধিরাজের অর্দ্ধাঙ্গিনী হ্লাদিনী শক্তির ছেলে, ছোট মন হ'ল মায়া নাম্নী বাঁদীর গর্ভজাত।

এই মায়া বড় সুন্দরী, বড় চতুরা, বড় শক্তিশালিনী। তারও ঐশ্বর্য্যসম্পদ লোকলস্কর কম নয়। বিশ্ববিমোহন রূপ তার, শব্দে-রসে-গন্ধে-স্পর্শে-দৃশ্যে সে নিজেকে কতরকমে বিকশিত ক'রে তোলে। সে চতুঃষষ্টিকলায় ভুবন ভুলায়। এই গেল তার ভালটুকু। কিন্তু তার মন্দের আর অন্ত নেই। তার প্রধান দোষ, আঁকড়ে থাকা। একবার যে তার আলিঙ্গনপাশে এসেছে তার প্রাণ খানিকবাদে ত্রাহি ত্রাহি ক'রে উঠলেও ছাড়ান নেই। ত্রাহি ত্রাহি করবেই। কেননা, মায়ার আর একটি অমার্জ্জনীয় দোষ এই যে, যে-সব বস্তু দিয়ে সে মানুষকে বাঁধে তারা মায়ায় গড়া—এই আছে, এই নেই। যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তাদের সঙ্গ অতি সুখদ, কিন্তু স'রে পড়লেই পরম তুঃখদ। ছেড়ে তারা যায়ই, অথচ তারা ছাড়লেও তাদের প্রতি মায়া ছাড়ে না। তখন হাহুতাশবহ্নি চোখের জলের চোবানিতে নির্ব্বাপিত হবার নয়।

মায়ায়-গড়া পাঞ্চভৌতিক বস্তু অনিত্য। সেই বস্তুগুলির উপভোগের

জন্ম-মায়ায় গড়া পাঞ্চভৌতিক ইন্দ্রিয়েরা ক্ষয়শীল, অনিত্য ; আর মায়ায়-গড়া মানুষের ছোট মনখানা অতি মলিন, দাম্ভিক, ক্রুর, লোভী, কামুক, হিংসুক ; মায়াবাঁধা চোখে সে কলুর বলদের মত স্বার্থের সঙ্কীর্ণ চক্রে ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। এই হ'ল মায়াপুত্র।

তবু সে রাজার ছেলে। সুতরাং কতকগুলি রাজকার্য্য ও রাজশক্তি তারও অধিকৃত আছে। তার প্রধান কার্য্য হচ্ছে—মনন করা, এবং শক্তি হচ্ছে নির্ম্মাণ করা। মন যেমনটি মনন করে তেমনটি হয়।

১। শরীর সম্পর্কে ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে।

২। ঘটনা সম্পর্কে।

৩। জড় বা অপক্ক চেতন সম্পর্কে।

শরীর ও শরীরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে মনের কার্য্য অনেক। মন কারিগর যেমন গড়ে শরীর তেম্‌নি হয়। মন যদি নিজের শরীর সম্বন্ধে 'কুৎসিৎ' ভাবনা করে শরীর কুৎসিৎ হয়। মন যদি শরীর সম্বন্ধে 'জরাযুক্ত, পলিত, বলিত, দিন-দিন বলহীন, শরীরের প্রত্যেক কোষ ইন্দ্রিয় স্নায়ু বা পেশী ক্ষীয়মান্'—এই ভাবনা করে তবে তা-ই হয়।

আর যদি মন ভাবে—'আমার শরীর চিরনবীন, আমার শরীর চির-যৌবনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য, অক্ষয় বল, তার কোন অংশে জীর্ণতা নেই, সর্ব্বাংশে পূর্ণতা,' তবে শরীর তা-ই হয়। কারণ—

চিন্তা নেয় রূপ, চিন্তা হয় বস্তু।

মন-পটুয়া শিব না গ'ড়ে যদি বানর গড়ে তবে তার অপটুতার পরিচয় হয়। তখন তার ওস্তাদ কারিগরের শরণ নেওয়া দরকার।

ঘটনার উপর মনের প্রভুত্ব অনেকখানি। যতই কুঘটনা ঘটুক তার কুত্ব থেকে মন যদি নিজেকে সরিয়ে নেয়, 'কু'র বিষদাঁত ভেঙ্গে যায়, নির্ব্বিষ হ'য়ে যায়।

একে ত' ঘটনাই কু, তার উপর তার জন্যে আথারি-পাথারি ক'রে নিজেকে কষ্টের একশেষের মুখে ফেলে দিলে জীবনে 'কু'র পরিমাণকে অযথাভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। অতএব 'কু'র প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে

মন তার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখ্‌বে, সেই অস্পৃশ্য 'কু'র স্পর্শ থেকে মন নিজেকে বাঁচিয়ে শুচি রাখ্‌বে, এই হ'ল মনের একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য।

আর যদি 'কু'র প্রতিকার হ'তে পারে তবে মন জোর হাতে শক্ত ক'রে তার কান ধ'রে উঁঠ্‌-বোস্‌ করিয়ে তাকে সিধে করবে। যদি সিধে হবার না হয়, শোধ্‌রাবার অসাধ্য হয়, প্রতিকারের অযোগ্য হয়—তবে মন তাকে তাড়িয়ে দেবে দূ—রে, নিজের ত্রিসীমানা মাড়াতে দেবে না।

আর এক কাজ কর্‌তে পারে মন—'কু'কে 'সু'য়ে পরিণত কর্‌তে পারে। কোন-একটা 'কু'র থেকেও কি কি 'সু'র উৎপত্তি হ'তে পারে তাই মনন ক'রে ঠিক ক'রে নিয়ে, সেই 'সু'র দিকে মন নিজেকে লগ্ন কর্‌তে পারে, সেই 'সু'গুলিকে গ'ড়ে তুল্‌তে পারে।

বাকী রইল জড় বা অপর চেতনের উপর মনের প্রভাবের কথা। সে একটা শাস্ত্রবিশেষ, বল্‌লে বিস্তর কথা বল্‌তে হয়। সংক্ষেপে এইটুকু বলা যেতে পারে—মন যদি নিজের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসসম্পন্ন হ'য়ে কাজে রত হয় তবে জড়কে বা যে-কোন চেতনকে ইচ্ছামত হেলাতে পারে, নিজের ইচ্ছায় বশীভূত কর্‌তে পারে। চাই বিশ্বাসের বর্ম্মটি যোগাড় করা, তাই দিয়ে নিজের চর্ম্মকে আবৃত করা। সে-বর্ম্ম আছে বড়কর্ত্তার অস্ত্রশালায়, তাঁর শরণাপন্ন হ'লে তাঁর ভাবে ভাব মেলালেই তবে সেটি লভ্য হয়।

এবার বড় কর্ত্তা, যিনি আমাদের শরীরস্থ উচ্চ মন তাঁর একটু পরিচয় দিই। ইনি মায়াধীশের হ্লাদিনী বা সম্বিৎপুত্র। আগেই বলেছি, সেই শাশ্বত পুরাণ পুরুষের যা কিছু ঐশ্বরী মহিমাসম্পদ সব এঁতে বিদ্যমান আছে। ইনি প্রথমতঃ নির্ভাঁজ চৈতন্য।

প্রতি দেহের বড় কর্ত্তা সেই দেহের প্রাণের প্রাণ। প্রাণ তাঁর অনুগত, তাঁর অধীন। তিনি দেহ ছেড়ে গেলে প্রাণও দেহকে ত্যাগ ক'রে যায়। তাঁর শক্তিতেই ইন্দ্রিয়েরা শক্তিমান্‌। তিনি আবাস ছেড়ে গেলে ইন্দ্রিয়েরা শক্তিশূন্য হ'য়ে পড়ে, তাদের কাজ বন্ধ হ'য়ে যায়। তিনি পাঁচভূতের মালমসলায় গড়া দেহের কাঠামখানা ছাড়্‌লে পাঁচ ভূতেরা

কাঠাম খাড়া রাখতে পারে না, তারা আপনা-আপনি পৃথক হ'য়ে ছিট্‌কে পড়ে, কাঠামখানাও ধসে যায়। চৈতন্যময় চ'লে গেলে দেহ বিনাশ পায়। ভিতরে নিরাশার অরূপ না থাক্‌লে, বাইরে সাকার রূপবান্ আর কেউ থাকে না। যেখানে ইন্দ্রিয়, যেখানে রূপ, যেখানে প্রাণ, যেখানে মন সেইখানেই অদৃশ্য অরূপ আত্মা বিরাজমান। মায়াময় রূপলোকের জন্য চৈতন্যময় অরূপের সাহায্য প্রয়োজন।

আমাদের প্রত্যেকের শরীরস্থ আত্মা ও বিশ্বশরীরস্থ আত্মা একই, অর্থাৎ দুয়ের একই গুণ, একই কাজ। সচ্চিদানন্দ গুণ উভয়ের, সংযমন কার্য্য উভয়ের। বিশ্বাত্মা যেমন বিশ্বের অন্তর্য্যামী, আমাদের শরীরস্থ আত্মা তেমনি আমাদের অন্তর্য্যামী। বিশ্বাত্মা মহাভাস্কর, আমাদের ভিতরকার আত্মা বা আমি বা আমার উচ্চ মন তারই একটি কিরণ। বিশ্বাত্মা যেমন সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপারের পশ্চাতে অন্তর্য্যামীরূপে বিদ্যমান্, তিনি যেমন পৃথিবীতে, সলিলে, অগ্নিতে, অন্তরীক্ষে, বায়ুতে, দিবে, আদিত্যে, দিকে, তারকায়, আকাশে, তমে ও তেজে থেকে তাদের যমন করেন, তারা জানেও না—তেম্‌নি আমাদের মনের ভিতর থেকে আর-এক মন তাকে যমন করে, এ মন জানে না। আগেই বলেছি, আমাদের শরীরস্থ এই বড়কর্ত্তা আসল যে আমি, সে বিশ্বের শাশ্বত কর্ত্তার পুত্র, সেই মহাসমুদ্রেরই একটি ধারা, তাই তিনি আর আমি এক,—

My Father & I are one

যো সাবসৌ পুরুষ সোহমস্মি

ঐ আদিত্যের ভিতর যে-পুরুষ সে আমিই। মন অন্ধকারের পরপারে গেলে এই পুরুষকে জান্‌তে পারে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং
তমসঃ পরস্তাৎ

তখন স্ত্রীদেহধারী জীব উমার মত বলে—

আমি নই সামান্যা নারী,
আমি ঈশানী।

এবং স্ত্রীপুরুষ উভয় দেহধারীই বলে—

আমি মায়াধীশ, অজর, অমর,
পূর্ণকাম, অকাম,
অশোক, অভয়,
সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম !

কিন্তু অজ্ঞানান্ধ মনের সেই জ্ঞান আসে কি ক'রে? কে হঠাৎ চোখ খুলে দেয়? কে নিজেকে চিনিয়ে দেয়? কেউ বল্‌তে পারে না—কে, সবাই এক কথায় বলি—ভগবানের কৃপা। তবে এ কথা জানি, সে-কৃপা পায় সে-ই, যে সে-কৃপা চায়।

যদি প্রাণের থেকে ডাকৃতে পারি—

'আমি হে তব কৃপার ভিখারী'

তবে কৃপাময় প্রাণের পাত্রখানি ভ'রে দেন, দ্বিমনা মানুষকে তার অবজাত মন ছেড়ে অভিজাত মনের কূলে বাসা বাঁধতে পাট্টা দিয়ে যান।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা

—শ্রীবুদ্ধদেব বসু

অন্যান্য কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও এ-কথা বলা নিরাপদ বোধ করি যে, প্রেমের কবিতায় ইংরেজি সাহিত্যই সবচেয়ে সম্পদশালী। বৈষ্ণব-কাব্যকে বাদ দিলে, আমাদের বাঙলায় সত্যিকারের প্রেমের কবিতার পরিমাণ এখনো খুব সামান্য। তা'র কারণ, আমাদের প্রথম ও প্রধান লিরিক্-কবি রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনার মধ্যে প্রেমের কবিতা যে-ক'টি আছে, তা তাঁর একেবারে অধুনাতম সৃষ্টি; এবং রবীন্দ্রনাথের যৌবনের ও মধ্য-বয়সের রচনা অবলম্বন ক'রেই বাঙ্‌লা কাব্য-সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে। সেজন্য দেখি, বাঙ্‌লা কাব্যে প্রকৃতি-পূজা—বিশেষ ক'রে ষড়্‌ঋতুর বিস্তৃত বর্ণনা—এত বেশী। রবীন্দ্রনাথ জন্মে, রুচিতে, শিক্ষায়, পারিপার্শ্বিকতায়, সর্ব্বান্তঃকরণে আদর্শবাদী, তাঁর মন অতিরিক্ত-রকম আধ্যাত্মিক। তাই প্রেমকে Idealize ক'রেই তিনি তৃপ্ত হয়েছেন: তা'র প্রকাশ একেবারে নৈর্ব্যক্তিক।

ত্রিযামা যামিনী একা বসে' গান গাহি,
'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।'
—'হে বন্ধু, আছো তো ভালো?' মুখে তা'র চাহি'
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।

সুন্দর, অত্যন্ত সুন্দর কাব্য, কিন্তু একেবারে impersonal। কবির নিজের অর্থাৎ, মানুষটির হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ এ-সব কবিতায় পাইনে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের রচনায় পাই অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অত্যন্ত সুকুমার কল্পনা-বিলাস, মৃদু সৌরভের যা মধুর, মোহময়—

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ,
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মত—

না-হয় নব-জাগ্রত বাসনার আত্ম-নিবেদনের অস্পষ্ট প্রয়াস—

আজি মোর দ্রাক্ষা-কুঞ্জবনে
গুচ্ছে-গুচ্ছে ধরিয়াছে ফল—

না-হয়—আরো ভালো উদাহরণ নে'য়া যাক্—

ঝিকিমিকি করে পাতা, ঝিলিমিলি আলো,
আমি ভাবিতেছি কা'র আঁখি দুটি কালো।

এ-সব কবিতায় আমরা অত্যন্ত ভীরু, পৃথিবী-পলাতক কবি-মনের পরিচয় পাই, প্রথম প্রেমের লজ্জায়, কুণ্ঠায়, আনন্দে, গৌরবে যা'র সমস্ত আকাশ রঙে-রঙে রঙীন হ'য়ে উঠেছে; একদা এক বর্ষার দিনে যে হঠাৎ এই বিশাল আবিষ্কার করে' ফেলে—

এমন দিনে তা'রে বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের পরিণত যৌবনের রচনায় এই ভীরু প্রেমই একটু দৃঢ়, আত্ম-প্রতিষ্ঠ হয়েছে: এ-কথা তিনি সাহস করে' মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পেরেছেন—

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট।

নিজের প্রেমে নিজেই মুগ্ধ হ'য়ে প্রেমিকার দিক্ থেকে তিনি প্রণয়-প্রশ্ন করেছেন—

আমার মধুর অধর বধূর
নব লাজ-সম রক্ত?

কিন্তু এখনো রূপক ছেড়ে সোজা কথায়, স্পষ্ট কথায় তিনি নেমে আসেন নি। এর খানিকটা ব্যতিক্রম হয়েছিলো 'ক্ষণিকা'য়।—

হৃদয় পানে হৃদয় টানে
নয়ন পানে নয়ন ছোটে,
দু'টি প্রাণীর কাহিনীটা
এইটুকু বই নয়কো মোটে।

হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে
করিয়ো ক্ষমা।

আমি নাব্‌বো মহাকাব্য
সংরচনে
ছিলো মনে—

ঠেক্‌লো কখন তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিণীতে,
কল্পনাটি গেলো ফাটি'
হাজার গীতে।

এ-সব উক্তি অনেকটা স্পষ্ট, অনেকটা ব্যক্তিগত—তবু যথেষ্ট নয়, যথেষ্ট ব্যক্তিগত নয়। রূপকের আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে রবীন্দ্রনাথ এখানে নিয়েছেন হাসির আশ্রয়: মনের কথাকে তিনি ঢেকেছেন ঠাট্টার আচ্ছাদনে, গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে সাহস পান নি—বরং, বড় বেশি গভীর করে' বড় বেশি গভীর কথাই বলেছেন, তীক্ষ্ণ ঋজুতায়—যা নিতান্ত মনের কথা তা বলেছেন বাঁকিয়ে নানারকম ছদ্মবেশের আড়াল থেকে। ইংরেজী কবিতা পড়ে' অভ্যস্ত আমাদের মনে এ-ধরণের জিনিষ 'ঠিক প্রেমের কবিতা—love-poetry—বলে' মনে হয় না। প্রেমের কবিতা বল্‌তে আমরা বুঝি অত্যন্ত স্পষ্ট, সহজ, direct উক্তি, পুরুষ তা'র প্রণয়িণীকে সম্বোধন করে', তা'কে নাম ধরে' ডেকে যা বল্‌ছে, বাস্তবিকপক্ষে যা একজনকে শোনাবার জন্যেই লেখা—একেবারে নিরাভরণ,—প্রত্যেকটি শব্দে টিপ্‌ টিপ্‌ করে' হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে। সে-কবিতা অত্যন্ত ব্যক্তিগত, কবির একরকমের আত্ম-চরিত কবির মানসিক জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে যা পড়া যায়। যেমন ধরা যাক্ ডন্‌-এর—

> I wonder, by my troth, what thou and I
> Did, till we loved?

কিম্বা হেরিক্‌-এর—

> Bid me, Julia, and I shall live
> Thy Protestant to be.

কিম্বা ব্যর্ণস্‌-এর

> Had we never loved so kindly,
> Had we never loved so blindly,
> Never kissed and never parted
> We'd never been broken-hearted.

না-হয়—শেলিকেও ধরা যাক্—

I can give not what men call love
But wilt thou accept not
The worship that the heart lifts above
And the heavens reject not?

এবং ব্রাউনিঙ -এর—

Silent silver lights and darks undreamed-of
Where I hush and bless myself in silence.

এ-সব হচ্ছে খাঁটি লিরিকের উদাহরণ—লিরিক্ বল্‌তে সত্যি যা বোঝায়, গানের মত প্রাণ থেকে যা স্বতঃ-উৎসারিত হয়, যা নিতান্ত মনের কথা, আর-একজনের উদ্দেশ্যে একজনের মনের কথা। এম্‌নি নিবিড়-ভাবে ব্যক্তিগত না হ'লে সে-কবিতাকে—রসসৃষ্টির' আদর্শ অনুসারে তা যতই উচ্চাঙ্গের হোক্—ঠিক্ প্রেমের কবিতা বল্‌তে আট্‌কায়। এবং ঠিক এই ধরণের কবিতা রবীন্দ্রনাথের সহস্রাধিক কবিতার মধ্যে যদি কোথাও পাওয়া যায় তো তাঁর শেষ দু'খানা বই 'পূরবী'তে এবং 'মহুয়া'য়।

কবির মনের যৌবন যে শারীরিক জরার আক্রমণকে লঙ্ঘন করে' চিরজীবী হ'তে পারে, তার প্রমাণ একবার দিয়েছিলেন ব্রাউনিঙ্—সত্তর বছর বয়সে Asolando লিখে'—আর-একবার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পূরবী'তে—এবং হয়-তো আরো বেশি 'মহুয়া'য়। Red Cotton, Night Cap Country, Ferishta's Fancies প্রভৃতি অত্যন্ত জটিল দার্শনিক গবেষণা-পূর্ণ, প্রায় দুর্বোধ্য সব কাব্যের পর—হঠাৎ Asolando-র সরল প্রাঞ্জলতা, যৌবনের হৃদয়াবেগ, সেই অন্তিম মিনতি—প্রেমের একেবারে শেষ কথা—'Out of all your life give me but a moment'—কী মুক্তি, কী বিস্ময়। তেম্‌নি, 'নৈবেদ্য'-'বলাকা'র গভীর দার্শনিকতার পর রবীন্দ্রনাথ যখন দিলেন 'পূরবী', বিস্ময়ে আমরা স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। অবিশ্যি 'পূরবী'ও দার্শনিকতার ব্যূহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পায় নি; তাঁর 'তপোভঙ্গ', 'সাবিত্রী', 'মুক্তি',

'অন্ধকার' প্রভৃতি কবিতা 'বলাকা'য় ঢুকিয়ে দিলে আদৌ বেমানান হয় না। কিন্তু এ-সব ছাড়াও অনেক কবিতা আছে, যা একেবারে খাঁটি প্রেমের লিরিকের কোঠায় পড়ে, যা ছদ্মবেশমুক্ত এবং স্বচ্ছন্দ, তীরের মত যা সোজা বুকে এসে লাগে। ঠিক এই জাতের কবিতার সংখ্যা 'পূরবী'-র চাইতে 'মহুয়া'য় বেশি; এবং এইজন্য, 'মহুয়া' মোটের ওপর অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হ'লেও কবির বার্দ্ধক্য-বিজয়ী যৌবনকেও বইয়ে আমরা পরিপূর্ণতর করে' পাই। 'পূরবী'তে যা'র সূচনা, 'মহুয়া'তে তা'রি পরিণতি; 'মহুয়া' লেখা না হ'লে 'পূরবী' অসম্পূর্ণ থেকে যেতো; সুতরাং সমালোচনার ক্ষেত্রে এ-দু'টি বইকে একসঙ্গে ধরা অযুক্তিসঙ্গত নয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে Passion-এর সে-রকম তীব্রতা (যেমন, ধরা যাক্, ডন্ কি ডি, এইচ্ লরেন্স্-এর) কোনোকালেই ছিল না; এবং 'পূরবী'-'মহুয়া'র কবিতা বিশেষ করে' আত্ম-সমাহিত, শান্ত। প্রেমে আর তীব্রতা নেই, মাদকতা নেই, হৃদয়ের পাত্রে মদ্য-ফেনার মত তা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে না; তারা-ভরা অন্ধকার রাত্রির মত তা তপস্যায় স্তব্ধ। মধ্যদিনের খরসূর্য্যালোক, আর 'প্রখর পিপাসা হানি', পুষ্পের শিশির টানি' নেয় না, প্রেম তখন সন্ধ্যার মত স্নিগ্ধ। উদ্দীপনার, উত্তেজনার, উন্মাদনার অবসানে এখন ধ্যানের প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা। এ-প্রেম চেতনা দিয়ে অনুভব করবার বস্তু ততটা নয়, যতটা অবচেতনা দিয়ে উপলব্ধি করবার, ইন্দ্রিয় এখানে আত্মাকে উন্মুক্ত করবার রন্ধ্র-পথ মাত্র।—

> আঁখি চাহে তব মুখপানে,
> তোমারে জেনেও নাহি জানে।
> কিসের নিবিড় ছায়া
> নিয়েছে স্বপন-কায়া
> তোমার মর্ম্মের মাঝখানে। ('মহুয়া')

প্রেম প্রবেশ করতে চায় 'মর্ম্মের মাঝখানে', চায় প্রিয়ার সত্য-তম সত্তাকে আবিষ্কার করতে; এবং প্রেমিক প্রিয়ার কাছে আত্ম-প্রকাশ

কর্‌তে চায় তা'র সাধারণ জীবনের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে নয়, তা'র গভীরতম 'আমিত্বে', যেখানে তা'র বাইরের কোনো পরিচয় নেই, যেখানে শুধু নিজেকে নিয়ে অখণ্ড নিঃসঙ্গতায় সে অবস্থান কর্‌ছে—

যেথা আমি একা
সেথায় নামুক্‌ তব দেখা !
সে মহা নির্জ্জন,
যে-গহনে অন্তর্যামী পাতেন আসন—। ('মহুয়া')

প্রিয়ার অবচেতনার অন্ধকারকে সন্ধান কর্‌তে না পার্‌লে কবির তৃপ্তি নেই—

সেইখানেতেই আমার অভিসার,
যেথায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আছে চেতন বনের
ছায়াতলে—

কারণ, পৃথিবীর পথে চল্‌তে চল্‌তে কবি একদা একজনের দেখা পেয়েছিলেন ; ভেবেছিলেন, তা'কে তাঁর জীবনের সঙ্গিনী হ'তে বলেন ; কিন্তু সে তো সঙ্গিনী নয়, সে তপস্বিনী—

দেখেছিলেম, সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে
তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের
অন্ধকারের গভীর তলে। ('পূরবী')

গভীরতম ব্যক্তিত্বের সঙ্গে গভীরতম ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ, একজনের নির্জ্জনতার সঙ্গে আর-একজনের নির্জ্জনতার মিলন—লাখ-লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখ্‌লেও যা ঘটে না—তা-ই এই প্রেমের লক্ষ্য, তা'র কম কিছু নয়।

এ-সব কবিতায় আগাগোড়া একটি সুর বেজেছে—বিনয়ের। বিনয়—যার মানে দীনতা নয়, যাজ্ঞার আত্ম-অবমাননা নয় ; বিনয়—যৌবনোচ্ছ্বাসের স্ফীত দম্ভ আকাঙ্ক্ষার উদ্ধত ফণা যা'র কাছে এসে লজ্জায় আনত হ'য়ে পড়ে ; অনেক দুঃখ পেয়ে, অনেক ঘা খেয়ে, ভালোবাসার পাত্রকে চিরকালের মত হারিয়ে সেই বিরহকে অমৃতে পরিণত কর্‌তে

পার্‌লে তবে যা লাভ করা যায়। বিনয়—যা বাইরের ঐশ্বর্য্য দিয়ে প্রেমকে লজ্জিত করে না, সম্ভোগের কারাগারে তা'কে বন্দী ক'রে রাখে না, অধিকারিত্বের দাবীতে তা'কে সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে না। Ring and the Book-এর অপূর্ব্ব উৎসর্গে পরিচয় পাই এই বিনয়ের; Asolando-র 'Humility' কবিতায় ব্রাউনিঙ বল্‌ছেন—মেয়েটি এক ঝুড়ি ফুল নিয়ে যেতে যেতে একটি গুচ্ছ পথে ফেলে দিয়ে গেলো; সেই গুচ্ছটি আমি তুলে' নিলাম—কে জানে?—হয়তো তা সবচেয়ে তুচ্ছ নয়। রবীন্দ্রনাথও এর বেশি কিছু আশা করেন না :—

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাবো, প্রিয়ে,
সমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হ'বে না তো আর
ফেলে দিয়ো ভোরে গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী॥ ('পূরবী')

পাছে তাঁর প্রেম প্রিয়াকে ব্যথা দেয়, প্রেমের মূল্য নিতে গিয়ে পাছে তিনি তা'র যথাযোগ্য প্রতিদান দিতে না পারেন, সেই আশঙ্কায় হৃদয় তাঁর ব্যাকুল, সেই ভয়ে প্রিয়ার কাছে প্রেম-নিবেদন কর্‌তে তিনি সাহস পান না—

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘব তরে
চাপাই বোঝা তোমার 'পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কইনে খুলে;—('পূরবী')

প্রকৃত পৌরুষের চিহ্ন এই বিনয়—যে পৌরুষ কখনো জোর করে না, কখনো কেড়ে নিতে চায় না; পথ ছেড়ে দিতে যা সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

'শ্লথপ্রাণ দুর্ব্বলের স্পর্দ্ধা আমি কভু সহিবো না'—এ-কথা রবীন্দ্রনাথের মুখেই সাজে ; কারণ, অন্তরের দুর্ব্বলতা যা'রা বাইরের আড়ম্বর দিয়ে, আসুরিক শক্তির আস্ফালন দিয়ে ঢাক্‌তে চায়, রবীন্দ্রনাথ কখনো তা'দের একজন ছিলেন না। আজকালকার দিনের ফ্যাশ্‌নেবে্‌ল্‌ drawing-room cave-man-কে তিনি নিতান্ত উপহাসের বস্তু বলেই জানেন, আবার দু'জনে মিলে' mutual admiration society তৈরি করে' পৃথিবীর সব দায়িত্ব আর সংঘাত এড়িয়ে যাওয়াকে তিনি প্রেমের যোগ্য সার্থকতা মনে করেন না। প্রেম মহান প্রবুদ্ধকারী শক্তি—

> বিবশ দিন, বিরস কাজ,
> কে কোথা ছিনু দোঁহে,
> এসেছো প্রেম, এসেছো আজ
> কী মহা সমারোহে। ('মহুয়া')

এবং প্রেম যখন এলোই, তখন তাকে নিয়ে শান্তির নীড় রচনা করে' পৃথিবী-পলাতক হ'তে কবি চাইলেন না ; মুক্তকণ্ঠে আনন্দে তিনি বলে' উঠ্‌লেন—

> আমরা দু'জন স্বর্গ-খেলনা
> গড়িব না ধরণীতে,
> মুগ্ধ ললিত অশ্রু-গলিত গীতে।
> পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
> বাসর-রাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে ;
> ভাগ্যের পায়ে দুর্ব্বল প্রাণে
> ভিক্ষা না যেন যাচি।
> কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
> তুমি আছ, আমি আছি। ('মহুয়া')

পৃথিবীর হাতে দুঃখ পেয়ে প্রিয়ার কাছে আস্‌ব সান্ত্বনার জন্যে ; সাংসারিক দুর্য্যোগ থেকে সে হ'বে মনের আশ্রয় ; সমস্ত কাজ, কোলাহল, বাস্তবের নির্ম্মমতা থেকে সে হ'বে মধুর অবসর—প্রেম সম্বন্ধে এই-রকম ধারণাই সাধারণত' কবিতায় পাওয়া যায়। এই মনোভাব পুরুষের বহুযুগের অন্ধ কর্ত্তৃত্বভোগের ফল। এ-কথা সরল গদ্যে বল্‌লে এই-রকম দাঁড়ায়—

সারাদিন আপিসে খেটে-খুটে বাড়ি ফিরে' যেন দেখ্‌তে পাই, তুমি সেজে-গুজে, গন্ধ মেখে, থালা-ভরা লুচি সাজিয়ে বসে' আছো; কমিটির মিটিং-এ হেরে গিয়ে যেদিন মন-খারাপ হ'ল, সেদিনো তুমি যেন থাকো আমাকে বাহবা দিতে; যেদিন কোনো নির্ব্বোধ আচরণের জন্য সবাই আমাকে উপহাস কর্‌ছে, সেদিনো তুমি আমাকে admire কর্‌বে। যে-পুরুষ নারীকে তা'র দায়িত্বের, তা'র দুঃখের, তা'র অপমানের সমান অংশ দিতে চায় না, তা'কে শুধু ভালোবাসা খেলার পুতুল সাজিয়ে রাখ্‌তে চায়, সে দুর্ব্বল, সে কাপুরুষ; তা'রি বিরুদ্ধে আধুনিক নারীর বিদ্রোহ। এই ছেলে-ভুলোনো বিলাসিতার ওপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমের ভিত্তি-স্থাপন কর্‌তে পরাঙ্মুখ; তিনি চান্, দু'জনে মিলে' পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াতে, সব দুঃখ একসঙ্গে মাথা পেতে নিতে, সব দায়িত্ব একত্র বহন কর্‌তে। প্রিয়াকে এ-কথা বল্‌বার পরম সাহস তাঁর আছে।—

> সেবা-কক্ষে করি না আহ্বান ;—
> শুনাও তাহারি জয়গান
> যে-বীর্য্য বাহিরে ব্যর্থ, যে-ঐশ্বর্য্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
> চাটুলুব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্ম্মম লাঞ্ছিত। ('মহুয়া')

প্রেম পরম প্রবুদ্ধকারী শক্তি—তা'র সাহায্যে তিনি চান মিথ্যার কুজ্ঝটিকা দীর্ণ কর্‌তে, সত্যকে জান্‌তে—

> হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
> কুজ্ঝটিকা চিরসত্য নয়।
> চিত্তেরে তুলুক ঊর্দ্ধে মহত্ত্বের পানে
> উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
> হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
> অবসাদ হ'তে লহো জিনি',—
> স্পর্দ্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক্ সিংহনাদ,
> হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ। ('মহুয়া')

'ক্লেদঘন চাটুবাক্যে' এ-প্রেম লাভ করা যায় না—তা দুঃসাধ্য, তা দুর্লভ।—

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে কানে মৃদু কণ্ঠে নয়।
ক'রে নেবো জয়
সংশয়-কুণ্ঠিত তোর বাণী ;
দৃপ্ত বলে লবো টানি'
শঙ্কা হ'তে, লজ্জা হ'তে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব হ'তে
নির্দ্দয় আলোতে। ('মহুয়া')

যে-সাহসে, যে-শক্তিতে তিনি এ-কথা বল্‌তে পেরেছেন, তা'রি ওপর নির্ভর করে' প্রিয়ার বিমুখতায় তিনি নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েন না ; ব্রাউনিঙ্-য়ের কবিতার প্রেমিকদের মত তাঁর অগাধ আত্মবিশ্বাস। তিনি জানেন, এ-বিমুখতা ক্ষণিক :—

ফিরালে মোরে মুখ !
এ শুধু মোর ভাগ্য করে ক্ষণিক কৌতুক !
তোমার প্রেমে আমার অধিকার
অতীত যুগ হ'তে সে জেনো লিখন বিধাতার। ('মহুয়া')

এই সুদৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস আছে বলে' প্রেমের আয়ু তিনি জোর করে' বাড়াতে চান না ; অসংখ্য দাবী-দাওয়ায়, অনুযোগে-অভিযোগে প্রেমকে তিনি বাঁধ্‌তে চান্ না ; তাঁর প্রেম মুক্ত, স্বচ্ছন্দবিহারী, নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রেম যখন মর্‌বে, তখন তিনি তা'কে অনায়াসে ছেড়ে দেবেন, তখনো তা'কে ধরে' রাখ্‌বার ব্যর্থ এবং হাস্যকর চেষ্টা তিনি কর্‌বেন না। তাই এক কথাতেই তিনি দায়-মোচন করে' দিয়েছেন।—

চিরকাল র'বে মোর প্রেমের কাঙাল
এ-কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হোক্ সেই চিরকাল ;
তারপর যদি তুমি ভোলো
মনে করাবো না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা র'বে দ্বার,
যাবার সময় হ'লে যেয়ো সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো। ('মহুয়া')

সেই 'ক্ষণিকা'র কথাই আবার নতুন করে' বলা—কিন্তু 'ক্ষণিকা'র চেয়ে কত বেশি প্রগাঢ়! এ-সব কবিতায় এমন একটি গভীর বিষাদ আছে, যা সস্তা কারুণ্য নয়, যা সত্যিকারের ট্র্যাজিডির সুর—যে-সুর 'পূরবী'র আগে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কখনো বাজে নি। 'এই ক্ষণটুকু হোক্ সেই চিরকাল'—ব্রাউনিঙ্-য়ের 'The instant made eternity!' শুধু এ-পংক্তিই নয়, 'মহুয়া'র অনেক কবিতাই ব্রাউনিঙ-য়ের তেজস্বী পৌরুষকে মনে করিয়ে দেয়।

'পূরবী'র একগুচ্ছ কবিতা আছে, যা এ-পর্য্যন্ত এ-আলোচনার বহির্ভূত হ'য়ে এসেছে; কিন্তু যা'র কথা না বল্‌লে প্রবন্ধ অসমাপ্ত থেকে যায়। সেই কবিতাগুচ্ছের সঙ্গে এ-কবিতাগুলোকে এক পর্য্যায়ে ফেলা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। সে-কবিতাগুলো সংখ্যায় খুব কম, এবং ভাবে ও সুরে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিভিন্ন এই কারণে যে, যে-নারীর উদ্দেশ্যে তা'রা রচিত, সে মৃত। মৃতা, অর্দ্ধ-বিস্মৃতা প্রিয়াকে উদ্দিষ্ট তিন-চারটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের গৌরব, আমাদের গৌরব, বাঙ্‌লা সাহিত্যের গৌরব, পৃথিবীর যে-কোনো সাহিত্যের গৌরব হ'তে পার্‌তো। ব্রাউনিঙ্ *Ring and the Book* আরম্ভ কর্‌বার আগে তাঁর মৃতা প্রিয়ার উদ্দেশে যে-স্তব রচনা করেছিলেন, শুধু তা'র সঙ্গেই এ-সব কবিতার তুলনা হয়। শীতের হাওয়া কবির মনের কথা এলোমেলো ক'রে দিয়ে তা'কে টেনে নিয়ে চল্‌লো সেখানে,

> যেথায় ভূমিতলে
>   একলা তুমি, প্রিয়ে,
> ব'সে আছো আপন মনে
>   আঁচল মাথায় দিয়ে।

যে দেখা দিয়েছিলো বলে' প্রথম 'গানের ফসল মোর এ-জীবনে উঠেছিলো ফলে',' কবির শেষ বসন্তের ফসলও তিনি তা'রি কাছে ফিরিয়ে দেবেন—

> তোমার চরণ-মূলে
>   যেথায় তুমি, প্রিয়ে,

একলা ব'সে আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে।

বহুবর্ষ পর বিস্মৃতির কুয়াশা পার হ'য়ে তাঁর প্রথম প্রেম তাঁর কাছে ফিরে' এসেছে, 'বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের আলোতে' তিনি তা'কে চিন্‌লেন। সেই প্রেম একদিন এসেছিলো—

তাই আমি আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা করি,—
যত দুঃখে যত শোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি'
সব ভুলে' গিয়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে গভীর বিষাদের সুর বেজে ওঠে—

আজ তুমি নাই আর, দূর হ'তে গেছো তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দূরে,
সঙ্গীহীন এ-জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন—

তবু একবার যে পেয়েছিলেন, সে-আনন্দ, সে-গৌরব তাঁর অক্ষুণ্ণ—

সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।

তাই ভাগ্যকে অবজ্ঞা করে' দৃপ্তস্বরে তিনি বল্‌তে পারেন—

তবু শূন্য শূন্য নয়—

কেননা

ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে-গগন,
একা-একা সে-অগ্নিতে
দীপ্ত গীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

জয়ন্তী

—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তরে মাধুরী-লক্ষ্মী, কণ্ঠে তব মহাসরস্বতী,
ধূলির আসনে বসি' গায়িতেছ ভূমার আরতি ;
সোনার বাঁশীতে বাজে সুন্দরের জয়ধ্বনি-গান,
রচিয়াছ রসমূর্ত্তি, মহিমার পেয়েছ সন্ধান !

ললাট প্রদীপ্ত তব কি অপূর্ব্ব জ্যোতির তিলকে,
কি রহস্য প্রতিভাত 'আলোকের অতীত' আলোকে !
বাণীর বাহিনী তব বসুন্ধরা করে প্রদক্ষিণ,
উজ্জীবন-মন্ত্র সুরে ঝঙ্কারিছ কি উদাত্ত বীণ !

চিরন্তন সত্য শিব,—সেই কাব্য, অমৃত-প্রাশন,
উপহার-ডালি ভরি' নানা দেশে কর' বিতরণ,
নানা ভাষে বিকশিত তোমার মানস-পদ্মমালা—
কেশরে পরাগে তা'র স্বর্গের কুসুমরেণু ঢালা !

যেই অবিনাশী প্রাণ তরু-তৃণে, মাটিতে-আকাশে
আনন্দের আলিম্পনে ঋতুর উৎসবে ফিরে আসে,
অ-সীম অ-পরিমাণ সেই প্রাণ—তা'রি স্পর্শ লভি'
ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে উদিয়াছ তুমি মহাকবি !

রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষাগুরু

—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখ্‌তে আমার সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবেরা আমাকে বহুবার অনুরোধ করেছেন, সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসে যে, গদ্যলেখকেরাই গদ্যসাহিত্যের মর্ম্ম উদ্ধার কর্‌তে পারেন, আর পদ্যলেখকেরা কবিতার। এ বিশ্বাস সম্ভবতঃ অমূলক। কাব্যের সমালোচনার অর্থ কবিত্ব করা নয়; এবং গদ্য-সাহিত্যের সমালোচনার অর্থ নিজের অনুদার সাংসারিক মনের পরিচয় দেওয়াও নয়। যদি তাই হ'ত, তাহ'লেও কারও পক্ষে এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যের সম্যক পরিচয় দেওয়াও একেবারে অসম্ভব হ'ত। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্য এত বিপুল ও বিচিত্র যে, সংক্ষেপে তা'র পরিচয় দেবার চেষ্টা করা অসাধ্য-সাধন কর্‌বার বৃথা চেষ্টা মাত্র। আজকে যে আমি উক্ত সাহিত্যের একাংশের পরিচয় দিতে উদ্যত হয়েছি, তার কারণ আজকের সভা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচারালয় নয়। আজ এক্ষেত্রে আমরা সমবেত হয়েছি বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের প্রতি আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্‌তে; সমগ্র বাঙালী জাতি যে তাঁর কাছে কত বিষয়ে চিরঋণী তাই স্বজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিতে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী জাতিকে বলেছিলেন যে—

"কোন দিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে, কোন দিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

"এরূপ হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল, সে-কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্ব্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

"ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া আমরা জানি না। কি রাজনীতি,

কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই, রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই।"

(আধুনিক সাহিত্য, পৃঃ ৩)

পূর্ব্বোক্ত কথা ক'টি সম্পূর্ণ সত্য। সেকালের চাইতে একালে আমরা রামমোহন রায়ের বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে কিঞ্চিৎ বেশি পরিচিত; কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে রামমোহন ইতিহাসের বহির্ভূত হ'য়ে কিম্বদন্তির দেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বর্ত্তমান যুগে যে-সকল মহাপুরুষ বাঙালী জাতির মন গ'ড়ে তুলেছেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তাদের স্মরণ "করিতেই হইবে।" কারণ এরূপ স্মরণ করায় আমরাই কৃতার্থ হই। ইংরাজ কবি Wordsworth বলেছেন যে, "By admiration we live," আর যা মহৎ তা'কে admire করতে পারা আত্মোন্নতির একটি প্রধান উপায়।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার আর-একটি মহাপুরুষের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এ সব কথা আমাদের বলেছিলেন, তাঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র। রামমোহন রায় যেমন বাংলার নব-জীবনের প্রবর্ত্তক, বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি বাঙলার নব-যুগের নব-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, "বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যেদিন নব-যৌবন-প্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেইদিনের সর্ব্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ-উৎসব আমাদের মনে আছে।" (আধুনিক সাহিত্য, পৃঃ ৬)। অবশ্য আমার মনে নেই। কারণ, বঙ্গদর্শন যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন আমি নিতান্ত বালক। তখন মন ব'লে আমার কোন পদার্থই ছিল না, সুতরাং সেকালে যদি কোন বিষয়ে বিশেষ আনন্দ পেয়ে থাকি সে বঙ্গ-সাহিত্যের মুক্তিতে নয়, খেলাধুলোয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-গগনে উদয়ে কি কারণে কিশোর রবীন্দ্রনাথের মন আনন্দে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছিল সে-কথাও তাঁর মুখেই শোনা যাক্। তাঁর কথা এই—

"আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্ব্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

"কিন্তু এ-মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য। যখন বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন, একটি নূতন প্রভাতের মত আমাদের বঙ্গদেশে

উদিত হইয়াছিল, তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? য়ুরোপের দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোনো নূতন তত্ত্ব, নূতন আবিষ্কার, বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে, বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজী শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল—বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ-সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল।"

(শিক্ষার হেরফের, পৃঃ ১৩)

এ কথা রবীন্দ্রনাথ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বলেছিলেন। আর রবীন্দ্র-সাহিত্য আজ চল্লিশ বৎসর ধ'রে বাঙালীর শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য সাধন, প্রাণের সঙ্গে ভাবের আনন্দ-সম্মিলন সংঘটন ক'রে আস্ছে।

এ সাধনার দু'টি দিক্ আছে। তা'র একটি দিক্ হচ্ছে নব-রসসাহিত্য সৃষ্টি করা, আর-একটি দিক্ হচ্ছে নানা বিষয়ে মানুষকে উদ্বোধিত করা। তাই বঙ্কিমচন্দ্র শুধু উপন্যাস লেখেন নি, প্রবন্ধও লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথও শুধু কাব্য ও উপন্যাস লিখে ক্ষান্ত হন নি, নানা বিষয়ে তাঁর মতামত প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেছেন। এঁরা উভয়েই স্বজাতিকে আনন্দ ও শিক্ষা দুই-ই সমান দান করেছেন। বলা বাহুল্য, আমরা যাকে প্রবন্ধ বলি তা ইংরাজী Essay শব্দের প্রতিবাক্য মাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে Essay নেই, য়ুরোপীয় সাহিত্যেও ছিল না; Renaissance-এর সময়ে এ-সাহিত্য জন্মলাভ করে। ইউরোপীয় সাহিত্যেও Essay বল্‌তে কি বোঝায় সে-সম্বন্ধে নানামত আছে, কারণ Essay বহুরূপী। আর ইংরাজী অভিধানেও কথাটির অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। Johnson-এর Dictionary-তে Essay-র অর্থ—a loose sally of the mind-এ ব্যাখ্যা কি ঈষৎ অবজ্ঞাসূচক নয়? সে যাই হোক্, Essay বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। জনৈক খ্যাতনামা ইংরাজ লেখক বলেছেন যে, য়ুরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায়—প্রথমে ছিল কবিতা, তা'র পর এল treatise, তার পর আবির্ভূত হ'ল essay; that characte-

istic literary type of one of our time, a time so rich and various in special apprehensions of truth. (Walter Pater—Plato and Plato'ism.) এ কথা যদি সত্য হয়, এবং আমার বিশ্বাস মূলতঃ সত্য, তাহ'লে প্রবন্ধ যে নবযুগের বঙ্গসাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ হবে সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ-সাহিত্যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছেন, তা'র কারণ তাঁদের মন was so rich and various in special apprehensions of truth. প্রবন্ধ-সাহিত্যের বৈচিত্র্যই তা'র বিশিষ্টতা এবং রবীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রবন্ধাবলীকে, বিচিত্র প্রবন্ধ বলা যায়। এই প্রবন্ধাবলী বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও ভাবের ঐশ্বর্য্যে বাঙ্‌লা সাহিত্যে অতুলনীয়। এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রসাদে বাঙালী জাতির মনে নানা দিকে, চিন্তা ও ভাবের নানা উৎস খুলে গিয়েছে। কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যার উপর নূতন আলোকপাত করে নি। এ ক্ষেত্রে আমি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে যে-সব মতামত প্রকাশ করেছেন, তারই দু' একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কারণ, এ যুগে শিক্ষা ও সাহিত্যের যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ।

আমার বক্তব্য কথা পরিষ্কার করতে রবীন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত একখানি পুস্তকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। আজ পর্য্যন্ত স্বজাতির শিক্ষার কথাটা তাঁর মনের উপর কি রকম প্রভুত্ব করছে এই গ্রন্থে তা'র পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত "রাশিয়ার চিঠি" প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষার অভাব ও ত্রুটির জন্য আক্ষেপ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখ্‌বার জন্য"। আর এই কথা তিনি একখানি চিঠিতে নয় বহু চিঠিতে বলেছেন এবং একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই যে, আজকের দিনে রাশিয়ায় যাওয়া সার্থক, বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক Dewey-র তাই মত। তিনি বলেছেন যে—

One can appreciate the inner meaning of the New Russian Life more intimately and justly by contact with

educational effort than with specific political and economic conditions.

(Impression of Soviet Russia)

য়ুরোপ ও আমেরিকার যে-সব খ্যাতনামা লেখক, নব-রাশিয়া চোখে দেখে সে-দেশ সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতা পাঁচজনের কাছে প্রকাশ করেছেন—তাঁরা সে-দেশে গিয়েছিলেন অন্য উদ্দেশ্যে। Karl Marx-এর Das-Kapital মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে কিরূপ ধারণ করেছে, দেবতার না অপদেবতার, তারি সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করা ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য, এবং তাঁরা নিজের নিজের শিক্ষা দীক্ষা রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে, communism সম্বন্ধে কেউ আস্তিক; কেউ বা নাস্তিক হ'য়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। Karl Marx গড়েছিলেন Theory, Lenin করেছেন তা'র Experiment ; সুতরাং সে প্রাচীন Theory-র সঙ্গে যাঁদের সম্যক পরিচয় ছিল, তাঁরা এই বিরাট Experiment-এর ফলাফল চোখে দেখ্‌বার লোভ সম্বরণ কর্‌তে পারেন নি। নব-রাশিয়ায় নব শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে তাঁরা অনেকেই অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন, আর তা'র দোষগুণও বিচার করেছেন, কিন্তু তা শুধু প্রসঙ্গত' মাত্র। কারণ সর্ব্বজনীন লোক-শিক্ষা তাঁদের দেশেও আছে। রবীন্দ্রনাথ হতভাগ্য ভারতবর্ষের লোক, তিনি বল্লেছেন "ঐ দেশের আবহাওয়াতেই আমিও ত মানুষ, সেইজন্যেই জোরের সঙ্গে মনে করতে' সাহস হয় নি যে, বহু কোটি জনসাধারণের বুকের উপর অপেক্ষাও অসামর্থ্যের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব। ফলে, রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়েছেন। কারণ—"আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে গিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত হয়েছে।" এতে ভারতবাসী মাত্রেই চমৎকৃত হবে। কারণ শিক্ষা সম্বন্ধে জারের রাশিয়ার লোকের অবস্থা আমাদেরই অনুরূপ ছিল। এবং রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্ব্বে বলেছিলেন যে,

"এই সব মূঢ় ম্লান মুখে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে ভাষা।
এই সব ভগ্ন শুষ্ক বুকে জাগায়ে তুলিতে হবে আশা॥"

কিন্তু আমরা কি উপায়ে তা করতে হবে তার সন্ধান করিও নি পাইও নি।

ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোক আজও মূঢ় ম্লান ভগ্নোদ্যম ও আশাহীন, তাই নব-রাশিয়ায় মনের এ মুক্তি তাঁর কাছে miracle স্বরূপে প্রতিভাত হয়েছে। আমাদের শিক্ষা বিষয়ক দৈন্যের তুলনায় বোলশোভিক্ রাশিয়ার লোকশিক্ষার ব্যবস্থা তাঁর নয়ন-মনকে মুগ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই দেশের লোককে ব'লে এসেছেন যে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হচ্ছে শিক্ষার সমস্যা আর কি উপায়ে এ সমস্যার সমাধান করা যায় তারও বিচার করেছেন। শিক্ষাই যে জনগণের অভ্যুদয়ের প্রধান সহায়, এ জ্ঞান তিনি রাশিয়ায় গিয়ে লাভ করেন নি, তাই তিনি বলেছেন যে, "গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি 'এতকাল যা ভেবেছি এখানে তা'র বেশি কিছু নেই, কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আছে কার্য্যকর্ত্তাদের ব্যবস্থা-বুদ্ধি"। এক কথায়, শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা রাশিয়ায় দেহলাভ করেছে, ভারতবর্ষে করে নি। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' ভারতবর্ষের শিক্ষার অভাবে এবং ত্রুটির জন্য আক্ষেপ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ যে চিরদিন ধ'রে দেশবাসীর শিক্ষার কথা ভেবেছেন, তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধের অন্তরে।

এ দেশের অধিকাংশ লোক যে নিরক্ষর এ-কথা সকলেই জানেন। ভাষার বর্ণ-পরিচয় হ'লেই যে লোক শিক্ষিত হয়, তা অবশ্য নয়। কিন্তু বর্ণ-পরিচয়ের অভাবে এ যুগে যে কেউ কোনও-রূপ শিক্ষা লাভ করতে পারে না—সে-কথাও নিঃসন্দেহ। একের সঙ্গে অপরের মনের যোগা-যোগের প্রশস্ত পথ হচ্ছে লেখাপড়ার পথ। সুতরাং যে দেশে স্বল্পসংখ্যক লোক শিক্ষিত ও অসংখ্য লোক নিরক্ষর সে-দেশে, এই দুই শ্রেণীর ভিতর ব্রাহ্মণশূদ্রের প্রভেদ সৃষ্ট হয়। ফলে, সমাজের অধিকাংশ লোককে মনো-রাজ্যে-অস্পৃশ্য ক'রে রাখায়, সমাজের উভয় শ্রেণীই পঙ্গু হ'য়ে পড়ে—, বিশেষতঃ সেই দেশে যে-দেশে শিক্ষিত সমাজ বিদেশী শাস্ত্রে শিক্ষিত আর জনগণ সর্ব্বশাস্ত্রে সমান অশিক্ষিত?

দেশের অনেকেই কিছুদিন ধ'রে mass education-এর জন্য লালায়িত হয়েছেন, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তাঁরা জনগণকে শিক্ষা দিতে চান তা খুব স্পষ্ট নয়; সম্ভবতঃ mass তাঁদের লেখা খবরের কাগজ প'ড়ে তাঁদের মতাবলম্বী

হবে এই আশায় ; আর কেউ বা একমাত্র বিলেতিসভ্যতার নকল হিসাবে। বিলাত দেশটা, ধনে ও বলে সমৃদ্ধ দেশ, অতএব সে-দেশে যখন লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তখন এদেশেও উক্তরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা কর্‌তে পার্‌লে আমরা ধন ও বল লাভ করব এই লোভে তাঁরা লোক-শিক্ষার পক্ষপাতী হ'য়ে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ideal কিন্তু স্বতন্ত্র। তাঁর মতে মানুষকে মানুষ ক'রে তোলাতেই শিক্ষার সার্থকতা। আর এ সত্য তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ কথা —"ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা কিছু হইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে ও দরিদ্রের ছেলে কোনও প্রভেদ লইয়া আসে না।" যিনি এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করেন নি তাঁর মুখে লোকশিক্ষার কথা একটা বুলি মাত্র। কারণ mass-এর সঙ্গে আমাদের মত bourgeois সম্প্রদায়ের প্রধান প্রভেদ ধনের প্রভেদ। মূলতঃ আমরা সকলেই মানুষ। সুতরাং মানুষকে মানুষ ক'রে তোলাই যখন শিক্ষার উদ্দেশ্য তখন শিক্ষা লাভে সকলের সমান অধিকার আছে। রাশিয়ার যে-শ্রেণীর লোক আজ সমগ্র জাতির হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হ'য়ে উঠেছেন, তাঁরা যে লোকসমাজকে মানুষ ক'রে তোল্‌বার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এতেই রবীন্দ্রনাথ চমৎকৃত হয়েছেন, কারণ তা করা সে-কোন দেশে, অন্ততঃ আমাদের দেশে, সম্ভব তা রবীন্দ্রনাথ কখন কল্পনাও করেন নি। আমাদের মনে নানারূপ সংকল্প জন্মলাভ কর্‌তে পারে, কিন্তু সে-সব সংকল্প কার্য্যে পরিণত কর্‌বার সামর্থ আমাদের নেই। "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ", আর আমরা জাতি-হিসাবে ধনে ও প্রাণে সমান দরিদ্র। আমি অবশ্য সে-জাতের লোক নই যাঁরা মনে করেন যে, অবস্থার দোষে যে ideal-কে হয়ত কার্য্যে পরিণত করা না যায় সে ideal-এর কোনও মূল্য নেই। একটা বড় ideal-কে জীবনে ভাঙিয়ে নিতে না পার্‌লেও, আমাদের মনের উপরে তার প্রভাব প্রবল। আমরা যাকে শিক্ষা বলি, তার একটা উদ্দেশ্য কতকগুলি ideal-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, যাতে ক'রে আমাদের মনের শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে আমরা তাদের অনুসরণ কর্‌তে পারি। রবীন্দ্রনাথ লোক-শিক্ষায় যে ideal গড়েছেন, তা কোন সম্প্রদায় বিশেষের ideal নয়—

সমগ্র মানব-সমাজের ideal এবং তিনি মনে করেন বর্ত্তমান রাশিয়া সে ideal-কে সার্থক করেছে—এতেই তাঁর আনন্দ। এর থেকে আমরা আশা করতে পারি যে, আজ না হোক্ কাল ভারতবর্ষেও এ শিক্ষার ideal-কে real করতে পারব, যদি চ আমি জানি এ-দেশে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা আমাদের পক্ষে কত কঠিন। কারণ, আমরা যুগ-যুগ ধ'রে লক্ষ লক্ষ লোককে জীবনে অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছি তার পর বিদেশী শিক্ষার প্রসাদে এ যুগে কোটি কোটি লোককে মনের অস্পৃশ্য ক'রে ফেলেছি। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, রাশিয়ার চিঠি প্রকারান্তরে স্বদেশের শিক্ষার অভাব ও ত্রুটির জন্য আক্ষেপ। এ অভাব হচ্ছে লোক-শিক্ষার অভাব, আর এ ত্রুটি হচ্ছে আমাদের বর্ত্তমান সরকারী শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি।

প্রাক্-বোলশেভিক যুগে রাশিয়ার উচ্চশিক্ষার পদ্ধতি যে কি ছিল, তা আমরা ঠিক জানিনে। তবে এইমাত্র জানি যে, Czarist যুগেও রাশিয়ায় বহু উঁচুদরের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকের সাক্ষাৎ আমরা পাই যাঁদের নাম আজ জগৎ-বিখ্যাত। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, সে-দেশে পূর্ব্বযুগের শিক্ষাপদ্ধতি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল না। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে কেউ বড় বৈজ্ঞানিক হ'তে পারে না। আর বড় সাহিত্যিকও শিক্ষিত সমাজের অন্তরেই আবির্ভূত হয়। রাশিয়ার পূর্ব্ব শিক্ষার আর যাই দোষ থাক্ বিদেশী ভাষা সে-শিক্ষার বাহন ছিল না।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে কলেজি শিক্ষার প্রসাদে যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে, সে শ্রেণীর শিক্ষিত মন যে পক্ক-কষায় নয় তা সকলেই জানেন। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্ব্বে বলেছেন যে—"এরূপ শিক্ষা-প্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পায় না, সে-কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।" রবীন্দ্রনাথের এ-কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। আমাদের শিক্ষিতাভিমানী সমাজের কাছে, এ-কথাটা অপ্রিয় হ'লেও সম্পূর্ণ সত্য। যে-বিদ্যা আমরা স্কুল-কলেজে অর্জ্জন করি সে-বিদ্যা বেশির ভাগই মুখস্থ বিদ্যা। আমাদের জাতের যে বুদ্ধি কম, এ-কথা আমরা মনে করি নে, রবীন্দ্রনাথও যে করেন না, তা তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেছেন। বাঙালী জাতির মন যে বিদেশী বিদ্যার চাপে পঙ্গু

হ'য়ে পড়্‌ছে, মনোজগতে আমরা যে আজও পরভাগ্যোপজীবী, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর নেই। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে, ইংরাজী আমাদের শিক্ষার বাহন আর প্রধান অভাব হচ্ছে শিক্ষার মিলন।

প্রথমেই শিক্ষার মিলন অর্থে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝেন দেখা যাক্। তিনি বলেছেন যে, আমাদের দেশের বিদ্যা-নিকেতনকে পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন-নিকেতন ক'রে তুল্‌তে হবে। অর্থাৎ "যে বিদ্যার জোরে পশ্চিম বিশ্বজয় করেছে" সেই বিদ্যা আমাদের আয়ত্ত কর্‌তে। এ বিদ্যার নাম বিজ্ঞান। আর এ বিদ্যা যে পশ্চিমের লোকই আবিষ্কার করেছে ও আয়ত্ত করেছে এ-কথা সজ্ঞানে অস্বীকার করা চলে না। কারণ যারা অস্বীকার করে "বাইরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মর্‌চে, তারা আর কর্ত্তৃত্ব পেলে না।" জড়-জগতের উপর যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব লাভ করা বিজ্ঞান-শিক্ষা-সাপেক্ষ। বাইরের বিশ্বের উপর প্রভুত্ব লাভ কর্‌তে হ'লে আমাদের পক্ষে বিজ্ঞানের জ্ঞান-মার্গ ও কর্ম্ম-মার্গ উভয় মার্গই সাধনা কর্‌তে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে যে-ভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে আমরা সুধু ও শাস্ত্রের কতকগুলি সূত্র কণ্ঠস্থ করি মাত্র। তার ফলে বাইরের উপর আমাদের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব জন্মায় না।

অপর পক্ষে পূর্ব্ব মহাদেশ অন্তরাত্মার যে-সাধনা করেছে সেই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মতে অমৃতের অধিকার লাভ কর্‌বার উপায়। অতএব পূর্ব্ব-পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তা হ'লে উভয়েই ব্যর্থ হবে। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন-মন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। সে মন্ত্র হচ্ছে—

"অবিদ্যায়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যায়া মৃতমশ্নুতে"

ভারতবর্ষে নব-শিক্ষার এই হচ্ছে যথার্থ ideal, কারণ আমরা পশ্চিমের নব-বিদ্যাকেও প্রত্যাখ্যান করতে পারিনে,—ভারতবর্ষের সনাতন বিদ্যাকেও উপেক্ষা কর্‌তে পারিনে। রামমোহন রায়েরও শিক্ষার আদর্শ ঐ একই।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার গোড়ায় গলদ হচ্ছে, এ শিক্ষার বাহন ইংরাজী-ভাষা—আমাদের মাতৃভাষা নয়। এ শিক্ষার ফলে আমাদের শিক্ষিত সমাজ

যে-বিদ্যা অর্জ্জন করেন সে-বিদ্যা সুধু পুরোপুরি আমাদের মনে বসে না। এবং দেশের শিক্ষিত মন যে ফলে অপরিণত অবস্থাতেই থেকে যায় তাতে আর আশ্চর্য্য কি। রবীন্দ্রনাথ কলম ধ'রে অবধি এই সহজ সত্যটির প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি এ যাবৎ শিক্ষা সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ লিখেছেন তার প্রতিটিতেই এ কথার পুনরুক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত লোক সে-কথায় বড় একটা কান দেয় নি এবং বহু শিক্ষাভিমানী লোকে কথাটিকে কবিত্ব ব'লে হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। যাঁরা মনে করেন য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রাণপণে নকল করতে পারলেই আমাদের মোক্ষ লাভ হবে, তাঁদেরও এ সত্যটি চোখ এড়িয়ে গিয়েছে যে, য়ুরোপে এমন কোনও দেশ নেই যেখানে শিক্ষার বাহন স্বদেশী ভাষা নয়। এর কারণ শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। যে শিক্ষা-প্রণালীতে সকলেই অভ্যস্ত তার আমূল পরিবর্ত্তন করাটাকে তাঁরা শিক্ষাজগতে revolution স্বরূপে গণ্য করতেন। এবং এ revolution করা যে অসম্ভব, এই ছিল তাঁদের ধারণা। যাঁরা মনে করেন যে, মাতৃভাষাকে আমাদের শিক্ষার বাহন করা অসম্ভব, তাঁদের অবশ্য আমাদের জাতের মনের স্বরাজ্য লাভের দুরাশায় জলাঞ্জলি দিতে হবে। এই যদি আমাদের কপালের লেখা হয় তবে বৃথা আক্ষেপের কোন কারণ নেই। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানে আমাদের সাংসারিক ও মানসিক অভ্যুদয়ের জন্য ইংরাজীভাষা শিক্ষা করা আমাদের যে নিতান্ত প্রয়োজন এ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের মনে দ্বিধা নেই। তবে মাতৃভাষার উপর সম্যক্ অধিকার না জন্মালে একটি বিদেশী ভাষাকে যথার্থ আয়ত্ত করা যায় না তার প্রমাণ, যে দুটি বাঙালীর ইংরাজী রচনা ইংলণ্ডেও সাহিত্যস্বরূপে গ্রাহ্য হয়েছে—তাঁরা উভয়েই প্রধানতঃ বাঙলা সাহিত্যিক, তাঁদের একজনের নাম রামমোহন রায়, অপরের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমি বিশেষ ক'রে এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধে মতামতের উল্লেখ করছি এইজন্য যে, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শিক্ষার যে-ত্রুটি ও যে-অভাব রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছিল সে-অভাব ও সে-ত্রুটি

আজও সমান রয়ে গিয়েছে। আজও আমাদের শিক্ষার বাহন ইংরাজী ভাষা এবং আজও আমাদের মনোজগতে, পূর্ব্ব-পশ্চিমের শিক্ষার মিলন হয় নি। ফলে, আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের অসামঞ্জস্য ইতিমধ্যে কমা দূরে থাক্ বেড়েই চলেছে।

এ রোগের প্রতিকারের উপায় কি? এ স্থলে রবীন্দ্রনাথের একটি কথার পুনরুল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। বহু পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের মনে এ প্রশ্নের উদয় হয়েছিল যে—"এ মিলন কে সাধন করিতে পারিবে?" তিনি বলেছিলেন—বাঙলা ভাষা-বাঙলা সাহিত্য। এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য। আজকের দিনে বাঙলা সাহিত্য যে কতক পরিমাণে উক্ত মিলন সাধন কর্ছে সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আজকের দিনে বাঙালী জাতির প্রধান গৌরবের বিষয় হচ্ছে বাঙলা-সাহিত্য। এ-সাহিত্য বাঙালী জাতির মনকে নবভাবে উদ্বোধিত করেছে। আজ এ-সভায় যাঁরা সমবেত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই ইংরাজী-শিক্ষিত অথচ বাংলা-সাহিত্যের ভক্ত। এই কি আমাদের নবভাবের প্রত্যক্ষ নিদর্শন নয়? এবং বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের বিস্তার ও উন্নতির জন্য বাঙালী জাতি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরঋণী থাক্বে। আমাদের আত্মপ্রকাশের প্রেরণা এঁদের কাছ থেকেই এসেছে এবং বাঙলা ভাষার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য যে কতদূর তা এঁরাই আমাদের কাছে reveal করেছেন।

শিক্ষাসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দুটি মূলকথা আপনাদের কাছে পুনরুত্থান কর্লুম, কারণ, এ দুটি যুগপৎ ভাবের কথা ও কাজের কথা। কিন্তু এ উপায়ে মূল উদ্ধার করতে গিয়ে আমাকে শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে অসংখ্য সত্য কথা বলেছেন, সে-সব কথা এ প্রবন্ধে উহ্য রয়ে গেল। সুধু শেষে এই কথাটি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, রবীন্দ্র-সাহিত্য is so rich and various in special apprehensions of truth যে, দু'কথায় তার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। আমার আসল কথা এই—বাঙলা-সাহিত্য যদি বাঙালী জাতির শিক্ষার অন্যতম উপায় হয়—তা হ'লে রবীন্দ্রনাথ যে, এ-যুগে আমাদের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাগুরু তার আর সন্দেহ নেই।

কবি রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

বহুদিন আগে বাঙ্‌লাদেশের এক প্রতিভাবান্ মনীষীর লেখায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা কথা পড়িয়াছিলাম। সে-কথাটা এখন আর ঠিক মনে নাই; মোটামুটি তিনি এই ধরণের একটা কথা বলিয়াছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাবান্ সুলেখক, রবীন্দ্রনাথ চিন্তাশীল দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত, রবীন্দ্রনাথ আদর্শ নৈষ্ঠিক গৃহস্থ, সর্ব্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঋষি।' যথাযথভাবে কথাটি আমি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না; কিন্তু লেখক রবীন্দ্রনাথের 'সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথা বলিতে গিয়া তাঁহার ঋষিত্বকেই সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল, এ-কথাটা মনে আছে। ইহা কিছু অস্বাভাবিকও নয়। কারণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ, উপনিষদের ভাবরসে পুষ্ট রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ, অসংখ্য ধর্ম্মসঙ্গীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, উপনিষদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মের ভক্ত উপাসক রবীন্দ্রনাথ, Religion of Man-র রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, এবং পরম সুরসিক তত্ত্বজ্ঞ রবীন্দ্রনাথকে ঋষি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াই মনে হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। পশ্চিম যে দুয়ার খুলিয়া রবীন্দ্রনাথকে সাদর অভিনন্দন জানাইয়াছে, তাহা কবি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এই ঋষি রবীন্দ্রনাথকেই, যে-রবীন্দ্রনাথ তাহাদিগকে পরমধর্ম্মের সন্ধান দিয়াছেন, মুক্তির বাণী শুনাইয়াছেন, এই দস্তুর জড় সভ্যতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পথ যিনি দেখাইয়াছেন। আর ঋষিত্বের যে-আদর্শ আমরা প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভারতবর্ষে দেখিয়াছি, সে-আদর্শের মাপকাঠিতেও রবীন্দ্রনাথের উপর ঋষিত্ব আরোপ করিবার আপত্তির কারণ কিছু আছে বলিয়া তো মনে হয় না। সর্ব্বোপরি, তাঁহার ঋষিত্বের সবচেয়ে বড় চাক্ষুষ অভিজ্ঞান তাঁহার সুদর্শন চেহারা। আর এই চেহারা তো শুধু তাঁহার দেহের রূপ ও আকৃতি মাত্রই নয়,—তাহা যে তাঁহার অন্তর-

পুরুষেরই প্রতিকৃতি; তিনি যেন তাঁহার সর্ব্বাবয়বের মধ্য দিয়া, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের বিচ্ছুরিত শুভ্র জ্যোতির মধ্য দিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন। কতদিন প্রত্যূষে অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই তাঁহাকে দেখিয়াছি বারান্দায় দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া আছেন দূরে বহুদূরে কোন্ জ্যোতির্ম্ময় লোকের পরপারের দিকে, স্থির যোগমগ্ন দৃষ্টি, অচল আঁখিপল্লব, জ্যোতিতে উদ্ভাসিত দু'টি চক্ষু, মুখমণ্ডলের উপর অপূর্ব্ব দীপ্তি ও জ্যোতির আভা! কতদিন কত কথার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করিয়াছি, বাহিরের সমস্ত ঔদাসীন্য ভেদ করিয়া কে যেন তাঁহার ভিতর হইতে কথা কহিয়া উঠিতেছে, গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে তাঁহার দৃষ্টি নাই, দূর হইতে যেন আর-এক রবীন্দ্রনাথ কথা কহিতেছেন, গান গাহিতেছেন। আর, শান্তি-নিকেতনে, প্রত্যূষে অথবা প্রদোষে কবিগুরুকে একা মাঠের মধ্যে অথবা ছাদের উপরে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই ঋষিত্ব কত বড় সত্য। যে-যোগমগ্ন ধ্যান-দৃষ্টি, যে-পরমজ্ঞান, যে-দৃষ্টি ও প্রতিভা, যে দিব্য পরম ঔদাসীন্য, এবং সর্ব্বোপরি যে-বিরাট personality আমাদের ভারতীয় ঋষিত্বের আদর্শকে মহীয়ান করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অল্পবিস্তর সঞ্চারিত হইয়াছে। সত্যই, রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলিলে অত্যুক্তি কিছু করা হয় না। তবু, বলিতে ইচ্ছা হয়, রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব রূপবান্ সুপুরুষ, রবীন্দ্র-নাথ প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, রবীন্দ্রনাথ আদর্শ নৈষ্ঠিক গৃহস্থ, রবীন্দ্রনাথ অক্লান্তকর্ম্মী, রবীন্দ্রনাথ চিন্তাশীল সুলেখক ও সুবক্তা, রবীন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ ঋষিও বটেন; রবীন্দ্রনাথের সৃজনী ও সংগঠনী প্রতিভা অসাধারণ, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারায় রবীন্দ্রনাথের দান বিপুল, বাঙলা ও বিশ্বসাহিত্যে তাঁহার দান অতুলনীয়; কিন্তু সব-কিছু ছাড়িয়া, সব-কিছুর উপরে, সব-কিছুর মূলে রবীন্দ্রনাথ কবি। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী; একথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যতখানি সত্য বর্ত্তমান জগতে আর কোনো জীবিত মানুষের পক্ষেই ততখানি সত্য নয়, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার সকল দিক্ ছাড়াইয়া উঠিয়াছে তাঁহার কবি-প্রতিভা। পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ, ঋষি রবীন্দ্রনাথকেও ম্লান করিয়াছেন কবি রবীন্দ্রনাথ।

বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের সকলপ্রকার চিন্তা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাঁহার অন্তর্নিহিত সত্তার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা ছাড়া আর-কিছু বলিয়া মনে করিতে পারি না। কাব্যে-সঙ্গীতে-গল্পে-নাট্যে-উপন্যাসে তিনি যেমন করিয়া আপনার আনন্দের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করিয়াছেন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্ম্মপ্রচেষ্টায়, শিক্ষাদান ও প্রচারে, তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও ব্যাখ্যায়, অধ্যাত্মবোধ এবং তাহার প্রচারে-ও তিনি তেমন করিয়াই নিজকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকাশ কোনো নূতন জ্ঞানলাভের প্রেরণায় বা প্রয়োজনের তাড়নায় যে নয়, একথা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি। বিশ্বজীবনের বিচিত্র বিকাশের সঙ্গে মানুষের একটা নিবিড় যোগ আছে; বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞানের প্রেরণায় এ-সম্বন্ধকে কেহ জানিতে চায়, প্রয়োজনের তাড়নায় এ-সম্বন্ধকে কেহ আরো দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে চায়। কিন্তু এই জাতীয় চেষ্টার বাহিরেও একটা চেষ্টা মানুষের আছে; মানুষ চায় এই সম্বন্ধটিকে, এই নিবিড় সংযোগের রসটিকে ভোগ করিতে, জানিতে নয়, অনুভব করিতে। এই ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির ক্ষুধাই মানুষকে রূপসৃষ্টি রসসৃষ্টির কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, তাহার নিদ্রিত চৈতন্যকে প্রকাশের তাড়নায় ব্যাকুল করিয়া তোলে। নানান্ যুগের, নানান্ দেশের ইতিহাস-যে কাব্যে সঙ্গীতে চিত্রে ভাস্কর্য্যে মঞ্জুরিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে এই অনুভূতির ক্ষুধা, প্রকাশের প্রেরণা, নিজের সত্তার আনন্দবোধকে বিকশিত করিবার ব্যাকুল প্রয়াস। এই যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের রসকে ভোগ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার মনে যে অনুভূতির ক্ষুধা জাগিয়াছে, তাহারই ফলে তিনি অদ্বিতীয় রূপস্রষ্টা, অদ্বিতীয় কবি। তাঁহার এই কবিমানস, বস্তুতঃ সকল প্রকার রূপমানসের মূলে আছে এই রসভোগের ইচ্ছা, অনুভূতির ক্ষুধা, প্রকাশের ক্ষুধা,—জ্ঞানের প্রেরণা নয়, প্রয়োজনের তাড়না নয়।

একদিন রবীন্দ্রনাথ, তখন তাঁহার বয়স কুড়ি কি একুশ হইবে, কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীর সদরষ্ট্রীটের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক অপূর্ব্ব সুমহান্ সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। সেই সকাল-বেলার এক জ্যোতির্ম্ময় মুহূর্ত্তে মানুষের সঙ্গে বিশ্বজীবনের বিশ্বপ্রকৃতির সত্যসম্বন্ধটিকে

তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে কাব্যে-গানে-কর্ম্মে-চিন্তায় এই সত্যটি কত ভাবে ও রূপে যে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তত্ত্বচিন্তার দিক্ হইতে, অধ্যাত্মবোধের দিক্ হইতে এই সত্যটির একটি বিশেষ মূল্য আছে, এবং চিন্তাজগতে এই তত্ত্ব একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের কাছে এ-সত্য কিছু তত্ত্বচিন্তা অথবা অধ্যাত্মবোধের ফল নয়,—একটি সহজ অনুভূতি, একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক রসবোধের ফলেই এই সত্যকে তিনি জানিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কাছে কিছু 'তত্ত্ব-ও নয়, বিজ্ঞান-ও নয়, কোনো প্রকার কাজের জিনিষ-ও নয়, তাহা চোখের জল ও মুখের হাসির মত অন্তরের চেহারা মাত্র। তাহার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান কিম্বা আর কোনো বুদ্ধিসাধ্য জিনিষ মিলাইয়া দিতে পার তো দাও, কিন্তু সেটা গৌণ।' (জীবনস্মৃতি—বিশ্বভারতী সংস্করণ, ২৩২ পৃষ্ঠা)। কবিধর্ম্মের সৃজন-প্রতিভার ইহাই স্বরূপ; এবং আমি বলিতে চাই, এই স্বরূপটিই রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার চিন্তা ও ধর্ম্ম-প্রচেষ্টায় ব্যক্ত হইয়াছে। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের এই কবিমানস কি ভাবে অঙ্কুর ফুঁড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, জীবনস্মৃতি (বিশ্বভারতী সংস্করণ, ৭৬ পৃষ্ঠা) হইতে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় তাহা একটু উদ্ধৃত করিলেই ইহার স্বরূপটি বুঝা যাইবে।—

"নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে, সে-বয়সে উহার তাৎপর্য্য আমি ঠিক্ ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি "ভূর্ভুবঃস্বঃ" এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম, স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো জিনিষ নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে,—মনের মধ্যে ঘা' দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে-জিনিষটা বাজিয়া উঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে সেটা নিতান্তই একটা ছেলেমানুষী কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে, তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশী······আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিষ বুঝি নাই, কিন্তু তাহা অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে।"

শুধু ছেলেবেলায়-ই নয়, পরবর্ত্তী সমগ্র জীবনেও তাঁহার এই বিশিষ্ট কবিপ্রকৃতিই জয়যুক্ত হইয়াছে। এক-একটা জিনিস এক-এক সময়ে তাঁহার অন্তরের মধ্যে একটা খুব নাড়া দিয়াছে, এবং তাহারই ফলে তিনি সেই জিনিসকে ভোগ করিয়াছেন, পাইয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন; বুদ্ধি দ্বারা, চিন্তা দ্বারা তাহাকে জানিতে অথবা প্রয়োজনের খাতিরে তাহাকে একান্ত করিয়া তুলিতে চাহেন নাই। নিজেই তিনি বলেন, 'অন্তরের অন্তঃপুরে যে-কাজ চলে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।' আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার গড়নটা কবির গড়ন, সাহিত্যিকের গড়ন; যখনই বিশ্ব-জীবনের কোনো কিছু তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, তখনই তিনি কাব্যে, গানে, বিচিত্র কর্ম্মে ও চিন্তায় আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, আর-কিছুরই অপেক্ষা রাখেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই কবি, রূপকার, রসস্রষ্টা; তাঁহার সমগ্র জীবনের দৃষ্টি কবির দৃষ্টি। জগৎ ও জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন; কোনো বিশিষ্ট তত্ত্ব অথবা চিন্তাধারার ভিতর দিয়া ততটা নয় যতটা নিজের অন্তরের অনুভূতি দিয়া। তাঁহার অসংখ্য গান ও কবিতার কথা ছাড়িয়া দিয়া, 'শান্তিনিকেতনে'র উপাসনা ও উপদেশ, নানান্ তত্ত্ব ও চিন্তাধারাকে অবলম্বন করিয়া যে বিশিষ্ট সাহিত্য-রাজ্যটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে বিহার করিলেও সহজেই বুঝা যায়, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ ও জীবনের মধ্যে যাহা রসের, যাহা অনুভূতির সেই দিকেই তাঁহার কবিচিত্তের সহজ গতি। অনেক সুমহান্ সত্যের ইঙ্গিত হয়তো তিনি পাইয়াছে; তাঁহার রচিত বিভিন্ন সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে মধ্যে তাহা প্রকাশ-ও পাইয়াছে; কিন্তু এই পাওয়া বা প্রকাশ কোনো চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়া, অথবা তত্ত্বের তন্তুজাল বুনিয়া বুনিয়া নয়, জ্ঞানের সুদুর্গম পথের যাত্রী হইয়া নয়—অন্তরের সহজ অনুভূতির বিপুল ঐশ্বর্য্য দিয়া, রসিক-চিত্তের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া। যে-যুক্তিপর্য্যায়, যে-প্রমাণমালা, যে-বিচারের ভিতর দিয়া একটা তত্ত্বের, একটি সত্যের সন্ধান আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ তেমন করিয়া তাহার সন্ধান পান নাই। অথচ বিশ্বজীবনের অনেক নিগূঢ় রহস্যই, অনেক দুর্ল্লভ দুরধিগম্য সত্যই তাঁহার নিকট

উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; এবং তিনি তাঁহার অননুকরণীয় কবি-জনোচিত ভাব ও ভাষায় তাহা প্রকাশ-ও করিয়াছেন। Logical consistency বলিতে যাহা বুঝি, sequence of thought and reasoning বলিতে যাহা বুঝি, তাহার প্রকাশের মধ্যে হয়তো সর্ব্বত্র তাহা নাই, যে সরস analogy তাঁহার রচনার একটা বিশেষ ভঙ্গী, তাহা হয়ত সর্ব্বত্র সত্য-ও নয়, অকাট্য যুক্তি দিয়া হয়ত সব সময় তাহার প্রতিষ্ঠা-ও করা যায় না; কিন্তু সমস্ত যুক্তিকে অতিক্রম করিয়া হৃদয়ের মধ্যে যাহার অনুভূতি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত দেখা দেয়, যাহার বোধ কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, অন্তরের মধ্যে যার স্পর্শ সূর্য্যালোকের মত স্পষ্ট, সেখানে তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবির অন্তরকে যাহা নাড়া দিয়াছে, পাঠকের অন্তরকে-ও তাহা নাড়া না-দিয়া পারে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের যে কোনো বিশিষ্ট চিন্তাধারার পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে, এই কবি-প্রকৃতির প্রকৃত রূপটি কি। সৌন্দর্য্যের মূল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ চিন্তা আছে; যে-কেহ তাঁহার সাহিত্য ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তিনিই এই বিশেষ চিন্তাটির খবর জানেন। প্রভাত-সঙ্গীত রচনার সঙ্গে-সঙ্গে ইহার খবর সর্ব্বপ্রথম আমরা পাই; সূচনাটি কি করিয়া হইল, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাহা বলিতেছেন,—

"সামান্য কিছু করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে-গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনও লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই—এখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সঙ্গীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্ত্তেই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহ-চাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্য্যনৃত্যের আভাস পাইতাম। ... ... এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এইজন্য তাহার একটি সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটি অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া

দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে—এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশ কাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে।" (জীবনস্মৃতি—বিশ্বভারতী সংস্করণ, ২২৯ ও ২৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা)।

এই উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে যাহা অস্পষ্ট, সেই অনুভূতিই ক্রমে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া একটা বিশেষ তত্ত্বের রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাই পরবর্ত্তী জীবনের creative unity। পরবর্ত্তী জীবনে সমস্ত সৃষ্টির মূলে এক বিরাট সৌন্দর্য্যময় ঐক্যানুভূতির কথা তিনি বহুবার বলিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যধর্ম্মের মূলে-ও রহিয়াছে এই সৌন্দর্য্যময় ঐক্যানুভূতি—creative unity-র কথা। এই creative unity-কে এখন আপাতঃ-দৃষ্টিতে আমরা কবির সুদীর্ঘ চিন্তাধারা-প্রসূত একটা বিশেষ মতবাদ বলিয়া দেখি। এ মতবাদ সত্য কি না, ইহার বিরুদ্ধ মতবাদ কিছু আছে কি না, ইহা বিচার-গ্রাহ্য কি না, সে-বিচার স্বতন্ত্র। কিন্তু একটা বিশেষ মতবাদ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, যে বিশেষ জ্ঞান ও তত্ত্বচিন্তার ফল বলিয়া জানি, রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্য্য-রহস্য, এই সৃষ্টি-রহস্যকে আমি তেমন কিছু মতবাদ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। এ-কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তীকালে এই অনুভূতিলব্ধ রহস্যকে নানা যুক্তি নানা বিচারের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু, মূলতঃ ইহা একটা আনন্দানুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যকে দেখিবার একটা সহজ দৃষ্টি, বিশ্বজীবনের রসকে ভোগ করিবার একটা বিশেষ ভঙ্গী, নিজের মধ্যকার সৌন্দর্য্যের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করিবার একটা বিশেষ রীতি।

সীমার সঙ্গে অসীমের, খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বিশ্বজীবনের যোগের মধ্যে একটি নিগূঢ় সুনিবিড় সম্বন্ধের অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাছে অত্যন্ত সত্য, এবং এই অনুভূতি-ও রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটা বিশেষ মতবাদের রূপ ও অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ইহা যে একান্তই কবিগুরুর নিজস্ব তাহা নহে; আমাদের দেশের প্রাচীন চিন্তাধারার মধ্যে হয়ত এই মতবাদের পরিচয় আছে। তৎসত্ত্বে-ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে ইহা একটা বিশেষ ও সুনির্দ্দিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে, এ

বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিচার্য্য তাহা নহে। এই মতবাদের সঙ্গেই আবার রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা"র রহস্য-ও জড়িত; কিন্তু তাহা-ও আলোচ্য নয়। বলিবার কথা এই যে, এই সীমা-অসীমের সম্বন্ধ, এই "জীবন-দেবতা"র রহস্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে ইহা কিছু তত্ত্ব বা মতবাদ নয়, কোনো প্রকার ধর্ম্মের সূত্র নয়, শুদ্ধ অনুভূতি মাত্র। অসীম আকাশ আঙিনার ক্ষুদ্র আকাশের মধ্যে ধরা দেয়, ততটুকুর মধ্যেই তাহার বিচিত্র রূপ ফুটিয়া উঠে; আবার এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন আকাশই সুবিস্তৃত আকাশের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিশ্বজীবন আমার ব্যক্তিজীবনের মধ্যে ধরা দিয়া তবে তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি লাভ করে; সেই আমার ব্যক্তিজীবনই আবার বিশ্বজীবনের মধ্যে নিজকে বিসর্পিত করিয়া নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতে চায়। এমনি করিয়াই সীমায় অসীমে, খণ্ডে পূর্ণে, ব্যক্তিজীবনে বিশ্বজীবনে একটি অশেষ অপরূপ চিরন্তন লীলা চলিয়াছে; এই লীলাই সৃষ্টির সৌন্দর্য্য, ইহাই আনন্দ। এই সৌন্দর্য্য, এই আনন্দ, ইহারই পরিপূর্ণ রসটিকে রবীন্দ্রনাথ আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন, একটি অপূর্ব্ব সুগভীর রহস্য-রূপে অনুভব করিয়াছেন। তত্ত্ব হয়ত ইহার মধ্যে আছে, তত্ত্বের আকারে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে একাধিকবার ব্যক্ত-ও করিয়াছেন, কিন্তু, আমার ধারণা, সে শুধু তাঁহার কবি-প্রকৃতির সহজ বোধ ও অনুভূতিকে যুক্তি ও প্রমাণের মধ্যে, জ্ঞানের ও চিন্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা দান করিবার জন্য। তাহা তাঁহার নিজের জন্য ততটা নহে, যতটা পরের কাছে এই অনুভূতিকে বোধ্য ও জ্ঞানলভ্য করিবার জন্য তাঁহার "জীবন-দেবতা"র রহস্য-ও মূলতঃ এইরকম একটি অনুভূতি, এবং তাহাকেই তিনি নিজের অন্তরের মধ্যে পরম রমণীয় করিয়া রসের আধার করিয়া পাইয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন। ঋষি রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ও সুগভীর অধ্যাত্মবোধের মূলে-ও আছে এই বিশেষ কবিপ্রকৃতি, রসের ক্ষুধা, ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির ক্ষুধা। তিনি যে এক শুভ্র নিরঞ্জন অদ্বিতীয় দেবতার স্পর্শ বারংবার হৃদয়ের মধ্যে লাভ করিয়াছেন, যাঁহার লীলায় তাঁহার কবিজীবন অপূর্ব্ব ভাবরসে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং যাঁহার প্রকাশ তাঁহার অন্তরের মধ্যে সূর্য্যালোকের মত

উজ্জ্বল, সেই এক শুভ্র নিরঞ্জন দেবতাকে-ও তিনি পাইয়াছেন তাঁহার কবি-হৃদয়ের অনুভূতির মধ্যে নানান্ ভাবে, নানান্ রূপে—কখনো তিনি দেবতা, কখনো বন্ধু, কখনো সখা, কখনো লীলাসঙ্গিনী। যৌগিক সাধনার বন্ধুর দুর্গম পথে তাঁহার দেবতা আসেন নাই, কোনো বিশেষ ধর্ম্মাচরণের অপেক্ষা-ও তিনি রাখেন নাই, বহু শাস্ত্র চর্চ্চা, বহু ধ্যান নিদিধ্যাসন, বহু জ্ঞানের পথে-ও সে-দেবতার পদচিহ্ন পড়ে নাই, 'ন মেধয়া, ন বহুধা শ্রুতেন' ; তিনি আসিয়াছেন তাঁহার সহজ অনুভবের মধ্যে। দেবতাকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়াছেন বলিব না, বলিব, তাঁহাকে তিনি পাইয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন, প্রকাশ করিয়াছেন। উপনিষদের অনুরক্ত রসিক পাঠক রবীন্দ্রনাথে ঔপনিষদ-তত্ত্বের মধ্যে বিচরণ করিবার আগ্রহ বড় দেখি না ; দেখি, তিনি ডুব দিয়াছেন রসসমুদ্রের অতলে, সেখানে কোনো তত্ত্ব নাই, কোনো বিচার নাই, বিরোধ নাই। জ্ঞানের সমস্ত পুঁজি নাড়িয়া, বিচার করিয়া বিবেচনা করিয়া যাহার সন্ধান আমাদের কাছে কিছুতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে না, তাহা তাঁহার কাছে ধরা দিল অত্যন্ত সহজে, তাহা এক মুহূর্ত্তে তাঁহার রসের ক্ষুধা, ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির ক্ষুধাকে তৃপ্তিতে ভরিয়া দিল, আর সঙ্গে-সঙ্গে তাহার প্রকাশ জীবনের মধ্যে অপূর্ব্ব রসে ও সৌন্দর্য্যে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

একদিন রবীন্দ্রনাথ বাঙলা দেশের, তথা ভারতবর্ষের, রাষ্ট্রীয় জীবন-যজ্ঞে পৌরোহিত্যের কাজ করিয়াছিলেন, স্বদেশী মন্ত্রের তিনিই ছিলেন উদ্গাতা। বাঙলা দেশে তখন একটা সুবৃহৎ ভাবের জোয়ার আসিয়াছিল ; তেমন জোয়ার এ-দেশে ইতিপূর্ব্বে কখন-ও আসে নাই ; তেমনভাবে বাঙলা দেশ বুঝি আর কখন-ও আন্দোলিত হয় নাই। সমস্ত বাঁধ ভাঙিয়া গেল, রবীন্দ্রনাথ ভগীরথের মত বাঙলা দেশের উপর দিয়া ভাগীরথীর ধারা বহাইয়া দিলেন। বিজয়ার দিনের আহ্বান শুনিয়া সমস্ত দেশ মাতিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে স্বদেশী সমাজ গড়িয়া উঠিল, ভিক্ষুকবৃত্তি ছাড়িয়া দেশ নিজের দিকে মুখ ফিরাইল,—এ-সমস্ত তাঁহারই প্রেরণা পাইয়া ; গানে কবিতায় প্রবন্ধে বক্তৃতায় বাঙলা দেশ যেন তাঁহার মুখে ভাষা পাইল। কিন্তু, কেন তিনি এমন করিলেন, কেন তিনি নিজের ঘরে

শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে তৃপ্ত হইয়া রহিলেন না, এ-কথাটা বুঝিতে চাই। আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না, কোনো প্রয়োজনের তাড়নায় রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় যজ্ঞের পৌরহিত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আগেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার চিন্তা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাঁহার অন্তর্নিহিত অজাগ্রত সত্তার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা মাত্র। তাঁহার জীবনের মূলে আছে একটা অনুভূতির ক্ষুধা, প্রকাশের চেষ্টা, নিজের আনন্দবোধকে বিকশিত করিবার একটা ব্যাকুল প্রয়াস। বাঙলা দেশের স্বদেশীযজ্ঞ এক সময় তাঁহার অন্তরকে খুব একটা নাড়া দিয়াছিল, বিশ্বজীবনের এই খণ্ড ও সাময়িক বিকাশটি তাঁহার অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল, এবং তাহার ফলে তিনি অন্তরের মধ্যে খুব একটা সুবৃহৎ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার রসের ক্ষুধা, ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির ক্ষুধা, এবং অন্তরের আনন্দবোধকে প্রকাশ করিবার একটা ব্যাকুল আগ্রহ মনের মধ্যে জাগিয়াছিল। এই হিসাবে স্বদেশীযজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্য তাঁহার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছার একটা কর্ম্মরূপ। যেদিন এই অনুভূতির ক্ষুধা মিটিয়া গেল, আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা তৃপ্তি লাভ করিল, সেদিন তিনি এক মুহূর্ত্তেই যজ্ঞের পৌরোহিত্য-পদ পরিত্যাগ করিলেন। এ-কথা বলা চলিবে না যে, রাষ্ট্রান্দোলনের ক্ষেত্রে, দেশের সেবায়, দেশের শৃঙ্খলমোচনে তাঁহার সাহায্যের আর প্রয়োজন ছিল না; সে প্রয়োজন তখন-ও যেমন ছিল, এখন-ও তেমনই আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো সে প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করেন নাই, নিজের সৃষ্টির আনন্দকে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকেই রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন।

আজ পূর্ণ এক যুগ ধরিয়া দেশে আবার আর-এক জাতীয় যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে; বহু জীবন সেবা দিয়া, ক্ষতি দিয়া, অর্থ দিয়া, প্রাণ দিয়া সে-যজ্ঞে আহুতি দিয়াছে। সকলেই জানেন, এই নূতন জাতীয় যজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের যোগ তেমন নাই। এই সুবৃহৎ যজ্ঞে তাঁহার যে কোনো কর্ম্মপ্রচেষ্টা নাই, শুধু তাহাই নয়, তাঁহার অন্তরাত্মা ইহাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ-ও করে নাই। অনেকেই ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করেন, অনেকেই এজন্য তাঁহার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, দুঃখ বোধ করিয়াছেন; আবার অনেকে তাঁহার

উপর inconsistency-র দোষ-ও আরোপ করিয়াছেন,—বলিয়াছেন, যিনি বাঙলা দেশের স্বদেশী যজ্ঞের পৌরোহিত্য করিয়াছেন, দেশকে স্বদেশ-মন্ত্রে একদিন দীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার এই ব্যবহার শোভা পায় না। আমার মনে হয়, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই; ভিতরকার রবীন্দ্র-নাথকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা বুঝিবেন, ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের inconsistency-ও কিছু নাই, এবং এই ব্যবহার রবীন্দ্রনাথকেই শোভা পায়। নিজের কাছে এ ব্যাপারে তিনি একান্তভাবে খাঁটি, মিথ্যাচরণের লেশমাত্র কোথা-ও কিছু নাই। আমি এইমাত্র বলিয়াছি, স্বদেশী যজ্ঞের পৌরোহিত্য রবীন্দ্রনাথ যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা দেশের কিছু প্রয়োজনে নয়, দেশের হিতসাধন যদি কিছু হইয়া থাকে, তবে তাহা গৌণ, কিন্তু মূলে ছিল তাঁহার আত্মবিকাশের ইচ্ছা, প্রকাশের প্রেরণা, অন্তরের আনন্দ-বোধকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুল আগ্রহ। কবিপ্রকৃতির ইহাই স্বরূপ। স্বদেশী যজ্ঞ এই কবিপ্রকৃতিকে ব্যক্ত করিবার একটা সুমহান্ সুযোগ দান করিয়াছিল; সেইজন্যই সেই যজ্ঞকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া রবীন্দ্র-নাথের তখনকার জীবনে এক সাড়া পড়িয়াছিল, কাব্যে গানে গল্পে প্রবন্ধে বক্তৃতায় তাঁহার প্রতিভা তখন বাঁধভাঙা দুকুলহারা নদীর মত ছাপাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে অনুভূতির ক্ষুধা বহুদিন মিটিয়াছে, রাষ্ট্রীয় জীবনযজ্ঞে আহুতি দিয়া আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা বহুদিন তৃপ্তিলাভ করিয়াছে, এবং তাহার আনন্দ জীবনকে নূতনরূপে নূতনভাবে অভি-ব্যক্তি-ও দান করিয়াছে। আজ আর সেই অনুভূতির ক্ষুধা, সে-প্রকাশের ইচ্ছাকে ভোগ করিবার আগ্রহ-ও তাঁহার নাই, বিশ্বজীবনের সেই ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা-ও আর তিনি অনুভব করেন না। সেইজন্যই আজিকার অসহযোগ যজ্ঞ তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিল না, তাঁহার অন্তরের সত্তাকে নূতন চৈতন্যে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারিল না, সে-চৈতন্য বহুদিন আগেই উদ্বোধিত হইয়া গিয়াছে। আজ তিনি বিশ্বজীবনের অন্যতর বৃহত্তর বিস্তৃততর ক্ষেত্রে অনুভূতির ক্ষুধা মিটাইতেছেন, আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা অন্যতর যজ্ঞক্ষেত্রে তৃপ্তিলাভ করিতেছে; আনন্দের রসভোগের ক্ষেত্র আজ রাষ্ট্রীয় যজ্ঞক্ষেত্র নয়। পঁচিশ বৎসর আগেকার রবীন্দ্রনাথকে

আজ পঁচিশ বৎসর পরে ফিরিয়া পাইতে চাহিলে আমাদের মূঢ়তাই প্রকাশ পাইবে। অথচ এ-কথা বলিতে পারিব না যে, বাঙলা দেশের স্বদেশী যজ্ঞের চেয়ে আজিকার নিখিল ভারতের অসহযোগ-যজ্ঞ কিছু ছোট জিনিস। আদর্শের দিক্ হইতে, ত্যাগের দিক্ হইতে, মর্ম্মবেদনার গভীরতার দিক্ হইতে, আন্দোলনের ব্যাপ্তির দিক্ হইতে, সংগ্রামের কঠোরতার দিক্ হইতে এই অসহযোগ-যজ্ঞ বাঙলার স্বদেশী যজ্ঞের অনেক ঊর্দ্ধে, সমগ্র ভারতবর্ষ আসমুদ্র হিমাচল এমন করিয়া পূর্ব্বে আর কখনো আন্দোলিত হইয়াছে, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত নাই। সাধারণ যুক্তির দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, এ যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিবার অধিকার কাহারো যদি থাকিয়া থাকে, তবে তাহা রবীন্দ্রনাথেরই; তিনিই তো তাঁহার 'স্বদেশী সমাজে' সর্ব্বপ্রথম অসহযোগ-মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, গুর্জ্জর-সিংহের গর্জ্জন তখন-ও শুনা যায় নাই। কিন্তু, এ তো আমাদের সহজ বুদ্ধি, স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির কথা নয়; ইহা কবিপ্রকৃতির স্বরূপটিকে, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ধর্ম্মকে বুঝিবার কথা। মতামতের কোনো অমিল অথবা বিরোধের জন্য তিনি এ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেন নাই, এই দেশব্যাপী সুবৃহৎ জীবনান্দোলন হইতে দূরে রহিয়াছেন, এ-কথা আমি মনে করিতে পারি না। তিনি নিজে অবশ্য একাধিকবার বলিয়াছেন, খদ্দর ও চরকার মন্ত্র তাঁহার ভাল লাগে নাই, এ আন্দোলনের asceticism-ও হয়ত তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই; কিন্তু এ সমস্তই after-thought, গৌণ। আসল কথা, স্বদেশী যজ্ঞের রবীন্দ্রনাথ আর আজিকার রবীন্দ্রনাথ এক মানুষ নহেন, এক রবীন্দ্রনাথ আর-এক রবীন্দ্রনাথকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। ইহার জন্য দুঃখ করা মূঢ়তা মাত্র, এবং তাঁহাকে এজন্য দোষী করা একান্ত অন্যায়-ও বটে। রবীন্দ্রনাথের যথার্থ কবিপ্রকৃতির কথা জানিলে আমরা হয়ত তাহা করিতাম না। কারণ, কবিপ্রকৃতির স্বরূপই এই প্রকার। কবি হইতেছেন বিচিত্রের দূত, চঞ্চলের লীলা-সহচর। এক যজ্ঞক্ষেত্র হইতে অন্য যজ্ঞক্ষেত্রে, এক রূপ হইতে অন্য রূপে, এক ভাব হইতে অন্য ভাবে, এক রহস্য হইতে অন্য রহস্যে তাঁহার চিরন্তন লীলাভিসার চলিয়াছে। চলিষ্ণু সেই সেই প্রকৃতি

এক রসের আধার হইতে অন্য রসের আধারে ডুব দিয়া তাহার চিরন্তন রসভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির ক্ষুধা, প্রকাশের ক্ষুধা মিটাইতেছে, এবং তাহার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা বিচিত্র সৃষ্টিতে রূপায়িত হইতেছে।

আর এক দিন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের তপোবনে শিশু বালকদের শিক্ষার জন্য এক আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; আজ তাহা শতাব্দীর এক পাদ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাদের শিক্ষাব্যাপারে এমন 'experiment' বাঙলা দেশে আর কোথাও হয় নাই, ভারতবর্ষেও হইয়াছে বলিয়া জানি না। প্রকৃতির অবাধ উন্মুক্ত লীলার মধ্যে, প্রকাশের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের মধ্যে সুকুমার প্রাণগুলি যে স্বেচ্ছা-বিকাশের আনন্দ লাভ করে, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষায় আকাঙ্ক্ষার প্রথম সূচনা কত সহজ, কত স্বাভাবিক, জীবনের বিকাশ কত সুন্দর! তিনি এই বালক-বালিকাদের জন্য এক সময় 'সিলেবাস'-ও হয়ত প্রণয়ন করিয়াছেন, নিজে পড়াইয়াছেন, এমন-কি পাঠ্যপুস্তকও লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই কর্ম্মচেষ্টার মূলে ইহারা অত্যন্ত গৌণ; মূলতঃ তিনি বিশ্বজীবনের লীলার মধ্যে শিশুমনের যে প্রথম আনন্দ সেইটিই ভোগ করিতে চাহিয়াছেন, বুদ্ধির উষার সঙ্গে সঙ্গে এই বালক-বালিকাদল যে প্রকৃতির ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া বিচিত্রভাবে নিজেদের প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে কবির চিত্তই আনন্দে উদ্বোধিত হইয়াছে। এইখানেও তাঁহার কবিপ্রকৃতিরই জয়। ইহাদের সম্মিলিত জীবনধারাকে-ও তিনি একটি সমগ্র কবিতা করিয়া রচনা করিয়াছেন। এই যে আশ্রম-প্রাঙ্গণে নৃত্যগীতি ও বিচিত্র উৎসবের লীলায়, ঋতুতে ঋতুতে প্রাণের উৎসবে ইহারা মাতিয়া উঠে, ইহাদের জীবনের প্রকাশের যে এই সুন্দর সুঠাম রূপ, ইহার মধ্যে-ও তো রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির অভিব্যক্তিই আমি দেখিতে পাই। শিক্ষা-সমস্যার কি মীমাংসা এখানে হইয়াছে বা হয় নাই, শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় সম্বন্ধে এ বিচার অত্যন্ত গৌণ বলিয়াই আমি মনে করি। শান্তি-নিকেতন রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রাণের একটি অপূর্ব্ব প্রকাশ; বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র আনন্দলীলাকে শিশুজীবনে কি করিয়া সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহাদের আনন্দকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া নিজের অন্তরের রসভোগের

ক্ষুধাকে, আনন্দের প্রকাশের ব্যাকুলতাকে, অনুভূতির তৃষ্ণাকে সৃষ্টির কার্য্যে উদ্‌বুদ্ধ করা যায়, শান্তিনিকেতন তাহারই পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন,—

"এই আশ্রমের কর্ম্মের মধ্যেও যেটুকু প্রকাশের দিক্ তাই আমার ; যেটুকু এর যন্ত্রের দিক্ যন্ত্রীরা তা' চালনা করছেন। মানুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে আমি রূপ দিতে চেয়েছিলাম। সেইজন্যেই তার রূপভূমিকার উদ্দেশে একটি তপোবন খুঁজেছি। নগরের ইঁটকাঠের মধ্যে নয়, এই নীলাকাশ উদয়াস্তের প্রাঙ্গণে, এই সুকুমার বালক-বালিকাদের লীলা-সহচর হ'তে চেয়েছিলাম। এই আশ্রমে প্রাণসম্মিলনের যে কল্যাণময় সুন্দর রূপ জেগে উঠেছে, সেটিকে প্রকাশ করাই আমার কাজ। এর বাইরের কাজ-ও কিছু প্রবর্ত্তন করেছি, কিন্তু সেখানে আমার চরম স্থান নয়, এর যেখানটিতে রূপ সেইখানটিতে আমি। ... এখানে আমি শিশুদের যে ক্লাস করেছি, সেটা গৌণ—প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের সুকুমার জীবনের এই যে প্রথম আরম্ভরূপ, এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি-সূচনায় যে উষারুণ দীপ্তি, যে নবোদ্গত অঙ্কুর, এইকই অবারিত করবার জন্য আমার প্রয়াস, না হ'লে আইন-কানুনের সিলেবাসের জঞ্জাল নিয়ে আমায় মরতে হ'তো। এই সব বাইরের কাজ গৌণ।......কিন্তু লীলাময়ের লীলায় ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে কখনো ছুটী দিয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্বোধিত করবার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার সার্থকতা।......"

(প্রবাসীর ক্রোড়পত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ ; সপ্ততিতম জন্মতিথিতে কবির অভিভাষণ।)

ঠিক্ এইভাবেই বিশ্বভারতীতে ও শ্রীনিকেতনে সকল নিয়ম-কানুন, কাজ-কর্ম্ম যত কিছুর বাইরে যেটুকু প্রকাশের দিক্, সেইখানে রবীন্দ্রনাথ, 'যেখানটিতে রূপ সেইখানে তিনি'। বিশ্বভারতীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির মহামানবের মিলনতীর্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার বহু দিনের একটি আনন্দ-স্বপ্নকে সেখানে রূপ দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার এই কর্ম্মচেষ্টা কতখানি সার্থক হইয়াছে বা হয় নাই সে-বিচারের কোনই প্রয়োজন নাই ; কিন্তু যে-স্বপ্ন যে-আদর্শকে তিনি বিশ্বভারতীতে রূপ দিতে চাহিয়াছেন, তাহা যে প্রকাশের প্রেরণায় ব্যাকুল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সমগ্র বিশ্বের শিক্ষার ও সংস্কৃতির যাঁহারা গুরু, তাঁহারা সকলে আসিয়া একটি যজ্ঞক্ষেত্রে মিলিতেছেন, মন্ত্র দিতেছেন—মহামানবের কত বড় আনন্দের ইহা প্রকাশ! এই আনন্দ-কেই রবীন্দ্রনাথ রূপ দিতে চাহিয়াছেন, এবং মহামানবের এই আকুলতাকে

প্রকাশ করিয়াই তাঁহার নিজের আনন্দ-ও ব্যক্ত হইতেছে। এখানে প্রাচ্যবিদ্যার যে-আলোচনা হইতেছে, এখানে কলাশালায় যে-স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রদীপটি জ্বালা হইয়াছে, যে-বিচিত্র গ্রন্থরাজি এখানকার গ্রন্থাগারে আহৃত হইয়াছে, এ সমস্তই বিশ্বমানবের বিচিত্র আনন্দাভিব্যক্তির রূপ। ইহার বিচিত্র বিচ্ছিন্ন পৃথক পৃথক অঙ্গ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নাই, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে একটি সমগ্ররূপ আছে, সেইখানেই রবীন্দ্রনাথ। এই রূপটির মূলে আছে তাঁহার মহামানবের ঐক্যানুভূতির ক্ষুধা, রসভোগের ক্ষুধা, প্রকাশের ক্ষুধা। শ্রীনিকেতনে-ও তাই। এখানকার পশুশালায়, শস্যক্ষেত্রে, মাঠের ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডারে হয়ত রবীন্দ্রনাথ নাই; কিন্তু ইহার সব-কিছুর পশ্চাতে একটি সমগ্র রূপ আছে, সে রূপ শ্রীর, লক্ষ্মীর। এই লক্ষ্মীর রূপই রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয়ের আনন্দকে উদ্বোধিত করিয়াছে। মাটির মধ্যে, গাছের মধ্যে বিশ্বজীবনের মাধুর্য্য ও আনন্দের প্রকাশ তিনি অনুভব করিয়াছেন, তাহাকেই তিনি এখানে রূপ দান করিয়াছেন। গাছের বীজ মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হয়; বীজের মধ্যে আত্ম-প্রকাশের যে-ব্যাকুলতা আছে, তাহাই তাহাকে গাছে রূপান্তরিত করে। শ্রীনিকেতনে যে-জিনিষটি রূপ পাইয়াছে—পল্লীশ্রীর রূপ, গ্রামলক্ষ্মীর রূপ —তাহার মধ্যে-ও রবীন্দ্রনাথ এই আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছিলেন, এবং এই অনুভূতির ক্ষুধাই এইভাবে নিজকে ব্যক্ত করিয়াছে। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে স্নিগ্ধ অপূর্ব্ব মঙ্গলানুষ্ঠানের ভিতর আশ্রমে যে বৃক্ষরোপণ উৎসব, হলকর্ষণ উৎসব ইত্যাদি তিনি করিয়া থাকেন, তাহার অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য্যই যে শুধু উপভোগ্য তাহাই নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির এই সবিশেষ পরিচয়টি-ও তাহার মধ্যে আছে।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র চিন্তা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার-দুই চারিটির মূলে তাঁহার কবিপ্রকৃতির স্বরূপটি ধরিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাঁহার এই কবি-মানস যে শুধু তাঁহার চিন্তা ও কর্ম্মচেষ্টার মধ্যেই জয়যুক্ত হইয়াছে তাহাই নয়। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার রচনায়, কি ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায়, কি সমাজ ও রাষ্ট্রবিষয়ে বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে—বাতায়নিকের পত্রে, কি কর্ত্তার

ইচ্ছায় কর্ম্মে—কি চিঠিপত্রে, কি তত্ত্বব্যাখ্যায়, কি সাহিত্য-বিচার ও ব্যাখ্যানে, সর্ব্বত্রই ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ কবিপ্রকৃতিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়কে যুক্তিদ্বারা, প্রমাণের সাহায্যে তিনি বুঝাইতে বা উপস্থিত করিতে চেষ্টা ততটা করেন না, যতটা করেন তাঁহার সহজ বোধশক্তিকে, অনুভব-ক্ষমতাকে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবের অপরূপ ভাষার যাদুর সাহায্যে শ্রোতা ও পথিকের একেবারে অন্তরের অন্তঃপুরে ঠেলিয়া দিতে; মনে হয়, ইহাই তো যুক্তি, ইহাই তো প্রমাণ। বুদ্ধি যেন স্তব্ধ হইয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে সাড়া পাইতে দেরী হয় না—সমস্ত ব্যাপারটা যেন একেবারে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। সরস ও অনায়াস-লব্ধ analogy এবং অপরূপ পরিবেশ-সৃষ্টিতে তাঁহার মত কৃতিত্ব আর কাহারও আছে বলিয়া জানি না; ইহারাও যেন তাহার যুক্তি-প্রমাণের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া বুদ্ধিকে নিরস্ত্র করিয়া দেয়। সুগভীর চিন্তাশীল রচনায় এমন কাব্যগুণের পরিচয় বোধ হয় অতুলনীয়। যে-কোনো লেখা পড়িলেই এ-কথা বুঝিতে বাকী থাকে না যে, ইহার লেখকের ভিতরকার গড়ন সাহিত্যিকের গড়ন, ভিতরকার রূপ কবির রূপ।

কিন্তু, দৃষ্টান্ত উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। তবে, ভয় হয়, একটু ভুল বুঝিবার কারণ হয়ত থাকিয়া গেল। এ-কথা যেন কেহ মনে না করেন, রবীন্দ্রনাথ কবি, কবিকুলগুরু ছাড়া আর-কিছুই নহেন। আমি পূর্ব্বাহ্লেই বলিয়াছি, তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। এ-কথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যতখানি সত্য, আজিকার পৃথিবীর আর কোনো জীবিত মানুষের পক্ষেই তাহা ততখানি সত্য নয়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সুবিপুল সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সমক্ষে, বিরাট personality-র সম্মুখে শুধু স্তব্ধ হইয়া যাইতে হয়; কোনো কিছু বলিবার ইচ্ছা থাকে না। কত বিচিত্র দিকে তাঁহার প্রতিভা বিকাশ লাভ করিয়াছে, কোন্ দিক্ ছাপাইয়া কোন্ দিক্‌টি যে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হঠাৎ কিছু ধারণাই হয়ত করা যায় না। এ-কথা সত্য যে, কোনো নির্দ্দিষ্ট এক-একদিকে কাহারও প্রতিভার দীপ্তি হয়ত রবীন্দ্রনাথকে-ও ম্লান করিয়াছে; কিন্তু সৃষ্টি, চিন্তা ও কর্ম্মের সকল-

দিকে কাহার-ও প্রতিভা এমন অম্লান দীপ্তি লাভ করিয়াছে, পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান কালে আর তো দেখি না। প্রতিভার এই সুবিপুল ঐশ্বর্য্য শুধু রবীন্দ্রনাথেরই। বাঙলা দেশের সমতলক্ষেত্রে তিনি যেন উত্তুঙ্গ গৌরীশঙ্করের সূর্য্যকরোজ্জ্বল শুভ্র শিখরের মত দাঁড়াইয়া আছেন; সে-শিখরের উচ্চতাকে খর্ব্ব করিতে পারে, এমন আর কেহ নাই। সেই দুরারোহ শিখরের তলদেশে দাঁড়াইয়া আমরা শুধু পুলকে, স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকি। আমাদের জাতীয় জীবনে, বিশেষ করিয়া আমাদের বাঙলা দেশের জীবনধারায় তিনি ভাগীরথীপ্রবাহের সঞ্চার করিয়াছেন। যে-জীবন ঘরের দাওয়ায় পুকুর-পাড়ে বটের ছায়ে কাটিতেছিল, বৃহৎ পৃথিবীর জীবনস্রোতের সঙ্গে তিনি তাহার সংযোগ সাধন করিয়াছেন। তিনি বাঙলা ভাষা-সরস্বতীর লজ্জা ও জড়তা ঘুচাইয়া তাহার মধ্যে সুনিপুণ নৃত্যের গতিবেগ ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, এবং বাঙলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করিবার মর্য্যাদা দান করিয়াছেন।

> "গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া কবিতায়, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে যে সুবিপুল সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। শিক্ষিত বাঙালী যে-ভাষা ব্যবহার করেন, বাঙালী কবিরা যে-ছন্দ লইয়া নাড়াচাড়া করেন, মধ্যবয়স্ক বাঙালী যে উচ্চ অঙ্গের চিন্তাধারায় পরস্পর ভাববিনিময় করেন, তাহাতে প্রায় অধিকাংশই তাঁহার দান। অথচ তাহা এত অলক্ষিতে আমরা গ্রহণ করিয়াছি যে, বিশেষ অনুধাবন না করিলে তাহা আমাদের চোখেই পড়ে না।" (কবি-পরিচিতি—ভূমিকা; শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত))

একথা যথার্থ। কিন্তু ইহাই শুধু নয়; বাঙলা দেশের চেয়ে সবচেয়ে বড় জিনিষ আমি মনে করি, বাঙালীর জীবনে একটি সুকুমার রুচি ও অনুভূতি, একটি শ্রী ও সৌন্দর্য্যের চেতনা, এবং তাহার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় একটি সুকুমার সৌষ্ঠব সৃষ্টির সজাগচেষ্টা তিনি জাগাইয়াছেন। কিন্তু এ তো গেল বাঙলা দেশের কথা। সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে-ও তাঁহার প্রভাবের পরিমাণ কম নয়। আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় জীবনে নবজাগ্রত চৈতন্যের মূলে রহিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ, এ-কথা সকলেই জানেন, আমি-ও

আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি। আর ভারতবর্ষের শিক্ষা, সাধনা, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তিনি যেমন করিয়া তাঁহার জীবনে ও কর্ম্মে রূপদান করিয়াছেন, এমন আর কে করিয়াছে? ভারতবর্ষের বাহিরে বিশ্বসভ্যতায়-ও তিনি যাহা দান করিলেন, তাহার মূল্য কিছু কম নয়। যে-অজ্ঞাত লোকের রূপ ও রহস্য আজ য়ুরোপীয় সাহিত্যকে আবেগচঞ্চল করিয়াছে, যে-আলোক-পন্থা সে-সাহিত্যে একটা নূতন চেতনা আনিয়া দিয়াছে, তাহার মূলে অন্য সাহিত্যগুরুদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-ও নাই, এ-কথা কি করিয়া বলিব? কিন্তু সর্ব্বোপরি, পশ্চিমকে রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, একটা নূতন ভাবধারা, সমাজে ও রাষ্ট্রে মুক্তির এক নূতন বাণী। পশ্চিমের জড়যান্ত্রিকতার, লোলুপ সভ্যতার মধ্যে গলদ কোথায়, এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি, রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম পশ্চিমকে তাহা শুনাইয়াছেন, এবং পশ্চিম তাহা শুনিয়া শ্রদ্ধায় পুলকে বিস্ময়ে তাঁহার কাছে মাথা নত করিয়াছে। কিন্তু এইখানে-ই তো তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও প্রতিভার বিকাশ শেষ হইয়া যায় নাই। আমাদের দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, পল্লীশ্রীর সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে, দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার দানের কথা সকলেই জানেন। ইহার প্রত্যেকটি রবীন্দ্রনাথের নিজের চিন্তা ও কর্ম্মের প্রকাশ, একটিও অন্য কাহার-ও বুদ্ধি বা আদর্শ দ্বারা প্ররোচিত হয় নাই। শুধুই কি তাই? বাঙলা দেশে গান, অভিনয় ও নৃত্যকলার এক নূতন স্রোত তিনি বহাইয়াছেন, এবং ইতিমধ্যেই তাহা একটি বিশেষ ভঙ্গী লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের সাধনা ও ইতিহাসের মর্ম্মস্থলকে তিনি আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, সুকঠিন দার্শনিক তত্ত্বের রহস্য তিনি আমাদের কাছে সরলতর করিয়াছেন, মানুষের সঙ্গে বিশ্বজীবনের নিগূঢ় আত্মীয়তার সম্বন্ধকে তিনি আমাদের কাছে সহজ করিয়াছেন, এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সাহায্যে সৃষ্টির বিচিত্রতাকে একান্তভাবে উপভোগ করিয়াও তাহাকে এক শুভ্র নিরঞ্জনের মধ্যে উপলব্ধি করিবার যে-রহস্য, তাহা আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই যে বিচিত্র চিন্তা ও কর্ম্মের প্রবাহ, বিচিত্র প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম্মকে যখন একটু দূর হইতে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখি,

আমার কেবলই মনে হয়, এই সব-কিছুর মধ্যে একটিমাত্র রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যেন আমি পাই—তিনি কবি, কবিকুলচূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ। আমার কেবলই মনে হয়, কবি রবীন্দ্রনাথই তাঁহার বিচিত্র চিন্তা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার জনক। যেদিক্ হইতে তাঁহাকে দেখি, সেই দিক্ হইতে মনে হয়, সকলের ঊর্দ্ধে তাঁহার শুভ্র সুউন্নত শির। তাঁহার জ্ঞানরাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য্য, তাঁহার বুদ্ধি ও চিন্তার দীপ্তি বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান ও চিন্তার জগৎ-টিকে আলোকিত করিয়াছে। কর্ম্মের ক্ষেত্রে-ও তাঁহার মত অক্লান্ত কর্ম্মী কয়জন? এই সত্তর বৎসর বয়সে-ও কি তাঁহার কর্ম্মচেষ্টার কোনো বিরাম আছে? দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সখ্য ও শান্তি স্থাপন করিয়া পৃথিবীকে মহামানবের মিলনক্ষেত্র করিবার জন্য, শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে শিক্ষা, জ্ঞান ও সমবায়ের এক নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য যে-পরিশ্রম তিনি এই বয়সে-ও করিতেছেন, তাহার কি কোন তুলনা আছে? আর এই কর্ম্মপ্রচেষ্টা-ও তো কিছু গতানুগতিক পথ ধরিয়া নয়, এখানে-ও তাঁহার দুর্জ্জয় প্রদীপ্ত প্রতিভার চিহ্ন সুপরিস্ফুট! কিন্তু আমি চেষ্টা করিলাম তাঁহার জীবন ও কর্ম্মকে একটা সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিতে—সকল বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও কর্ম্মকে দূর হইতে এক করিয়া। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন,

> "নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না।......নানাখানা ক'রে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্ত্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তা'তে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হ'য়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে দেখ্‌তে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝ্‌তে পেরেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্ম্মের উপলক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নানা জনের গোচর হ'য়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই।......" (প্রবাসীর ক্রোড়পত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮; সপ্ততিতম জন্মোৎসবে কবির অভিভাষণ)।

যাহা হউক, এই সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিলে কখন-ও ভুল হইবার কারণ নাই যে, রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান জগতের চিন্তাবীর ও জ্ঞানীশ্রেষ্ঠদের অন্যতম, বিশ্বমানবের সুদীর্ঘ যাত্রাপথের যাঁহারা অগ্রণী তাঁহাদের তিনি অন্যতম; কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও আমাদের মনের মধ্যে জুড়িয়া বসিবার যথেষ্ট কারণ আছে, যে, সকলের উপরে রবীন্দ্রনাথ কবি, কবিকুলগুরু। আমরা জানি, এক সূর্য্যের শুভ্র আলোকচ্ছটা পৃথিবীতে বিচ্ছুরিত হইয়া পত্রে-পুষ্পে জলে-স্থলে বিচিত্র বর্ণ ধারণ করে—রবীন্দ্রনাথের কবিমানস সেই এক শুভ্র জ্যোতি বহুধা বিচ্ছুরিত হইয়া বিচিত্র বর্ণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ভালই হইল যে, সর্ব্বোপরি রবীন্দ্রনাথ কবি। কারণ, কবি যিনি বিশ্বচিত্তের তিনি দূত, বিশ্বরূপ রচনা করিতে করিতে তিনি চলেন সূর্য্যের উদয়াচল হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত। কবিই একমাত্র বোদ্ধা, একমাত্র জ্ঞাতা। বিশ্বভুবনের বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও আনন্দকে একমাত্র কবিই আমাদের কাছে প্রকাশ করেন, 'নবো নবো ভবসি জায়মানোহ্নাংকেতুরুষ সামেষ্যগ্রম্'—নব নব দিনে নিত্য নবীন হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন, ঊষাকে তিনিই আবাহন করিয়া দিনের সূচনা করেন, একটি মাত্র লোকে বাস করিয়া সর্ব্বলোকের রহস্য তিনি জানেন, দেখিতে পান। যে রস ও সৌন্দর্য্যের দৃষ্টি দিয়া এই বিশ্বজীবনকে আমরা পাই, ভোগ করি, সে দৃষ্টি কবিই আমাদের দিয়াছেন। 'ন ত্বদন্যঃ কবিতরো ন মেধয়া ধীরতরো স্বধাবন। ত্বং তা বিশ্বা ভুবনানি বেত্থ। সখা নো অসি পরমং চ বন্ধু।' কবি অপেক্ষা ধ্যানবলে বলীয়ান্ কেহ নাই, কবি অপেক্ষা জ্ঞানবলে বলীয়ান্ কেহ নাই। বিশ্বভুবন সবই তিনি জানেন। তিনি আমাদের সখা, তিনিই আমাদের পরম বন্ধু।

——————রবীন্দ্রনাথ সেই কবি।

প্রণাম

—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

সেদিন নিশীথভোরে শয্যা ছাড়ি' মাঠে বাহিরিনু ভ্রমণের আশে,—
সুপ্তির জড়তামগ্ন স্খলিত আঁধার-সমাবৃত ধরাশিরে ভাসে
অস্তোন্মুখ ম্লান শশী, মিলায় নীলিমাপ্রান্তে খদ্যোতের শিখা,
তবুও বিস্ময়ে হেরি, ধীরে ধীরে পূর্ব্বাশায় ভেদি' কুজ্ঝটিকা,
জ্যোতি উদ্ভাসিল যেন নব জাতকের জন্মে মাতৃহর্ষ-ধারা।
বিহঙ্গ ধরিল গীতি কুলায়ে কুলায়ে, বায়ু দিল পুষ্পবৃন্ত নাড়া,
পল্লীর কল্যাণী বধূ স্মিত-শান্ত মুখে ত্বরা হ'ল গৃহকর্ম্মে রতা,
গোষ্ঠপথে রাখালের বংশীধ্বনি শুনি' মুঞ্জরিল বনে স্বর্ণলতা।
গাভী-আগে বৎসতরী ধাইল কৌতুকে পুচ্ছ তুলি' অঙ্গ আকুলিয়া,
মন্দিরে মন্দ্রিল শঙ্খ, মন্দিরার তালে বৈরাগীর ভজন-অমিয়া॥

অকস্মাৎ কোথা হ'তে মায়াবীর যাদুমন্ত্রবলে হইল উদ্ভব
গগনে সে-শুভলগ্নে দেব দিবাকর,—শিরে তার অতুল বিভব
ব্রহ্মাণ্ডের মূল-প্রাণ-মণি-গাঁথা বিজয়ীলাঞ্ছন প্রদীপ্ত মুকুট;
হিমসিক্ত বনশীর্ষ ধরি' প্রতিচ্ছবি-আভা তার হ'লো হেমকূট।
নব রৌদ্রালোকে শিশু প্রাঙ্গণেতে নামি' কলভাষে আরম্ভিল খেলা,
কৃষাণ চলিল ক্ষেত্রে শস্য-আহরণে, মাঝি গাঙে ভাসাইল ভেলা,
পাঠশালে ছাত্রদল মাতিল গুঞ্জনে, মহাজন খুলিল বিপণি,
শূন্যপথ পূর্ণ হ'লো জনতার স্রোতে, উদ্যমেতে ভরিল অবনী।
বিস্ময়বিমুগ্ধ মনে চেয়ে থাকি আঁখি বিস্ফারিয়া পূর্ব্বাচল পানে
বুঝিনা রহস্য কিছু। মৃতদেহে সঞ্চারে জীবন—কী গুণ সে জানে!
পঙ্গুরে লঙ্ঘালো গিরি, মূকে যেবা করিল মুখর, আঁধারেতে আলো
জ্বালালো যে; একখানি পূর্ণ শতদল পদ্ম সম নিখিলে ফুটালো,
মনে মনে যাও বুঝিলাম, ভাষা দিয়া মুখে তাহা অবর্ণনীয়,
তবু বর্ণিবারে বলি,—প্রাণ মোর নিল জেনে তাঁরে আত্মার আত্মীয়।

যেথা হ'তে আদি অভ্যুত্থান, চলিয়াছি মাগি' যেথা চরম বিলয়,
যে যাহা ভাবুক অন্য, আমি জানি যে আমার সুচির আশ্রয়,
সেই যে পরম বন্ধু প্রিয়তম মম ওই তাঁরি প্রেমের প্রতীক,
সুন্দরের লীলা-পরিচয়ে অগ্রদূত উজলিয়া চলে দশদিক।

সেদিন প্রথম অর্ঘ্য সঁপিলাম তাঁহারি উদ্দেশে ভক্তি-নত শিরে ;
ধরণীর এত কাছে ধরা দিল স্বপ্নের দেবতা এত ভাগ্য কি রে !
বেলা বাড়ে, জ্যোতি খরতর ; সে যত নিবিড় করি' বেড়িবারে আসে
প্রীতি-পরিচয়-ডোরে, আমি দেখি তাঁরে, দূর হ'তে দূর পরবাসে
সরিল ভ্রূকুটি হানি' মৃত্তিকানিবাসী তুচ্ছ নর মানবেরে।
তাঁরি রশ্মিজালে চিনি আপনা ও বিশ্বজন সবে, চলি পথ হেরে'।
সঙ্কীর্ণ ভঙ্গুর পাত্রে ধরিতে সহিতে নারি' বিপুল মহিমা
আঁখি ফিরাইয়া লই, ভাবি সে থাকুক ঊর্দ্ধে নিয়ে দেবত্ব-গরিমা।
বিক্ষুব্ধ কৌতুকী চিত্তে অথচ উদ্যানে হেরি নব ঘন-পত্র-শ্যাম
মালতী অপরাজিতা পুষ্পকর প্রসারি' হরষে দাঁড়ায়ে সুঠাম,
অঙ্গুলি পূরিয়া লয় সৌরকর-সুধাসঞ্জীবনী, বাড়ে দিনে দিনে।
বক্রবুদ্ধি ভাবাকুল বিকারী মোদের প্রাণ যারে আগে বেশি চিনে
অভিমানে অবিশ্বাসে কৃতজ্ঞতা ভুলিয়া নিমেষে তারে পর করে,—
দুর্ব্বলতা হেতু যত ক্ষতিদুঃখে জর্জ্জরে নিজেরে—সে-সবার তরে
পরোক্ষে তাহারে করে দায়ী। গৃহ-আবরণ-কোণে গিয়ে দ্বার আঁটে,
খর্ব্ব হয় সীমার পীড়নে।

ওদিকেতে সুবিস্তীর্ণ শস্যপূর্ণ মাঠে
অপরাহ্ণ-রৌদ্রচ্ছায়া খেলে ঝিকিমিকি। পশ্চিমেতে বেলা এল নামি',
গাভী গেল গোষ্ঠে, পাখী ফিরিল কুলায়ে, ক্রমে সূর্য্য অস্তাচলগামী।
এবার আবার তাঁরে পাইলাম কাছে, প্রতিবেশীরূপে দিল দেখা,
দিক্‌চক্র পরিক্রমি' ক্লান্ত দেহভার, আননেতে রক্তরাগ-রেখা।
এতক্ষণে হতগর্ব্ব, সদয় ধরার ধূলা 'পরে ;—মনে হ'লো আশা,
—তাই কোনো কোণে এক মৃন্ময়কুটীরে বাসা খোঁজে, চায় ভালোবাসা

অমনি মুহূর্ত্তে মন আবার লুলিল কল্পনায়, ভাবাবেশে হইল বিহ্বল,
সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে নেত্র মুদি' বন্দনাতে হৃদি-পদ্মদল,
নিঃশেষেই নিবেদন করিল তাঁহারে ধুয়ে মুছে বিক্ষোভের গ্লানি ;—
ঘরে এল বুঝি হারাধন দীর্ঘ বিচ্ছেদের 'পরে যবনিকা টানি' !
—এ কী, শেষে গেল কোথা নয়ন মেলিতে মিলাইয়া কামনার ধন !
সারানিশি শিলাসম অচল রহিনু পড়ি', খুঁজিয়া না পাইনু জীবন,
লক্ষ লক্ষ তারা ফুটে হিরণবরণী, শশী সে-ও শোভিল বিমান,
কান্তারে তারাও বটে মণি ছড়াইল ;—কিন্তু কই সেই খরসান
খড়্গধার জ্যোতি, যাহে রাতের কুহেলিক্লিন্ন হীন জড়ত্বের মায়া
ছুঁইতে না ছুঁইতেই শূন্যে লীন, যাঁর বিকিরণে তেজপুঞ্জ-কায়া
লভিয়া মানব চলে জীবনের সার্থকতাপথে নব কালে কালে।
"আগে তাঁরে ভালো ক'রে না জানিতে মন, অবহেলে কী রত্ন হারালে !"
—এই মত ধিক্কারেতে হিয়া দহি' দুঃস্বপনে কাটিল ত্রিযাম,
নিশান্তে জাগিয়া দেখি দ্বারে আগে তাঁরি দরশন, পূর্ণ মনস্কাম।
তেমনি পূরব-নভে জ্যোতিমালে সাজি' দিগ্বিজয়ী অভিযানমুখী,—
সে-রূপ নেহারি' সবে জাগে নবোদ্যমে দৃপ্ত দৃঢ় নব আশে সুখী।
সেদিন বেড়াতে পথে বিচারি' বুঝিনু সত্য মনে,—এই সে নবীন
প্রিয়তম দূত মম, এনেছহে ক্ষণিক মরীচিকা। এরে প্রদক্ষিণ
করি' চলিয়াছে নিরবধি কাল-রথ আরোহিয়া বিপুলা পৃথিবী ;
ক্ষুদ্র মোরা জীবধারা স্ফুলিঙ্গের মতো সে ঘূর্ণনে জ্বলে' উঠি, নিভি।
সে রয়েছে নিত্য স্ব-আসনে অম্লান ভাস্বর—নাহি ক্ষয় ক্ষতিলেশ,
শুধু হেথা চক্রপথে আবর্ত্তের মুখে এ মর্ত্ত্যের যখন যে-দেশ
ফিরে আসে তাঁর দিকে, সেথা হয় দিবার উন্মেষ, অন্যদিকে তাঁরি
রাত্রি হয় ঘন-ঘোরতরা। মোরা অজ্ঞানতাবশে বুঝিতে না পারি,
এ সকলি প্রকৃতির লীলা। হায় হায় করি তাঁরে হারালে বারেক ;
সে বিশুদ্ধ নির্ব্বিকার নিয়ত ঢালিছে প্রাণে প্রবাহের বেগ
দাতার স্বভাবে বিশ্বে। না রাখি' অপেক্ষা কারো কোনো স্তুতিনিন্দাগীতে
যে পায় সৌভাগ্যবলে আহরিতে কণা তার সেই ধন্য ধরণীতে।

ভাবিতে ভাবিতে চিত্তে ফুটিল সেদিন যেন নয়নেতে সে কী নব বিভা!
পথের বালুকারাশি হেরি সে-প্রভাতরৌদ্র মাখি' সাজিয়াছে কী বা
চূর্ণ চূর্ণ হীরকের মতো। দিশি-দিশি হ'তে আসি' বর্ণ-গন্ধ-গীতি
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল কত যত্নভরে তাঁর মধুময় প্রীতি।

এবার জ্ঞানেতে শুদ্ধ ভক্তিপ্লুত মনে আপনারে বিলাতে উৎসুক,
সহসা সরণী-পার্শ্বে "উদয়ন"-দ্বারে; দেখি, কবি, তব দীপ্ত মুখ
নবোদিত সূর্য্যপানে আছে উন্মুখিয়া; যেন সখাসম্মিলনে
শুধাও কুশলপ্রশ্ন। অঙ্গ তব মাখি' দ্যুতিজাল ছিল বদ্ধ আলিঙ্গনে।
উদার ললাটে তব প্রতিফলি' পীতরৌদ্র কী যে করিল ইঙ্গিত,
অমনি হৃদয় মম তোমারি চরণোপান্তে গিয়া হ'লো উপনীত।
দেব সূর্য্য মানবের নেত্রগ্রাহ্য হ'য়ে নররূপে এলে ধরাধাম,
এ-কথা জানিয়া মন সেদিন হইতে পদে তব রাখিল প্রণাম॥

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবির জীবনের সপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হোলো; বিধাতার এই আশীর্ব্বাদ কেবল আমাদিগকে নয়, সমস্ত মানবজাতিকে ধন্য ক'রেচে। সৌভাগ্যের এই স্মৃতিকে আনন্দোৎসবে মধুর ও উজ্জ্বল কোরে আমরা উত্তরকালের জন্য রেখে যেতে চাই, এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও এই পরিচয়-টুকু তা'দের দিয়ে যাবো যে, কবির শুধু কাব্যই নয় তাঁকে আমরা চোখে দেখেচি, তাঁর কথা কানে শুনেচি, তাঁর আসনের চারিধারে ঘিরে বস্‌বার ভাগ্য আমাদের ঘটেচে। মনে হয়, সেদিন আমাদের উদ্দেশেও তারা নমস্কার জানাবে।

সেই অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ আজকের এই সাহিত্য-সভা। সাহিত্যের সম্মিলন আরও অনেক বসবে, আয়োজনে প্রয়োজনে তাদের গৌরবও কম হবে না; কিন্তু আজকের দিনের অসামান্যতা তা'রা পাবে না। এ'তো সচরাচরের নয়, এ বিশেষ একদিনের, তাই এর শ্রেণী স্বতন্ত্র।

সাহিত্যের আসরে সভা-নায়কের কাজ করবার ডাক ইতিপূর্ব্বে আমার আরও এসেচে, আহ্বান উপেক্ষা করতে পারিনি, নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করেও সসঙ্কোচে কর্ত্তব্য সমাপন ক'রতে এসেচি; কিন্তু এই সভায় শুধু সঙ্কোচ নয়, আজ লজ্জা বোধ করচি। আমি নিঃসংশয় যে, এ গৌরব আমার প্রাপ্য নয়, এ-ভার বহনে আমি অক্ষম। এ আমার প্রচলিত বিনয় বাক্য নয়, এ আমার অকপট সত্য কথা।

তথাপি আমন্ত্রণ অস্বীকার করিনি। কেন যে করিনি, আমি সেইটুকুই শুধু ব্যক্ত কোরব।

আমি জানি, বিতর্কের স্থান এ নয়, সাহিত্যের ভালোমন্দ বিচার, এর জাতিকুল নির্ণয়ের সমস্যা নিয়ে এ পরিষদ আহূত হয় নি—তার প্রয়োজন যথাস্থানে—আমরা সমবেত হয়েচি বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে দিতে, তাঁ'কে সহজভাবে বল্‌তে—কবি, তুমি অনেক দিয়েচো, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েচি। সুন্দর, সবল, সর্ব্ব-

সিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়েচো তুমি, দিয়েচো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েচো অপরূপ সাহিত্য, দিয়েচো জগতের কাছে বাঙ্‌লার ভাষা ও ভাব-সম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েচো যা' সকলের বড়—আমাদের মনকে দিয়েচো তুমি বড় ক'রে। তোমার সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আমার সাধ্যাতীত—এ আমার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ; প্রাজ্ঞমান যাঁরা, যথাকালে তাঁরা এর আলোচনা কর্‌বেন; কিন্তু তোমার কাছে আমি নিজে কি পেয়েছি, সেই কথাটাই ছোট ক'রে জানাবো ব'লেই এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্‌লাম।

ভাষার কারুকার্য্য আমার নেই। ওতে যে পরিমাণ বিদ্যা এবং শিক্ষার প্রয়োজন, সে আমি পাইনি; তাই, মনের ভাব প্রচলিত সহজ কথায় বলাই আমার অভ্যাস,—এবং এমনি কোরেই ব'ল্‌তে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্গ্রহ এসে বিঘ্ন ঘটালে। একে আমি বিখ্যাত কুড়ে, তাতে বায়ু-পিত্ত-কফ-আদি আয়ুর্ব্বেদোক্ত চরের দল একযোগে কুপিত হ'য়ে আমাকে শয্যাশায়ী করে দিলে। এমন ভরসা ছিল না যে, নড়তে পারবো। কিন্তু একটা বিপদ এই যে, চিরকাল দেখে আসচি, আমার অসুখের কথা কেউ বিশ্বাস করেনা; যেন ও আমার হ'তে নেই। কল্পনায় স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম, সবাই ঘাড় নেড়ে স্মিত হাস্যে বল্‌চেন, উনি আসেননি ত? এ আমরা জান্‌তাম। সেই বাক্যবাণের ভয়েই আমি কোনমতে এসে উপস্থিত হয়েচি। এখন দেখ্‌চি ভালই করেচি। এই না-আসতে পারার দুঃখ আমার আমরণ ঘুচতনা। কিন্তু যা লিখে আনবার ইচ্ছে ছিল, সে হ'য়ে ওঠেনি। একটা কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করেচি, তার চেয়েও বড় কৈফিয়ৎ আছে। মানুষের অল্পসল্প পাওয়ার কথাই মনে থাকে, তাই লিখ্‌তে গিয়ে দেখ্‌লাম কবির কাছ থেকে পাওয়ার হিসাব দিতে যাওয়া বৃথা; দফা-ওয়ারি ফর্দ্দ মেলেনা।

ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধ'রে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বা'র হই। ঠিক বিশ্ব কবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হ'লে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জ্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর-অভ্যর্থনার পালা শেষ হ'লে অভিভাব-

কেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান ক'রে দেন। সেখানে আর-এক দফা সম্বর্দ্ধনা লাভের পর আবার বোধোদয়, পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্টসরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাগরেদি সুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ-যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার তেম্নি তাদের আপ্যায়ন সম্বর্দ্ধনার ঘটা—এমনি কোরে বোধোদয়, পদ্যপাঠ ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল।

এলাম সহরে, একমাত্র বোধদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্ত্তি ক'রে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাশে; তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাব শতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু প'ড়ে যাওয়া নয়, মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘট্‌লো চোখের জলে। তারপরে বহুদুঃখে আর-এক দিন সে-মিয়াদ্‌ও কাট্‌লো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোনো উদ্দেশ্য আছে।

যে-পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য; সেখানে সবাই চায় পাশ করতে এবং উকীল হ'তে; এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্য্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ; কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের জড় ক'রে তিনি একদিন প'ড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের "প্রকৃতির প্রতিশোধ"। কে কতটা বুঝ্‌লে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়েছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চ'লে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘট্‌লো, এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়। এর পরে এ-বাড়ীর উকীল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইল না, আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরোনো পল্লী-ভবনে। কিন্তু এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙ্গা দেরাজ থেকে খুঁজে বের কোরলাম "হরিদাসের গুপ্তকথা" আর বেরোলো "ভবাণী পাঠক"।

গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ্‌ছেলের অপাঠ্যপুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই কোরে নিতে হলো আমাকে বাড়ীর গোয়াল ঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানিনে।

একই স্কুলে বেশি দিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাষ্টার মশাই স্নেহবশে একদিন এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হলো সহরে। বলা ভাল, এর পরে আর স্কুল বদ্‌লাবার প্রয়োজন হয়নি। এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না, প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হ'য়ে গেল। বোধ হয়, এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়, লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হ'য়েছে; কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তারপরে এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'চ্চে। ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে প'ড়লো। সে দিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনো দিন ভুল্‌বো না। কোনো কিছু যে এমন ক'রে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায় এর পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এত দিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক প'ড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, একথা সত্য নয়। ওইতো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এতবড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি। ভুলেই গেলাম যে, জীবনে একটা ছত্রও কোনো দিন লিখেচি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র ক'রে কি ক'রে যে নবীন বাঙ্‌লা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভ'রে উঠলো, আমি তার কোনো খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোনো দিন ঘনিষ্ঠ হ'বারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন; এইটা

হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও সাহিত্য; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বারবার ক'রে প'ড়েছি,—কি তার ছন্দ, ক'টা তার অক্ষর, কা'কে বলে Art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটেছে কি না,—এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হ'তেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক'রে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হ'য়ে গেছে। থাকি প্রবাসে,—সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম,—ভয়ের কথা মনেই হোল না। আর কোথাও না-হোক্, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা করতে আমি পারিনে, কিন্তু ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ওর অন্তরের সন্ধান আমাকে দিয়েছে। পণ্ডিতের তত্ত্ববিচারে তা'তে ভুল যদি থাকে তো থাক্, কিন্তু আমার কাছে সেই সত্য হ'য়ে আছে।

জানি, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় এ সকল অবান্তর, হয়ত বা অর্থ-হীন; কিন্তু গোড়াতেই আমি ব'লেচি যে, আলোচনার জন্য আমি আসিনি, এর সহস্র ধারায় প্রবাহিত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের বিবরণ দেওয়াও আমার সাধ্যাতীত, আমি এসেছিলাম শুধু আমার ব্যক্তিগত গোটাকয়েক কথা এই জয়ন্তী-উৎসর্গ সভায় নিবেদন ক'রে যেতে।

কাব্য, সাহিত্য ও কবি রবীন্দ্রনাথকে আমি যে-ভাবে লাভ ক'রেছি, তা জানালাম। মানুষ-রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমি সামান্যই এসেছি। কবির কাছে একদিন গিয়েছিলাম বাঙ্গলা সাহিত্য সমালোচনার ধারা প্রবর্তিত করার প্রস্তাব নিয়ে। নানা কারণে কবি স্বীকার করতে পারেননি, তার একটা হেতু এই দিয়েছিলেন যে, যার প্রশংসা করতে তিনি অপারগ, তার

নিন্দে করতেও তিনি তেম্‌নি অক্ষম। আরো বলেছিলেন যে, তোমরা যদি একাজ কর, কখনো ভুলোনা যে অক্ষমতা ও অপরাধ এক বস্তু নয়। ভাবি, সাহিত্য-বিচারে এই সত্যটা যদি সবাই মনে রাখ্‌ত!

কিন্তু, এই সভার অনেকখানি সময় নষ্ট করেছি, আর না। অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্ব্বাচন করারই এটা দণ্ড। এ আপনাদের সইতেই হবে। সে যাই হোক্, রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এ সমাদর ও সম্মান আমার আশার অতীত। তাই সকৃতজ্ঞচিত্তে আপনাদিগকে নমস্কার জানাই।*

* রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ